তবকাত-ই-আকবরী

[প্রথম খণ্ড]

আহমদ ফজলুর রহমান
অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮

[জুন, ১৯৭১]

বাএ/৯৪৬

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ

(পাঠ্য পুস্তক বিভাগের সৌজন্যে

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক

ফজলে রাব্বী

পরিচালক

প্রকাশন মুদ্রণ বিক্রয় বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর

আবু আব্বাস

বিপাশা মুদ্রণ

৪৮, হৃষিকেশ দাস রোড

ঢাকা-১

প্রচ্ছদ

রফিকুন্নবী

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা।

সূচীপত্র

তবকাত-ই-আকবরী

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

সর্বোচ্চ প্রশংসা সেই প্রকৃত নৃপতিরই প্রাপ্য যিনি পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থায় ভাঙ্গাগড়া আর মানব জাতির ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ রাজাদের ও বিজ্ঞ শাসকদের মহান অস্তিত্বের উপর ভারার্পণ করেন ; আর ধর্ম ও শাসনের আইন কানুন প্রয়োগ ও রক্ষণ করিবার ব্যাপারে এই সব মহান লোকদের চরিত্রে মহত্ত্ব, ও ঔদার্য, দয়ার্দ্রতা এবং দৃঢ়তা ও করুণা ও রোষ প্রদান করেন। আর আল্লাহর সিংহাসনের ন্যায় উচ্চ প্রার্থনা সেই কাফেলাসমূহের নেতাদেরই প্রাপ্য যাহারা সত্য পথ অনুসরণ করেন এবং নির্বোধ পরিব্রাজকদের ধর্মহীনতার অন্ধকার হতে পথ প্রদর্শন করিয়া সত্যের উজ্জ্বল প্রান্তরে আনয়ন করেন আর যাহারা হতবুদ্ধিতার মরুভূমিতে বিচরণ করেন তাহাদিগকে আল্লাহর আলোকের প্রাচুর্যের সহায়তায় এবং আল্লাহর মহান দীপ্তির মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণতার বেহেশতে লইয়া যান। আর বিশেষভাবে সৃষ্টির ঐ সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং আল্লাহর সাহায্য ও অনুপ্রেরণার সর্বশেষ প্রতীক, যাহার সমুন্নত প্রকৃতি আল্লাহর দীপ্তির অংশ এবং যাহার মহান নির্যাস আল্লাহর পবিত্রতারই অংশ ; পৃথিবী আর আকাশ যাহার আলোকের প্রতিচ্ছবি, আর সকল শূন্যতা ও সৃষ্টি যাহার চিন্তার নির্যাস ; আর যাহারা তাহার ইচ্ছার রাজপথে বিচরণ করেন এবং পদে পদে তাহার অনুসরণ করিয়া মিলনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে পৌঁছেন।

কিন্তু ইহার পর এই তুচ্ছ পরমাণু—নিযাম উদ্দীন আহমদ, মুহম্মদ হাকিম হারাভির পুত্র, যিনি মহান সম্রাটের মহান দরবারের একজন নগণ্য ভৃত্য ও বিশ্বাসী অনুচর, আর সেই মহাসম্রাট হইলেন পৃথিবীর সুলতানদের সুলতান, আল্লাহর পরোপকারী প্রতিচ্ছায়া, সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি, বিশ্ব বিজয়ের খুঁটিসমূহের সুদৃঢ়কারী, পৃথিবী শাসনের নিয়ম কানুনের প্রতিষ্ঠাতা, সমস্ত পৃথিবী এবং ইহার সকল অধিবাসীর শাসনকর্তা, সকল কালের এবং সকল জিনিসের প্রভু, আল্লাহর সকল রহস্যের প্রতীক, আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের রূপ পরিগ্রহকারী, সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী বিজয়ী এবং সর্বাপেক্ষা সফল শাসনকর্তা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রণক্ষেত্রের সিংহ, আবুল ফতেহ জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ ; আল্লাহ তাহার প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্য যেন চিরস্থায়ী এবং তাহার ন্যায়পরায়ণতা ও পরোপকারিতার ভাব যেন পূর্ণ করেন।

—তাহার সুযোগ্য পিতার উপদেশ অনুযায়ী তাহার শৈশবকাল হইতেই তিনি ইতিহাস পুস্তকসমূহ পাঠে মনোযোগ দেন, যাহা অধ্যয়নশীলদের বুদ্ধিমত্তা উজ্জ্বল করে আর বুদ্ধিমানদিগকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া অনুপ্রাণিত করে। আর অস্তিত্বের এমন পথের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিব্রাজকদের বিবরণ পাঠ দ্বারা, যাহা আত্মার অগ্রগতির অনুরূপ, তাহার স্বভাবের মরিচা ঘষিয়া ফেলে।

আর হিন্দুস্তানের এই মহাদেশে, যাহা বহু আবহাওয়া সম্বলিত এক বিস্তৃত ভূভাগ আর যাহা, যাহারা পৃথিবীর আয়তন পরিমাপ করিয়াছে তাহাদের মতে ভূপৃষ্ঠের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ, বিভিন্ন সময়ে আর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নৃপতিগণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে আর নিজদিগকে সুলতান আখ্যা দিয়া দেশটি শাসন করিয়াছে ; আর ঐ সব কালের লেখকগণ বিজয় অভিযান এবং ঐ সব অঞ্চলের শাসন সম্বন্ধে বিবরণ দিয়া তাহাদের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। এইভাবে দিল্লী, গুজরাট, মালব, বাঙ্গালা এবং সিন্ধুর ইতিহাস রক্ষিত আছে ; আর অনুরূপভাবে হিন্দুস্তানের সকল প্রদেশ ও অংশের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই সব লেখকের কেহই কোন একটি প্রদেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন নাই। অথবা সমস্ত ভারত আর ইহার রাজধানী দিল্লী সম্বন্ধেও কোন সম্পূর্ণ ইতিহাস সংকলিত হয় নাই। একমাত্র পুস্তক যাহা কিছুটা খ্যাতি অর্জন করিয়াছে তাহা হইল তবকাত-ই-নাসিরী, যাহাতে মিনহাজ সুলতান মুইযুদ্দিন ঘোরির রাজত্বকাল হইতে শুরু করিয়া সামসুদ্দীনের পুত্র নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের এক বিবরণ দিয়াছেন। আবার সুলতান নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকাল হইতে সুলতান ফিরোযের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন যিয়া বরণী। সুলতান ফিরোয-এর রাজত্বকাল হইতে বর্তমান শাসন আমল পর্যন্ত কালের বেশীর ভাগ সময়ে এই দেশে মহাবিশৃঙ্খলা বিরাজ করিয়াছে। সুতরাং লোকদের কোন মহান সম্রাটের দ্বারা শাসিত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, এই অক্ষম লেখক পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান সত্ত্বেও এই কালের শুধু মাত্র বিচ্ছিন্ন সংকলন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে ; আর এমন কোন ইতিহাসের সন্ধান পায় নাই যাহাতে সম্পূর্ণ হিন্দুস্তানের বিবরণ লিখিত আছে।

বর্তমানে যখন হিন্দুস্তানের সমস্ত প্রদেশ এবং বিভাগসমূহ আল্লাহর প্রতিনিধি মহান সম্রাটের বিশ্ববিজয়ী তরবারি দ্বারা বিজিত হইয়াছে, আর বহু মিলিত হইয়া এক হইয়াছে এবং যেহেতু ভারতের বাইরের বহু দেশ, যেগুলি পূর্বের মহা সুলতানদের কেহই কখনও জয় করিতে পারেন নাই, তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে আর আশা করা যাইতেছে, যে মহান সম্রাটের শুভসূচক পতাকার অধীনে সপ্ত জলবায়ুর

অধীনে এই দেশ সুখ ও শান্তির আবাসে পরিণত হইবে, তখন এই নির্বোধ লেখকের মনে হইয়াছে যে তাহার উচিত সত্য ও আন্তরিকতার কলম দ্বারা একটি সুসম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা যাহা ইহার বিভিন্ন অংশে সকল ভাষায় সবুক্তগীনের সময় হইতে যাহার আরম্ভ হয় আঃ হি ৩৬৭[১] সনে যখন হিন্দুস্তানে প্রথম ইসলামের সূচনা হয়, আঃ হি ১০০১[২] সন পর্যন্ত অর্থাৎ ইলাহী সনের ৩৭তম বৎসর পর্যন্ত সময়ের হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের এক বিবরণ হইবে; এই ইলাহী বৎসরের সূচনা হয় আল্লাহর প্রতিনিধি মহান সম্রাটের সিংহাসনারোহণের যুগান্তকারী সময় হইতে; আর ইহার প্রতিটি অংশের শেষ দিকটা মহান সম্রাটের বিজয়ী বাহিনীর বিজয়ের কাহিনী দ্বারা অলংকৃত হইবে, যাহা প্রকৃতপক্ষে এক মহান ইতিহাসের ভূমিকা স্বরূপ হইবে। অতঃপর সেই মহান সম্রাটের রাজত্বকালের বিজয়াভিযান ও ঘটনাসমূহের প্রত্যেকটির উপযুক্ত স্থানে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে। এই সব ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ আকবর-নামা নামক মহা ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, যাহা সকল উৎকর্ষতার প্রতীক, সকল সত্য ও জ্ঞানের অধিকর্তা, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জগতের উৎকর্ষের স্বরূপ মহান সম্রাটের প্রিয়পাত্র, সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সকল উৎকর্ষ ও মর্যাদার মুখবন্ধ, আবুল ফজল তাহার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং চিরকালের এক ইতিহাসে পরিণত করিয়াছেন।

এই পুস্তক সংকলনে যে সব ইতিহাস গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে সেইগুলির নাম হইল তারিখ-ই-ইয়েমেনী, তারিখ-ই-জয়নুল আকবার, রৌযাত-উস-সাফা, তাজ-উল-মা'সির, তবকাত-ই-নাসিরি, খাযাইন-উল-ফতুহ, তুঘলকনামা, তারিখ-ই-ফিরোয শাহী: লেখক যিয়া বরণী, ফতুহাত-ই-ফিরোযশাহী, তারিখ-ই-মুবারক শাহী, তারিখ-ই-ফতুহ-ই-সলাতিন, মা'সির-মুহম্মদ-শাহী-গুজরাটি, তারিখ-ই-মাহমুদ শাহী মান্দভী; তারিখ-ই-মাহমুদ শাহী, খুর্দ মান্দভী, তবকাত-ই-মাহমুহ শাহী গুজরাটি, তারিখ-ই-বাহাদুর শাহী, তারিখ-ই-বাহমনী, তারিখ-ই-নাসিরী, তারিখ-ই-মুজাফফর শাহী, তারিখ-ই-মির্যা হায়দার কাশ্মিরী, তারিখ-ই-কাশ্মির, তারিখ-ই-সিন্দ্, তারিখ-ই-বাবরী, ওয়াকায়াত-ই-বাবরী, তারিখ-ই-ইব্রাহিম শাহী, ওয়াকায়াত মুশতাকী, জান্নাতবাসী মহান সম্রাট হুমায়ুন বাদশাহের ওয়াকায়াত—আল্লাহ তাহার কবর সমুজ্জ্বল করেন।

১. আঃ হি ৩৬৭ সনে অর্থাৎ খ্রীঃ ৯৭৭ সনে সবুক্তগীন যবনীর প্রধান হন, কিন্তু আরও কণ বৎসর গত হইবার পূর্বে তিনি ভারত আক্রমণ আরম্ভ করেন নাই, অর্থাৎ তাহার ভারত আক্রমণ আরম্ভ হয় ৯৮৬-৮৭ খ্রীঃ।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ দেওয়া আছে; আর একটিতে আছে আঃ হিঃ ১০০২।

যেহেতু এই সংকলনটিতে হিন্দুস্তানের সকল রাজার সম্বন্ধেই অধ্যায় দেওয়া আছে, আর আল্লাহর প্রতিনিধি মহান সম্রাটের সম্বন্ধীয় মহান অংশটি অন্যান্য অংশের শেষে আছে, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে তবকাত-ই-আকবর শাহী, আর ইহা এক চমৎকার যোগাযোগ যে নিযামী শব্দটাতে সংকলনকারীর নামের অংশ আছে আর ইহাতে সংকলনের তারিখটি নিহিত আছে। আশা করা যায় যে, বিস্ময়কর ঘটনাসমূহের এই ইতিহাস বুদ্ধিমানগণকে তথ্য যোগাইবে আর লেখকের উপকার করিবে।

এই পুস্তকে থাকিবে একটি উপক্রমণিকার অংশ,[১] নয়টি অংশ আর একটি সমাপ্তি। ভূমিকার অংশটিতে থাকিবে আঃ হি ৩৬৭ সনে সবুক্তগীনের রাজত্বের শুরু হইতে আঃ হি ৫৮২ সন পর্যন্ত একশত পনের বৎসরের ঘটনায় পনের জন রাজার ইতিহাস। নয়টি অংশ হইবে, (১) দিল্লী সম্বন্ধে একটি অংশ, ইহা আরম্ভ হইবে সুলতান মুইযুদ্দীন ঘোরির রাজত্বকাল হইতে, যিনি সর্বপ্রথম দিল্লী অধিকার করিয়া তথায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, আর আল্লাহর প্রতিনিধি, মহান সম্রাটের শুভসূচক শাসন পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে, যাহাতে ছত্রিশ জন রাজার ইতিহাস থাকিবে, আর যাহা আরম্ভ হইবে আঃ হি ৫৭৪ সনে শেষ হইবে আঃ হি ১০০২ সনে, চারিশত আটচল্লিশ[২] বৎসর সময়ের ইতিহাস: (২) দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে একটি অংশ যাহাতে আঃ হি ৭৪৮ সন হইতে আঃ হি ১০০২ সন পর্যন্ত, দুইশত পঞ্চান্ন বৎসরে ছত্রিশ জন রাজার ইতিহাস থাকিবে; (৩) গুজরাট সম্বন্ধে একটি অংশ, যাহার সংখ্যায় ষোল জন রাজা আঃ হি ৭৯২ সন হইতে আঃ হি ৯৮০ পর্যন্ত, একশত সাতাশি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (৪) বাঙ্গালা সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে আঃ হি ৭৪১ সন হইতে আঃ হি ৯৩৯ সন পর্যন্ত—একশত আটানব্বই বৎসরে একুশ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; (৫) জৌনপুর সম্বন্ধে একটি অংশ যেখানে সাতানব্বই বৎসরে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন: (৬) মালব সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে বারজন রাজা একশত আটান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; (৭) কাশ্মির সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে দুইশত পয়তাল্লিশ বৎসরে ছাব্বিশ জন রাজা ছিলেন; (৮) সিন্ধু সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে দুইশত ছত্রিশ বৎসরে একুশ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; এবং (৯) মুলতান সম্বন্ধে একটি অংশ, যেখানে আশিটি বৎসরকাল মধ্যে পাঁচ জন রাজত্ব করেন। সমাপ্ত অংশটিতে থাকিবে হিন্দুস্তান সম্বন্ধে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং অন্যান্য কয়টি বিষয়।

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই অংশগুলির পর্যায়ক্রম সম্বন্ধে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়।

২. ৫৭৪ সন হইতে ১০০২ সন পর্যন্ত সময় ৪২৮ বৎসর হয়, কিন্তু সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই ইহা ৪৪৮ বৎসর দেওয়া আছে।

উপক্রমণিকা অংশ

ঘযনীন রাজাদের বিবরণ সম্বলিত[১]

রাজাগণ হইলেন ঃ

১. সুলতান নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন, তিনি বিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

২. সুলতান মাহমুদ ইয়েমিনুদ্দৌলাহ, তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

৩. সুলতান মুহম্মদ, পিতা সুলতান মাহমুদ, তাহার রাজত্বকাল পঞ্চাশ দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

৪. সুলতান মাসুদ, পিতা, সুলতান মাহমুদ, তিনি রাজত্ব করেন এগার বৎসর।

৫. সুলতান মওদুদ, পিতা সুলতান মাসুদ, তাহার রাজত্বকাল নয় বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

৬. সুলতান মুহম্মদ, সুলতান মওদুদের পুত্র, তাহার রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

৭. সুলতান আলী, সুলতান মাসুদের পুত্র, তিনি মাত্র তিন মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৮. আবদুর রশিদ, মাসুদের পুত্র, তিনি চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৯. ফররুক নিযাদ, মাসুদের পুত্র, তিনি ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১০. ইব্রাহিম, মাসুদের পুত্র, তিনি ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, আর কাহারও মতে বিয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১১. মাসুদ, ইব্রাহিমের পুত্র, তিনি ষোল বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১২. আরসলান শাহ, মাসুদের পুত্র, তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৩. বহরাম শাহ, মাসুদের পুত্র, তিনি পয়ত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৪. খুসরু শাহ, বহরাম শাহ-র পুত্র, তিনি আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৫. খুসরু মালিক, খুসরু শাহের পুত্র, তিনি আটাশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে রাজাদের নামে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। একটি পাণ্ডুলিপিতে রাজাদের নামের তালিকার গোলমাল আছে, আর একটিতে মাত্র বারজন রাজার নাম আছে।

১। আমীর নাসিরুদ্দীন সবুক্তগীন

তিনি ছিলেন আলবতিগীনের তুর্কী জাতীয় একজন ক্রীতদাস, আবার আলবতিগীন ছিলেন সামানী নূহের পুত্র আমীর মনসুরের ক্রীতদাস আর তাহার চাকুরীতে আমীর উল উমরা[১] পদে উন্নীত হন। আমীর মনসুরের প্রতিপত্তির সময়ে আমীর নাসিরুদ্দীন আলবতিগীনের পুত্র আবু ইশহাকের সঙ্গে বুখারায় আগমন করেন; আর তাহার চাকুরীতে তাহার প্রতিনিধির পদে উন্নীত হন। আবু ইশহাক যখন আমীর মনসুরের প্রতিনিধিরূপে ঘযনীর গভর্ণর নিযুক্ত হন, তখন তিনি শাসন কার্য আমীর নাসিরুদ্দীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান এবং তাহার শাসনে পূর্ণ শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করে। আবু ইশহাক যখন কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়াই পরলোকগমন করেন, তখন সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ আমীর নাসিরুদ্দীনের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া নেন[২] এবং তাহার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি মহা উৎসাহের সঙ্গে শাসনকার্য আরম্ভ করেন এবং দেশ-বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেন।

আঃ হি ৩৬৭ সনে বাস্তের ভূতপূর্ব রাজা তুঘান, যিনি পাতিউয নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, আমীর নাসিরুদ্দীনের নিকট আগমন করেন এবং তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমীর নাসিরুদ্দীন তাহার সেনাবাহিনী সহ অগ্রসর হন এবং পাতিউযের নিকট হইতে বাস্ত ছিনাইয়া নেন এবং তাহা তুঘানের হস্তে অর্পণ করেন; তুঘান যথেষ্ট পরিমাণ কর দিতে স্বীকৃতি হন এবং এক চুক্তি সম্পাদন করেন যে তিনি কখনও আনুগত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না। পরবর্তীকালে তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং আমীর নাসিরুদ্দীন ঐ দেশ হইতে তাহাকে বিতাড়িত করেন এবং তথায় তাহার নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

যেহেতু কুশদার দুর্গটি তাহার রাজ্য সীমার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল আর ইহার শাসনকর্তা নিজের স্বাধীনতা জাহির করিত, আমীর নাসিরুদ্দীন সহসা তাহাকে অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং তাহাকে বন্দী করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে তাহার কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন; আর তাহাকে কুশদারের শাসনকর্তা রূপে পুনর্বহাল করেন।

১. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী আলবতিগীন ছিলেন আমীর মনসুরের আমীর-ই-হাজিব অর্থাৎ গৃহাধ্যক্ষ।

২. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী ইশহাকের উত্তরাধিকারী ছিলেন আমীর বলকাতিগীন, আর তিনি দশ বৎসরকাল শাসন করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, আঃ হি ৩৫৫ সনে ইশহাক ইন্তেকাল করেন আর বলকাতিগীন ইন্তেকাল করেন আঃ হি ৩৬২ সনে। ফলে তাহার শাসনকাল দাঁড়ায় মাত্র সাত বৎসর। বলকাতিগীনের মৃত্যুর পর আলবতিগীনের অপর এক ক্রীতদাস পিরে শাসনকর্তা হন, কিন্তু আঃ হি ৩৬৭ সনে তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং শাসনভার সবুক্তগীনের হস্তগত হয়।

ইহার পর রাজকীয় উদ্যম ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি এক ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন আর বহু যুদ্ধবন্দী ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য আনয়ন করেন; আর যে সব দেশ তিনি জয় করেন সেগুলির প্রত্যেকটিতে তিনি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন; আর সেই সময়ে তিনি হিন্দুস্তানের শাসনকর্তা রাজা জয়পালের রাজ্য বিধ্বস্ত এবং জনশূন্য করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। জয়পাল তাহার রাজ্য আক্রমণে বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া এবং এই আক্রমণের ফলে রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার ফলে, এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ, যাহাতে বহু বিরাট আকারের হস্তীও ছিল, আমীর নাসিরুদ্দীনকে আক্রমণ করেন। আমীর তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং তাহার নিজের রাজ্য সীমার নিকটে তাহার সম্মুখীন হন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাতে আমীর নাসিরুদ্দীনের পুত্র আমীর মাহমুদ অসম সাহস ও মহা বীরত্ব প্রদর্শন করেন। উভয় বাহিনী কয়েকদিন পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া অপেক্ষা করিল। এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহারা বলে যে ঐ অঞ্চলে একটা ঝরণা ছিল। কোন প্রকারে ইহাতে কাদা বা ময়লা কিছু নিক্ষেপ করা হইলে ঝড় উত্থিত হইত আর প্রবল তুষার ও বৃষ্টিপাত সংঘটিত হইত। আমীর মাহমুদ ইহাতে ময়লা নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিলেন এবং যখন ইহা করা হইল তখন প্রচণ্ড ঝড় ও প্রবল তুষারপাত হইল; আর জয়পালের সেনাগণ অধিক শীতে অভ্যস্ত না থাকার ফলে অত্যন্ত দুর্দশায় পতিত হইল এবং বহু অশ্ব ও অন্যান্য প্রাণী নিহত হইল। জয়পাল ভয়ানক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং স্থির হইল যে তিনি পঞ্চাশটি হস্তী ও প্রচুর ধনরত্ন আমীর নাসিরুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করিবেন; আর তাহার কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া যাইবেন আর তাহার সঙ্গে আমীর নাসিরুদ্দীনের কতিপয় বিশ্বাসী অনুচরকে লইয়া যাইবেন; যাহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে ধনরত্ন ও হস্তীসমূহ প্রদান করিতে পারেন।

কিন্তু তিনি যখন তাহার স্বদেশে পৌঁছিলেন তখন তিনি সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিলেন এবং তিনি যে লোকদের প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের কারারুদ্ধ করিবার প্রতিশোধরূপে আমীর নাসিরুদ্দীনের প্রতিনিধিগণকে কারারুদ্ধ করিলেন। আমীর নাসিরুদ্দীন যখন এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প করিয়া তাহার সৈন্যদলসহ অগ্রসর হইলেন। জয়পাল হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজাদের সাহায্য চাহিলেন এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এবং বহু হস্তী সংগ্রহ করিয়া তাহার মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলেন, আর উভয় বাহিনী লামঘানের সন্নিকটে পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। আমীর নাসিরুদ্দীন জয় লাভ করিলেন এবং যুদ্ধবন্দী, হস্তী এবং ধনরত্নসহ

প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হইল। জয়পাল হিন্দুস্তানে পলায়ন করিলেন এবং লামঘান দেশটি আমীর নাসিরুদ্দীনের দখলে আসিল এবং তথায় তাহার নামে খোৎবা পাঠ ও মুদ্রার প্রচলন করা হইল।

ইহার পর তিনি সামানী মনসুরের পুত্র আমীর নূহকে সাহায্য করিতে গমন করিলেন; আর খুরাসানে এবং মাওয়ারুন্নাহারে তিনি বহু বিজয় লাভ করিলেন; আর আঃ হি ৩৮৭ সনের শাবান মাসে মহান আল্লা তা'আলার আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিলেন, "এই যে আমি"। তাহার রাজত্বকাল বিশ বৎসরের অধিক কাল বিস্তৃত হইয়াছিল।

২। সুলতান মাহমুদ সবুক্তগীন

সবুক্তগীনের ইন্তেকালের পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর ইসমাইল তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন আর আমীর মাহমুদকে তাহার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার সংকল্প করিলেন, কিন্তু শেষোক্ত জন তাহাকে পরাজিত করিলেন এবং তাহার পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি তাহার সেনাবাহিনী বলখ অভিমুখে পরিচালনা করিলেন এবং খুরাসান দেশটি তাহার অধীনে আনয়ন করিলেন। তিনি যখন ঐ দেশটিকে ও তাহার শত্রুদিগকে সমূলে ধ্বংস করিলেন এবং তাহার অসীম ক্ষমতা নাকাড়ার শব্দ সর্বদিকে বিস্তৃত হইল তখন বোগদাদের খলিফা আল কাদির বিল্লাহ আব্বাসী তাহাকে একটি সম্মানীয় পোষাক প্রেরণ করিলেন, ইহা ইতিপূর্বে যে কোন খলিফা কর্তৃক যে কোন বাদশাহকে প্রেরিত পোষাকের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিল, আর তাহাকে আমীর-উল-মিল্লাত ওয়া ইয়েমিন উদ্‌দৌলত[১] উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

আঃ হিঃ ৩৯০ সনের যিলকাজা মাসের শেষভাগে সুলতান বলখ[২] হইতে

---

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এইরূপই আছে, কিন্তু তবকাত-ই-নাসিরীতে তাহার যে নাম ও উপাধি দেওয়া আছে তাহা হইল এই সুলতান-উস-আযম ইয়েমিন উদ্‌দৌলা নিযামুদ্দীন আবুল কাসিম মাহমুদ-ই গাজী, তিনি যখন সম্মানীয় অঙ্গাবরণটি লাভ করেন তখনই তিনি বোগদাদের খলিফার নিকট হইতে সুলতান-ই-ইয়েমিন উদ্‌দৌলা উপাধি লাভ করেন। কিন্তু অপর এক বিবরণ অনুযায়ী, তিনি যখন অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা সিজিস্তানের তাক দুর্গটি অধিকার করেন তখন তাহার শাসনকর্তা খালাফকে যখন তাহার সম্মুখে বন্দী করিয়া আনয়ন করা হয় তখন খালাফ তাহাকে সর্বপ্রথম 'সুলতান' বলিয়া সম্বোধন করেন। কথিত আছে যে, ইহাতে মাহমুদ এত খুশী হন যে, তিনি খালাফের প্রাণ রক্ষা করেন।

২. পূর্ববর্তী বৎসরে অর্থাৎ আ: হি ৩৬৯ সনে মাহমুদ নুহ সামানীর পুত্র আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ করেন। ইহার অল্প পরেই সামানী বংশ বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর ঐ বৎসর হইতেই মাহমুদের স্বাধীনতা গণ্য করা যাইতে পারে। সবুক্তগীন ইহার কিছু পূর্বেই বলখে তাহার

হিরাতে গমন করিলেন এবং তথা হইতে তিনি সিসতানে[১] গমন করিলেন এবং ঐ দেশের শাসনকর্তা, আহমদের পুত্র খালাফকে পরাজিত করিয়া ঘযনীন আনয়ন করিলেন। ঘযনী হইতে তিনি হিন্দুস্তানের প্রতি মনোযোগ দিলেন; কতিপয় দুর্গ অধিকার করিলেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অতঃপর তিনি আইলাক খানের সঙ্গে এক মিত্রতা স্থাপন করিলেন[২] এবং উভয়ের মধ্যে স্থির হয় যে মাওয়ার-উন-নাহার আইলাক খানের অধিকারে থাকিবে আর বাকী সব স্থান সুলতানের অধীনে থাকিবে।

আঃ হিঃ ৩৯১ সনের শাওয়াল মাসে সুলতান ঘযনীন হইতে পুনরায় হিন্দুস্তান অভিযান করিলেন এবং দশ সহস্র অশ্বারোহীসহ পরশাওয়ার[৩] আক্রমণ করিলেন। রাজা জয়পাল দশ বা বার সহস্র অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্য এবং তিন শত হস্তীসহ তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হন। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সন্নিবেশ করেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ বিজয়ী হন। রাজা জয়পাল তাহার পনর জন পুত্র ও ভ্রাতাসহ বন্দী হন এবং যুদ্ধে পাঁচ সহস্র কাফের নিহত হয়। কথিত আছে যে জয়পাল তাহার গলায় একটি জহরতের হার পরিধান করিয়াছিলেন, যাহাকে হিন্দুস্তানের ভাষায় বলা হয় 'মালা', অভিজ্ঞ লোকেরা ইহার মূল্য নির্ধারণ করেন এক লক্ষ আশি হাজার দিনার আর তাহার ভ্রাতাদের গলায়ও মহামূল্য হার ছিল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় আঃ হিঃ ৩৯২ সনের ৮ই মহরম শনিবার দিন। ঐ স্থান হইতে সুলতান জয়পালের বাসস্থান বাহিন্দা[৪] গমন করেন এবং ঐ দেশটি অধিকার করেন আর বসন্তকালে ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন।

রাজধানী স্থাপন করেন; আর এই সময়ে ইহাই ছিল মাহমুদের রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু দেখা যায় যে ইহার কিছু পরেই তিনি ঘযনীকে তাহার রাজধানী করেন, কারণ আঃ হিঃ ৩৯২ সন হইতে তিনি ঘযনীন হইতেই তাহার অভিযানসমূহে যাত্রা করিতেন এবং অভিযান শেষে বসন্তকালে তথায় প্রত্যাবর্তন করিতেন।

১. ইহাকে সিজিস্তানও বলা হয়। মাহমুদ তাক দুর্গটি অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা অধিকার করেন এবং খালাফকে বন্দী করেন।

২. সম্ভবতঃ আঃ হিঃ ৩৯৬ সনে ইহা সংঘটিত হয়, ঐ সময়ে সুলতান মাহমুদ, বঘরা খানের পুত্র তুর্ক আইলাক খানের নিকট সন্ধির শর্ত দিয়া এক দূত প্রেরণ করেন এবং দেশ বিভাগের প্রস্তাব দেন। ইতিমধ্যে সামানী বংশের শেষ প্রতিনিধিকে নিহত করিবার ফলে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৩. ইহা আধুনিক পেশোয়ার কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ শেষোক্ত শহরটিকে বাবর আকবরের সময় পর্যন্তও 'বগ্রাম' বলা হইত।

৪. মেজর রাভার্টী এই স্থানটিকে পাতিয়ালা রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বাথিণ্ডা বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন।

আঃ হিঃ ৩৯৩ সনের মহরম মাসে তিনি পুনরায় সিসতানে গমন করিলেন এবং খালাফকে পুনরায় পরাজিত করিয়া তাহাকে ঘযনীনে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান অভিযান করেন আর ভাতিয়া দখল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মুলতান রাজ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন এবং ভাতিয়ার সম্মুখে শিবির স্থাপন করেন। ঐ স্থানের রাজা বহিরা, যিনি তাহার বিশাল সেনাবাহিনী, অত্যধিক হস্তীর সংখ্যা এবং দুর্গের শক্তি সম্বন্ধে গৌরব করিতেন, সুলতানকে বাধা দিবার জন্য তাহার সৈন্যদের রাখিয়া, তিনি তাহার অল্প সংখ্যক অনুচরসহ সিন্ধু নদীর তীরে গমন করেন। সুলতান যখন ইহা জানিতে পারিলেন তিনি রাজাকে আক্রমণ করিবার জন্য কিছু সৈন্য প্রেরণ করিলেন, আর শেষোক্ত জন এই সৈন্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিজের ছোরা দ্বারা নিজেকে আঘাত করিয়া নিজের জীবনের অবসান ঘটান; আর তাহার শির সুলতানের নিকট আনয়ন করা হয়। সুলতান তাহার বহু অনুচরকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেন এবং হস্তী, যুদ্ধবন্দী এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং হিন্দুস্তানের মনোরম উৎপন্ন দ্রব্য-সম্ভার হস্তগত করিয়া ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন। লুণ্ঠিত জিনিসের মধ্যে দুই শত আশিটি হস্তী ছিল।

কথিত আছে যে নসরের পুত্র, মুলতানের শাসনকর্তা দাউদ মুলাহিদা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সুলতান ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাস্তি দিতে সংকল্প করেন। ফলে তিনি মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন; আর তাহাকে অতর্কিত আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে এক ঘুর পথ অবলম্বন করেন। জয়পালের পুত্র আনন্দ পাল, যাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তাহার অগ্রগমনে বাধা দান করেন আর সুলতান তাহার সৈন্যগণকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে এবং তাহার দেশ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিতে নির্দেশ দান করেন। আনন্দ পাল অপদস্থ হইয়া কাশ্মিরের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন আর সুলতান সিন্ধু[১] নদী অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া মুলতান পৌঁছেন এবং সাতদিন ধরিয়া তাহা অবরোধ করিয়া রাখেন। মুলতানের শাসনকর্তা বাৎসরিক বিশ সহস্র দিরাম কর দিতে সম্মত হন এবং তাহার পূর্বের ভুল স্বীকার করিয়া সত্য ধর্মের অনুশাসন পালন করিতে অঙ্গীকার করেন। সুলতান এই শর্তাধীনে তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৩৯৬ সনে।

আঃ হিঃ ৩৯৭ সনে তিনি তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, যাহার বিবরণ অধিকতর বিশদ ইতিহাসসমূহে দেওয়া আছে আর যখন আঃ হিঃ ৩৯৮ সনের রবিউল আখর মাসে তিনি জয় ও সাফল্য লাভ করিয়া ঐ যুদ্ধ হইতে মুক্ত হন তখন সংবাদ

---

১. এই স্থানে অর্থ সুস্পষ্ট নয়। পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠেও সামান্য পার্থক্য আছে।

পান যে হিন্দুস্থানের রাজার পৌত্র সুখপাল, যিনি আবু আলী সিমজুরী কর্তৃক বন্দী হইয়া তাহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্মত্যাগের পথ গ্রহণ করিয়াছে এবং পলায়ন করিয়াছে। সুলতান মাহমুদ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাহাকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আঃ হিঃ ৩৯৯ সনে সুলতান পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন এবং আনন্দ পালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে ত্রিশটি হস্তী ও অন্যান্য বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করেন। অতঃপর তিনি ভীমনগর[১] গমন করেন এবং তাহা অবরোধ করেন। দুর্গের অভ্যন্তরের লোকেরা তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং দুর্গের প্রবেশ দ্বার খুলিয়া দিল। সুলতান অল্প কয়েকজন বাছাই করা সঙ্গীসহ দুর্গের অভ্যন্তরে গমন করিলেন এবং ইহার ধনরত্ন এবং রৌপ্য এবং স্বর্ণ ও হীরকসমূহ, যেগুলি ভীমের সময় হইতে একত্র সংগৃহীত হইয়া আসিতেছিল, হস্তগত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন (তিনি তাহার মঞ্চের সম্মুখে কতিপয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের সিংহাসন স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে সকল ধনরত্নই একটি বিস্তৃত প্রান্তরে ছড়াইয়া দিতে হইবে, যাহাতে এইগুলি দেখিয়া সৈন্যগণ ও লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৪০০ সনের গোড়ার দিকে।

আঃ হি ৪০১ সনে ধর্ম রক্ষাকারী সুলতান ঘযনীন হইতে অভিযান করেন মুলতান রাজ্যের যে অংশটি তিনি পূর্বে অধিকার করেন নাই তাহা দখল করিয়া নেন আর তিনি ঐ স্থানে অবস্থিত ভিন্ন মতাবলম্বী ও প্রচলিত ধর্মের বিরোধীগণকে হত্যা করেন আর তিনি তাহাদের কতিপয়ের হাত কাটিয়া দেন আর অন্যান্যদের একটি দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিবার নির্দেশ দেন; আর তাহারা ঐ স্থানেই ইন্তেকাল করে; আর এই বৎসরে তিনি নসর এর পুত্র দাউদকে ঘযনীনে নিয়া যান এবং তাহাকে ঘুরক দুর্গে প্রেরণ করেন এবং তথায় তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয় আর পরবর্তীকালে ঐ স্থানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

এই সময়ে সুলতান সংবাদ পান যে, হিন্দুস্তানে থানেশ্বর নামে এক শহর আছে আর তথায় এক সুবিখ্যাত মন্দির আছে এবং ঐ মন্দিরে জগরসোম নামে এক মূর্তি আছে, যাহাকে হিন্দুস্তানের লোকেরা পূজা করে। তিনি এক ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং আঃ হি ৪০২ সনে থানেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হন। জয়পালের পুত্র[২] ইহার সংবাদ পাইয়া এক দূত

১. কাংরা বা নগরকোট।
২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রূপ পাঠ আছে। যেমন 'জয়পাল'; 'জয়পালের পুত্র' এবং 'নারো জয়পাল' সম্ভবত জয়পালের পৌত্র ত্রিলোচন পালকে বুঝাইতেছে।

প্রেরণ করেন এবং তাহার মাধ্যমে নিবেদন করেন যে সুলতান যদি এই অভিযান হইতে বিরত থাকেন তবে তিনি কররূপে পঞ্চাশটি হস্তী প্রেরণ করিবেন। সুলতান এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না এবং তিনি যখন থানেশ্বরে পৌঁছিলেন তখন দেখিলেন শহরটি সম্পূর্ণ জনশূন্য। সৈন্যগণ যাহা কিছু পাইল তাহাই লুন্ঠন ও বিধ্বস্ত করিল, মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া দিল আর জগরসোমকে ঘযনীন নিয়া গেল। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে নামাযের স্থানের সম্মুখে এই মূর্তিটি রাখিয়া দিতে হইবে যাহাতে লোকেরা ইহাকে পদদলিত করিতে পারে।

আঃ হিঃ ৪০৩ সনে সুলতান ঘর্জিস্তান[১] জয় করেন এবং ঐ দেশের শাসনকর্তাকে যাহারা উপাধি ছিল শার, বন্দী করিয়া তাহার সঙ্গে আনয়ন করেন, আর ঐ বৎসরের শেষ দিকে বাহাউদ্দৌলার পুত্র আবুল ফাওয়ারিশ তাহার ভ্রাতাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুলতান তাহাদের নিকট পত্র লিখেন। এর ফলে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

এই বৎসরেই মিশরের শাসনকর্তার নিকট হইতে থাতি[২] নামক একজন দূত আসিল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ও খ্যাতনামা আইনজ্ঞগণ সুলতানকে বলিলেন যে এই দূত করামিতা[৩] মতবাদের অনুযায়ী। তদনুযায়ী সুলতান তাহাকে ভৎ´সনা করিবার এবং তাহার রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন।

আঃ হি ৪০৪ সনে সুলতান বালনাথ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত নন্দনা দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। নারো জয়পাল[৪] দুর্গটি রক্ষার জন্য অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের রাখিয়া গেলেন এবং স্বয়ং কাশ্মির উপত্যকায় চলিয়া গেলেন। সুলতান নন্দনায় আগমন করিয়া দুর্গটি ঘেরাও করিলেন এবং ইহা দখলের জন্য বিস্ফোরক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। দুর্গের অভ্যন্তরের লোকেরা তাহাদের নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিয়া দুর্গটি সমর্পণ করিয়া দিলেন। সুলতান মাহমুদ তাহার অল্প কয়েকজন দেহরক্ষীসহ দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় অবস্থিত সকল প্রকার ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার হস্তগত করিলেন আর সরিঘকে দুর্গের কোতোয়াল

১. কেহ কেহ এই দেশটির নাম ঘরিশস্থানও বলিয়াছেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে শাসনকর্তার কোন নাম বা উপাধি দেওয়া নাই। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে উপাধি বলা হইয়াছে। পরের আর একটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে শর্কী। তবকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদের ৮০ পৃষ্ঠার ৫নং টীকা অনুযায়ী যে শার সুলতান মাহমুদ কর্তৃক পরাজিত হন তাহার নাম ছিল আবু নসর, আর তিনি ছিলেন শার রশিদের পুত্র।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন মহারথী, ফতি, কাতি ও নিহনি।

৩. পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানের পাঠে সামান্য পার্থক্য আছে।

৪. পূর্ব পৃষ্ঠার ২নং টীকা দেখুন।

বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলেন[১] ; আর তৎপর নারো জয়পালের বিরুদ্ধে কাশ্মির উপত্যকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ঐ স্থান হইতেও পলায়ন করিলেন আর সুলতান উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবন্দী ও স্বর্ণের প্রভূত লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করিলেন এবং বহু কাফেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিযা আর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হি ৪০৬ সনে পুনরায় সুলতান কাশ্মির অভিযান করেন এবং ইহার উচ্চতা ও শক্তির জন্য সুবিখ্যাত লোহকোট[২] দুর্গ অবরোধ করেন ; কিন্তু প্রবল প্রবাহ এবং তুষারপাতের ফলে আর তীব্র শীত এবং কাশ্মিরীগণের সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবার জন্য সুলতান অবরোধ ত্যাগ করেন আর বসন্তকালে ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন।

এই বৎসরেই[৩] খোয়ারিযমের শাহ আবুল আব্বাস-ই-মামুন মাহমুদের নিকট পত্র লিখিলেন এবং তাহার ভগ্নিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিলেন আর সুলতান এই অনুরোধ অনুযায়ী তাহার ভগ্নিকে খোয়ারিযমে প্রেরণ করিলেন। আঃ হি ৪০৭ সনে একদল নীচ প্রকৃতির লোক খোয়ারিযমের শাহকে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে হত্যা করিল। সুলতান ঘযনীন হইতে বলখ গমন করিলেন এবং তথা হইতে

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই অংশের পাঠ ভিন্নরূপ যেমন : "আর জয়পাল যাহাকে পূর্বেই বন্দী করা হইয়াছিল এবং বর্তমানে দুর্গটি অধিকার করিবার জন্য সুলতানের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, ইহা দখল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিয়া ও সুলতানের লোকদের অসতর্ক দেখিয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। সুলতান ঐ উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া প্রচুর দ্রব্য-সম্ভার লুণ্ঠন করেন। "ইত্যাদি ইত্যাদি।"

২. দুর্গটির নাম বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন : কোহ কোট, কোহ, লোহ কোট এবং বুব কোট। লোহকোট লাহোরের প্রাচীন নাম আর প্রবাদ অনুযায়ী রামের দুই পুত্রের একজন লব বা লোহ ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই স্থানে বর্ণিত লোহ কোট যে লাহোর ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

৩. মেজর রাভার্টীর মতে (তবকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদ পৃঃ ৮৪, ৮ ও ৯ নং পাদটীকা) খোয়ারিযমের জুরজানিয়া নামক স্থানের শাসনকর্তা আবুল আব্বাস-ই-মামুন সুলতান মাহমুদের জামাতা ছিলেন আর তিনি আ: হিঃ ৪০৭ সনে তাহার কতিপয় সৈন্য কর্তৃক নিহত হন। মনে হয় যে আ: হিঃ ৩৮৭ সনে মাহমুদের কন্যার সঙ্গে জুরজানিয়ার ওয়ালী বা শাসনকর্তা, মামুনের পুত্র এবং মুহম্মদ আল ফারঘুনির পৌত্র আলীর সঙ্গে বিবাহ হয়। আ: হিঃ ৩৯০ সনে আলী ইন্তেকাল করেন এবং তাহার ভ্রাতা আবুল আব্বাস সিংহাসন লাভ করেন। পর বৎসর তিনি এক দূত প্রেরণ করেন, সম্ভবত এই দূতই আবু রিহান আল বিরুনী (ভারত সম্বন্ধে যাহার জ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট নির্ভর করা হইতেছে) এবং তাহার ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই পুস্তকের গ্রন্থকারের মতে তিনি পুনরায় আ: হিঃ ৪০৬ সনে সুলতান মাহমুদের নিকট তাহার ভগ্নিকে বিবাহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খোয়ারিযম দেশটি হইল অক্সাস বা জিহুন নদীর তীরে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

খোয়ারিযম আক্রমণের চেষ্টা করিলেন আর তিনি যখন ঐ দেশের সীমান্তে অবস্থিত হাসারবন্দে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি ইব্রাহীম-তা-ই-এর পুত্র মুহম্মদের নেতৃত্বে এক অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ইহারা যখন এক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া ফযরের নামাজ আদায় করিতেছিলেন তখন খোয়ারিয্মের সেনাবাহিনীর সেনাপতি খমার তাশ গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া অতর্কিতে ইহাদের আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদের বহুসংখ্যককে হত্যা করিয়া অন্যান্যদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। সুলতান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি তাহার ব্যক্তিগত ক্রীত-দাসগণের[১] বিরাট এক দলকে খমার তাশের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করিলেন আর তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া সুলতানের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। সুলতান যখন হাযারস্প দুর্গে পৌঁছিলেন তখন অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ খোয়ারিযমের বাহিনী তাহার মোকাবিলা করিতে আসিল। এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল আর শেষ পর্যন্ত খোয়ারিযমের বাহিনী পরাজিত হইল এবং তাহাদের সেনাপতি আলপ্তগীন বুখারী[২] বন্দী হইলেন। সুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ খোয়ারিযম অগ্রসর হইলেন এবং প্রথমে আবুল আব্বাসের হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দান করিলেন; খোয়ারিযম ও আরগঞ্জ[৩] তাহার নিজের গৃহাধ্যক্ষ আলতুনসাশের হস্তে অর্পণ করিলেন, আর তাহাকে খোয়ারিযমের শাহ উপাধি দান করিলেন। খোয়ারিযম হইতে সুলতান বলখে আগমন করিলেন এবং তাহার পুত্র আমীর মাসুদকে হিরাত দেশটি সমর্পণ করিলেন এবং তাহার প্রতিনিধিরূপে তাহার সঙ্গে আবু সহল মুহম্মদ বিন হুসেন রৌযানী[৪]কে প্রেরণ করিলেন আর তিনি কুরকান আমীর মুহম্মদকে প্রদান করিলেন ও আবু বকর কুহতানিকে[৪] তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

আঃ হিঃ ৪০৯ সনে সুলতান মাহমুদ কান্যকুব্জ দেশটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সেনাবাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং সাতটি ভয়ঙ্কর নদী অতিক্রম করেন আর তিনি যখন কান্যকুব্জের সীমান্তে অবস্থিত কোরায়[৫] পৌঁছান তখন ঐ দেশের রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন, আর সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং কর প্রদান করেন।

১. সুলতান মাহমুদের দরবার ৪০০০ তুর্কী যুবক পাহারা দিত, আর ইহারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইত তখন তাহারা অপর এক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইত।

২. রাভার্টী তাহার নাম লিখিয়াছেন নিয়ালতিগীন, তবে বলিয়াছেন যে বৈহাকী তাহার নাম আলবতি-গীন লিখিয়াছেন (তবকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদের ৮৪ পৃঃ ৯ নং টিকা দ্রষ্টব্য)।

৩. আরগনজ, খুরাসানের একটি শহর।

৪. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামগুলি বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে।

৫. এই সময় কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন রাজ্যপাল পরিহার, কিন্তু তাহার নাম এই ইতিহাসে দেওয়া নাই। এই স্থানে বর্ণিত রাজা সম্ভবতঃ নিকটস্থ অন্যকোন রাজা হইবে।

কান্যকুব্জ হইতে সুলতান বরন[১] গমন করেন। আর ঐ স্থানের রাজা হরদত দুর্গটি তাহার স্বগোত্রীয় লোকদের ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট সমর্পণ করিয়া স্বয়ং পলায়ন করেন। দুর্গ রক্ষী বাহিনী সুলতানকে প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া সহস্র দিরামের সহস্র গুণ, যাহার পরিমাণ হইল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, ও ত্রিশটি হস্তী কর প্রদান করেন এবং এইরূপে নিরাপত্তা লাভ করেন। ঐ স্থান হইতে সুলতান মহাওয়ান দুর্গে আগমন করেন, ইহা জুন (বা যমুনা) নদীর তীরে অবস্থিত, আর ঐ দুর্গের শাসনকর্তা, যাহার নাম ছিল কুল চন্দ্র একটি হস্তী পৃষ্ঠে চড়িয়া ঐ নদী অতিক্রম করিয়া পলায়নের চেষ্টা করেন। সুলতানের সৈন্যগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহারা যখন তাহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিল তখন তিনি তাহার ছোরা দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন।

বাঁচিয়া থাকিয়া যদি তোমার শত্রুদের আনন্দ বর্ধন করিতে হয়
তখন বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যুই অনেক শ্রেয়।

দুর্গটি অধিকৃত হইল এবং পঁচাশিটি হস্তী ও সকল হিসাবের বহির্ভূত লুণ্ঠিত দ্রব্য ইসলামের সেনাবাহিনীর হস্তগত হইল।

ঐ স্থান হইতে সুলতান মথুরা গমন করিলেন; মথুরা একটি বড় শহর এবং ইহাতে বহু মন্দির ছিল। ইহা বাসদেও-এর পুত্র কিষাণের (কৃষ্ণ) জন্মস্থান, হিন্দুদের বিশ্বাস যে কিষাণ মহা স্বয়ম্ভুর অবতার (শব্দার্থ অনুযায়ী অবতার স্থান)। সংক্ষেপে সুলতান যখন এই শহরে আসিয়া পৌঁছিলেন কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিল না; আর সুলতানের সেনাবাহিনী শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিল এবং মন্দিরগুলি জ্বালাইয়া দিল এবং প্রচুর সম্পদ লাভ করিল। একটি স্বর্ণের মূর্তি ছিল সুলতানের নির্দেশ ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইহার ওজন ছিল ৯৮৩০০ মিসকাল খাঁটি স্বর্ণ।[২] তাহারা একটি বহুমূল্য পাথর[৩] পাইল, ইহার ওজন ছিল ৪৫০ মিসকাল। তাহারা বলে যে চান্দ রায় নামে হিন্দুস্তানের এক রাজা ছিলেন এবং তাহার সুবিশাল একটি হস্তী ছিল এবং তাহা ছিল অত্যন্ত খ্যাতনামা। সুলতান ইহা ক্রয় করিতে চাহিলেন এবং ইহার জন্য প্রচুর মূল্য দিতে চাইলেন কিন্তু ইহা ক্রয় করিতে পারিলেন না। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে সুলতানের কাণ্যকুব্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় এক রাত্রে এই হাতীটি ইহার মাহুত ছাড়া পলায়ন করিল এবং সুলতানের

১. আধুনিক বুলন্দ শহর। অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে হরদব, আবদুল কাদির-ই-বদাওনীর হরদত, আর জামিউত্তাওয়ারিখের হিরদত ছিলেন মথুরার রাজা।
২. এক মিসকালের পরিমাণ হইল এক সেরের [illegible] অংশ।
৩. এই মূল্যবান পাথরটিকে বলা হইতে ইয়াকুত-ই-কুহলী। ইয়াকুত হলো হয় চুনি অথবা নীলকান্ত মণি। বিশেষণটি দ্বারা বুঝায় যে ইহার রং ছিল কুহল বা সুর্মার ন্যায়।

শিবিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শেষোক্ত জন ইহা ধরিয়া লইলেন এবং অত্যন্ত আমোদ উৎসব করিলেন ও ইহার নামকরণ করিলেন "আল্লাহর দান"। তিনি যখন ঘযনীন পৌঁছিলেন তিনি কান্যকুব্জ অভিযানে সংগৃহীত দ্রব্য-সম্ভার গণনা করিলেন; ইহার পরিমাণ বিশ দণ্ড[1] বা সহস্র দিরামের সহস্র গুণ, এবং তিপান্ন হাজার যুদ্ধ বন্দী এবং তিনশত পঞ্চাশটি[2] হস্তী।

কথিত আছে যে সুলতান যখন শুনিতে পাইলেন যে, কান্যকুব্জের রাজা তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে: এই কারণে নন্দ[3] নামে এক রাজা কান্যকুব্জের রাজাকে হত্যা করিয়াছে, তখন তিনি নন্দকে ধ্বংস করিবার দৃঢ় সংকল্প করেন এবং আঃ হিঃ ৪১০ সনে তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান অভিযান করেন আর তিনি যখন জুন নদীর তীরে পৌঁছেন, নারো জয়পাল যিনি তাহার সেনাবাহিনীর সম্মুখ হইতে বহুবার পলায়ন করিয়া গিয়াছেন, এইবার নন্দকে সাহায্য ও সহায়তা করিবার জন্য ইহার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন। যেহেতু নদীটি গভীর ছিল, সুলতানের অনুমতি ছাড়া কেহই ইহা অতিক্রম করিতে পারিত না। কিন্তু এক রহস্যজনকভাবে সুলতানের ব্যক্তিগত ক্রীতদাস বা রক্ষীদের মধ্য হইতে ষাট জন সহসা নদী অতিক্রম করিয়া যায় এবং নারো পালের সেনাবাহিনীকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেয় এবং ইহা বিধ্বস্ত করে। নারো জয়পাল কতিপয় কাফেরসহ পলায়ন করে। ক্রীতদাসগণ সুলতানের নিকট ফিরিয়া আসে না, তাহারা ঐ স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত শহরটি আক্রমণ করে; আর ইহা জনশূন্য দেখিয়া ইহা লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করে এবং মূর্তি-মন্দিরগুলি ধ্বংস করে।

ঐ স্থান হইতে সুলতান নন্দের রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হন। শেষোক্ত জনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন এবং এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেন। কথিত আছে যে, এই বাহিনীতে ছিল ৩৬,০০০ অশ্বারোহী, ১,৪৫,০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৩০০ হস্তী।[4] সুলতান যখন নন্দের সেনাবাহিনীর সম্মুখে শিবির স্থাপন করলেন, তখন তিনি প্রথমে তাহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে ও

১. অর্থ সুস্পষ্ট নয়; একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে সহস্র দিরামের সহস্র গুণ, কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপি গুলির এই স্থানের যে পাঠ দেওয়া আছে তাহার অর্থ বুঝা যায় না।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে পাঞ্জ ও ফিলসহ দুইটের মধ্যে 'দানদ' এই শব্দটি আছে। আর একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে আছে 'আনদ্', এই শব্দ দুইটির অর্থ বুঝা যায় না।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। সঠিক নামটি সম্ভবতঃ কালঞ্জরের চন্দেল রাজা গণ্ডা হইবে, ইহা আধুনিক বান্দা জেলায় অবস্থিত ছিল।

৪. এই সংখ্যাগুলি একটি পাণ্ডুলিপি হইতে নেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে সংখ্যার তারতম্য আছে একটি পাণ্ডুলিপিতে পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা দেওয়া আছে ১০৫০০০, আর একটি পাণ্ডু-লিপিতে হস্তীসংখ্যা দেওয়া আছে ৬৪০।

ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। নন্দ বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর সুলতান নন্দের সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য একটি উচ্চ স্থানে গমন করিলেন। তিনি যখন এই বিশাল বাহিনী অবলোকন করিলেন তখন তিনি তাহার আগমনের জন্য অনুতপ্ত হইলেন; আর নিবেদনের শির আনুগত্যের ভূমিতে স্থাপন করিয়া সকল করুণার আধার আল্লাহর নিকট জয় ও সাফল্য লাভের জন্য মোনাজাত করিলেন। রাত্রিতে নন্দের মনে মহা ভয় উপস্থিত হইল আর তিনি তাহার সেনাবাহিনী ও যুদ্ধের সকল অস্ত্রশস্ত্র পশ্চাতে ফেলিয়া কতিপয় বিশেষ অনুচর সঙ্গে নিয়া পলায়ন করিলেন।

পরদিন ভোরে সুলতান যখন এই সংবাদ পাইলেন, তিনি তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং শত্রু অতর্কিত আক্রমণের জন্য লুকাইয়া থাকিতে পারে এরূপ সকল সম্ভাব্য স্থান সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া শত্রুসেনাদের চিহ্নসমূহ পরীক্ষা করিলেন এবং তিনি যখন নিশ্চিত হইলেন যে কোনরূপ চাতুরী বা বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা নাই তখন তিনি তাহার ধ্বংস ও লুণ্ঠনের হস্ত প্রসারিত করিলেন।

এই একই সময়ে সংবাদ আনয়ন করা হয় যে কিরাত ও নুর নামে দুইটি উপত্যকা আছে, যাহার অধিবাসীগণ পৌত্তলিক আর তাহাদের দুর্গ আছে। সুলতান তাহার সেনাদের সমবেত করিবার নির্দেশ দিলেন আর তিনি ঐ দেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, আর বিরাট এক দল কামার, ছুতার ও পাথর কাটিবার লোক সঙ্গে নিলেন। তিনি যখন ঐ দেশে পৌঁছিলেন তখন তিনি প্রথমে কিরাত আক্রমণ করিলেন। ইহা একটি ঠাণ্ডা দেশ আর এখানে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয় এবং দেশের লোকেরা পূজা করে[১] ......। ঐ বুনোদেশটির রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলেন; আর ঐ দেশের সকল অধিবাসীই ইসলাম গ্রহণের তৃপ্তি লাভ করিল। সাহিব আলী ইবনে আলত আরসলান[২]কে নুর জয় করিবার জন্য মনোনীত করা হইল। তিনি ঐ দেশের অভিমুখে গমন করিলেন এবং তাহা জয় করিলেন এবং একটি দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং আলী ইবনে কদর জুককে ইহার কোতোয়াল বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া ঐ দেশ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ দেশেও ইসলাম প্রসার লাভ করিল, কোন কোন স্থানে লোকদের স্বইচ্ছায় আর কোথাও কোথাও তাহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম প্রচারিত হইল।

১. তাহারা যে কি পূজা করিত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। পাণ্ডুলিপিগুলিতে যাহা লিখা আছে তাহার অর্থ বোধগম্য নয়।

২, এই নামটির বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে। একটা পাণ্ডুলিপিতে আছে যাহা সাহিব আলী ইবনে আলত আরসলান, আর একটিতে আছে সাহিব আলী ইবনে ইলার মুসলমান, আর একটিতে আছে সাহিব আলী বিন ইলার সলান, আবার অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নামটির উল্লেখই নাই।

আঃ হিঃ ৪১২ সনে সুলতান কাশ্মির আক্রমণ করিলেন এবং লোহকোট[১] দুর্গ অবরোধ করিলেন। তিনি তথায় এক মাস অবস্থান করিলেন কিন্তু ইহা শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য হওয়ার ফলে তিনি ইহা দখল করিতে সক্ষম হইলেন না। তাই তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন এবং লাহোর ও বকরাহ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন[২]। পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে সৈন্যগণ নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া চলিল এবং অগণিত দ্রব্য-সম্ভার ইসলামের বাহিনীর হস্তগত হইল। জয় ও খ্যাতির মাল্য ধারণ করিয়া বসন্ত কালের প্রারম্ভে সুলতান ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হিঃ ৪১৩ সনে তিনি পুনরায় নন্দার রাজ্য আক্রমণ করিলেন আর তিনি গোয়ালিয়র দুর্গে পেঁৗছিয়া তাহা অবরোধ করিলেন। চারি দিন শেষ হইলে, দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ দূত প্রেরণ করিলেন এবং পঁয়ত্রিশটি হস্তী কর দিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সুলতান এই শর্তাবলী গ্রহণ করিলেন এবং কালঞ্জর গমন করিয়া ঐ দুর্গটি অবরোধ করিলেন। সমস্ত হিন্দুস্তানের মধ্যে শক্তি ও দুর্ভেদ্যতার জন্য এই দুর্গটি অতুলনীয় ছিল। বেশ কিছুকাল ধরিয়া অবরোধ চলিবার পর ঐ দুর্গের শাসনকর্তা নন্দা কর রূপে তিনশত হস্তী প্রদানের প্রস্তাব করিলেন এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলেন। এই হস্তীগুলিকে যখন মাহুত ছাড়া দুর্গ হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে সুলতান নির্দেশ দিলেন যে তুর্কীগণ এইগুলিকে ধরিবে ও এইগুলিতে আরোহণ করিবে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দুর্গের সৈন্যগণ অবাক হইয়া গেল; আর তুর্কীদের শক্তি সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধাবান হইল। অতঃপর নন্দা সুলতানের প্রশংসা করিয়া হিন্দী ভাষায় স্বয়ং কয়েকটি কবিতা লিখিয়া সেগুলি সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জন এই-গুলি হিন্দুস্তানের জ্ঞানী লোকদের ও তাহার অনুগামী অন্যান্য কবিদের প্রদর্শন করিলেন। তাহারা সকলেই এইগুলির প্রশংসা করিলেন। সুলতান তাহার অভিনন্দন প্রেরণ করিলেন এবং ইহার প্রতিদানে অন্যান্য উপহারসহ পনেরোটি দুর্গের কর্তৃত্ব তাহাকে দিয়া এক নির্দেশ প্রেরণ করিলেন। নন্দা সুলতানের জন্য বহু ধনরত্ন ও মূল্যবান মণি-মাণিক্যও প্রেরণ করিলেন। ঐ স্থান হইতে সুলতান জয় ও সাফল্যের সঙ্গে (ঘযনীনে) প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৪১৪ সনে সুলতান তাহার সৈন্যদের এক গণনা করেন আর দেখা

১. পূর্বেই এই দুর্গটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি লোহকোট দেওয়া আছে, আর একটিতে আছে লোদহকোট।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে স্থানটির নাম দেওয়া আছে বকরাহ, আর একটিতে আছে বকোর, আর একটিতে আছে বখবাহ। একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটী দেওয়া নাই।

যায় যে তাহার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সব দুর্গরক্ষী সৈন্য আছে, তাহাদের ছাড়াও ৫৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ১,৩০০ হস্তী আছে।

আঃ হিঃ ৪১৫ সনে সুলতান বলখ গমন করেন। সেই সময় মাওয়ার-উন-নাহারের লোকেরা আলীতিগীনের অত্যাচার সম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং সুলতান তাহাকে শাস্তি দিবার সংকল্প করেন, এবং ঐ উদ্দেশ্যে জিহুন অতিক্রম করেন। মাওয়ার-উন-নাহার-এর সরদারগণ একে একে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করেন আর তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদমর্যাদা ও অবস্থা অনুযায়ী কর প্রদান করেন। তুর্কিস্তানের সম্পূর্ণটার শাসনকর্তা ইউসুফ কদর খানও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করেন এবং বন্ধুত্ব ও অনুরাগের পরিবেশে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাহার আগমনে সুলতান আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেন; আর তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট উপহার প্রেরণ করেন। সুলতান তাহার নিকট হিন্দুস্তানের উপাদেয় জিনিসসমূহ, উজ্জ্বল মূল্যবান পাথরসমূহ, আর সুবিশাল হস্তী প্রেরণ করেন আর তাহারা শান্তি ও সৌহার্দের সহিত পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। আলীতিগীন সুলতানের উদ্দেশ্যের কথা জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন। সুলতান তাহাকে ধরিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তাহারা তাহাকে বন্দী করে এবং সুলতানের সম্মুখে আনয়ন করে। শেষোক্ত জন তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে হিন্দুস্তানের কোন একটি দুর্গে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন এবং শীতকাল তথায় অতিবাহিত করেন।

অতঃপর তাঁহার প্রথা অনুযায়ী সোমনাথ বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ হিন্দুস্তান অভিমুখে অগ্রসর হন। ইহা সমুদ্রতীরে একটি বড় শহর এবং ব্রাহ্মণদের একটি পূজার স্থান। এই শহরের মন্দিরে অনেকগুলি স্বর্ণমূর্তি ছিল আর ইহাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ মূর্তিটিকে বলা হইত মনাত।[1] ইতিহাস পুস্তকে আমি পড়িয়াছি যে শেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্বে (আল্লাহ্ যেন তাহার উপর শান্তি ও করুণা বর্ষণ করেন) এই মূর্তিটিকে কাবাগৃহ হইতে অপসারণ করা হয় এবং এই স্থানে আনয়ন করা হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাচীন পুস্তক হইতে দেখা যায় যে ইহা সত্য নহে। চারি শত বছর পূর্ব হইতেই কিষাণের (কৃষ্ণের) সময় হইতেই এই মূর্তিটি ব্রাহ্মণগণ পূজা করিয়া আসিতেছে; আর ব্রাহ্মণদের মতে এই স্থানেই কিষাণ অদৃশ্য হইয়া যায়।

১. ইসলাম প্রচারের পূর্বে মক্কার পৌত্তলিকগণের প্রধান মূর্তিটির নাম ছিল মনাত।

সংক্ষেপে, সুলতান যখন নহরওয়ালা পতন শহরে উপস্থিত হন তখন তিনি শহরটিকে জনশূন্য দেখিতে পান। তিনি তখন শস্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন এবং অতঃপর তিনি সোমনাথের পথে অগ্রসর হন। তিনি যখন সোমনাথে পৌঁছেন তখন ঐ স্থানের অধিবাসীগণ তাহার মুখের উপরে ইহার প্রবেশ দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর দুর্গটি দখল করা হয় আর লুণ্ঠন ও ধ্বংসের প্রথাসমূহ কার্যে পরিণত করা হয় আর অসংখ্য লোক নিহত হয় ও বন্দী করা হয়। মন্দির-সমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এব ইহাদের ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। সোমনাথের মূর্তি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় এবং ইহার একটি খণ্ড ঘযনীনে প্রেরণ করা হয় এবং তাহা জামে মসজিদের প্রবেশপথে স্থাপন করা হয়; আর বহু বৎসর পর্যন্ত ইহা তথায় ছিল।

সুলতান প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে তাহারা পতাকা উত্তোলন করিলেন। কিন্তু যেহেতু পথিমধ্যে হিন্দুস্তানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজাদের অন্যতম রাজা পরম দেও-এর মোকাবিলা করিবার প্রয়োজন হয়, আর যেহেতু ঐ সময়ে তিনি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না। ঐ পরিবেশে, তিনি সিন্ধুর পথে মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাহার সৈন্যগণ কয়েক স্থানে পানির অভাবে এবং অন্যান্য স্থানে পশুর খাদ্যের অভাবে অত্যধিক দুর্দশায় পতিত হয়; কিন্তু শেষপর্যন্ত অশেষ দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা ভোগ করিয়া আঃ হিঃ ৪১৭ সনে তিনি ঘযনীনে পেঁৗছেন।

এই বৎসর খলিফা আল-কাদির-বিল্লাহ সুলতানের নিকট এক পত্র লিখেন; আর তাহার নিকট খুরাসান এবং হিন্দুস্তান এবং নিমরোয এবং খোয়ারিযমের পতাকাসমূহ প্রেরণ করেন; আর ঐ চিঠিতে তিনি সুলতান এবং তাহার পুত্র ও ভ্রাতাগণকে উপাধি দান করেন। সুলতান কহফ-উদ-দৌলাহ ওয়াল ইসলাম (রাষ্ট্র ও ইসলামের গুহা বা আশ্রয়স্থল) লাভ করেন; আমীর মাসুদ লাভ করেন শাহাব-উদ-দৌলত ওয়া জামাল-উল-মিল্লাত (রাষ্ট্রের উজ্জ্বল তারকা ও ধর্মের সৌন্দর্য) উপাধি; আমীর মুহম্মদ লাভ করেন জালাল-উদ-দৌলত ওয়া জামাল-উল-মিল্লাত (রাষ্ট্রের মহত্ত্ব ও ধর্মের সৌন্দর্য) উপাধি; আমীর ইউসুফ লাভ করেন আযদ-উদ-দৌলত ওয়া মুইদ-উল-মিল্লাত (রাষ্ট্রের শক্তি ও ধর্মের সহায়ক) উপাধি · আর তিনি ঐ চিঠিতে লিখেন যে ইহাদের যে কাহাকেও তিনি তাহার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিবেন, তিনি তাহাকেই স্বীকৃতি দান করিবেন। এই চিঠি বলখে সুলতানের নিকট পেঁৗছে।

এই বৎসরেই সুলতান জাঠগণকে শায়েস্তা করিবার জন্য এক অভিযান করেন। তাহার সোমনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাহারা সেনাবাহিনীর প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার করে এবং তাহাদের যথেষ্ট বিরক্ত করে। তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ মুলতান

অভিমুখে অগ্রসর হন আর মুলতান পৌঁছিয়া তিনি নির্দেশ দেন যেন এক সহস্র চারিশত নৌকার একটি নৌবহর প্রস্তুত করা হয় আর প্রত্যেকটি নৌকায় যেন তিনটি অত্যন্ত দৃঢ় লৌহপাত শক্ত করিয়া স্থাপন করা হয়। একটি সম্মুখে আর দুইটি দুই পাশে ; যাহাতে যাহা কিছু ইহাদের উপর আঘাত করে তাহাই যেন ভাঙ্গিয়া চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। আর প্রত্যেকটি নৌকায় তীর-ধনুকে সজ্জিত বিশ জন লোক এবং বড় বড় পাত্রপূর্ণ ন্যাফথাসহ তিনি জাঠগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। জাঠগণ এই সব আয়োজন সম্বন্ধে পূর্বেই সতর্ক হইয়া তাহাদের স্ত্রী ও পরিবারদের দ্বীপসমূহে প্রেরণ করে। আর এইরূপে ভারমুক্ত হইয়া তাহাদের বিরোধিতা করিবার জন্য প্রস্তুত হয় ; নদীতে তাহাদের চার সহস্র এবং অপর এক রিপোর্ট অনুযায়ী আট সহস্র নৌকা ছিল ; আর তাহারা এইগুলির প্রত্যেকটিতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কতিপয় লোক স্থাপন করে এবং এইরূপ যুদ্ধ ও রক্ত-পাতের জন্য প্রস্তুত হয়। উভয় বাহিনী যখন পরস্পরেরর সম্মুখীন হয় তখন এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে। জাঠদের প্রত্যেকটি নৌকা যখন সুলতানের একটি নৌকার সম্মুখে আসে এবং লোহার পাতাগুলির কোন একটার সহিত আঘাত করে, তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া ডুবিয়া যায়। এইভাবে জাঠদের সকলেই ডুবিয়া যায় ; আর যাহারা ডুবিয়া গেল না, তাহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল। অতঃপর সুলতানের সৈন্যগণ তাহাদের পরিবারের উপর নিপতিত হইল ও তাহাদিগকে বন্দী করিল ; আর সুলতান বিজয়ী হইয়া ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হিঃ ৪১৯ সনে সুলতান আমীর তুষ আবুল হারব আরসলানকে বাওয়ার্দ[১] প্রেরণ করিলেন যাহাতে তিনি গিয়া তুর্কমানদের ধ্বংস করিতে পারেন। বহু যুদ্ধের পর আমীর তুষ সুলতানকে লিখিলেন যে তিনি স্বয়ং তথায় গমন না করিলে তুর্কমানদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমন করা সম্ভব হইবে না। ফলে সুলতান স্বয়ং তথায় গমন করিলেন এবং তুর্কমানদের নির্মূল করিলেন। অতঃপর তিনি রেই-এ গমন করিলেন এবং কোন প্রকার প্রচেষ্টা বা কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই ঐ দেশের শাসনকর্তাগণ কর্তৃক বহু বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত ও প্রোথিত ধন-রত্ন ও সম্পদসমূহ হস্তগত করিলেন। এই অঞ্চলে বহু সংখ্যক কাফের ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। যাহারা এইরূপ বলিয়া প্রমাণিত হইল তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রাণদণ্ড বিধান করা হইল ; রেই ও ইস্ফাহান দেশদ্বয় আমীর মাসুদের নিকট সমর্পণ করা হইল ; আর সুলতান ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১. স্থানটির নাম সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। একটি পাণ্ডুলিপিতে কোন নাম দেওয়া নাই। একটিতে যাহা আছে তাহা অনেকটা 'বাওয়াব ওয়ানসা' মনে হয়। আর একটিতে আছে বাওয়ার ওয়ানসা ; আর একটিতে আছে বাওয়ার্দুন।

ইহার পর অল্প দিনের মধ্যেই সুলতান ক্ষয় জ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং অসুখটি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তিনি অতি কার্যে নিজেকে লোকের নিকট দেখাইতে সক্ষম হইতেন, যেন তখনও তাহার পূর্বের ন্যায় শক্তিসামর্থ আছে। এই অবস্থায় তিনি বলখ গমন করিলেন; আর যখন বসন্ত কাল আসিল তখন তিনি ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন; আর তথায় এই একই রোগে তিনি আঃ হিঃ ৪২১ সনের রবিউল আযর[১] মাসের ২৩ তারিখে বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করিলেন। আল্লাহর করুণা যেন তাহার উপর বর্ষিত হয়। তাহার রাজত্বকাল পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল বিস্তৃত হইয়াছিল।

তাহারা বলে যে তিনি যখন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন সুলতান নির্দেশ দেন যে তাহার সমস্ত সম্পদ এবং তিনি যে সমস্ত মনোরম দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়াছেন সে সব যেন তাহার চোখের সম্মুখে স্থাপন করা হয়। তিনি এই সবের নিকট হইতে তাহার আসন্ন বিয়োগের জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং তীব্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, কিন্তু সামান্যতম জিনিসটিও কাহাকেও দান করেন নাই। তিনি ভারতে দ্বাদশটি অভিযানে নেতৃত্ব করেন এবং ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

৩। জালাল-উদ-দৌলাহ জামাল উল-মিল্লাত মুহম্মদ, মাহমুদের পুত্র

যে সময় সুলতান মাহমুদ এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যান, সেই সময়ে আমীর মাহমুদ ইসফাহানে[২] ছিলেন আর আমীর মুহম্মদ ছিলেন গুরগানে। সুলতান মাহমুদের আত্মীয় আমীর আলী বিন আইল আরসলান,[৩] আমীর মুহম্মদকে তলব করিলেন এবং তাহাকে ঘযনীতে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। আমীর মুহম্মদ প্রথমে অত্যাচারীদের প্রতি তাহার মনোযোগ নিবদ্ধ করিলেন। বিষয়টির সম্বন্ধে সতর্কতার সহিত চিন্তা করিলেন এবং রাজ্যের জনসংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিবার

১. মেজর রাভার্তী আজিজ আবু নসর-এর মুকামাত হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে মাহমুদ ইন্তেকাল করেন আঃ হিঃ ৪২১ সনের ১৪ই রবিউসসানী, বৃহস্পতিবার।

২. তবকাত-ই-নাসিরীর মতে তিনি তখন ইরাকে ছিলেন, তিনি ঐ স্থানে গভর্ণর ছিলেন।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে আমীর আলী বিন আবি আরসলান এবং অপর একটিতে আছে আমীর আলী ইবনে আরসলান। ফসিহ-ই তাহাকে বলেন আলী কেশওয়ান্দ; তাযকিরাত-উল-মুলুক বলেন আয়াল আরসলানের পুত্র আলী। তাহাকে আলী কুরবাত এবং আলী করিমও বলা হইত।

জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার কোষাগারের দ্বারও উন্মুক্ত করিলেন এবং উচ্চ নীচ সকলকেই ধন সম্পদ দান করিলেন। তিনি তাহার চাচা ইয়াকুবকে পিতা ইউসুফ, পিতা নাসিরদ্দীন, তাহার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রদান করিলেন; আর খাজা আবু সহল[1] আহমদ বিন আল হাসান আল হামদৌরীকে তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন এবং শাসনকার্যের সমস্ত বিষয়ের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিলেন। তাহার সময়ে কম মূল্য এবং সমৃদ্ধিশালীতা দেখা দিল; আর সকল দিক হইতেই ব্যবসায়ীগণ ঘযনীতে আগমন করিতে লাগিল; আর লোকেরা ও সেনাবাহিনী সুখে সাচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিল। ইহা সত্ত্বেও লোকের মন আমীর শিহাব-উদ-দৌলা আবু সইদ মাসুদের দিকে ঝুঁকিয়া রহিল; আর সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের পর পঞ্চাশ দিন গত হইলে আমীর আয়ায রাজকীয় ক্রীতদাস বা রক্ষীদের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করিলেন যে তাহারা মাসুদের পক্ষাবলম্বন করিবে; আর তাহারা সকলে পরস্পরের নিকট শপথে আবদ্ধ হইল; এবং তাহারা একজন লোককে আবুল হাসান আলী বিন আবদুল্লাহর, যাহাকে বলা হইত আলী দায়াহ, নিকট প্রেরণ করিল এবং তাহাকে তাহাদের দলে ভিড়াইল। পরদিন ক্রীতদাসগণ একত্র সমবেত হইল। অশ্বশালা সমূহে প্রবেশ করল এবং বিশেষভাবে সুলতানের জন্য আলাদা করিয়া রাখা অশ্বগুলিতে আরোহণ করিয়া অত্যন্ত ঔদ্ধত্য সহকারে বাহির হইয়া আসিল এবং বাস্ত অভিমুখে যাত্রা করিল। আমীর মুহম্মদ এক বিরাট বাহিনীসহ সোন্দীরায় হিন্দুকে[2] তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন। আর তাহারা যখন মোকাবিলা করিল তখন এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সোন্দী রায়-এর বহু সংখ্যক হিন্দু নিহত হইল; আর ক্রীতদাসদেরও বহু সংখ্যক নিহত হইল এবং তাহাদের শিরগুলি আমীর মুহম্মদের নিকট প্রেরণ করা হইল। আয়ায এবং আলী দায়াহ ক্রীতদাসগণসহ অগ্রসর হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিশাপুরে আমীর মাসুদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাহারা তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাহাদের ভ্রমণের ক্লেশ সম্বন্ধে বলিলেন এবং সাধারণভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ লইলেন।

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে সহল এর স্থলে সহেল আছে. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে খাজা আবু সহেল আহমদ বিন আবদুল হাসান ওয়ার্দী। তবকাত-ই-নাসিরীতে ইহার নাম লিখা আছে খাজা আবু সহল।

২. অদ্ভুত ব্যাপার এই যে ইতিমধ্যেই তাহার অধীনে হিন্দু সৈন্য ও তাহাদের হিন্দু সেনাপতি ছিল।

আমীর মুহম্মদ ঘযনীনে আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারি মাস গত হইবার পর তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাহার শিবির বাস্ত অভিমুখে অপসারণ করা হউক, আর তিনি অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত ঘযনীন হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন তিগিনাবাদ পৌঁছিলেন তখন সেনাবাহিনীর সকল সেনাপতিগণ একত্র সমবেত হইলেন। আর আমীর মুহম্মদের নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাকে জানাইলেন যে যেহেতু সকল লোকই আমীর মাস্থদের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে চায় এবং তাহাকে সুলতান স্বীকার করিতে চায়, আর যেহেতু ইহা সুনিশ্চিত যে তিনি (মুহম্মদ) তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম হইবেন না; তাহার পক্ষে উচিত হইবে তাহার নিজের উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইয়া তথায় গমন করা (অর্থাৎ কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করা), আর তাহারা তাহার নিকট গিয়া তাহাদের নিজেদের জন্য ও তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। আর তিনি তাহাকে তাহার সম্মুখে তলবও করিতে পারেন এবং তিনি ও তাহারা সম্ভবতঃ তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। আমীর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর আমীর ইউসুফ এবং আলী হাজিব এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সেনাপতিগণ আমীর মুহম্মদকে যাব[১] দুর্গে রাখিলেন। অতঃপর সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণটি, সমস্ত ধন-সম্পদসহ আমীর মাস্থদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং হিরাত গমন করিলেন। মুহম্মদের শাসনকাল পাঁচ মাসের অধিক বিস্তৃত হয় নাই।

৪। আবু সইদ মাসুদ-বিন-ইয়েমিন-উদ দৌলাহ্ সুলতান মাহমুদ

আয়মাকের পুত্র আয়ায এবং আলী দারাহ যখন নিশাপুরে আমীর মাস্থদের নিকট গমন করিলেন, শেষোক্ত জন তাহার ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থাবান হইয়া বিচার কার্য পরিচালনার দিকে তাহার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। কয়েকদিন পর আবু সহল মুসিল বিন মনসুর বিন আফলাজ গুরদায়যী, আমীর উল মোমেনিন আল কাদির বিল্লাহ-এর নিকট হইতে একটি পতাকা আনয়ন করেন; আর বহু অনুগ্রহ ও প্রচুর দয়া লাভ করেন। অতঃপর আমীর মাস্থদ নিশাপুর হইতে হিরাতে আগমন করেন। এই সময়ে আলী হাজিব আমীর মাস্থদের নিকট আগমন করেন এবং নানারূপ অনুগ্রহ লাভ করেন। সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী এবং ধন-রত্নও তখন

১. দুর্গটির নাম সুস্পষ্ট বুঝা যায় যায় না। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে।

হিরাতে পৌঁছে ; আর আমীর মাস্উদ হিরাত ত্যাগ করিয়া বলখ গমন করেন ; আর শীতকালটা তথায় অতিবাহিত করেন।

অতঃপর আমীর মাস্উদ, আবুল কাসিম আহমদ বিন হাসান ময়মন্দীকে আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করেন ; সুলতান মাহমুদের নির্দেশে তিনি কলিঞ্জর দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন ; তাহাকে তাহার মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তিনি মীর জঙ্গ মিকাইলকে[১] শূলে দিয়া বধ করিবার নির্দেশ দিলেন, আর যাহারা তাহার বিরুদ্ধে ছিল এবং তাহার শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল তিনি তাহাদের সকলকে প্রাণদণ্ড দানের নির্দেশ দিলেন' আর সুলতান মাহমুদের কোষাধ্যক্ষ আমীর আহমদ বিন নিয়ালতিগীনকে[২] তিনি শাস্তি দান করিলেন এবং তাহার নিকট হইতে প্রচুর সম্পদ উদ্ধার করিলেন এবং তাহাকে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া বিদ্রোহ করিলেন।

এই সময়ে আমীর মাহমুদের নির্দেশে আবু তালিব রুস্তম মজদ-উদ-দৌলা ভারত হইতে ঘযনীন আগমন করিলেন। মেকরানের শাসনকর্তা আমীর হুসেন বিন ম'দান তাঁহাব ভ্রাতার বিরুদ্ধে আমীর মাস্উদের নিকট অভিযোগ করিলেন, আর তিনি মীর তাশ ফরাশকে তাহার জন্য তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে ন্যায়বিচার আদায় করিবার নির্দেশ দান করিলেন ; আর তাহাকে মেকরানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

অতঃপর আমীর মাস্উদ বলখ হইতে ঘযনীন আগমন করিলেন। শহরের লোকেরা আনন্দ উৎসব করিল এবং তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল এবং বিজয়তোরণ[৩] নির্মাণ করিল এবং দিরাম ও দিনার ছড়াইয়া দিল। অতঃপর তিনি সিপহান ও রেই-এ গমনের উদ্দেশ্যে ঘযনীন হইতে যাত্রা করিলেন এবং তিনি যখন হিরাত পৌঁছিলেন তখন সরখস এবং বাওয়ার্দ-এর লোকেরা তুর্কমানদের বিরুদ্ধে তাহার নিকট অভিযোগ করিল। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনীসহ আমীর আবু সইদ আবদুস বিন আবদুল আযিযকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধ করিলেন এবং উভয় পক্ষে প্রচুর সংখ্যক লোক নিহত হইল। আমীর মাস্উদের সৈন্যগণ বহুবার যুদ্ধ করিয়া তৎপর প্রত্যাবর্তন করিল।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে ; অপর একটিতে দেওয়া আছে মিকাল ; আর একটিতে আছে মিকল, আর একটিতে বিসকাল।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে ; আর একটিতে আছে বালপতিগীন। আর একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে মালিকগ।

৩. আনন্দ উৎসব ও বিজয়-তোরণ নির্মাণের এই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে এইরূপ আনন্দোৎসব ও বিজয় তোরণ নির্মাণের বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

আঃ হিঃ ৪০৩ সনে খাজা আহমদ বিন হাসান নির্দেশ লাভ করিলেন[১] আর খাজা আবু নসর আহমদ বিন মুহম্মদ আবদুস সামাদ, যিনি শাসনকার্য পরিচালনায় তাহার দক্ষতার জন্য এবং বিজ্ঞতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তাহার স্থলে মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন এবং খোয়ারিযম গমন করিয়া ঐ দেশটিকে সমৃদ্ধশালী করিলেন এবং তৎপর পুনরায় আমীর মাসুদের চাকুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। শেষোক্ত জন অতঃপর ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হিঃ ৪২৪ সনে আমীর মাসুদ ভারত অভিযান করিলেন এবং সরসতী দুর্গ আক্রমণ করিলেন; এই দুর্গটি কাশ্মিরের এক উপত্যকায় অবস্থিত। তাই ইহাকে অবরোধ করিলেন এবং ইহা অধিকার করিয়া প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লাভ করিলেন। ঐ স্থান হইতে তিনি ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হিঃ ৪২৫ সনে আমীর মাসুদ আমিল এবং সারি আক্রমণ করিলেন। ঐ দেশের লোকেরা একত্র সমবেত হইল এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল, আর যেহেতু ঘযনীনের সেনাবাহিনী বিজয়ী হইল, তাবারিস্তানের আমীর আমা কলি খান[২] দূত প্রেরণ করিলেন এবং খোৎবাতে আমীর মাসুদের নাম ঘোষণা করিতে সম্মত হইয়া তাহার নিজ পুত্র বহমান এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও সুরখাবের পুত্র শরউইনকে প্রতিভূ-রূপে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমীর মাসুদ ঘযনী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তিনি যখন নিশাপুরে পৌঁছিলেন তখন লোকেরা তুর্কমানদের অত্যাচার সম্বন্ধে তাহার নিকট অভিযোগ করিল। আমীর মাসুদ তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী সহ একতা'দি এবং হুসেন বিন আলী-বিন-মিকাইলকে প্রেরণ করিলেন। সেনাদল যখন শুনিয়া ইতফাক[৩] পৌঁছিল, তখন তুর্কমানগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া এই নিবেদন করিল যে তাহারা আমীরের দ্বারপথের ক্রীতদাস মাত্র তাই তাহার নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য। শুধু এইটুকুই প্রয়োজন যে তাহাদের চারণভূমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে কাহারও সঙ্গে তাহাদের আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না এবং আর কেহই কোন প্রকারে তাহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। একতা'দি প্রতিনিধিগণের সঙ্গে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে একমাত্র তরবারির মাধ্যম ছাড়া শান্তি স্থাপনের আর কোন পথ নাই। তোমরা যদি বশ্যতা স্বীকার কর এবং অন্যায়

১. অর্থ সুস্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ তাহাকে অপসারণ করা হইয়াছিল।
২. নামটি সন্দেহজনক। একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা নাই; অন্যান্যগুলিতে আছে।
৩. নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে যেমন 'শুনিয়া ইতফাক', 'সনদ ইতফাক', সনিয়া ইতফাক, সনবদ আনকান ইত্যাদি।

কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, এবং কাহাকেও আমীর মাসুদের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে আমার কাছে চিঠি আনিতে পার, একমাত্র তখনই আমি তোমাদের উপর হইতে আমার হাত সরাইয়া লইব।'

তুর্কমানগণ যখন তাহাদের দূতদের মুখ হইতে এই কথা জানিতে পারিল তখন তাহারা অগ্রসর হইল এবং এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিল। শেষপর্যন্ত তুর্কমানগণ পরাজিত হইল এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। একতা 'দি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহাদের স্ত্রী ও পরিবারদের বন্দী করিলেন এবং বহু দ্রব্য-সম্ভার লুণ্ঠন করিলেন। একতা 'দির সৈন্যগণ যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন তাহারা লুণ্ঠনের অনুসন্ধানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে; আর এই সময় দাউদ তুর্কমান পার্বত্য গিরি-সংকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। যুদ্ধ দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া চলে। একতা 'দি হুসেন বিন আলীকে বলেন, আমি আমার অবস্থান রক্ষা করিতে পারিতেছি না। হুসেন কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধ করিয়া যাইতে থাকেন এবং তুর্কমানগণ কর্তৃক বন্দী হন। একতা 'দি পলায়ন করেন এবং আমীর মাসুদের নিকট গমন করেন।

আমীর মাসুদ ঘযনীনে পৌঁছিলে আহমদ বিন নিয়ালতিগীনের বিদ্রোহের সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছে। তিনি হিন্দুস্তানের সেনাপতি বনথ-বিন-মুহম্মদ আলীকে[১] তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আর তাহারা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হন তখন এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়; আর বনথ নিহত হয় এবং তাহার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এই সংবাদ যখন আমীর মাসুদের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি হিন্দুদের অপর সেনাপতি তিলক বিন হুসেনকে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি আহমদের নিকট গমন করেন এবং যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন এবং আহমদের যে সব সৈন্য বন্দী করা হয়, তিনি তাহাদের নাক ও কান কাটিয়া দিবার নির্দেশ দেন। আহমদ সিন্ধু দেশের মনসুরায় পলায়ন করেন এবং সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন। নদীটি কিন্তু সহসা প্লাবিত হইয়া যায় এবং তাহাকে ভাসাইয়া নিয়া যায় এবং তিনি ডুবিয়া যান। পরে যখন তাহার মৃতদেহ নদীতীরে ভাসিয়া উঠে তখন তাহার শির কাটিয়া তাহা তিলকের নিকট আনয়ন করা হয় আর তিনি ইহা আমীর মাসুদের নিকট প্রেরণ করেন।

১. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রূপ আছে যেমন বনথ বিন মুহম্মদ আলী, বানহ বিন মুহম্মদ আলী, তলক বিন হুসেন। বানথ-এর অর্থ বুঝা যায় না; বানথ ও তিলক উভয়ক্ষেত্রেই পিতার নাম দেখা যায় মুসলমান, কিন্তু তাহাদের নাম সম্ভবতঃ হিন্দু।

আঃ হিঃ ৪২৭ সনে নূতন দুর্গটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় আর মণিমুক্তা শোভিত একটি স্বর্ণ সিংহাসন ইহাতে স্থাপন করা হয় এবং মূল্যবান পাথরে শোভিত একটি স্বর্ণের মুকুট, যাহার ওজন ছিল সত্তর মণ, স্বর্ণের শিকল দ্বারা ইহার উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয় ; আর সুলতান ঐ সিংহাসনে বসিয়া এবং ঐ ঝুলান মুকুট মাথায় স্থাপন করিয়া এক প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

এই বৎসরেই তিনি আমীর মওদুদকে একটি পতাকা ও একটি নাকাড়া প্রদান করিয়া তাহাকে বলখে প্রেরণ করেন ; আর তিনি স্বয়ং হিন্দুস্তান অভিমুখে গমন করেন এবং হানসী দুর্গে পৌঁছিয়া তাহা দখল করেন আর ইহাতে সংখ্যাতীত দ্রব্য সম্ভার লাভ করেন ; আর ঐ দুর্গ হইতে তিনি তাহার সৈন্যবাহিনীসহ সনিপত দুর্গে গমন করেন এবং ঐ দুর্গের দানিয়াল হর[১] নামক সেনাপতি তাহার আগমন সংবাদ অবহিত হইয়া পলায়ন করেন এবং নিজেকে বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া রাখেন। ইসলামের সেনাবাহিনী ঐ দুর্গটি দখল করিয়া সকল মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করে। অতঃপর তাহারা যখন শুনিতে পাইল যে কোথায় দানিয়াল হর লুকাইয়া রহিয়াছে তখন তাহারা তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল আর তিনি ইহা জানিতে পারিয়া একাকী পলায়ন করিলেন ; আর তাহার সৈন্যদের সকলকেই হয় হত্যা করা হয় নতুবা বন্দী করা হয়। ঐ স্থান হইতে আমীর মাসুদ রামের উপত্যকার অভিমুখে অগ্রসর হন ; আর রাম যখন ইহার সংবাদ পান তখন তিনি প্রচুর কর প্রেরণ করেন এবং এক সংবাদ পাঠান যে যেহেতু তিনি বৃদ্ধ ও অসমর্থ আনুগত্য প্রকাশের জন্য তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমীর মাসুদ তাহার ওজর গ্রহণ করিলেন এবং তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত রহিলেন। অতঃপর তিনি মাসুদের পুত্র আমীর আবুল মুহম্মদকে[২] একটি পতাকা এবং একটি নাকাড়া প্রদান করিলেন এবং তাহাকে লাহোরে প্রেরণ করিলেন আর তিনি স্বয়ং ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হি ৪২৯ সনে তিনি তুর্কমানগণ কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমনের উদ্দেশ্যে ঘযনীন হইতে বলখ গমন করিলেন। শেষোক্তগণ এই সংবাদ পাইয়া বলখ ত্যাগ

---

১. পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে যেমন দানিয়াল হর ; দিপাল হর ; দিপাল হরমানহ, দিপাল হরিয়ানহ।

২. এই স্থানের পাঠ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রূপ। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'আমীরুল মোমেনীন আবদুল মুহম্মদ বিন মাসুদকে একটি পতাকা ও একটি নাকাড়া প্রদান করিলেন এবং তাহাকে লাহোর প্রেরণ করিলেন, ইত্যাদি।" অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে যে পাঠ পুস্তকে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাই আছে ; আর একটিতে আছে "আবুল ফাওয়ারিণ ও মাসুদকে একটি নাকাড়া ও একটি পতাকা প্রদান করিয়া ইত্যাদি" আর একটিতে আছে "আর আমীর আবুল আহমদ বিন মুহম্মদকে একটি নাকাড়া ও একটি পতাকা প্রদান করিলেন।"

করিল ; এবং অন্যত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে পুতিকেনের প্রতি লোকেরা বীতশ্রদ্ধ হওয়ার ফলে সমস্ত মারওয়ার-উন-নাহার বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হইয়াছে। কদর খানের ইন্তেকালের পর পুতিকেন তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

আর মাসুদ সমস্ত মারওয়ার-উন-নাহার দেশটি দখল করিবার আশায় তথায় অগ্রসর হন। ঐ দেশের লোকেরা তাহাদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারা নিজেদের গৃহাদি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। আর কেহই যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। ইহার কয়েকদিন পরেই মাসুদের মন্ত্রী খাজা বিন মুহম্মদ আবদুস সামাদ তাহাকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন, আর তাহাকে সংবাদ দিলেন যে দাউদ তুর্কমান এক বিশাল বাহিনী লইয়া বলখ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন আর তাহার এমন শক্তি নাই এবং এমন যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নাই যাহাতে তিনি সাফল্যের সহিত দাউদকে বাধা দিবার আশা করিতে পারেন। আমীর মাসুদ তৎক্ষণাৎ মারওয়ার-উন-নাহার হইতে বলখ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। তুর্কমানগণ ঘুরিয়া গেল এবং মার্ভে গমন করিল। আমীর মাসুদ বলখে আগমন করিলেন এবং তৎপর দাউদের পশ্চাদ্ধাবনে গুরগান গমন করিলেন।[১] তথায় কতিপয় লোক তাহার নিকট আগমন করিল এবং আলী তন্দরীর[২] অত্যাচারের অভিযোগ করিল। এই লোকটি ছিল একজন প্রতারক, একজন অত্যাচারী, আর তিনি ঐ সমস্ত অঞ্চলের উপরই তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। আমীর মাসুদ তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য তাহাকে তলব করিলেন কিন্তু তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; কিন্তু লোকদের উৎপীড়ন করিয়াই চলিলেন। তিনি তাহার পরিবার ও সন্তানদের দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন ; দুর্গটি ঐ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল এবং অবরোধ প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমীর মাসুদ তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দুর্গটি অধিকৃত হইল ; আর আলী তন্দরীকে আমীর মাসুদের সম্মুখে আনয়ন করা হইল ; আর শেষোক্ত জন তাহাকে শূলে চড়াইয়া বধ করিবার নির্দেশ দিলেন।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী দাউদ গুরগান গমন করেন কিন্তু মাসুদ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে তথায় গমন করেন নাই।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে। অপর একটিতে এক স্থানে আছে আবদরি এবং আর এক স্থানে আছে বায়াবদরি। অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কন্দরী এবং চন্দী ; অন্য একটিতে আছে বত্রদরী।

তুর্কমানগণ যখন আমীর মাস্‌উদের মার্ভ অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংবাদ পাইল তখন তাহারা দূত প্রেরণ করিল এবং নিবেদন করিল যে তাহারা তাহারই ক্রীতদাস, তাহার নির্দেশ পালনে তাহারা বাধ্য; আর যদি তাহাদের চারণভূমির সীমা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাদের পণ্য ও পরিবারগুলি তাহাদের জন্য নির্ধারিত ভূমিতেই থাকিবে আর তাহারা নিজেরাই তাহার খেদমত করিবে। আমীর মাস্‌উদ তাহাদের আবেদনে সম্মত হইলেন এবং তাহাদের নেতা বেঘুর নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন যাহাতে এক চুক্তি সম্পন্ন হয় এই মর্মে যে ঐ সময় হইতে তাহারা তাহাদের চিরাচরিত অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিবে। এই একই সময়ে তাহাদের চারণভূমির সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এই শর্তগুলি মানিয়া লওয়া হইল; আর তৎপর আমীর মাস্‌উদ হিরাত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে একদল তুর্কমান আমীর মাস্‌উদের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল; তাহাদের কিছুসংখ্যক হত্যা করিল; আর কিছু জিনিসপত্র লুট করিল। আমীর মাস্‌উদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, আর তাহারা তাহাদের সকলকে ধরিয়া হত্যা করিল এবং তাহাদের স্ত্রী ও পরিবারদের বন্দী করিয়া নিহতদের শিরসহ তাহাদিগকে আমীরের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষোক্ত জন ঐ সব শির গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া বেঘুর নিকট প্রেরণ করিলেন আর তাহাকে এই সংবাদ পাঠাইলেন যে যাহারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাহাদের সকলেরই এইরূপ শাস্তি হয়। বেঘু নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইল এবং বলিল যে সে এই সব ব্যাপারের কোন কিছুও জানে না আর আমীর স্বয়ং ঐ সব লোকদের প্রতি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই তাহা সংঘটিত হইত। আমীর হিরাত হইতে নিশাপুর গমন করিলেন এবং তথা হইতে তুষ গমন করেন। শেষোক্ত স্থানটির সন্নিকটে এক দল তুর্কমান তাহার সম্মুখীন হয় এবং এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাহাদের বহু সংখ্যক নিহত হয়। এই সময়ে সংবাদ আসে যে বাওয়ার্দের লোকেরা তাহাদের দুর্গ তুর্কমানদের নিকট সমর্পণ করিয়াছে। আমীর মাস্‌উদ দুর্গটি আক্রমণ করিলেন এবং তাহা অধিকার করিয়া দুর্গের সৈন্যগণকে হত্যা করিলেন। অতঃপর তিনি নিশাপুর প্রত্যাবর্তন করেন এবং শীতকালটা তথায় অতিবাহিত করেন।

আঃ হিঃ ৪৩০ সনের বসন্তকাল যখন সমাগত হইল তখন আমীর মাস্‌উদ তুখরান তুর্কমানকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় বাওয়ার্দ গমন করিলেন। শেষোক্ত জন ইহা অবগত হইলেন এবং তিনি বাওয়ার্দ অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমীর মাস্‌উদ ঘুরিয়া গেলেন এবং মহনাহ্-এর পথে নরখস-এর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন আর

যেহেতু মহনাহ এর লোকেরা কর প্রদান করে নাই তিনি তাহাদের বন্দী করাইলেন আর তাহাদের বহু সংখ্যককে হত্যা করিবার আর অন্যান্যদের হাত কাটিয়া দিবার নির্দেশ দান করিলেন; আর তাহাদের দুর্গসমূহও ধ্বংস করিয়া দিলেন। ঐ অঞ্চল হইতে তিনি দিদাঙ্কন[১] গমন করিলেন। তিনি যখন এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তুর্কমানগণ প্রচুর সংখ্যায় বিভিন্ন দিক হইতে আগমন করিয়া ঘযনীনের সেনাবাহিনীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমীর মাসুদ তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তুর্কমানগণ তাহার সম্মুখীন হইল এবং যুদ্ধের জন্য সন্নিবেশিত হইল এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইত্যবসরে ঘযনীনের সৈন্যবাহিনীর বহু সংখ্যক সেনাপতি ঘুরিয়া গিয়া শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করিল; আর আমীর একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়া গেলেন। তিনি তাহার তরবারি, এবং বল্লম ও দণ্ড দ্বারা তুর্কমানদের কতিপয় নেতাকে বধ করিলেন। ঘযনীনের বাহিনীর যে সব সেনাপতি শত্রুদের পক্ষে চলিয়া গিয়াছিলেন তখন তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন এবং ঘযনীন অভিমুখে পলায়ন করিলেন। যখন আমীর মাসুদের নিকট আর কোন লোক রহিল না তখন তিনি তাহার স্বীয় শক্তি ও সাহসের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; আর কেহই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহস করিল না। এই ঘটনা আঃ হিঃ ৪৩১ সনের ৮ই রমযান সংঘটিত হয়। আমীর মাসুদ যখন মার্ভে পৌঁছেন, তখন তাহার কিছু সংখ্যক সৈন্য তাহার সঙ্গে যোগদান করে এবং তিনি ঐ স্থান হইতে ঘুর এর পথে ঘযনীন আগমন করেন।

অতঃপর তিনি তাহার যে সব সেনাপতি যুদ্ধ না করিয়াই শত্রুদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকেই শাস্তি দিলেন, যেমন আলী দায়াহ[২], মহা গৃহাধ্যক্ষ সিপাহী এবং একতা'দি গৃহাধ্যক্ষ। তিনি তাহাদের সকলকেই বন্দী করিবার নির্দেশ দেন, এবং অর্থদণ্ড আদায় করেন এবং ভারতে প্রেরণ করেন, আর ঐ স্থানে তাহাদিগকে বিভিন্ন দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয় আর তাহাদের সকলেই কারারুদ্ধ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। অতঃপর আমীর মাসুদ তাহার সৈন্যবাহিনীকে ভারতে নিয়া যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন, যাহাতে তিনি তথায়

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে; একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা দেওয়া আছে ইধনার এবং আর একটিতে আছে দনদান। তবকাত-ই-নাসিরীর ৭৪২ পৃঃ ৩নং টীকা অনুযায়ী (অনুবাদ) দেখা যায় যে বিভিন্ন পুস্তকে নামটির বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে, তবে সঠিক নাম হইল তালকান।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই নামগুলি এইরূপ দেওয়া আছে, শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে একতা'দির স্থলে 'মুকতাদি' দেওয়া আছে।

নূতন শক্তি সংগ্রহ করিতে পারেন এবং পুনরায় এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিতে পারেন আর তৎপর তুর্কমানগণকে আক্রমণ করিয়া যথাসময়ে তাহাদিগকে শাস্তি বিধান করিতে পারেন। তিনি আমীর মওদুদকে আমীররূপে বলখে প্রেরণ করিলেন এবং উযির খাজা মুহম্মদ বিন আবদুস সামাদকে তাহার সঙ্গে গমনের নির্দেশ দিলেন, আর আরতিগীন হাজিবকে[১] তাহার গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার সঙ্গে চারি সহস্র লোক প্রেরণ করিলেন[২]। আমীর মুহম্মদকে দুই সহস্র সৈন্য-সহ মুলতান গমনের জন্যও তিনি নির্দেশ দিলেন। আর তিনি আদেশ দিলেন যে ঐ প্রদেশের আমীর ঘযনীনের পার্বত্য অঞ্চলে গমন করিবেন, যাহাতে তিনি ঐ দেশের উচ্ছৃঙ্খল আফগানদের উপর নজর রাখিতে পারেন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে তাহাদিগকে বাধা দান করিতে পারেন। সুলতান মাহমুদের যে ধনরত্ন বিভিন্ন দুর্গে রক্ষিত ছিল তিনি সেগুলির সমস্তই ঘযনীনে আনয়ন করেন এবং এইগুলিকে উটের পিঠে বোঝাই করিয়া ঐগুলিসহ ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হন। পথ হইতে তিনি লোক প্রেরণ করিয়া তরঘন্দের[৩] দুর্গ হইতে তাহার ভ্রাতা আমীর মুহম্মদকে আনয়ন করেন।

তিনি যখন রবাত বারিকলাহ[৪] পৌঁছেন তখন ক্রীতদাসগণ (বা পাহারা-দারগণ) উটের পৃষ্ঠে বোঝাই ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। এই সময়েই আমীর মুহম্মদ তথায় উপস্থিত হন; আর ক্রীতদাসগণ কোন নূতন আমীর না আসিলে তাহাদের অপরাধ যে ক্ষমা করা হইবে না ইহা বুঝিতে পারে এবং তাহাদের আমীর মুহম্মদের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বাদশাহরূপে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রহিল না। ফলে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আমীর মাসুদকে আক্রমণ করিল। শেষোক্ত জন রবাত-এ (সরাইখানা) নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন। পরদিন সম্পূর্ণ সেনা-বাহিনী একত্র হইয়া গমন করে এবং সরাইখানা হইতে আমীরকে বাহির করিয়া আনে এবং তাহাকে বন্দী করে এবং গিরি[৫] দুর্গে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে।

১. শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে আরতিগিন হাজিবকে উযির নিযুক্ত করা হয়. অন্যান্য সব গুলিতে পুস্তকে যে পাঠ দেওয়া আছে তাহাই আছে।

২. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে এই সংখ্যা দেওয়া আছে; কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে এক সহস্র দেওয়া আছে।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কা'বাদ, আর একটিতে আছে আহুর আর একটিতে বর আহাদ। তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে দুর্গে ইব্রাহীম এবং ফররুখযাদকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহার নাম বরঘন্দ। সম্ভবতঃ আমীর মুহম্মদকেও ঐ দুর্গেই কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে রবাত মারকলাহ, রবাত মার কলিহ; রবাত বারিকহ। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী স্থানটির প্রকৃত নাম মারিকলাহ।

৫. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে।

আর তিনি আঃ হিঃ ৪৩২ সনের ১১ই জমাদিউল আউয়াল পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন, এবং ঐ সময়ে আমীর মুহম্মদের নামে ঐ দুর্গের কোতোয়াল বা সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এবং তাহার শির আমীর মুহম্মদের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য এক মিথ্যা সংবাদ আনে। এই সংবাদ অনুযায়ী তাহার দেহ হইতে তাহার শির বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয় এবং তাহা আমীর মুহম্মদের নিকট প্রেরণ করা হয়; আর তিনি ইহাতে প্রচুর কান্নাকাটি করেন আর ইহার জন্য যাহারা দায়ী তিনি তাহাদের কঠোর ভৎর্সনা করেন।

৫। শিহাবউদ্দীন[১] ওয়া দৌলত, ওয়া কুতুব-উল-মিল্লাত আবুল ফতেহ মওদুদ বিন মাসুদ

তাহার পিতার হত্যার সংবাদ যখন বাহিস্তানে[২] আমীর মওদুদের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বারিকলাহ গমনের সংকল্প করিলেন, কিন্তু আবু[৩] নসর বিন আহমদ বিন মুহম্মদ বিন আবদুস সামাদ তাহাকে ঐ অভিযান হইতে বিরত রাখিলেন এবং তাহাকে ঘযনীনে নিয়া গেলেন। শহরের লোকেরা সকলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া গেলেন, শোক অনুষ্ঠান পালনে যোগদান করিলেন এবং তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। অতঃপর এক বিরাট বাহিনীসহ তিনি তাহার চাচা আমীর মুহম্মদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন দানতুরে[৪] পৌঁছিলেন, আমীর মুহম্মদ দ্রুত তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইহা সমস্ত দিন স্থায়ী হয়, এবং যখন রাত্রি হয় তখন উভয় পক্ষ শত্রুদের হিসাব করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে থাকে। রাত্রির মধ্যে আমীর মওদুদ, আমীর মুহম্মদের সেনাবাহিনীর মীর আজল সৈয়দ মনসুরের নিকট এক সংবাদবাহক প্রেরণ করেন এবং তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া ফেলেন; ফলে পরদিন যুদ্ধের সময় মীর আজল সৈয়দ মনসুর দর্শকের ন্যায় এক

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; একটিতে 'উদ্দীন' বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং "বিন সুলতান মাহমুদ" যোগ করা আছে। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটির শেষে "বিন মাহমুদ" যোগ করা আছে।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; একটিতে আছে নহান, এবং আর একটিতে আছে নিসতান। পূর্বে উল্লেখিত আছে যে তাহার পিতা ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার অল্প পূর্বেই আমীর মওদুদকে বলখ শাসন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় এবং মেজর রাভার্টীর মতে তাহার পিতার কারারুদ্ধ ও নিহত হওয়ার সংবাদ যখন তাহার নিকট পৌঁছে তখন তিনি বলখে অবস্থান করিতেছিলেন।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে আবদুস সামাদের পূর্বে 'বিন' শব্দটি নাই, অন্যান্যগুলিতে আছে।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া নাই; অন্যান্যগুলিতে বিভিন্নরূপ আছে যেমন দনতুর, দস্তুর দনুর। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী যুদ্ধটি সংঘটিত হয় নগরাহর নামক স্থানে।

পাশে দণ্ডায়মান থাকে এবং যুদ্ধরত কোন পক্ষকেই সাহায্য করেন না। বহু যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত আমীর মওদুদ জয়লাভ করেন; আর আমীর মুহম্মদ এবং তাহার পুত্র আহমদ এবং তাহার সেনাবাহিনীর সকল সেনাপতিগণকে বন্দী করা হয়; আর বহু উৎপীড়নের পর তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। আমীর মওদুদ ঐ স্থানে একটি সরাইখানা এবং একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার নামকরণ করেন ফতেহাবাদ আর তাহার পিতা ও ভ্রাতাগণের কফিনগুলি গিরি হইতে ঘযনীনে আনয়ন করিবার নির্দেশ দান করেন। এই বিজয় লাভ সংঘটিত হয় আঃ হিঃ ৪৩২ সনের শাবান মাসে।

আঃ হিঃ ৪৩৩ সনে আমীর মওদুদ খাজা আহমদ আবদুস সামাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে ঘযনীনের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার নির্দেশ দান করেন। আর তিনি বন্দী অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন। অতঃপর আমীর আবু তাহির বিন মুহম্মদ মুস্তৌফাকে তাহার উযির মনোনীত করিলেন আর এই বৎসরই তিনি আবু নসর মুহম্মদ বিন আহমদকে নামি মুহম্মদ বিন মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য হিন্দুস্তান অভিমুখে প্রেরণ করিলেন; আর যুদ্ধে নামি নিহত হইলেন।

আঃ হিঃ ৪৩৪ সনে আমীর মওদুদ আরতিগীনকে তজরিস্তানে[১] প্রেরণ করিলেন; আর তিনি যখন তথায় পৌঁছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন যে দাউদ তুর্কমানের পুত্র অরহন আগমন করিয়াছে। তিনি তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি যখন তাহার সন্নিকটে আগমন করিলেন, তখন তুর্কমান নেতা হুসিয়ারী লাভ করিলেন; আর তাহার সেনাবাহিনী পেছনে ফেলিয়া তিনি সামান্য কতিপয় সঙ্গীসহ ঐ স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। আরতিগীন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহার বহু অনুগামীকে হত্যা করিলেন। অতঃপর তিনি বলখ অভিমুখে গমন করিলেন এবং শহরটি অধিকার করিয়া আমীর মওদুদের নামে খোৎবা পাঠ করাইলেন। অল্প কিছুকাল পরেই তুর্কমানগণ তাহাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বলখ অভিমুখে আগমন করিল; আর যেহেতু তাহার সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল না, তাই তিনি আমীর মওদুদকে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করিতে বলিলেন; কিন্তু যেহেতু তাহার অনুরোধ অনুমোদন করা হইল না, তিনি তাহার সেনাদলসহ বলখ হইতে ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হি ৪৩৫ সনে কতিপয় লোকের প্ররোচনায় আমীর ঘযনীনের কোতোয়াল আবু আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যখন কোতোয়ালের নিরপরাধ হওয়ার কথা জানিতে পারেন

[১] তিনটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই আছে। একটিতে আছে তাবারিস্তান।

তখন তিনি তাহাকে মুক্ত করেন এবং তাহাকে তাহার রাজ্যের মন্ত্রী এবং ঘযনীনের কোতোয়াল নিযুক্ত করেন আর সুরি বিন আলাবর[১], যিনি পূর্বে তাহার উযির ছিলেন, তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন; আর লোকটি কারাগারে থাকা অবস্থায়ই ইন্তেকাল করে। লোকেরা আরতিগীন সম্বন্ধেও আমীর মওদুদের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করিল; আর তিনি তাহাকে তাহার নিজের সম্মুখে শিরোচ্ছেদ করাইলেন।

আঃ হিঃ ৪৩৬ সনে উযির খাজা তাহির তাহার (বরখাস্তের) হুকুম পাইলেন; আর তাহার স্থলে খাজা ইমাম সৈয়দ আবুল ফতেহ আবদুর রাজ্জাক বিন আহমদ বিন হুসেনকে উযির নিযুক্ত করা হইল। এই একই বৎসরে তুঘরিল হাজিবকে বাসত অভিমুখে প্রেরণ করা হইল, আর তিনি সিসতান পর্যন্ত গমন করিলেন এবং আবুল ফযল দরঙ্গী আবু মনসুরের ভ্রাতাকে বন্দী করিলেন এবং তাহাকে ঘযনীনে আনয়ন করিলেন।

আঃ হিঃ ৪৩৭ সনে তুর্কমানগণ বিপুল বাহিনীসহ ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহারা যখন বাসত অতিক্রম করিতেছিল এবং রবাত আমীর ধ্বংস করিল, তখন ঘযনীনের বাহিনী তাহাদের মোকাবিলা করিল এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং বহু সংখ্যক তুর্কমান নিহত হইল। এই বিজয়ের পর তুঘরাল গরমশির[২] অভিমুখে গমন করিলেন এবং ঐ দেশের তুর্কমানগণকে হত্যা করিলেন। ইহাদের বলা হইল সুর্খ কুলাহ (লাল টুপি): আর তাহাদের বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে আনয়ন করেন।

আঃ হিঃ ৪৩৮ সনে আমীর মওদুদ এক বিরাট বাহিনীসহ তুঘরালকে পুনরায় এই একই দিকে প্রেরণ করিলেন। তুঘরাল যখন বকনাবাদ[৩] পৌঁছিলেন তখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন। যখন ইহার সংবাদ আমীর মওদুদের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য ও খুশি করিবার জন্য তাহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। প্রত্যুত্তরে তুঘরাল তাহাদের নিকট বলিলেন যে যেসব লোকেরা আমীরের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছে তাহারা তাহার শত্রু হওয়ার ফলে তিনি আসিয়া আমীরের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। আর একটিতে আছে সুরি বিন আলমাগর। আর একটিতে সুরি বিন আলমাবর; আর একটিতে সুরি বিন ইমাবর।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহাই আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে গরমির; গরমসু বা গরমু এবং গরনিরাহ্ত।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে তাকনাবাদ, বকনাবাদ, ইকিয়াদ। সম্ভবতঃ ইহা তিগিনাবাদ হইবে।

ইহার পর আমীর তুঘরালকে তলব করিবার জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ আলী বিন রাবিকে প্রেরণ করিলেন। আলী বিন রাবি যখন তুঘরাল যে স্থানে ছিলেন তাহার সন্নিকটে আসিয়া পোঁছিলেন তখন শেষোক্ত ব্যক্তি অল্প কিছু সংখ্যক লোকসহ পলায়ন করিলেন; আর আলী তাহার সেনাদলের মোকাবিলা করিয়া তাহা বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন; আর কিছু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে ঘযনীনে নিয়া গেলেন।

এই বৎসরেই আমীর, আমীর হাজিব বুযুর্গ বতবকিনকে[১] ঘুর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন, আর শেষোক্ত জন যখন এই অভিযানে যাত্রা করিলেন তখন তিনি শির বাচাহ[২] কে তাহার সঙ্গে নিলেন আর তাহারা যখন আবু আলীর দুর্গের নিকটে পোঁছিলেন তখন তাহারা ইহা অধিকার করিলেন এবং আবু আলীকে বন্দী করিলেন। এই দুর্গটি সাত শতাব্দী ধরিয়া কেহই অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। শির বাচাহ আবু আলীর ঘাড়ে একটা জোয়াল লাগাইয়া তাহাকে ঘযনীনে আনয়ন করেন।

এই একই বৎসরেই আমীর মওদুদ আমীর হাজিব বয়তিগীনকে তুর্কমানগণের নেতা বহরাম খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন আর তাহাদের সেনাবাহিনী বাস্তের সন্নিকটে পরস্পরের মোকাবিলা করিল ও যুদ্ধ করিল এবং তুর্কমানগণ পরাজিত হইল।

আঃ হিঃ ৪৩৯ সনে আমীর কযদর বিদ্রোহ করেন আর আমীর মওদুদ তাহার বিরুদ্ধে হাজিব বুযুর্গ বয়তিগীনকে প্রেরণ করেন আর আমীর কযদর পরাজিত হন; আর কিছুকাল পর তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং কর দিতে অঙ্গীকার করেন। অতঃপর আমীর হাজিব ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৪৪০ সনে তাহার দুই পুত্র আবুল কাসিম মাহমুদ ও মনসুরকে সম্মানীয় অঙ্গাবরণ, নাকাড়া ও পতাকা প্রদান করেন এবং একই দিনে তাহাদিগকে, প্রথম জনকে লাহোর অভিমুখে, আর শেষোক্ত জনকে পরশুর অভিমুখে প্রেরণ করেন; আর তিনি ঘযনীনের কোতোয়াল আবু আলী হাসানকে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেন, যাহাতে তিনি ঐ দেশের বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে পারেন। আবু আলী মাহিতাহ[৩] দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হন, আর ঐ দুর্গের শাসনকর্তা আহনিন[৪] যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি তাহার অনুগামীদের ফেলিয়া রাখিয়া একাকী পলায়ন করেন। কোতোয়াল হিন্দুদের সেনাপতি হজরায়[৫] এর নিকট এক সংবাদবাহক

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নাম আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে বলতিগীন, বরবুকতেন ও বিবিকেন।
২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; আর দুইটিতে আছে সরপঞ্জাহ্ ও শিরপঞ্জাহ।
৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে মাহিলাহ, বাহবিলাত, মাহতাহ।
৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে আনহা এবং আহিন।
৫. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; আর একটিতে আছে বেজরায় এবং সহরায়।

প্রেরণ করেন ; ইনি সুলতান মাহমুদের আমলে কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং সুলতানের চাকুরীতেই তাহার জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কতিপয় ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন ; আর হিন্দুস্তানে পলায়ন করেন এবং বর্তমানে কাশ্মিরের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাহাকে নানা প্রকারে আশ্বাস দেন এবং তাহার নিকটে তলব করেন এবং নিজের ধর্মের দোহাই দিয়া তাহাকে ঘযনীনে প্রেরণ করেন। আমীর মওদুদ তাহাকে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন এবং আশ্বাস দান করেন।

যে সময় কোতোয়াল আবু আলী হিন্দুস্তানে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় তাহার শত্রুগণ তাহার প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ বশতঃ তাহার সম্বন্ধে বহু ব্যাপার সম্রাটের নিকট বিরূপভাবে তুলিয়া ধরে ; আর তিনি যখন ঘযনীনে ফিরিয়া আসিলেন তখন আমীর তাহাকে বন্দী করিবার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে মিরক হাসান[১] ভকিলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অল্প কয়েক দিন পরেই, তিনি যখন কারাগারে বন্দী তখন তাহার শত্রুগণ তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিল ; আর যেহেতু তাহারা আমীর মওদুদের অনুমতি ছাড়াই এই কাজ সম্পন্ন করিল, তাহারা তাহার নিকট হইতে ইহা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিল ; আর প্রতিদিন চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে আমীর মওদুদকে ভ্রমণে বহির্গত করিতে প্ররোচিত করা যায় এই আশায় যে, আমীর যদি ঘযনীন ত্যাগ করেন তবে তাহাদের এই কাজ গোপন থাকিয়া যাইবে। শেষ পর্যন্ত আমীর কাবুল ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন শ্যামকোট[২] দুর্গে পৌঁছিলেন, তখন তিনি শূল বেদনায় আক্রান্ত হন, আর তাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে তিনি ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। তিনি যখন তথায় পৌঁছেন, তখনও তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আবু আলী কোতোয়ালকে কারগার হইতে আনিয়া তাহার নিকট হাজির করিবার জন্য মিরককে নির্দেশ দেন। মিরক ভকিল নানা প্রকার ছলচাতুরী[৩] আরম্ভ করেন এবং এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করেন ; আর এই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আঃ হিঃ ৪৪১ সনের ২৪ই রজব আমীর মওদুদ ইন্তেকাল করেন। তাহার রাজত্বকাল নয় বৎসর কাল বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র মুহম্মদ আলী বিন রাবির প্রচেষ্টায় সিংহাসনে স্থাপিত হন ; কিন্তু পাঁচ দিন পর আমীরদের মতের পরিবর্তন ঘটে এবং আলী বিন মাসুদকে সুলতানাতে উন্নীত করা হয়।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে। অন্যান্যগুলিতে আছে মিরক বিন হসেন, মিরক বিন হাসান।
২. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে ; অন্যান্যগুলিতে আছে শিয়ালকোট, সযকোট, সনকোট।
৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে আছে, সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া দাবী করিয়া কিন্তু অন্যান্য সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে ছলচাতুরী করিয়া।

৬। আলী বিন মাসুদ

আলী বিন মাসুদকে যখন সিংহাসনে বসান হয়, তখন আবদুর রাযযাক বিন আহমদ ময়মন্দী, যাহাকে আমীর মওদুদ সিসতানের গভর্ণর মনোনীত করিয়াছিলেন, বাসত ও ইসফ্রাইনের[১] মধ্যবর্তী এক দুর্গে পৌঁছেন এবং দেখিতে পান যে আমীর মওদুদের নির্দেশে আবদুর রশিদ ঐ দুর্গে কারারুদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি শেষোক্ত জনকে দুর্গের বাহিরে আনয়ন করেন এবং তাহাকে তাহার বাদশাহ স্বীকার করেন। তিনি সেনাদের তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশের জন্য তলব করেন এবং তাহাদের সকলকেই তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করান। আলীর রাজত্বকাল তিন মাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

৭। আবদুর রশিদ বিন মাসুদ

তাহাকে যখন সিংহাসনে বসান হয় তখন তিনি আবদুর রাযযাক ও অন্যান্য সেনাপতিগণসহ ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর হন। তাহারা যখন ঘযনীনের সন্নিকটে উপস্থিত হন আলী বিন মাসুদ কোন যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করেন আর আবদুর রশিদ ঘযনীর সুলতান হন। তিনি তুঘরাল হাজিবকে, যিনি সুলতান মাহমুদের একজন আমীর ছিলেন, সিসতানে প্রেরণ করেন আর তুঘরাল ঐ দেশটি অধিকার করেন এবং যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমীর আবদুর রশিদকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন রাজধানীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন আমীর তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হন এবং তাহার অনুগামীগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন আর তুঘরাল শহরটি দখল করেন এবং আমীর আবদুর রশিদ ও সুলতান মাহমুদের অন্যান্য বংশধরদের হত্যা করিবার নির্দেশ দান করেন; একমাত্র মাসুদের এক কন্যা ছাড়া, যাহাকে তিনি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করেন। কিন্তু একদিন তিনি যখন প্রকাশ্য দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাহার অন্যায় কার্যাবলীর জন্য বিদ্বেষবশতঃ একজন সাহসী লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাহাদের তরবারি দ্বারা তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং তাহার মৃতদেহ দুর্ভাগ্যের ধুলায় নিক্ষেপ করে। তাহার শাসন চারি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।[২]

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে ইসফ্রার: ইসরার; ইসতখার।
২. সম্ভবতঃ ইহা আবদুর রশিদকেও বুঝাইতেছে। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী আবদুর রশিদের রাজত্বকাল আড়াই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল আর তুঘরালের রাজত্বকাল স্থায়ী হইয়াছিল চল্লিশ দিন।

৮। ফররুখযাদ বিন মাসুদ

তুঘরাল যখন নিহত হয়, আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিগণ কারাগারে বন্দী দশা[১] হইতে ফররুখযাদকে মুক্তি দান করেন এবং তাহাকে সিংহাসনে বসান। এই সময়ে সলজুকীয়গণ শক্তিশালী বাহিনীসহ ঘযনীন আক্রমণ করিতে আগমন করেন এবং তাহা দখল করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু হরহর[২] ফররুখযাদের নির্দেশে তাহাদের মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হন; আর তাহাদের বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়; আর তাহাদের কতিপয় সেনাপতিকে বন্দী করা হয় এবং তাহাদিগকে আমীরের সম্মুখে আনয়ন করা হয়, আর তিনি তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দান করেন। দ্বিতীয়বার আলব আরসলান এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করেন এবং ঘযনীনের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের পরাজিত করিয়া ঘযনীনের বহু আমীরকে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে খুরাসান নিয়া যান। ফররুখযাদের রাজত্ব যখন ছয় বৎসর[৩] কাল বিস্তৃত হয় তখন তিনি এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যান আর তাহার স্থলে তাহার ভ্রাতা ইব্রাহীম বিন মাসুদ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৯। ইব্রাহীম বিন মাসুদ বিন সুলতান মাহমুদ

তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু সুলতান ছিলেন এবং তাহার দক্ষতা এবং বিজ্ঞতার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি চমৎকার হস্তাক্ষরে লিখিতেন; আর প্রতি বৎসর তিনি কোরানের এক নকল করিতেন এবং বহু ধনরত্নসহ তাহা মক্কায় প্রেরণ করিতেন। সংক্ষেপে, তিনি যখন সলজুকীগণের সঙ্গে এক শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন আর ঐ অঞ্চল হইতে তাহার মনের সকল উদ্বেগ দূর হইয়া গেল তখন তিনি হিন্দুস্তানের দিকে তাহার মনোযোগ নিবিষ্ট করিলেন এবং ঐ দেশের বহু শহর ও দুর্গ অধিকার করিলেন। ইহাদের মধ্যে একটি খুব জনবহুল শহর ছিল। অধিবাসীগণ ছিল খুরাসানীদের বংশধর, যাহাদের আফ্রাশিয়াব খুরাসান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ শহরে একটি জলাশয় ছিল, যাহার পরিধি ছিল অর্ধ ফরসঙ্গ (লীগ)। যদিও মানুষ ও পশু ইহার পানি পান

১. তবকাত-ই নাসিরী অনুযায়ী বরঘন্দের দুর্গে।
২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে: অন্য দুইটিতে আছে খর খর।
৩. তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে তাহার রাজত্বকাল সাত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে তাহার রাজত্বকাল স্থায়ী হইয়াছিল ছয় বৎসর। কথিত আছে তিনি ও মওদুদের ন্যায় শূল বেদনায় ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

করিত, তবু কখনও ইহার পানি এতটুকু কমিত না; আর দুর্গের চতুর্দিকে গভীর জঙ্গল থাকিবার ফলে ইহা হইতে কোন প্রকার আগমন নির্গমন দৃষ্টিগোচর হইত না। ফররুখযাদ তাহার শৌর্য ও বীর্যের দ্বারা এরূপ শক্তিশালী দুর্গ অধিকার করেন এবং এক লক্ষ লোককে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে ঘযনীনে আনয়ন করেন। ইহা হইতে তিনি যে কি পরিমাণ দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিয়াছিলেন তাহার ধারণা করা যাইতে পারে। তিনি আঃ হিঃ ৪৯১ সনে[১] ইন্তেকাল করেন আর তাহার রাজত্বকাল ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আর বনাকতির লেখকের মত অনুযায়ী বিয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১০। মাসুদ বিন ইব্রাহীম

তাহার পিতার পর তিনি তাহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং সুলতান জামাল উদ্দীন উপাধিতে ভূষিত হন।[২] তাহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আর কোন কিছু আমার চোখে পড়ে নাই। তাহার রাজত্বকাল ষোল বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১১। আরসলান শাহ বিন মাসুদ বিন ইব্রাহীম

তাহার পিতার পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন আর তাহার রাজত্বে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য তিনি একমাত্র বহরাম শাহ ছাড়া তাহার ভ্রাতাগণের সকলকেই বন্দী ও কারারুদ্ধ করেন; বহরাম শাহ খুরাসানে সুলতান মনসুরের নিকট পলায়ন করেন; আর যদিও সুলতান মনসুর তাহার সম্বন্ধে পত্র লিখেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তাহার পক্ষে সুপারিশ করেন; আরসলান শাহ তাহার অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। শেষ পর্যন্ত সুলতান মনসুর এক বিশাল বাহিনীসহ তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তিনি যখন ঘযনীনের এক লীগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন আরসলান শাহ ত্রিশ সহস্র সৈন্যসহ তাহার মোকাবিলা করিতে

১. তবকাত-ই নাসিরী অনুযায়ী তিনি ইন্তেকাল করেন আঃ হিঃ ৪৯২ সনে।

২. তবকাত-ই নাসিরীর মতে তাহার উপাধি ছিল আলাউদ্দীন, কিন্তু অনুবাদকের এক টীকা অনুযায়ী তাহার প্রকৃত উপাধি ছিল আলাউদ্দৌলা। তিনি সম্ভবতঃ একজন ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী সুলতান ছিলেন। তিনি 'করিম' বা 'পরোপকারী' উপাধি লাভ করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাহার সময়েই হাজিব তুঘাতিগীন গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্তানে এক ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন আর একমাত্র সুলতান মাহমুদ ছাড়া আর কেহই সেনাদলসহ গমন করেন নাই—এমন স্থানেও তিনি অভিযান পরিচালনা করেন।

অগ্রসর হন এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরসলান শাহ পরাজিত হন এবং হিন্দুস্তানে পশ্চাদপসরণ করেন। সুলতান মনসুর ঘযনীন প্রবেশ করেন এবং তথায় চল্লিশ দিন অবস্থান করেন আর বহরাম শাহকে দেশটি অর্পণ করিয়া তাহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আরসলান শাহ যখন সুলতান মনসুরের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান হইতে এক বিরাট বাহিনীসহ ঘযনীনে ফিরিয়া আসিলেন। বহরাম শাহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইলেন না এবং ঘযনীন ত্যাগ করিয়া বামিয়ান দুর্গে গমন করিলেন: এবং তৎপর সুলতান মনসুরের নিকট হইতে সাহায্য ও সৈন্য লাভ করিয়া পুনরায় ঘযনীনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আরসলান শাহ সুলতান মনসুরের সেনাদের ভয়ে ভীত হইয়া শহর ছাড়িয়া গেলেন এবং অজ্ঞাত স্থানে গমন করিলেন। সলজুক বাহিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহাকে বন্দী করিল এবং তাহাকে তাহার ভ্রাতা বহরাম শাহের নিকট আনয়ন করিল; আর তিনি তাহার ভ্রাতার হস্তে নিহত হইলেন।[১] তাহার রাজত্ব তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

১২। বহরাম শাহ বিন মাসুদ বিন ইব্রাহীম

তিনি অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন। শেখ সনাতী তাহার সম্মানে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন আর তাহার রাজত্বকালে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছিল। 'কলেলাহ ওয়া দমনাহ' তাহার সম্মানেই রচিত হইয়াছিল; আর যে দিন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন সৈয়দ হাসান ঘযনভী এক গীতি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম দুই পংতি এইরূপ ছিল ঃ

সপ্ত গগন হইতে একই উচ্চ রব উত্থিত হইল
"পৃথিবীর মহান বহরাম শাহ একজন রাজা।"

তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ হিন্দুস্তানে অভিযান করেন এবং তাহার পূর্বপুরুষগণ কখনও জয় করেন নাই এমন অঞ্চলসমূহ তিনি অধিকার করেন। তিনি তাহার হিন্দুস্তানের রাজ্য শাসনের জন্য তাহার একজন আমীরকে রাখিয়া আসেন এবং স্বয়ং ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার দীর্ঘকাল পর ঐ লোকটি তাহার অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিল এবং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করিল। এই সংবাদ পাইয়া বহরাম শাহ

১. তবকাত-ই নাসিরী তাহার ইন্তেকাল ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছে।

বিদ্রোহীদের শাস্তি দিবার জন্য হিন্দুস্তান আগমন করিলেন। তিনি যখন মুলতানের সন্নিকটে উপস্থিত লইলেন তখন উভয় বাহিনী ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। বিদ্রোহীগণ তাহার নিকট পরাজিত হইল এবং তাহারা বন্দী ও নিহত হইল। হিন্দুস্তান রাজ্যটি দ্বিতীয়বার বহরাম শাহের দখলে আসিল। আঃ হিঃ ৫৪৭ সনে[১] তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাহার রাজত্বকাল পয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৩। খুসরু শাহ বিন বহরাম শাহ বিন মাসুদ বিন ইব্রাহীম

তাহার পিতার পর তিনি সুলতান হইলেন। যেহেতু আলাউদ্দীন হুসেন ঘুরি ঘযনীনের প্রতি তাহার মনোযোগ নিবিষ্ট করিলেন, খুসরু শাহ হিন্দুস্তানে পলায়ন করিলেন এবং লাহোরে তাহার শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। আলাউদ্দীন হুসেন প্রত্যাবর্তন করিলে খুসরু শাহ ঘযনীনে ফিরিয়া আসেন কিন্তু যেহেতু ঘয সুলতান মনসুরকে বন্দী করিয়া ঘযনীনের অভিমুখে অগ্রসর হইল, খুসরু শাহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া পুনরায় লাহোরে পলায়ন করেন; আর আঃ হিঃ ৫৫৫ সনে তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন। তাহার রাজত্বকাল[২] আট বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৪। খুসরু মালিক বিন খুসরু শাহ

তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি লাহোরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিনয়ী ও ধীর স্থির ছিলেন; কিন্তু যেহেতু তিনি ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিলেন, রাজ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

রাজা যখন তাহার প্রজাদের পাহারা দেয় না
রাখাল যেমন তাহার ভেড়ার পাল রক্ষা করে,
রাজ্যে তখন চরম বিশৃঙ্খলা আর
ভয়াবহ দুঃখ দুর্দশা সৃষ্টি হয়।

১. বহরাম শাহের ইন্তেকালের বৎসর সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবকাত-ই-নাসিরী অনুবাদের ১১২ পৃঃ মেজর রাভার্টী বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দেওয়া তারিখগুলির আলোচনা করা হইয়াছে।

২. খুসরু শাহের রাজত্ব সম্বন্ধে এই স্থানে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা তাবকিরাত-উল মুলুকে দেওয়া ইতিহাসের সঙ্গে মোটামুটি মিল আছে।

যখন সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সাম ঘযনীনে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাহার সেনাবাহিনীসহ ভারতে অগ্রসর হন এবং অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাসহ লাহোরের সন্নিকটে উপস্থিত হন তখন খুসরু মালিক তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন আর আঃ হিঃ ৫৮৩ সনে নিজেকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন। সুলতান তাহাকে ঘযনীনে প্রেরণ করেন এবং তথায় তিনি মৃত্যুর সরবত পান করিতে বাধ্য হন। তাহার রাজত্ব আটাশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল; আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘযনভীদের ক্ষমতারও অবসান ঘটিল; আর রাজত্ব এই বংশের হাত হইতে চলিয়া গেল।

প্রথম অংশ ঃ দিল্লীর সুলতানগণ

সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সাম ঘুরি

শিহাবুদ্দীন[১] নামেই তিনি সুবিখ্যাত। শামসুদ্দীন নামে তাহার এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি তাহার চেয়ে বয়সে বড়; তিনি সুলতান হইবার পর তাহাকে বলা হইত ঘিয়াসুদ্দীন। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন ঘুরের সুলতান হইবার পর এবং বহু দেশ বিজয়ের পর তিনি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইযযুদ্দীনকে গরমশির দেশে অবস্থিত তিগিনাবাদে রাখিয়া যান আর যখন সুলতান মুইযযুদ্দীন তিগিনাবাদের শাসনকর্তা হন তখন তিনি পুনঃ পুনঃ ঘযনীনের[২] বিরুদ্ধে তাহার সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকেন এবং আঃ হিঃ ৫৬৯ সন পর্যন্ত দেশটি অভিযান করিতে ও বিধ্বস্ত করিতে থাকেন; আর ঐ বৎসরেই সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তাহা অধিকার করেন আর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইযযুদ্দীন মুহম্মদকে তথায় রাখিয়া যান।

আঃ হিঃ ৫৭০ সনে মুইযযুদ্দীন তাহার ভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে ঘযনীনে আগমন করেন; আর এক বৎসর পর তিনি তাহার সেনাদলসহ উছ অভিমুখে গমন করেন এবং করামিতা নামক ধর্মবিরোধিদের নিকট হইতে মুলতান জয় করেন এবং তাহা অধিকার করেন। ভাটি উপজাতির[৩] শাসনকর্তাগণ নিজেদিগকে উছ দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন; কিন্তু কয়েক দিন যুদ্ধের পর ইহা বিজিত হয়; আর ইহা এবং সুলতান আলী করমাখের দায়িত্বে অর্পণ করা হয় এবং মুইযযুদ্দীন ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৫৭৪ সনে তিনি পুনরায় উছ ও মুলতানে আগমন করেন; আর তথা হইতে তিনি মরুভূমির মধ্য দিয়া গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর হন। ঐ দেশের শাসনকর্তা

---

১. তাহার ভ্রাতা ঘুরের সার্বভৌমত্ব লাভের পূর্বেই তিনি শিহাবুদ্দীন নামে পরিচিত ছিলেন; ঘুরের আধিপত্য লাভের পর তাহার উপাধি হয় মুইযযুদ্দীন। পূর্বের উপাধিটি তাজ-উল মাসির অথবা তবকাত-ই নাসিরীতে আদৌ উল্লেখিত নাই।

২. এই সময়ে ঘযনীন ঘয নামীয় এক উপজাতির হস্তে ছিল, এবং বার বৎসর পূর্বেই তাহারা ইহা দখল করিয়া নিয়াছিল; আর ঘিয়াসুদ্দীন তাহাদেরই পরাজিত করেন।

৩. এই উপজাতির নামটি বিভিন্ন রূপ বানানে লিখা হইয়াছে। পূর্বে ইহারা সিন্ধুর অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

রায় ভীম দেও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; আর এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সুলতান পরাজিত হন; আর বহু কষ্টের পর তিনি ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় অল্প কাল বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

অতঃপর আঃ হিঃ ৫৭৫ সনে[১] তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হন; যাহা প্রাচীন পুস্তকসমূহে বিক্রাম বা বিগ্রাম বা পরশুর বা ফুরশুর নামে খ্যাতনামা হইয়া আছে, আর ইহার চারিপাশের দেশটি অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি লাহোর গমন করিলেন; আর সুলতান খুসরু মালিক, যিনি ছিলেন ঘযনীনের সুলতান মাহমুদের বংশধর, আর এই সময়ে লাহোরে শাসন করিতেন নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছু আলাপ-আলোচনার পর খুসরু মালিক কররূপে একটি হস্তী[২] সহ তাহার পুত্রকে প্রেরণ করেন আর সুলতান মুইযযুদ্দীন তাহার সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

পর বৎসর তিনি তাহার সেনাদলসহ দিওয়ান অভিমুখে অগ্রসর হন, ইহা থাট্টার[৩] ও অপর নাম; আর উপকুল ভাগের সমস্ত দেশটা তাহার অধীনে আনয়ন করিয়া এবং প্রচুর লুণ্ঠিত মালপত্র সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৫ ০ সনে তিনি পুনরায় লাহোর দেশটি আক্রমণ করেন; আর খুসরু মালিক পুনরায় নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন লাহোরের চতুর্দিকের অঞ্চলটি লুণ্ঠন করেন এবং ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যস্থলে শিয়ালকোট[৪] দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন আর হুসেন খরমিলকে দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর খুসরু মালিক খোখরগণের[৫] ও অন্যান্য উপজাতির

১. এই তারিখটি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তিনজন ঐতিহাসিকের মতে ইহা ৫৭৫ আঃ হিঃ, দুইজনের মতে আঃ হিঃ ৫৭৬ সন; কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ইহা আঃ হিঃ ৫৭৭ সন; আর বদাওনীর মতে ইহা আঃ হিঃ ৫৮০ সন।

২. কতিপয় ঐতিহাসিক এই হস্তীকে একটি খ্যাতনামা হস্তী এবং খুসরু মালিকের হস্তীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে দিওয়ালকে থাট্টার বন্দর রূপে অভিহিত করা হইয়াছে; একটি পাণ্ডুলিপিতে থাট্টাকে দিওয়ালের অপর নাম বলা হইয়াছে; আর একটিতে দিওয়ালের সম্পর্কে থাট্টার কোন উল্লেখই করা হয় নাই; মেজর রাভার্টীর মতে ইহা এক স্থান নয়; ইহার অবস্থান থাট্টা প্রদেশে, থাট্টা ও করাচীর মধ্যে অবস্থিত।

৪. তবকাত-ই-নাসিরীর মতে মুইযযুদ্দীন শিয়ালকোট দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই, তিনি শুধু ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা একটি অতি প্রাচীন দুর্গ এবং একজন প্রাচীন হিন্দু রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল; মুইযযুদ্দীন ইহা পুনরুদ্ধার করেন।

৫. খোখরগণ গখর বা ঘখরদের হইতে স্বতন্ত্র জাতি।

সাহায্যে বহু দিন ধরিয়া দুর্গটি অবরোধ করিয়া রাখেন ; কিন্তু ইহা অধিকার করিতে ব্যর্থ হন এবং অবরোধ উত্তোলন করিয়া চলিয়া যান।

আঃ হিঃ ৫৮২ সনে সুলতান মুইযযুদ্দীন পুনরায় লাহোর আক্রমণ করেন। খুসরু মালিক পুনরায় নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কিছুদিন ধরিয়া নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার দুর্বলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি ত্বরায় সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সুলতান তাহাকে তাহার সঙ্গে ঘযনীনে নিয়া যান এবং তৎপর তাহাকে তাহার ভ্রাতা ঘিয়াসুদ্দিনের নিকট ফিরোয কোহতে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন তাহাকে খর্জিস্তানের একটি দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তিনি তথায় কারারুদ্ধ থাকা অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন।[১] সুলতান মুইযযুদ্দীন আলী করমাখের হস্তে লাহোরের দায়িত্বভার অর্পণ করেন ; ইঁহাকে পূর্বে মুলতানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছিল ; এবং তাহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৫৮৭ সনে তিনি পুনরায় হিন্দুস্তান অভিযান করিলেন। ঘযনীন ত্যাগ করিয়া তিনি সরহিন্দ[২] দুর্গে আগমন করিলেন ; এই স্থানটি ঐ সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী রাজাদের রাজধানী ছিল ; তিনি ইহা অধিকার করেন আর ইহা যিয়াউদ্দীন তুকালীর[৩] (অথবা অন্যান্যদের মতে তুলাকীর) হস্তে অর্পণ করিয়া এবং ইহা পাহারা দিবার জন্য তাহাকে বিশেষভাবে বাছাই করা বার শত অশ্বারোহী সৈন্য এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, আর ঐ সময়ই তিনি আজমীরের রায় পিথোরার (পৃথ্বিরাজ) আগমনের সংবাদ পান এবং তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হন। অতঃপর সরস্বতী নদীর তীরে তরাইন[৪] নামক স্থানে, যাহা থানেশ্বর হইতে সাত

---

১. এই বিবরণ প্রধানতঃ তবকাত-ই নাসিরীতে দেওয়া বিবরণের মত, কিন্তু ঐ পুস্তকে বলা হইয়াছে যে খুসরু মালিককে এক চুক্তি অনুযায়ী বাহির হইয়া আসিতে প্ররোচিত করা হয়। খর্জিস্তানের যে দুর্গটিতে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তবকাত-ই-নাসিরীতে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বলরওয়ান। এই বিবরণ কিন্তু এই লেখকেরই খুসরু মালিকের শাসনের বিবরণে এই সম্বন্ধে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা হইতে কিছুটা ভিন্নরূপ।

২. এই পুস্তকের সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই সরহিন্দ দেওয়া আছে, কিন্তু মেজর রাভার্টীর মতে তবকাত-ই-নাসিরীর সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে, যেগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইহা তবরহিন্দাহ বা তবরিহিন্দাহ লিখিয়াছেন।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই তাহার নাম যিয়াউদ্দীন তুকল দেওয়া আছে ; কিন্তু তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী তাহার সঠিক নাম ছিল মালিক যিয়াউদ্দীন কাযী মুহম্মদ-ই-আবদুস সালাম নিসাভী তুলকী। মেজর রাভার্টী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তিনি অথবা তাহার পরিবার আদিতে নিশা হইতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি তুখলকের কাযী ছিলেন।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি তরাইন দেওয়া আছে ; আর একটি যাহা আছে তাহা তরাইন বা নরাইন দুইটির একটি হইবে, কিন্তু দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা নরাইন দেওয়া আছে ; সঠিক নামটি তরাইন হইবে।

ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং বর্তমানে যাহা তারাওয়ারী[১] নামে পরিচিত, আর দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, আর ঐ স্থানে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইসলামের বাহিনী পরাজিত হয়। সুলতান যুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন এবং তাহার বল্লম দ্বারা পিথোরার ভ্রাতা খান্দি রায়[২] কে মুখে আঘাত করেন; খান্দি রায় ছিলেন দিল্লীর শাসনকর্তা, এবং তিনি একটি হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাহার সৈন্যদের পরিচালনা করিতেছিলেন; আর তিনি প্রতিদানে তাহার বল্লম দ্বারা সুলতানের বাহুতে আঘাত করেন এবং তাহাকে আহত করেন। সুলতান তখন তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন, আর সেই সময়ে একজন তরুণ খালজি পদাতিক সৈন্য তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহার পিছনে তাহার অশ্বে আরোহণ করে আর তাহাকে তাহার বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহিরে নিয়া আসে; আর সুলতানের অদৃশ্য হইবার ফলে সৈন্যদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহা প্রশমিত হয়। অতঃপর সুলতান যখন ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রায় পিথোরা সরহিন্দ (তাবারিন্দার) দুর্গ আক্রমণ করেন; এই দুর্গটি যিয়াউদ্দীন তুকালী রক্ষা করিতেছিলেন; আর তিনি ইহা এক বৎসর এক মাস কাল অবরোধ করিয়া রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা দ্বারা ইহা দখল করেন। আঃ হিঃ ৫৮৮ সনে সুলতান মুইযযুদ্দীন পুনরায় ভারতে আগমন করেন আর ঠিক ঐ তরাইনের প্রান্তরেই, যেখানে পূর্বে এক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তিনি পুনরায় পিথোরার মোকাবিলা করেন। আর অপর একটি মহা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলতান তাহার সেনাবাহিনী চারি ভাগে ভাগ করেন এবং কয়েকবার আক্রমণ পরিচালনা করিয়া শেষ পর্যন্ত শত্রুদের পরাজিত করেন। পিথোরাকে বন্দী করা হয় এবং হত্যা করা হয় আর খান্দি রায় (গোবিন্দ রায়) যুদ্ধে নিহত হয়। অতঃপর সুলতান সরস্বতী[৩] এর হানসী দুর্গদ্বয় জয় করেন এবং পিথোরার রাজধানী আজমীর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করেন; আর তাহার একজন

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে নামটি তরাওয়ারী দেওয়া আছে। মেজর র‍্যাভার্টীর মতে স্থানটি তরাওয়ারী হইবে।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। অন্য তিনটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা দেওয়া আছে খান্দাহ রায়, খন্দা রায় এবং খন্দ রায়। তবকাত-ই-নাসিরীর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে গোবিন্দ বা গোবিন্দহ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাণ্ডুলিপিতে এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের লেখায় ইহা খন্দ বা খন্দি দেওয়া আছে। একজন হিন্দু চারণ কবি চান্দ তাহাকে বলিয়াছেন রায় গোবিন্দ; সম্ভবতঃ ইহাই শুদ্ধ নাম।

৩. ইহা প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। ইবনে বতুতা সরসুতীকে একটি বিখ্যাত শহর বলিয়াছেন। আকবরের সময়ে সম্বল সরকারে সরসুতী ছিল একটি মহাল।

প্রিয় ক্রীতদাস মালিক কুতুবুদ্দীন আয়বককে দিল্লী হইতে সত্তর ক্রোশ দূরবর্তী কুহরাম শহরে রাখিয়া এবং ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত শিবালিক পর্বতশ্রেণীর সন্নিকটস্থ দেশ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া তিনি ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন।

এই একই বৎসরে মালিক কুতুবুদ্দীন আয়বক দিল্লী ও মিরাট দুর্গদ্বয় জয় করেন এবং এইগুলি পিথোরা ও খান্দি রায়ের আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নেন। আঃ হিঃ ৫৮৯ সনে তিনি কোল দুর্গ দখল করেন এবং দিল্লীতে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং ঐ স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনয়ন করেন। এই দিন হইতেই দিল্লী সুলতানদের রাজধানীতে পরিণত হয়। এই বৎসরেই সুলতান মুইযযুদ্দীন ভারত আক্রমণের জন্য পুনরায় ঘযনীন ত্যাগ করেন এবং কান্যকুব্জ অভিমুখে অগ্রসর হন। আর ঐ শহরের রাজা রায় জয় চান্দ, যাহার তিন শতেরও অধিক হস্তী ছিল, তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ইতাওয়া ও চন্দোয়ারের[১] সন্নিকটে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; কিন্তু তিনি পরাজিত হন আর তাহার হস্তীসমূহ ও সৈন্যগণ সুলতানের হস্তগত হয়। অতঃপর সুলতান বিজয় ও সাফল্যের মুকুট পরিধান করিয়া ঘযনীন প্রত্যাবর্তন করেন আর প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য সঙ্গে নিয়া যান আর মালিক কুতুবুদ্দীনকে দিল্লী রাখিয়া যান। শেষোক্ত জন থানকির,[২] গোয়ালিয়র এবং বদাওন দুর্গসমূহ অধিকার করেন আর তাহার সৈন্যবাহিনীসহ গুজরাটের শহর নহরওয়ালা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সুলতানকে তিনি যে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি ঐ দেশের শাসনকর্তা রায় ভীম দেওকে পরাজিত করেন; এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন যখন তুষ ও সরখসের[৩] সীমান্তে ছিলেন সেই সময় তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঘিয়াসুদ্দীনের, যাহার উপাধি ছিল বাদশাহ, ইন্তেকালের সংবাদ পান এবং তিনি তখন বাদঘেইসে আগমন করেন। আর শোক অনুষ্ঠান পালনের পর তাহার ভ্রাতার রাজ্য তিনি এই প্রকারে সাম-এর বংশধরদের মধ্যে বণ্টন

১. এই স্থানটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। মেজর রাভার্টী বলেন যে, ইহার অনুরূপ নামের একমাত্র স্থান হইল চান্দপুর বা চন্দনপুর, ইহা ফররুখাবাদ জেলায় বেরেলী হইতে ফতেহগড়ের পথে অবস্থিত অক্ষাংশ ২৭:২৭´, ও দ্রাঘিমা ৭৯°৪২´।

২. থানকির (আধুনিক বিয়ানাহ) দখলের তারিখ সম্বন্ধে আর কে ইহা অধিকার করেন সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

৩. তিনি হিরাতের সাহায্যার্থে তথায় গমন করিয়াছিলেন; খোয়ারিযমের সুলতান মুহম্মদ শাহের সেনাবাহিনী কর্তৃক ইহা অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

করিয়া দেন, যে তিনি ফিরোযকোহ্ এবং ঘুরের সিংহাসন প্রদান করেন তাহার চাচাত ভাই মালিক জিয়াউদ্দীনকে। তিনি সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের জামাতাও ছিলেন; আর সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ বাসত, এবং ফারাহ্ এবং ইসফারাইন লাভ করেন, আর সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের ভাগিনেয় নাসিরুদ্দীন ঘাযি লাভ করেন হিরাত এবং তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহের দখল ও শাসন কর্তৃত্ব। অতঃপর তিনি বাদঘেইস হইতে ঘযনীন আগমন করেন।

অতঃপর তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া খোয়ারিযম দেশটি অধিকার করিবার জন্য ঐ দেশে অভিযান করেন আর খোয়ারিযমের রাজা পর্যুদস্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করেন। সুলতান খোয়ারিযম পৌঁছেন এবং কয়েকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে; খোয়ারিযমের সৈন্যগণ জেইহুন হইতে খোয়ারিযমের পূর্ব পর্যন্ত যে নালা কাটা হইয়াছিল, তাহার তীরে যুদ্ধ করে আর যুদ্ধে ঘুরের কতিপয় আমীর নিহত হয়। সুলতান যেহেতু খোয়ারিযম অধিকার করিতে ব্যর্থ হন, তিনি জেইহুনের তীর ধরিয়া বলখ অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, আর খিতার সৈন্যবাহিনী এবং তুর্কমান মালিকগণ, যাহারা সুলতান মুহম্মদ খোয়ারিযম শাহের সাহায্যার্থে আগমন করিয়াছিল, জেইহুনের তীরে আগমন করে এবং মুইযযুদ্দীনের গমন পথ বন্ধ করিয়া দেয়। শেষোক্ত জন যখন আঁড়খুদ পৌঁছেন তখন এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর সুলতান মহা শৌর্য ও বীর্যের সঙ্গে তাহার সহিত যে একশত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল তাহাদের লইয়া যুদ্ধ করেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্তু যেহেতু তাহার আর শত্রুদের বাধা দিবার মত ক্ষমতা ছিল না তাই তিনি নিজেকে আঁড়খুদ দুর্গে আবদ্ধ করেন; আর তৎপর আলাপ-আলোচনা করিবার পর তিনি ইহা পরিত্যাগ করেন এবং নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিয়া ঘযনীনে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময়ে এক দল খোখর লাহোরের সন্নিকটে বিদ্রোহ করে, আর সুলতান তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন; আর কুতবুদ্দীন আয়বকও তাহার খেদমত করিবার জন্য দিল্লী হইতে আগমন করেন। খোখরদের শাস্তি দিয়া তিনি ঘযনীন অভিমুখে অগ্রসর হন আর তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন ঘযনীনের অন্তর্গত দামইয়াক নামক স্থানে একদল খোখর ফিদাই-এর[১] হস্তে তিনি শহীদ হন। এই ঘটনার তারিখটি স্মরণ রাখিবার জন্য পরপৃষ্ঠার চতুষ্পদী শ্লোকটি রচনা করা হইয়াছে:

১. তবকাত-ই নাসিরীর মতে, মুলাহিদা সম্প্রদায়ের এক অনুগামীর হস্তে সুলতান নিহত হন। আর যেহেতু দুই বা তিন বৎসর পূর্বে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন, ইহা কোন প্রকারেই অসম্ভব নয় যে তাহারাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে। তবকাত-ই-আকবরীর

জল ও স্থলের অধিপতি মুইযযুদ্দীনের হত্যাকাণ্ড,
পৃথিবীর আরম্ভ হইতে ইহার মত কোন নৃপতির আবির্ভাব ঘটে নাই ;
ছয় শত দুই বৎসরের শাবান মাসে তিন তারিখে
ঘযনীর পথে দামিয়াকের বিশ্রাম স্থলে সংঘটিত হয় ।[১]

ঘযনীতে তাহার শাসন আরম্ভ হইবার সময় হইতে তাহার জীবনের অবসান পর্যন্ত তাহার রাজত্বকাল ছিল বত্রিশ বৎসর কয়েক মাস। একমাত্র এক কন্যা ছাড়া তিনি আর কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। তাহারা বলে যে তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এবং সর্বোচ্চ মূল্যের পাঁচশত মণ হীরাসহ প্রচুর ধন-রত্ন রাখিয়া যান; আর অন্যান্য ধন-সম্ভার ও মূল্যবান জিনিসপত্রের পরিমাণ ইহা হইতেই ধারণা করা যাইতে পারে। তিনি নয়বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ; দুইবার পরাজিত হন : আর অন্যান্যবার জয়লাভ করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ রাজা এবং প্রজাদের প্রতি দয়াবান। তিনি পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিগণকে সম্মানের চোখে দেখিতেন এবং তাহাদের উপকার করিতেন।

সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বক

তিনি সুলতান মুইযযুদ্দীনের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। সর্বপ্রথমে তাহাকে যখন তুর্কীস্তান হইতে আনয়ন করা হয় তখন ইমাম আবু হানিফা কুফির বংশধর

ন্যায় জামি-উত তাওয়ারিখও বলে যে হত্যাকারীগণ খোখর ছিল, কিন্তু ইহার অল্প পরেই এই কথার বিপরীত কথা লিখিয়াছে। হিন্দুগণ ভিন্নরূপ বিবরণ দেয় যাহা আবুল ফজল পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং জমুনের বা জম্মুর এক ইতিহাসে লিখা হইয়াছে এবং মেজর রাভার্টী যাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের বিবরণ অনুযায়ী রায় পিথোরা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি তীর দ্বারা তিনি নিহত হন ; রায় পিথোরা তখনও একজন বন্দী ছিলেন। পিথোরার মহাকবি চন্দা বা চান্দা তীরন্দাজরূপে পিথোরার দক্ষতার প্রশংসা করিয়া সুলতানের কৌতুহলের উদ্রেক করে পিথোরাকে তাহার সম্মুখে আনিয়া তাহার দক্ষতার প্রমাণ দিবার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করে। পিথোরা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তীর নিক্ষেপ না করিয়া সুলতানের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করেন আর সুলতান তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন আর সুলতানের অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ রায় পিথোরা ও চান্দাকে কাটিয়া ফেলে। জম্মুর ইতিহাস অনুযায়ী রায় পিথোরাকে ইতিপূর্বেই অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি সুলতানের গলার স্বর দ্বারা এবং চন্দার সংকেত দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুলতানকে তীর বিদ্ধ করিতে সক্ষম হন।

১. কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই হত্যাকাণ্ড ১লা শাবান তারিখে সংঘটিত হয়। দামিয়াকের অবস্থান বিভিন্ন রূপ দেওয়া হইয়াছে ; কেহ বলেন যে ইহা ঝিলামের সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত, কেহ বলেন নিলাবের তীরে আবার অন্যান্যরা বলে যে ইহা সিন্ধুর পথে ঘযনীনের পথে অবস্থিত একটি গ্রাম।

কাযী ফখরুদ্দীন আবদুল আযীয কুফি তাহাকে ক্রয় করেন, আর তিনি কাযীর পুত্র-গণের সঙ্গে কোরান পাঠ করেন এবং আচার-ব্যবহারের জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর একজন ব্যবসায়ী তাহাকে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেন এবং বিশেষ পছন্দসই বস্তুরূপে তাহাকে ঘযনীনে সুলতান মুইযযুদ্দীনের নিকট নিয়া যান। সুলতান অতি উচ্চ মূল্যে তাহাকে ঐ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। যেহেতু তাহার কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ভাঙ্গা ছিল, তাই তাহাকে আয়বক বলা হইত। তিনি অত্যন্ত সুবিবেচনা ও বিশ্বস্ততার সহিত সুলতানের খেদমত করেন। কথিত আছে যে, এক রাত্রে সুলতান একটি মহাসভা আহ্বান করেন আর তিনি ইহাতে তাহার অত্যন্ত নিকটবর্তী ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কিত লোকদের আমন্ত্রণ করেন। তিনি মালিক কুতবুদ্দীনকে অকাতরে উপকার ও অর্থ প্রদান করিয়া বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। যখন সভা ভাঙ্গিয়া যায় তখন মালিক কুতবুদ্দীন তিনি উপহাররূপে যাহা কিছু লাভ করিয়াছিলেন তাহার সমস্তই যাহারা গালিচা পাতিয়াছিল এবং আসবাব পত্র সাজাইয়াছিল এবং অন্যান্য মজুরদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। পরদিন ভোরে যখন সুলতান ইহা শুনিতে পাইলেন তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কুতবুদ্দীনকে পুরস্কৃত করিলেন; আর তাহাকে একজন আমীর পদে উন্নীত করিলেন; আর তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সিংহাসনের সম্মুখের পরিচর্যার দায়িত্ব ভার দিয়া সম্মানিত করিলেন; আর অনবরত তাহার ব্যাপারের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল।

যখন ঘুর এবং ঘযনী এবং বামিয়ানের সুলতানগণ তাহাদের সেনাবাহিনীসহ খোয়ারিযমের সুলতান শাহকে পরাজিত করিবার জন্য খুরাসান অভিমুখে অগ্রসর হন[১] তখন তাহারা কুতবুদ্দীন আয়বককে তাহাদের সঙ্গে নেন; আর তিনি মার্ভের নিকটে অর্থাৎ মুরঘাব নদীর নিকটে সুলতান শাহের সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করেন আর যদিও তিনি অত্যন্ত শৌর্য ও বীর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তিনি তাহার অনুচরদের সংখ্যাল্পতার জন্য পরাজিত হন এবং বন্দী হন; আর তাহাকে সুলতান শাহের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার নির্দেশ দেন। পরবর্তী-কালে যখন ঘুর ও খোয়ারিযমের সৈন্যদের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শেষোক্তগণ বিধ্বস্ত হয়, তখন সুলতান মুইযযুদ্দীনের ভৃত্যগণ লৌহ শিকল দ্বারা একটি বোর্ডে বাঁধা অবস্থায় কুতবুদ্দীনকে একটি উটের পৃষ্ঠে বসাইয়া সুলতানের নিকট নিয়া যায়।

১. এই অংশটির অর্থ সুস্পষ্ট না। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মালিক কুতবুদ্দীন আয়বক তুর্ক বুবদাহ। আর একটিতে আছে মালিক কুতবুদ্দীন বা বুরদাহ বুদন্দ।

শেষোক্ত জন তাহাকে মহা সৌজন্য প্রদর্শন করেন এবং তাহাকে সম্মানীয় অঙ্গাবরণ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করেন।

পরবর্তীকালে যখন সুলতান ভারত হইতে যঘনীনে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি তাহাকে তাহার প্রতিনিধিরূপে কুহরামে রাখিয়া যান আর সুলতানের জীবদ্দশায় তিনি যে সব কীর্তিকলাপ স্থাপন করেন সে সবের বিবরণ ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুলতান মুইযযুদ্দীনের শহীদ হইবার পর সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন মুহম্মদের পুত্র সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন মাহমুদ মালিক কুতুবুদ্দীনের জন্য ফিরোযকোহ হইতে একটি চাঁদোয়া এবং রাজকীয় প্রতীক প্রেরণ করেন এবং তাহাকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। আঃ হিঃ ৬০২ সনে নূতন সুলতান দিল্লী হইতে লাহোর আগমন করেন আর ঐ বৎসরেরই ১৮ই যিকাদা তারিখ মঙ্গলবার তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উদারতার ও পরোপকারিতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি প্রচুর উপহার ও অর্থ বিতরণ করেন; যাহাতে তিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপহার দেন এবং যোগ্য লোকদের প্রতি এমন উপহার দেওয়া হয় যাহা তাহারা কখনও কল্পনা করে নাই; আর এই বিষয়ে এই যুগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বাহাউদ্দীন উশি নিম্নের শ্লোকটি রচনা করেন:

লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান প্রকৃতপক্ষে তুমি পৃথিবীতে আনয়ন কর নাই
তোমার হস্ত খনিসমূহকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে
খনির হৃদয় রক্তে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার হাতের ঈর্ষার
ফলে চুনিরূপে আমি চুনিটি উপস্থিত করিয়াছি।[১]

লোকেরা তাহাকে বলিত কুতবুদ্দীন লাখ বকস (লক্ষ দাতা); আর আজ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের লোকেরা, যখন তাহারা কাহাকেও তাহার দয়াশীলতা ও পরোপকারিতার জন্য প্রশংসা করে, তাহাকে বলে কুতবুদ্দীন কাল বা এই যুগের কুতবুদ্দীন (কাল অর্থ সময়)।

কিছুকাল পর কুতবুদ্দীন এবং তাজউদ্দীন ইয়েলদুযের মধ্যে (শত্রুতার সৃষ্টি হয়);[২] তাজউদ্দীন ইয়েলদুযও একজন মুইযযী ক্রীতদাস ছিলেন; আর তিনি

১. চুনির খনির সঙ্গে নৃপতিদের তুলনা করা হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় কুতবুদ্দীনের দানশীলতার প্রতি রক্তে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা কখনও যাহা অনুকরণ করিতে পারিবে না।

২. এই পংক্তিটি দৃশ্যতঃ অসম্পূর্ণ। কোন পাণ্ডুলিপিতেই 'শত্রুতার সৃষ্টি হয়' 'এইরূপ অর্থবোধক কোন শব্দ নাই। তৎপর পংক্তিটির শেষভাগটি অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায় যে সুলতান মুহম্মদ খোয়ারিযম শাহ যঘনীন দখল করিয়া নিলে তাজউদ্দীনকে বাধ্য হইয়া পাঞ্জাব আগমন করিতে হয়, কারণ তিনি ইহাকে তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি লাহোরে পৌঁছেন এবং নাসিরুদ্দীন কবাজাহকে পরাজিত করেন এবং পাঞ্জাব অধিকার

(সুলতান মুইযযুদ্দীনের ইন্তেকালের পর) ঘযনীনের শাসনকর্তা হন এবং বাদশাহ উপাধি ধারণ করেন, আর শেষোক্ত জন বিরোধিতার ভাব লইয়া লাহোরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, আর তিনি এবং কুতবুদ্দীন পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। বহু যুদ্ধ ও রক্তপাতের পর তাজউদ্দিন বিধ্বস্ত হন এবং কারমান চলিয়া যান আর সুলতান কুতবুদ্দীন ঘযনী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং চল্লিশ দিন ধরিয়া তথায় অবস্থান করেন আর আমোদ প্রমোদ এবং ভোগ-বিলাসে সময় অতিবাহিত করেন।[১] যেহেতু তিনি প্রতিনিয়তই লাম্পট্য ও মদ্যপানে মগ্ন থাকিতেন এবং রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিতে থাকেন, ঘযনীনের লোকেরা গোপনে সুলতান তাজউদ্দীনের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন এবং তাহাকে তলব করিয়া আনেন, আর যেহেতু শেষোক্ত জন সহসা আসিয়া উপস্থিত হন, সুলতান কুতবুদ্দীন সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকেন এবং তাহাকে বাধা দিতে ব্যর্থ হন। ফলে তাহাকে ঘযনী ত্যাগ করিতে হয় এবং সঙ্গ সুরাখের পথে তিনি লাহোর পলায়ন করেন। শ্লোক ঃ

সুলতান যখন সুরায় মাতাল হয়
অসাবধানে তাহার মুকুট শির হইতে পড়িয়া যায়।

আঃ হিঃ ৬০৭ সনে তিনি চৌগান খেলিবার সময় তিনি তাহার অশ্বসহ পড়িয়া যান, আর তাহার জিনের সম্মুখ ভাগ তাহার বুকে আঘাত করে এবং তিনি ইন্তেকাল করেন। দিল্লী জয়ের সময় হইতে তাহার জীবনাবসান পর্যন্ত তাহার রাজত্বকাল বিশ বৎসর বিস্তৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি স্বাধীনভাবে শাসন করেন চারি বৎসর কাল।

যেহেতু সুলতান শিহাবুদ্দীনের (মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ) সামের সাতজন ক্রীতদাস ও আমীর স্বাধীন রাজার মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহাদের এক বিবরণ এই স্থানে দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

সুলতান তাজউদ্দীন ইয়েলদুয

তিনি ছিলেন একজন মহান ও পরোপকারী রাজা এবং তিনি প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং চমৎকার চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার তরুণ বয়সে সুলতান

করেন। অতঃপর কুতবুদ্দীন পাঞ্জাব গমন করেন এবং ইয়েলদুযকে পরাজিত করেন আর তিনি কামরান চলিয়া যান। অতঃপর কুতবুদ্দীন ঘযনী অভিযান করেন এবং খোয়ারিযমের সুলতান মুহম্মদের পুত্র জালালুদ্দীন কর্তৃক গভর্ণরকে তথা হইতে বিতাড়িত করেন।

১. তবকাত-ই-নাসিরীর মতে তিনি ঘযনীনের লোকদের প্রচুর উপহার দান ও অসংখ্য অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং পুনরায় হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন।

মুইযযুদ্দীন তাঁহাকে ক্রয় করেন, আর তাঁহাকে তাঁহার নিজের নিকটে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন এবং তাঁহাকে উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। তিনি তাঁহার সকল ক্রীতদাসের মধ্যে তাঁহাকে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাকে যখন একজন আমীরে উন্নীত করা হয় তখন কারমান[১] ও শনকুরাণ তাঁহাকে জায়গীররূপে প্রদান করা হয়। যখনই সুলতান তাঁহার ভারত অভিযানের সময় কারমানের মধ্য দিয়া গমন করিতেন, তখন মালিক তাজউদ্দীন সকল আমীরকে ভোজ দিতেন এবং তাহাদিগকে এক সহস্র অঙ্গাবরণ ও এক সহস্র টুপি উপহার দিতেন, আর তিনি সুলতানের অনুচরদের প্রত্যেককেই তাহার অবস্থা অনুযায়ী উপহার দান করিতেন। তাহার দুই কন্যা ছিল, আর সুলতানের নির্দেশে তাহাদের একজনকে সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বকের নিকট বিবাহ দেওয়া হয়, আর অপর জনকে বিবাহ দেওয়া হয় মালিক নাসিরুদ্দীন কবাজাহ এর নিকট। মালিক তাজউদ্দীনের দুই পুত্র ছিল। তিনি তাহাদের একজনকে একজন শিক্ষকের নিকট সমর্পণ করেন। শেষোক্ত জন বালকটিকে শাস্তি দিবার জন্য একটি মাটির পানি রাখিবার পাত্র তুলিয়া দেন এবং ইহা দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করেন। যেহেতু তখন বালকটির মৃত্যু নির্ধারিত ছিল, তাই সে এই আঘাতে ইন্তেকাল করে। মালিক তাজউদ্দীন যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি শিক্ষকটিকে তাহার ভ্রমণের খরচ বাবদ কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বলেন। আর তাহাকে বলিয়া দেন যে বালকটির মাতা এই দুঃসংবাদ পাইবার পূর্বেই যেন তিনি কোন দূরবর্তী স্থানে চলিয়া যান। এই কাহিনীটা তাহার ভাল স্বভাবের একটি নমুনা।

তাহার রাজত্বের শেষ ভাগে যখন সুলতান মুইযযুদ্দীন কারমান আগমন করেন, তখন তিনি মালিক তাজউদ্দীনকে ইয়েলদুযকে একটি বিশেষ সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং একটি কাল পতাকা প্রদান করিয়া মর্যাদা দান করেন আর তাহার মনে এই ধারণা ছিল যে তাহার ইন্তেকালের পর তাজউদ্দীন ইযেলদুয ঘযনীনের

১. তবকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদে (মেজর রাভার্টীর) এই অঞ্চলটির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। ইহা কতকগুলি দরাহ বা উভয় পার্শ্বে পর্বত নীচ দিয়া প্রবাহমান নদীসহ দীর্ঘ উপত্যকার সমষ্টি। উপত্যকাগুলি হইল কুর্মা বা কুররম দরাহ ইহা এই অঞ্চলটির উপরের অংশ আর উভয় পার্শ্বে আছে ছোট ছোট দরাহ আড়াআড়িভাবে অবস্থিত; ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল শলুবান, বর্তমানে বলা হয় শলুযান, কারমান, যেরান, ইরিয়াব, (হররিয়াব) এবং পায়ওয়ার। এই অঞ্চলের নিম্নাংশে আছে বানু ও মারওয়াত। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, কারণ এই স্থানে অদ্যাপি অনেকগুলি শহরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

সিংহাসনে তাহার উত্তরাধিকারী হইবেন। সুলতান যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তুর্কি আমীরগণ ও মালিকগণ গরমশির দেশ হইতে সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন মাহমুদ বিন মুহম্মদ সামকে তলব করিবার ইচ্ছা করেন এবং তাহাকে তাহার চাচার সিংহাসনে বসাইতে চান। তাহারা ইহার একটি স্মারকপত্র রচনা করিয়া সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন মাহমুদের নিকট প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে শেষোক্ত জন পত্র লিখিয়া জানান যে তিনি তাহার পিতার সিংহাসনই পছন্দ করেন অর্থাৎ ফিরোয কোহ এবং ঘুর রাজ্য ˙ আর তিনি সুলতান তাজউদ্দীনকে একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং দাসত্ব মোচনের একটি পত্র প্রেরণ করেন ˙ আর ঘযনীনের সিংহাসন তাহাকে প্রদান করেন।

এই হুকুমনামা অনুযায়ী মালিক তাজউদ্দীন ঘযনীনে আগমন করেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করেন আর ইহার অন্তর্গত দেশসমূহ তাহার দখলে আনয়ন করেন। আর পরবর্তীকালে একবার তিনি ঘযনীন হইতে বহিষ্কৃত হন, কিন্তু তিনি নিজেকে তথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পাঞ্জাবে সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বকের সঙ্গেও যুদ্ধ করেন এবং তাহার দ্বারা পরাজিত হন, এবং ঘযনীন সুলতান কুতবুদ্দীনের দখলে আসে; কিন্তু তিনি পুনরায় ইহা পুনরুদ্ধার করেন যাহা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর একবার তিনি সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন মাহমুদকে সাহায্য করিবার জন্য হিরাতে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং হিরাতের মালিক ইযযুদ্দীন হুসেন খরমিলকে পরাজিত করেন।[১] আর একবার তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ সিসতান[২] অভিমুখে গমন করেন আর ঐ শহরটিকে অবরোধ করেন এবং মালিক তাজ হারাব-এর সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার প্রত্যাবর্তনের সময়ে তিনি (ভূতপূর্ব সুলতানের) প্রধান শিকারী মালিক নাসিরুদ্দীন

১. ইযযুদ্দীন হুসেন, সুলতান মুহম্মদ খোয়ারিযম শাহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন এবং তাহার পক্ষে চলিয়া যান। ঘুর এবং ঘযনীর মিলিত বাহিনী আগমন করিলেন তিনি পলায়ন করেন।

২. তবকাত-ই-নাসিরীতে বিষয়টির এইরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে আর একবার সুলতান তাজউদ্দীন ইয়েলদুয এক বাহিনী সৈন্যসহ সিজিসতান অভিমুখে গমন করেন এবং বেশ কিছুকাল ঐ অভিযানে অনুপস্থিত থাকেন এবং সিসতান শহরের প্রবেশ-দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হন। শেষ পর্যন্ত তাহার এবং সিজিস্তানের রাজা মালিক তাজউদ্দীন-ই হারাবের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।" মেজর র‍্যাভার্টী এক টীকায় বলেন যে কোন ঐতিহাসিকই ইয়েলদুযের সিসতানের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালনার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই অথবা এই ব্যাপারে বিশদ বিবরণ দান করেন নাই। অতঃপর তিনি অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ সিজিস্তানের রাজা সুলতান মুহম্মদ খোয়ারিযম শাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

হুসেনের[১] সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং তাহাদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে মালিক নাসিরুদ্দীন পরাজিত হন। অতঃপর[২] কিছুকাল পরে তিনি তাহার সৈন্য বাহিনী-সহ হিন্দুস্তান অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তরাইনের সন্নিকটে সুলতান শামসুদ্দীনের সঙ্গে এক যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। তিনি নয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুলতান নাসিরুদ্দীন কবাজাহ

তিনি সুলতান মুইযযুদ্দীনের একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরিপূর্ণ বুদ্ধি, সুবিবেচনা এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন শাসনকর্তায় পরিণত হন। তিনি সর্বপ্রকার পদ মর্যাদায় সুলতানের খেদমত করেন এবং সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় বিষয়ে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন এবং খিতার সেনাবাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে উছের করদ রাজা মালিক নাসিরুদ্দীন আয়তমার শহীদ হন আর মালিক নাসিরুদ্দীন কবাজাহ তাহার স্থলে উছে নিযুক্ত হন। তিনি সুলতান কুতবুদ্দীনের জামাতা ছিলেন। তিনি তাহার দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সুলতান কুতবুদ্দীনের ইন্তেকালের পর তিনি উছ এবং মুলতান এবং সিন্ধুদেশের সকল শহর ও দুর্গ এবং তাবরিন্দাহ এবং সরস্বতি পর্যন্ত কুহরাম তাহার দখলে আনয়ন করেন। আর তিনি বহুবার লাহোরের অধিকার লাভ করেন। একবার তিনি ঘযনী হইতে আগত তাজউদ্দীন ইয়েলদুযের সঙ্গে এক যুদ্ধ করেন। আর একবার ঘযনীন রাজ্যের উযির খাজা মুইদুল মুলক সনজরীর সঙ্গে এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন সিন্ধুর শাসনকর্তা হন তখন খুরাসান-এর ঘুর এবং ঘযনীনের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি চেঙ্গিস খান কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহার চাকুরীতে প্রবেশ করেন, আর তিনি তাহাদের প্রত্যেককেই অনুগ্রহ প্রদর্শন ও উপহার প্রদান করেন।

আঃ হিঃ ৬২১ সনে মুঘলগণ আগমন করে এবং চল্লিশ দিন ধরিয়া মুলতান শহর অবরোধ করিয়া রাখে। সুলতান নাসিরুদ্দীন এই সময়ে তাহার কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং লোকদের পুরস্কার ও অনুগ্রহ দ্বারা পালন করেন ও উৎসাহ দান করেন আর মহা শৌর্য বীর্য প্রদর্শন করেন। ইহার এক বৎসর ছয় মাস কাল

১. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী মালিক নাসিরুদ্দীন হুসেন, আমীর-ই-শিকার, ইয়েলদুযের প্রতি বৈরী ভাব প্রদর্শন করেন এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মালিক নাসিরুদ্দীন পরাজিত হন এবং খোয়ারিযম অভিমুখে পলায়ন করেন।

২. তবকাত-ই-নাসিরী হইতে জানা যায় যে তাহাকে বন্দী অবস্থায় বদাওনে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় তাহাকে হত্যা করা হয়, আর তথায় তাহার স্মৃতিসৌধ বর্তমান আছে এবং তাহা এক তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পরে খালজ[১] এবং খোয়ারিযমের বাহিনী সিবিস্তান অধিকার করে; ইহা শাহ-সাওয়ান নামেও পরিচিত। মালিক নাসিরুদ্দীন তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর শেষ পর্যন্ত তাহার শত্রুবাহিনী বিধ্বস্ত হয় এবং খালজদের খান নিহত হন। অতঃপর সুলতান নাসিরুদ্দীন উছ ও মুলতান প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার ইতিহাসের বাকী অংশটুকু সুলতান শামসুদ্দীনের ইতিহাসের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। তাহার রাজত্বকাল ছিল বাইশ বৎসর।

সুলতান বাহাউদ্দীন তুঘরাল

তিনি ছিলেন সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সামের একজন ক্রীতদাস এবং পরবর্তীকালে একজন খ্যাতনামা আমীর। তাহার বহু প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং আকর্ষণীয় নৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সাম যখন থানকীর[২] দুর্গটি অধিকার করেন এবং তাহা মালিক বাহাউদ্দীন তুঘরালের দায়িত্বে অর্পণ করেন, তখন শেষোক্ত জন বিয়ানাহ অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তথায় তাহার বসবাস আরম্ভ করেন,[৩] আর তিনি প্রতিনিয়ত গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করিতেন এবং ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ স্থানসমূহ আক্রমণ করিতেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সাম যখন গোয়ালিয়র হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন তিনি তুঘরালকে বলেন যে, যদি দুর্গটিকে অধিকার করা যায় তবে ইহা তাহাকে প্রদান করা হইবে। ফলে শেষোক্ত ব্যক্তি গোয়ালিয়রের দুই লীগের মধ্যে একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন আর ইহাতে তিনি তাহার সৈন্যদের সহ বসতি স্থাপন করেন এবং প্রতিনিয়ত চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করিতে থাকেন। যখন এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় আর গোয়ালিয়রের দুর্গ রক্ষীবাহিনী চরম দুর্দশায় পতিত হয়, তখন তাহারা উপহার ও ভেটসহ সুলতান কুতবুদ্দীনের নিকট দূত প্রেরণ করে; আর দুর্গটি তাহার নিকট সমর্পণ করে। ইহার ফলে সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বক এবং মালিক বাহাউদ্দীন তুঘরালের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার অল্প পরেই শেষোক্ত ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন।

১. তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে এই খালজ উপজাতিরই একটি দল এবং খোয়ারিযমের সেনাবাহিনীর এক অংশ সিবিস্তানের মনসুবাহ বিধ্বস্ত করিয়া দেয়।

২. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ভকর, কিন্তু পাঠ হইতে বুঝা যায় যে ইহা ঠিক নহে। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে থানকির আর ইহাই সঠিক। এই দুর্গটি অধিকার করিবার তারিখ এই সম্বন্ধীয় পরিবেশ-এর ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

৩. তিনি এই দুর্গের নাম দেন সুলতান কোট।

ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর শাসনের বিবরণ

তিনি ছিলেন ঘুর এবং গরমশির অঞ্চলের একজন মহান লোক। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, সাহসী এবং বিজ্ঞ ছিলেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সামের সময়ে তিনি ঘযনীনে আগমন করেন। তথা হইতে তিনি ভারতে আগমন করেন এবং মালিক মুয়াযযম হুসামুদ্দীন আঘুলবাকের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। তিনি দোয়াব ও গঙ্গার অপর তীরের কতিপয় পরগণার জায়গীর ভোগ করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ শৌর্য ও বীর্য প্রদর্শন করিলে কাম্পিলাহ[১] এবং পাতিয়ালীর জায়গীর তাহাকে প্রদান করা হয়, আর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত অতর্কিত আক্রমণ করিতেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রতিনিয়ত বিহার এবং মুনের[২] অভিমুখে অগ্রসর হইতেন এবং ঐ অঞ্চলটি লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর দ্রব্য-সম্ভার হস্তগত করিয়াছিলেন। সুলতান কুতবুদ্দীন যখন তাহার দুঃসাহসিক এবং অকুতোভয় কার্যাবলীর সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি তাহার জন্য একটি রাজকীয় সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং একটি পতাকা প্রেরণ করিলেন; আর মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন সুলতানের সাহায্যে, এবং আনুকুল্য এবং উৎসাহে বিহার দুর্গটি অধিকার করিলেন এবং ঐ দেশের সম্পূর্ণটা লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিলেন এবং বহু দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করিলেন। তিনি ঐ দেশের অধিবাসীদের, যাহাদের সকলেই ছিল বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ এবং মুণ্ডিত মস্তক, তাহার নিষ্ঠুর তরবারির খাদ্যে পরিণত করিলেন। হিন্দুস্তানের ভাষায় কলেজকে বলা হইত বিহার[৩] আর যেহেতু এই প্রদেশটি পূর্বে একটি বিদ্যার আধার ছিল, তাই ইহার নাম হইয়াছিল বিহার।

ইহার পর ইখতিয়ারুদ্দীন যখন সুলতান কুতবুদ্দীনের চাকুরীতে যোগদান করেন তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে বহু উপকার এবং অনুগ্রহ লাভ করেন। এত অধিক পরিমাণে লাভ করেন যে তিনি অন্যান্য আমীরদের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন; আর

১. এই নামগুলি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই দেওয়া আছে। মেজর রাভার্টী বলেন যে তিনি তবকাত-ই-নাসিরীর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামগুলি ভগবত বা ভুগবত এবং ভিউলী বা ভিওয়ালী দেওয়া আছে; আর তিনি আরও বলেন যে গঙ্গা ও কর্মনাশা নদীর মধ্যবর্তী দুইটি পরগণা এখনও এই নামগুলি বহন করিতেছে। এইগুলি চুনাগড়ের পূর্বদিকে এবং ইহার সংলগ্ন; সুতরাং তাহার মতে এইগুলিই পরগণাগুলির প্রকৃত নাম; কতিপয় পরবর্তী লেখক (তবকাত-ই-আকবরীর লেখক তাহাদের একজন) পরগণাগুলির নাম লিখিয়াছেন পাতিয়ালি এবং কম্পিলাহ, কিন্তু এই স্থানগুলি প্রকৃত জায়গীর হইতে তিন ডিগ্রী পশ্চিমে এবং উত্তরেও প্রকৃত স্থানগুলি হইতে ইহাদের দূরত্ব অনুরূপ।

২. গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে, এবং শোন নদীর ডান তীরে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন স্থান।

৩. সংস্কৃত বিহার শব্দের অর্থ সন্ন্যাসীদের আশ্রম।

শেষোক্তগণ যাহারা তাহার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, সুলতানের সম্মুখে তাহার প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এক দিন এইরূপ ঘটে যে সুলতান কুতবুদ্দীন শ্বেত দুর্গে এক দরবার করেন এবং তাহাতে মহা-আমীরগণকে সাক্ষাৎ দান করেন। ঐ দানে একটি মস্ত[1] (দুর্দান্ত) হস্তী আনয়ন করা হয়, আর লোকেরা বলে যে সমস্ত ভারতে এরূপ আর একটি হস্তীও নাই যেটি ইহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এবং ইহার একটি আঘাত সহ্য করিতে পারে। সুলতান ঐ হস্তীটির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য মুহম্মদ বখতিয়ারকে ইঙ্গিত করেন। আর তখন শেষোক্ত জন তাহার হস্তস্থিত গদা দ্বারা ইহার শুঁড়ের উপর এমন এক আঘাত করেন, যে ইহা তৎক্ষণাৎ পরাজিত হইয়া ঘুরিয়া গিয়া পলায়ন করে। ইহা দেখিয়া সুলতান বিস্ময়াভিভূত হইয়া যান; আর তিনি ইখতিয়ারুদ্দীনের প্রতি বহু পুরস্কার ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং লক্ষণাবতী দেশটির শাসনভার তাহাকে অর্পণ করেন এবং তাহা অধিকার করিবার কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য তাহাকে মনোনীত করেন। যেহেতু তিনি ইতিমধ্যেই বিহার দুর্গটি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার শৌর্য ও বীর্যের খ্যাতি লক্ষণাবতীর লোকদের নিকট ইতিমধ্যেই পৌঁছিয়াছিলেন। সকল ব্রাহ্মণ ও জ্যোতিষিগণ রায় লক্ষণের পুত্র লক্ষণিয়ার[2] নিকট গমন করেন; তাহার রাজধানী ছিল নুদীয়ার আর হিন্দুস্তানের সকল রায়গণ তাহাদের নেতা[3] এবং পথ প্রদর্শক রূপে গণ্য করিতেন এবং তাহাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন; আর তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিলেন যে তাহাদের প্রাচীন পুস্তকসমূহে লিখিত আছে যে দেশটি তুর্কীদের, অর্থাৎ মুসলমানদের দখলে আসিবে, আর ভবিষ্যৎ বাণীটি অচিরেই কার্যকরী হইবে। যেহেতু তুর্কীগণ বিহার অধিকার করিয়াছে এবং আগামী বৎসর তাহারা তাহার রাজ্যের সম্পূর্ণটাই অধিকার করিয়া লইবে। লক্ষণিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এমন কোন বিশেষ চিহ্ন যাহা দ্বারা যে লোকটি এই রাজ্যটি দখল করিবে তাহাকে চিনিতে পারা যাইবে, তাহাদের জ্যোতিষ গ্রন্থে লিখিত আছে কিনা? তাহারা জবাব দিল, হ্যাঁ, লোকটি যখন সোজা হইয়া তাহার দুই পায়ের উপর দাঁড়াইবে এবং তাহার বাহু দুইটি নীচের দিকে প্রসারিত করিবে, তখন

১. এই কাহিনীটির বিভিন্ন রূপ তবকাত-ই-নাসিরীতে দেওয়া আছে।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্ন রূপে দেওয়া আছে যেমন লক্ষণেশ, লক্ষণিয়া, লক্ষণী এবং লক্ষাহ।

৩ যেহেতু তাহাদের সার্বভৌম রাজা হইবার মত তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না, তাই বলা হইয়াছে যে তিনি তাহাদের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু তিনি যে ভারতের সমস্ত রাজার নেতা বা আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ তাহার বয়স ও চরিত্রের জন্য সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।

তাহার আঙ্গুলের প্রান্ত তাহার হাটুর নীচের দিকে পড়িবে। রায় লক্ষণিয়া তুর্কীদের সেনাপতির এইরূপ লক্ষণ আছে কিনা দেখিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। যখন জানা গেল যে এই লক্ষণগুলি সঠিক, তখন সকল ব্রাহ্মণ এবং জ্যোতিষিগণ দেশ ত্যাগ করিয়া গেল এবং কামরুদ এবং জগরনাথের দরবারে চলিয়া গেল। রায় লক্ষণিয়া তাহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। পর বৎসর মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার বিহার হইতে যাত্রা করিলেন এবং এক ক্ষুদ্র সেনা দলসহ দ্রুতগতিতে অবিরাম পথ চলিয়া নুদিয়ার শহরে উপস্থিত হইলেন। লক্ষণিয়া অত্যন্ত দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একটি নৌকায় আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন; আর তাহার সকল ধনরত্ন এবং রাষ্ট্রের আনুষঙ্গিক জিনিস পত্র, যাহার পরিমাণের সীমা পরিসীমা ছিল না, মুহম্মদ বখতিয়ারের হস্তগত হইল। শেষোক্ত জন নুদিয়া শহরটি বিধ্বস্ত করিলেন আর ইহার স্থলে অপর একটি শহর প্রতিষ্ঠা করিলেন, যাহার নাম হইল লক্ষণাবতী; আর ইহাকেই তাহার রাজধানী করিলেন, আর বর্তমানে এই শহরটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং তাহা গৌড় নামে পরিচিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে, মুহম্মদ বখতিয়ার চাঁদোয়া ধারণ করিলেন এবং নিজ নামে খোৎবা পাঠ করাইলেন এবং মুদ্রা প্রস্তুত করিলেন; আর পৌত্তলিকগণের মন্দিরের স্থলে মসজিদ এবং খানকা[১] এবং কলেজ স্থাপন করিলেন; আর তিনি যে সব লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে প্রচুর বহু মূল্য দ্রব্য-সম্ভার সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বকের নিকট প্রেরণ করিলেন।

আরও কিছুকাল পর যখন তাহার ক্ষমতা ও জাঁকজমক উৎকর্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তাহার মনে তিব্বত ও তুর্কিস্তান অধিকার করিবার বাসনা জাগে এবং দ্বাদশ সহস্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যসহ ঐ দেশগুলির অভিমুখে অগ্রসর হন, আর তাহার দ্বারা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত আমীর আলী মেজ[২] কে তাহার পথ প্রদর্শকরূপে নেন। তিনি এমন একটি শহরে গিয়া উপস্থিত হন, যাহার নাম ছিল বর্ধন[৩], আর ঐ শহরটির সম্মুখে একটি নদী ছিল যাহা গভীরতায় এবং প্রশস্ততায় গঙ্গা নদীর চারি গুণ ছিল আর ঐ নদীটির নাম ছিল বেগমতি।[৪] তাহারা

১. দরবেশগণের আশ্রম।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে আমীর আলী শেখ; অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি অত স্পষ্ট নয়, তবে সম্প্রতি মেজ লিখা আছে। অদ্যাবধি বাংলাদেশের উত্তরে এবং উত্তর পূর্বে কতিপয় মঙ্গোল আদিম অধিবাসী আছে যাহাদিগকে বলা হয় মেচ বা মেজ।

৩. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী এই শহরটির নাম ছিল বর্ধন কোট।

৪. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে শহরটির নাম আছে তমকদি বা নমকদি বা অনুরূপ কোন কিছু। অপর একটি পাণ্ডুলিপি শহর-এর স্থলে সঠিকভাবে নহর লিখিয়াছে, তবে নাম দিয়েছে নেনকদি।

বলে যে শাহ কর শাসন তুর্কিস্তান দেশ হইতে বর্ধনের পথে হিন্দুস্তানের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তখন তিনি এই নদীর উপরে একটি সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার উপর দিয়া নদী অতিক্রম করেন এবং কামরুদ অভিমুখে আগমন করেন। সংক্ষেপে, মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার যখন ঐ সেতুটির মাথায় উপস্থিত হন, তখন তিনি তাহার দুইজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে ইহা পাহারা দিবার জন্য তথায় রাখিয়া যান, আর তিনি স্বয়ং তাহা অতিক্রম করেন এবং তিব্বত দেশটিতে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি দশ দিন ধরিয়া সুউচ্চ এবং দুর্গম পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করেন; আর[১] তৎপর এমন একটি স্থানে উপস্থিত হন, যেখানে একটি সুউচ্চ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়া নির্মিত এবং প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া আসে এবং দিনের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ও নিধন কার্য চলিতে থাকে আর মুহম্মদ বখতিয়ারের বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত বা আহত হয়। যখন রাত্রি নামে তখন তিনি দুর্গের চতুর্দিকে শিবির স্থাপন করেন এবং তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি দেশটি এবং ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান[২] করেন এবং ইহা নিশ্চিন্তরূপে জানা যায় যে ঐ স্থান হইতে পাঁচ লীগ দূরে করমসেন[৩] নামে একটি শহর আছে আর তথায়

মেজর রাভার্টী তাহার তবকাত ই-নাসিরীর অনুবাদে বলেন যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলিতে নদীটির নাম দেওয়া আছে বেগমতি, কিন্তু ইহার পরের সর্বোত্তম কপিগুলিতে নামটি আছে বেঘতি বা বেগমতি আর অন্যান্যগুলিতে আছে বংগমতি মগমন্দী, নঙ্গমতি বা নগমতি. তিনি বলেন যে বাগমতি নামে একাধিক নদী আছে। নেপালের একটি নদীর নাম বাগমতি, ইহার নিম্নভাগের নাম গ্রনধক।

১. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী এই যাত্রাকাল আরও অনেক বেশী ছিল। ইহার মতে সেনাবাহিনী দশ দিন ধরিয়া পর্বতের মধ্যে দিয়া নদীর তীর ধরিয়া চলিতে থাকে এবং তৎপর পাথরের খণ্ড দ্বারা নির্মিত একটি সেতু দ্বারা ঐ নদী অতিক্রম করে, এই সেতুতে বিশটিরও অধিক খিলান ছিল। সেতু অতিক্রম করিয়া সেনাবাহিনী গিরিসংকট ও গিরিপথ দিয়া সুউচ্চ পর্বত শ্রেণীর চড়াই উৎরাই দ্বারা পনর দিন পথ চলে। ষোড়শ দিনে তাহারা তিব্বতের সমতল ভূমিতে পৌঁছে। ঐ স্থানেই অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গটি অবস্থিত ছিল।

২. তবকাত-ই-নাসিরীতে যে দুর্গরক্ষী সৈন্যদের মধ্যে যে সৈন্যদের বন্দী করা হইয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেই এই সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

৩. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি স্পষ্টই করমসেন আছে। একটিতে আছে করবন। মেজর রাভার্টী বলেন যে তবকাত-ই-নাসিরীর প্রাচীনতম কপিগুলিতে নামটি দেওয়া আছে করবত্তন, করপত্তন, বা করার বত্তন, বা করার পত্তন; অন্যান্যকপিতে আছে করমপত্তন মুহম্মদ-উত-আওয়ারিখ এ আছে করশিন বা করত্তন। অন্যান্য পুস্তকে আছে করম শিন। তিনি অনুমান করেন যে স্থানটি সম্ভবতঃ ধরমপত্তন হইবে। গুর্খা রাজ্যের বানারস ভাটিঘুনের প্রাচীন নাম, যাহা এক কালে একটি বড় শহর ছিল; অথবা ললিতপত্তন হইবে যাহা প্রাচীনকালে এক স্বাধীন রাজার রাজধানী ছিল; আর ইহা বাগমতি নদীর নিকটে অবস্থিত ছিল; কিন্তু উভয় শহরই অনেক দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত।

পঞ্চাশ হাজার রক্তপিপাসু তুর্কী বর্শাধারী[১] অবস্থান করিতেছে। যেহেতু ইসলামের সেনাবাহিনী সুদীর্ঘ যাত্রার ফলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এমন এক বাহিনী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবার মত শক্তি তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তাই এই সংবাদ শুনিয়া বখতিয়ার ঐ স্থান ত্যাগ করেন এবং বর্ধনের সেতুর মাথায় প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি দেখিতে পান যে, যে দুই জন আমীরকে তিনি সেতুটি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কলহের ফলে সেতুটির দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।[২] তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন এবং স্থির করেন যে নৌকা প্রস্তুত করা এবং নদী অতিক্রমের অন্যান্য সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত সেনাবাহিনী কোন শক্তিশালী স্থানে নিজেদের সুরক্ষিত করিয়া রাখিবে। অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষকগণ সংবাদ আনিলেন যে ঐ অঞ্চলেই একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুউচ্চ মন্দির আছে। মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার তাহার সকল আমীরকে সঙ্গে লইয়া ইহাতে প্রবেশ করেন এবং ইহা সুরক্ষিত করেন।

এই সময়ে কামরুদের রায়[৩] জানিতে পারেন যে মুহম্মদ বখতিয়ার মহা দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হইয়া ঐ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাহার রাজ্যের সর্বত্র নির্দেশ জারি করেন আর লোকেরা দলে দলে আসিয়া সুচাল বাঁশ মন্দিরটির সর্বদিকে মাটিতে পুঁতিয়া দিতে থাকে এবং সেগুলিকে একত্র বুনিয়া দেয়।[৪] আর সেগুলিকে মন্দিরের দেওয়ালে সোজা করিয়া রাখিয়া দেয়। মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার যখন দেখিতে পান যে তিনি অত্যন্ত বিপদজনক ফাঁদে পড়িয়াছেন, তখন তিনি মন্দির

১. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে আছে বর্শা নিক্ষেপকারী, আর একটিতে আছে তীরন্দাজ।

২. এই বুঝা যায় যে আমীরগণ নিজেদের মধ্যে কলহ করিবার ফলে সেতুটি পাহারা দেয় নাই। তবকাত-ই-নাসিরী বলে যে আমীরগণ তাহাদের কলহের জন্য সেতুর পাহারায় গাফিলতি করেন এবং পথ নিরাপদ রাখিতে অক্ষম হন আর কামরূদ দেশের হিন্দুগণ আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। মুন্তখব-উত-তাওয়ারিখ-এ আছে যে আমীর দুই জন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ সেতুটি পাহারা দেওয়া ছাড়িয়া দেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে চলিয়া যান; বদাওনী বলেন যে তাঁহারা প্রথমে যুদ্ধ করে পরে সেতু ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

৩ তবকাত-ই-আকবরীতে এই প্রথম কামরুদের (কামরূপ) রায় এর উল্লেখ করা হইল, কিন্তু তবকাত-ই-নাসিরীর অনুযায়ী, মুহম্মদ বখতিয়ার যখন তিব্বত গমনের পথে প্রথম নদী অতিক্রম করেন তখন তিনি তাহার নিকট লোক প্রেরণ করিয়া ঐ বৎসর এই অভিযান হইতে তাহাকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন; আর অঙ্গীকার করেন যে পর বৎসর তিনি স্বয়ং তাহার নিজের সেনাবাহিনী সহ মুসলিম বাহিনীর অগ্রে গমন করিবেন এবং ঐ দেশটি জয় করিতে বখতিয়ারকে সাহায্য করিবেন।

৪. এই অংশের অর্থ সুস্পষ্ট নয়; মোটামুটি অর্থ সম্ভবতঃ এই যে লোকেরা মন্দিরটির চতুর্দিকে এক খুঁটির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলে।

হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং বেগমতি নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন; আর নদী অতিক্রম করিবার প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সহসা একজন অশ্বারোহী এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত পানির মধ্যে হাটিয়া চলিয়া যায়; আর সৈন্যগণ মনে করে যে নদীটি বোধহয় হাটিয়া পার হওয়া যাইবে। তাহারা সকলেই একযোগে পানিতে ঝাপাইয়া পড়ে; কিন্তু যে পর্যন্ত অশ্বারোহী সৈন্যটি গিয়াছিল, তাহার পর ইহা অতিক্রমযোগ্য না হইবার ফলে বহু সৈন্য ডুবিয়া গেল। তাহাদের উপর যেন আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হয়। বহু সংখ্যক সৈন্য ডুবিয়া যাইবার পর মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ অতি কষ্টে নদী অতিক্রম করেন এবং দেউকোট আসিয়া পৌঁছেন।[১]

তাহার মনে যে মহা শোক ও দুশ্চিন্তা তাহাকে পীড়া দিতেছিল, তাহার ফলে বখতিয়ার অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি তাহার অনুগামীগণকে বলেন, "সম্ভবত সুলতান মুইযযুদ্দীন মুহম্মদ সামের কোন মহা বিপদ ঘটিয়াছে, যে আমি দুর্দিনে নিপতিত হইয়াছে এবং আমার সৌভাগ্য আমাকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে এই কয়দিনেই সুলতান মুইযযুদ্দীন শহীদ হন। মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার এই একই রোগে ইন্তেকাল করেন এবং চিরন্তন জগতে গমন করেন। কথিত আছে যে আলী মর্দান নামে তাহার একজন বিখ্যাত আমীর যখন তাহার প্রভুর এই বিপদের সংবাদ পান তখন তাদের জায়গীর বরসোলি[২] হইতে দেউকোট আগমন করেন। এই সময়ে শেষোক্ত জন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। কেহই তাহার নিকট যাইত না। আলী মর্দান তাহার নিকটে গেলেন; তাহার মুখ হইতে আবরণ টানিয়া ফেলিয়া দিলেন; আর তাহার ছোরার এক আঘাতে তাহাকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনা আঃ হিঃ ৬০২ সনে সংঘটিত হয়।

ইযযুদ্দীন মুহম্মদ শেরওয়ান[৩]

তিনি এবং তাহার[৪] ভ্রাতা মুহম্মদ বখতিয়ারের খ্যাতনামা আমীরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই মুহম্মদ শেরওয়ান ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং কর্মঠ এবং

১. বর্তমান দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। যাহারা বাঁচিয়া পাইল, সম্ভবতঃ তাহারা ভেলায় চড়িয়া নদী অতিক্রম করিয়াছিল।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে জায়গাটির নাম বরসোল বা ববসুল দেওয়া আছে। অন্যান্যগুলিতে ইহা লেখা আছে বরসোলি, বা বরমুলি বা পরমুলি। তবকাত-ই-নাসিরীর প্রাচীনতম কপিগুলিতে নরনকোও লেখা আছে।

৩. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি শিরওয়ান বা শেরওয়ান দেওয়া আছে; আর একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে শিরওয়ানী বা শেরওয়ানী। তবকাত-ই-নাসিরীতে নামটি দেওয়া আছে শেরান। মেজর রাভার্টীর মতে শেরান শব্দের অর্থ হইল অত্যন্ত সাহসী সিংহ বা ব্যাঘ্র।

৪. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে শেরওয়ানের একাধিক ভ্রাতার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ এইগুলির মতে তাহার

সুচতুর ; আর এই গুণগুলি তাহার এত অধিক ছিল যে, যে দিন মুহম্মদ বখতিয়ার নুদিয়ার শহরটি অধিকার করেন এবং লক্ষণিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং তাহার সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। সেই দিনে মুহম্মদ শেরওয়ান সম্পূর্ণ একাকী এক জঙ্গলে মাহুত সহ আঠারটি হস্তী ধরিয়া ফেলেন এবং তথায় ঐগুলিকে পাহারা দেন। তিন দিন পর যখন মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার এই ঘটনার সংবাদ পান, তখন তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন আর তাহারা হস্তীগুলিকে তাহাদের সম্মুখে তাড়াইয়া আনেন এবং সেইগুলিকে তাহার সম্মুখে আনয়ন করেন।

মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার যখন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তিব্বত এবং কামরূপ অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন তিনি মুহম্মদ শেরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতাকে, তাহার নিজের একদল সৈন্য সহ, জাজনগর অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুহম্মদ বখতিয়ার তাহার সঙ্গে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইবার পর, মুহম্মদ শেরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতা জাজনগর হইতে দেওকোট আগমন করেন এবং শোক অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন (মুহম্মদ বখতিয়ারের জন্য) আর তাহারা[১] জাজনগরের বাহিনীর এক দল সৈন্যসহ ঐ স্থান হইতে বরসোলি গমন করেন ; এবং মুহম্মদ বখতিয়ারের হত্যাকারী আলী মর্দানকে বন্দী করেন। আর তাহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাহাকে একজন কোতোয়ালের (পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক বা কারা তত্ত্বাবধায়ক) নিকট সমর্পণ করেন। যাহার নাম ছিল বাবা কোতোয়াল ইসফাহানী ; ইহার পর তিনি দেওকোট প্রত্যাবর্তন করেন, আর তখন খলজী আমীরগণের সকলেই তাহাকে তাহাদের নেতা স্বীকার করেন এবং তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন।

আলী মর্দান কিন্তু বাবা কোতোয়ালকে হাত ধরিয়া ফেলেন ; আর কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দিল্লী গমন করেন এবং সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বকের চাকুরীতে যোগ দেন এবং তাহার নিকট কতিপয় অভিযোগ পেশ করেন। ইহার ফলে সুলতান

একাধিক ভ্রাতা ছিল ; আর দুইটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার এক ভ্রাতার উল্লেখ আছে ; তবকাত-ই-নাসিরী সুস্পষ্টরূপে বলে যে তাহারা দুই ভাই ছিলেন, মুহম্মদ শেরওয়ান বা শেরান এবং আহমদ শেরওয়ান বা শেরান।

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে মুহম্মদ শেরওয়ান একাই বারসোল বা পারসোল গমন করিয়াছিলেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে মুহম্মদ শিরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতা জাজনগরের একদল সৈন্যসহ গমন করিয়াছিলেন। অপর পাণ্ডুলিপিটিতে ব্যাপারটি গোলমাল করিয়া ফেলা হইয়াছে, কারণ ইহাতে আছে যে মুহম্মদ শেরওয়ান এবং তাহার ভ্রাতা জাজনগর হইতে দেউকোট আগমন করেন এবং তথায় শোক অনুষ্ঠানসমুহ সমাপ্তি করেন, এবং তৎপর আছে যে তাহারা জাজনগর হইতে বারসোল গমন করেন।

কুতবুদ্দীন কায়মায রুমিকে[১] লক্ষণাবতী প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে ঐ অঞ্চলে অবস্থানরত প্রত্যেক খলজ আমীরকে তিনি যেন কোন উপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত করেন। কায়মায রুমি তথায় গমন করেন এবং সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী খলজ আমীরগণের প্রত্যেককে কোন একটি উপযুক্ত অঞ্চলে নিযুক্ত করেন; মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়াষ খলজী, যিনি মুহম্মদ বখতিয়ারের সময়ের পূর্ব হইতেই কলওয়াই[২] জায়গীরটি ভোগ করিতেছিলেন, দ্রুতগতিতে অগ্রবর্তী হইয়া কায়মায রুমিকে অভ্যর্থনা করেন এবং দেওকোট পর্যন্ত তাহার সঙ্গী হন, আর ইহা তাহাকে জায়গীররূপে প্রদান করা হয়। কায়মায রুমি যখন দেওকোট হইতে অযোধ্যা অভিমুখে গমন করেন, তখন মালিক মুহম্মদ শেরওয়ান এবং খলজ আমীরগণের সকলে, যাহারা তাহার সঙ্গে ছিলেন, দেওকোট গমন করেন। কায়মায রুমি যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি ফিরিয়া আসেন এবং খলজ আমীরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শেষোক্তগণ পরাজিত হন এবং তুষ[৩] অভিমুখে চলিয়া যান আর তথায় তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় আর মুহম্মদ শেরওয়ান শহীদ হন। তথায় তাহার সমাধি আছে।

আলী মর্দান খলজী

তিনি তাহার কর্মক্ষমতা, সাহসিকতা, অহমিকা এবং তেজস্বিতার জন্য সুখ্যাত এবং কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যখন কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং সুলতান কুতবুদ্দীনের সঙ্গে যোগ দেন, তখন শেষোক্ত জন যখন ঘযনীন গমন করেন তখন তিনি তাহার অনুগমন করেন। তথায় তিনি তুর্কিগণের হস্তে বন্দী হন এবং তাহাকে কাশঘর নিয়া যাওয়া হয় এবং তিনি তথায় অবস্থান করেন। তাহারা বলে যে একদিন সুলতান তাজউদ্দীন ইয়েলদুয শিকার করিতে বাহির হন। আলী মর্দানও তাহার সঙ্গে যান। তিনি তখন সালার যাফর নামীয় একজন খলজ আমীরের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাহাকে বলেন[৪] "ইহা কিরূপ হইবে যদি আমি সুলতান

১. মেজর রাভার্টী তাহাকে রুমানিয়ার অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। রুমি কিন্তু সাধারণতঃ কনস্টান্টিনোপোলের বা ইউরোপীয় তুরস্কের কোন তুর্কীকে বুঝায়।

২. তবকাত-ই নাসিরীতে এই জায়গাটির নাম দেওয়া আছে কনকুরি বা কসকুরি।

৩. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে আছে তুষ; একটিতে আছে সন্তষ, তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে মকসদা এবং সম্ভবতঃ ঐ খলজ আমীরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। মেজর রাভার্টী বলেন যে মকসিদাহ সম্ভবতঃ প্রাচীন মানচিত্রের ও প্রাচীন ভ্রমণকারীদের মকসুদাবাদ হইবে; তিনি আরও বলেন যে তবকাত-ই-আকবরীতে শুধু সন্তষ আছে।

৪. মেজর রাভার্টী মনে করেন যে এই নামটি যাফির উচ্চারণ করিতে হইবে।

তাজউদ্দীনকে আমার বর্শা[১] দ্বারা শেষ করিয়া দেই এবং আপনাকে বাদশাহ করি? সালার যাফর একজন জ্ঞানী এবং ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন আর তাহার হৃদয়ে সাম্রাজ্যের লিপ্সা ছিল না। তিনি আলী মর্দানকে এরূপ অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহাকে দুইটি আরবী অশ্ব দিয়া তাহাকে হিন্দুস্তান অভিমুখে পাঠাইয়া দেন।

তিনি যখন পুনরায় সুলতান কুতবুদ্দীনের দরবারে পৌঁছেন এবং তাহার চাকুরীতে যোগ দেন, তখন তাহাকে বিভিন্নরূপ অনুগ্রহ এবং উপহার দানে সম্মানিত করা হয় আর লক্ষণাবতী রাজ্যটি তাহাকে জায়গীররূপে প্রদান করা হয়; আর তিনি ঐ স্থানের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি কুষি নদী অতিক্রম করিবার পর মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়ায খলজী দেওকোট হইতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হন। দেওকোট আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে ক্ষমতার আসনে বসান হয়; আর তিনি লক্ষণাবতী দেশটির সম্পূর্ণটা দখল করেন। সুলতান কুতবুদ্দীন আল্লাহ্ তা'-আলার করুণার সঙ্গে বিলীন হইয়া যাইবার পর তিনি রাজকীয় চাঁদোয়া গ্রহণ করেন এবং তার নিজ নামে খোৎবা পাঠ ও সিক্কা মুদ্রণ করেন; আর সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার এত অহমিকা এবং ঔদ্ধত্য ছিল যে তিনি ইরান এবং তুরান রাজ্যসমূহ তাহার আমীরদের মধ্যে বিলি বণ্টন করিয়া দেন, আর তিনি এমন উৎপীড়িত এবং অত্যাচারী ছিলেন যে এই দেশগুলি সে তাহার রাজ্যের বাইরে অবস্থিত এই কথা তাহাকে বলিবার মত দুঃসাহস কাহারও ছিল না।

যখন তুমি অন্যায় কর, তখন নিজেকে বিপদমুক্ত মনে করিও না
কারণ প্রকৃতি স্বয়ং অন্যায় কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে।

যখন তাহার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন খলজ আমীরগণ একত্র ষড়যন্ত্র করেন এবং তাহাকে হত্যা করেন।

কথিত আছে যে, একজন ব্যবসায়ী বিপদগ্রস্ত হন এবং তাহার দারিদ্রতা সম্বন্ধে তাহার নিকট অভিযোগ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এই লোকটি কোথা হইতে আসিয়াছে?" তাহারা বলিলেন, 'ইসফাহান হইতে,'। তিনি ইসফাহান তাহাকে জায়গীর প্রদান করিয়া এক হুকুমনামা দিবার নির্দেশ দান করেন। ব্যবসায়ীটি এই হুকুমনামা গ্রহণ করেন না, মন্ত্রীগণ ইহা সুলতানের গোচরে আনিতে ভয় পায়; তবে তাহারা তাহার নিকট নিবেদন করিলেন যে ইসফাহানের নূতন শাসনকর্তার এই

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে বর্শা। তবকাত-ই নাসিরীতে আছে তীর

ভ্রমণের জন্য এবং তাহার রাজ্য দখলে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের অর্থ নাই। ইহার ফলে তিনি তাহাকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেন যে তাহা ব্যবসায়ীটির সকল কল্পনা ছাড়াইয়া যায়।

তাহাকে হত্যা করিবার পর আমীরগণ একযোগে মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়ায খলজীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

আলী মর্দান দুই বৎসর রাজত্ব করেন।

মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়ায খলজী

তিনি খলজ উপজাতির একজন আমীর এবং গরমশির দেশের অধিবাসী ছিলেন; আর তাহার প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং পরোপকারিতা বিশিষ্ট ছিল। তিনি যখন তাহার স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং তুর্কিস্তানের পুশতাহ-ই ফিরোয[1] নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছেন, তখন ঐ জীর্ণ বস্ত্র এবং তালি দেওয়া অঙ্গাবরণ পরিহিত দুইজন লোক, যাহাদের সঙ্গে ভ্রমণের প্রয়োজনীয় কোন রসদই ছিল না আর কেবল মাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই পাহাড় ও মরুভূমি অতিক্রম করিতেছিলেন, ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছেন। তাহারা মালিক হিসামুদ্দীনকে বলেন, "প্রভু! আপনার নিকট কি কোন রসদ আছে?" মালিক হিসামুদ্দীন কিছু উপাদেয় চাটনীসহ কয়েক টুকরা রুটি তাহাদের সম্মুখে মেলিয়া ধরেন। দরবেশগণ অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে আহার করেন এবং বলেন, "প্রভু, আপনার হিন্দুস্তানে গমন করা উচিত, কারণ ঐ দেশে আপনার জন্য একটি রাজ্য বরাদ্দ করা আছে।"

শ্লোক

কর্কশ বস্ত্র পরিহিত একজন, মাটিতে শুইয়া আছে
একজন প্রার্থীকে যোহাক রাজ্য দান করিতেছে।

মালিক হিসামুদ্দীন এই সুসংবাদটিকে তাহার অনুকূলে সত্য ভবিষ্যৎবাণীরূপে গ্রহণ করেন' হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং মালিক মুহম্মদ বখতিয়ারের চাকুরীতে যোগ দেন; যতদিন না সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাহাকে লক্ষণাবতী দেশটির রাজা করিয়া দেন আর তিনি সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। তাহার

১. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে, একটিতে আছে। পুশতাহ আফ্রোয। তবকাত-ই নাসিরীতেও এই নাম দেওয়া আছে। পুশতাহ-ই ফিরোয অর্থ বিজয়ের স্তূপ, আর পুশতাহ্ আফ্রোয দ্বারা বুঝায় অনন্ত স্তূপ, অথবা উজ্জ্বলকারী স্তূপ।

ন্যায়পরায়ণ শাসনাধীনে সৈন্য ও প্রজাগণ সকলেই সুখ এবং শান্তিতে দিনাতিপাত করে। শুভ লক্ষণ যুক্ত বৈশিষ্ট্যের ঐ রাজার পবিত্র পরোপকারিতার বহু চিহ্ন সময়ের পাতায় দাগ রাখিয়া গিয়াছে, যাহা তাহার সদিচ্ছার উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য দান করে।

বাঙ্গালা, তিরহুত, কামরুদ এর জাজনগর দেশগুলি তাহাকে রাজস্ব বা কর দান করিত।

আঃ হিঃ ৬২২ সনে সুলতান শামসুদ্দীন বাঙ্গালা আক্রমণ করেন আর উভয় বাহিনী পরস্পরের মোকাবিলা করে[১] এবং চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঘিয়াসুদ্দীন আটত্রিশটি হস্তী এবং আশি লক্ষ তংগা[২] সুলতান শামসুদ্দীনকে প্রদান করেন এবং তাহার নামে খোৎবা পাঠ করান। সুলতান শামসুদ্দীন যখন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি মালিক আলাউদ্দীন খানিকে[৩] বিহারের শাসনভার প্রদান করেন, কিন্তু পরে ঘিয়াসুদ্দীন লক্ষ্ণাবতী হইতে বিহারে গমন করেন এবং ইহার দখল পুনরুদ্ধার করেন এবং আঃ হিঃ ৬২৪ সন পর্যন্ত ইহা তাহার দখলে রাখেন, আর ঐ সময়ে সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্র মালিক নাসিরুদ্দীন মাহমুদ মালিক খানির প্ররোচনায় অযোধ্যা হইতে বিপুল এক বাহিনী সৈন্যসহ লক্ষ্ণাবতী আগমন করেন। ঐ সময়ে ঘিয়াসুদ্দীন ইওয়ায এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ লক্ষ্ণাবতী হইতে কামরুদ অভিমুখে গমন

১. সম্ভবতঃ কোন আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ হয় নাই। খণ্ডযুদ্ধ হওয়া সম্ভব। তবকাত-ই নাসিরী অনুযায়ী উভয় বাহিনীর মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই যেহেতু সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তাহার রণতরী-গুলি নদীর উপর দিকে অপসারণ করিয়া নেন, আবার অপর এক লেখকের মতে, তিনি নদী হইতে সকল নৌকা অপসারণ করেন। ফলে আলতামশ গঙ্গা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই।

২. তংগা শব্দটি দ্বারা পাতলা সোনা বা রূপার পাত বা মণ্ড বুঝায়। তংগার প্রকৃত মূল্য কত ছিল তাহা নির্ধারণ করা খুব শক্ত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের তংগা ছিল। ফিরিশতার মতে এক স্বর্ণ তংগা ছিল এক তোলা স্বর্ণ ছাপ মারা, আর রৌপ্য তংগা ছিল পঞ্চাশ পুলের সমান। এক পুল (অর্থাৎ যে কোন গোলাকার জিনিস) তামাকে (ব্রোঞ্জ ?) বলা হইত জিতল; আর ইহার সঠিক ওজন কিন্তু জানা যায় না। অন্যান্য লেখকের মতে এক তংগা টাকার ১/৮ বা ১/৬৪ বা ১/১২৮ ভাগ ছিল আর টাকার হিসাব এইরূপ ছিল: চারি জিতল = এক গন্দহ, বিশ গন্দহ = এক আনা এবং ষোল আনা = এক টাকা; কিন্তু এই বিভিন্ন মানের মুদ্রার মূল্য জানা যায় না; সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়ে ইহাদের মূল্য বিভিন্ন রূপ ছিল। তবকাত-ই-নাসিরী বলে যে এই করের পরিমাণ ছিল আশি লক্ষ মুদ্রা। তাযকিরাত-উল-মুলুক বলে আশি লক্ষ রৌপ্য তংগা।

৩. নামটি সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই দেওয়া আছে। তবে নামের শেষ অংশটি খানি বা জানি হইবে। তবকাত-ই-নাসিরীতে নামটি দেওয়া আছে মালিক ইযযুদ্দীন জানি; কিন্তু ঐ পাতায়ই এক টীকায় বলা হইয়াছে যে এই পুস্তকেরই অন্যত্র এবং অন্যান্য পুস্তকে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে আলাউদ্দীন জানি।

করিয়াছিলেন। মালিক নাসিরুদ্দীন মাহমুদ লক্ষণাবতী অধিকার করিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন ইওয়ায প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাহার বহু সংখ্যক আমীরসহ বন্দী হন এবং নিহত হন।

তাহারা বলে যে শুভলক্ষণযুক্ত সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশ (আল্লাহ্ যেন তাহার কবর সুগন্ধযুক্ত করেন) তাহার পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদের ইন্তেকালের পর, মালিক ইখ্‌তিয়ারুদ্দীনের[১] বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য লক্ষণাবতী আগমন করেন এবং মালিক হিসামুদ্দীন ইওয়ায খলজী কর্তৃক পরোপকারিতার যে সব চিহ্নসমূহ রাখিয়া যান সেগুলিকে সম্মানের চোখে দেখেন। তখন তিনি ন্যায়পরায়ণতার সহিত, যাহা সর্বদাই তাহার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল, বলেন যে যে লোক এরূপ ভাল এবং মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাহাকে সুলতান আখ্যা দিতে কোন আপত্তি নাই।

তাহার রাজত্বকাল বার বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সুলতান আরাম শাহ বিন সুলতান কুতবুদ্দীন

সুলতান কুতবুদ্দীন যখন এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যান, আর যেহেতু পৃথিবী একজন রাজা ছাড়া চলিতে পারে না, রাষ্ট্রের আমীরগণ এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ উত্তরাধিকারের আইন অনুযায়ী আরাম শাহকে, ইহাকে ছাড়া তাহার আর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, লাহোরের সিংহাসনে স্থাপন করেন; আর সকল দিকে এবং সকল জিলাসমূহে নির্দেশ এবং ফরমান প্রেরণ করিয়া তাহার ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতার সুখ সংবাদ ঘোষণা করে। যখন এইসব সম্পন্ন করা হইতেছিল তখন সিপাহ্-সালার (সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি) আলী ইসমাইল[৩] যিনি দিল্লীর গভর্ণর ছিলেন, অন্যান্য কতিপয় আমীরের সঙ্গে একযোগে, মালিক আলতামশকে তলব করিবার জন্য একজন সংবাদবাহক প্রেরণ করেন এবং তাহাকে সার্বভৌমত্ব গ্রহণের

১. ইনি হইতেন মালিক ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন দৌলত শাহ-ই বলখ; কতিপয় লেখকের মতে তিনি ছিলেন ঘিয়াসুদ্দীনের পুত্র আর অন্যান্যদের মতে তাহার একজন আত্মীয়; তিনি এই রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং কিছুকাল রাজত্ব করেন।

২. আরাম শাহ কুতবুদ্দীনের পুত্র ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে তবকাত-ই-নাসিরীতে আলোচনা করা হইয়াছে। কতিপয় লেখক বলেন যে তিনি কুতবুদ্দীনের পুত্র ছিলেন, অন্যান্যরা বলেন যে কুতবুদ্দীনের তিন কন্যা ছাড়া আর কোন সন্তান ছিল না। আরাম শাহ সম্ভবতঃ কুতবুদ্দীনের পালিত পুত্র ছিলেন। আবুল ফজল বলেন যে তিনি ছিলেন কুতবুদ্দীনের ভ্রাতা।

৩. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে; আর অন্য একটিতে এক স্থানে আছে আমীর আলী ইসমাইল এবং অপর এক স্থানে আছে আমীর আলী দাদ বা ওয়াদ। মেজর রাভার্টী

অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি ছিলেন সুলতান কুতবুদ্দীনের একজন ক্রীতদাস এবং জামাতা আর তাহাকে শেষোক্ত জন 'পুত্র' নামও দিয়াছিলেন; আর এই সময়ে তিনি বদাওনের গভর্ণর ছিলেন। মালিক আলতামশ দিল্লী আগমন করিলেন এবং তাহা অস্বীকার করিলেন। আরাম শাহ দিল্লীর উপকণ্ঠে ছিলেন, তিনি তাহার পিতার আমীরগণ ও সৈন্যদের আশ্বাস দেন এবং তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আগমন করেন। মালিক আলতামশ জুদের প্রান্তরে তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করেন এবং যুদ্ধ করেন। আরাম শাহ[১] পরাজিত হন।

সুলতান কুতবুদ্দীনের তিন কন্যা ছিল। তাহাদের দুই জনকে, একের পর অন্যকে মালিক নাসিরুদ্দীন কবাজাহ এর নিকট এবং এক জনকে মালিক আলতামশের নিকট বিবাহ দেন।

সুলতান কুতবুদ্দীনের ইন্তেকালের পর নাসিরুদ্দীন কবাজাহ সিন্ধু অভিমুখে গমন করেন এবং সুলতান উছ, ভকর এবং সিবিস্তান দখল করেন। আমীর-ই-দাউদ এবং অন্যান্য আমীরগণের সাহায্যে দিল্লী আলতামশের দখলে আসে আর লক্ষণাবতী এবং বাঙ্গালা দেশ ছিল মালিক হিসামুদ্দীন খালজের দখলে।

আরাম শাহের রাজত্বকাল এক বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই।[২]

তাঁহার তবকাত-ই নাসিরীর অনুবাদের এক টীকায় বলেন যে তাহার নাম ছিল আমীর-ই দাদ, যাহার অর্থ হইল 'প্রধান বিচারপতি', তবে তিনি ইহাও বলেন যে কেহ কেহ তাহাকে আমীর দাউদও বলিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে দিল্লী শহর বা প্রদেশের গভর্ণরও বলিয়াছেন। অর্থাৎ আমীর দিয়ার দিল্লী। তবকাত-ই-আকবরীতে দুইটি পাণ্ডুলিপিতে একবার মাত্র তাহাকে সিপাহ সালার এবং আমীর-ই দাদরূপে অভিহিত করা হইয়াছে; ফলে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে ইহা দ্বারা একজন বা দুইজন লোক বুঝাইয়াছে। তবকাত-ই নাসিরীর অনুযায়ী ইহারা দুইজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

১. আরাম শাহের এই পরাজয়ের পর তাহার কি হইল তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। তবকাত-ই নাসিরীর এই অংশে মেজর রাভার্টী যে পাঠ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু তবকাতের কোন কোন কপিতে যে পাঠ আছে তাহাতে কি তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল অথবা তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল তাহা সঠিক বুঝা যায় না।

২. কেহ কেহ আবার বলেন যে তাহার রাজত্বকাল তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। মেজর রাভার্টী বলেন যে আরাম শাহের এবং আলতামশের দুইটি মুদ্রার প্রথমটি আঃ হিঃ ৬০৭ সনে মুদ্রিত আর দ্বিতীয়টি আঃ হিঃ ৬১২ সনে মুদ্রিত, আর শেষোক্তটিতে বর্ণিত আছে যে ইহা তাহার রাজত্বের প্রথম হইতে বুঝা যায় যে আরাম শাহ তিন বৎসরেরও অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবার অপর দিকে তবকাত-ই নাসিরী এবং তবকাত-ই-আকবরী—এই দুই পুস্তকেই স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে আলতামশ আঃ হিঃ ৬০৭ সনে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশ[১]

প্রবাদ আছে যে তাহার পিতার নাম ছিল ইলম খান আর তিনি ছিলেন তুর্কী-স্থানের এক দল উপজাতির নেতা। তাহার ভ্রাতাগণ, আর অন্য এক প্রবাদ অনুযায়ী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, তাহার তরুণ বয়সের সময় তাহার প্রতি তাহাদের ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের ফলে ইউসুফের (প্রাচীন কালের) ন্যায় আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য কতিপয় উদ্যান ও প্রান্তরে নিয়া যায়; আর বৎসর বলপূর্বক তাহাকে এক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। ব্যবসায়ীটি তাহাকে বুখারা নিয়া যায়; এবং তাহাকে ঐ শহরের একজন সুবিখ্যাত লোকের নিকট বিক্রয় করে।[২] কিছু কাল তিনি এক সদাশয় পরিবারের মধ্যে সদয় ব্যবহার এবং শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের লিখনের ফলে হাজী বুখারী নামে একজন ব্যবসায়ী তাহাকে ক্রয় করেন এবং পুনরায় তাহাকে জামালুদ্দীন চুস্ত কবার নিকট বিক্রয় করেন। শেষোক্ত জন তাহাকে ঘযনীনে নিয়া যান। যেহেতু ঐ সময়ে ইহার চেয়ে সুন্দর চেহারার এবং অধিকতর বুদ্ধিমান লোক তুর্কী বালক ঘযনীনে আগমন করে নাই, লোকেরা সুলতান মুহম্মদ সামের নিকট তাহার কথা বলিলেন। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে তাহার একটা মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহার সঙ্গে আয়বক নামে আর একটি ক্রীতদাস ছিল। ইহাদের প্রত্যেক মূল্য নির্ধারণ করা হইলে এক সহস্র রুকনী দিনার।[৩] খাজা জামালুদ্দীন ঐ মূল্যে তাহাকে বিক্রয় করিতে আপত্তি করিলেন। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে কেহই যেন তাহাকে ক্রয় না করে এবং বিক্রয় বন্ধ হইয়া রহিল। এক বৎসর পর খাজা জামালুদ্দীন বুখারা অভিমুখে গমন করেন এবং আলতামশকে তাহার সঙ্গে নিয়া যান। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন এক বৎসর কাল ঘযনীতে

১. এই নামটি ইয়ালতিমিশ রূপেও লিখা হয়; এই তুর্কী নামটির রূপ যাহাই হউক না কেন ফার্সী ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে নামটি আলতামশ-ই দেওয়া আছে।

২. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী তাহাকে বুখারার সদর-ই-জাহানের এক আত্মীয়ের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছিল।

৩. তবকাত-ই-নাসিরী বলে যে দুইজনের জন্যই এক সহস্র বিশুদ্ধ রুকনী স্বর্ণের দিনার নির্ধারিত করা হইয়াছিল, কিন্তু এর টীকা হইতে দেখা যায় যে কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে ইহা এক সহস্রের বদলে দুই সহস্র দেওয়া আছে। তবকাত-ই আকবরীর সঙ্গে ইহার মিল আছে; এই সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আছে যে প্রত্যেকের জন্য এক সহস্র রুকনী দিনার মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী পংক্তিটি তবকাত-ই-নাসিরী আর তবকাত-ই-আকবরীতে প্রায় একরূপ, আর ইহাতে বুঝা যায় যে দুইজন ক্রীতদাসের মূল্য আলাদা আলাদা নির্ধারণ করা হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী ঐ মূল্যে আলতামশকে বিক্রয় করিতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু অন্য ক্রীতদাসটিকে বিক্রয় করিতে কোন আপত্তি করেন নাই।

থাকেন। লোকেরা সুলতানের হুকুম ছাড়া আলতামশকে ক্রয় করিতে সাহস করিল না। অবশেষে সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বক[১] নহরওয়ালার জয়লাভ এবং গুজরাট অধিকারের পর মালিক নাসিরুদ্দীন খরমিলের[২] সঙ্গে ঘযনীনে আগমন করেন। তিনি আলতামশের কথা শুনিলেন এবং তাহাকে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সুলতান বলিলেন, "আমি হুকুম দিয়াছি যে কেহই তাহাকে ক্রয় করিবে না। ঘযনীনে তাহার ক্রয়-বিক্রয় উচিত হইবে না। তাহাকে দিল্লী অঞ্চলে নিয়া যাওয়া হউক এবং তথায় তাহাকে বিক্রয় করা হউক।"

সুলতান কুতবুদ্দীন যখন ঘযনীন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি নিযামুদ্দীন মুহম্মদকে কতিপয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য তথায় রাখিয়া যান; আর নির্দেশ দেন যেন তিনি জামালুদ্দীন চুস্ত কবাকে তাহার সঙ্গে দিল্লীতে নিয়া আসেন। তাহারা যখন আসিলেন তখন সুলতান কুতবুদ্দীন দুইজন তুর্কীর প্রত্যেককেই অর্থাৎ আলতামশ এবং আয়বক, এক লক্ষ জিতল মূল্যে ক্রয় করেন।[৩] তিনি আয়বকের নাম দেন তঘমাজ[৪] এবং তাহাকে সরহিন্দের আমীর নিযুক্ত করেন। সুলতান কুতবুদ্দীন এবং সুলতান তাজউদ্দীন ইয়েলদুযের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তঘমাজ মরণের সরবত পান করেন। কুতবুদ্দীন আলতামশকে 'পুত্র' উপাধি দেন এবং তাহাকে তাহার নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া সম্মানিত করেন। গোয়ালিয়রের জয়লাভের পর

---

১. মূল গ্রন্থে তাহাকে সুলতান কুতবুদ্দীনই লেখা হইয়াছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনও সুলতান হন নাই।

২. এই নামটি আর কোথাও দেখা যায় নাই। সম্ভবতঃ তাহার ভ্রাতা ইযযুদ্দীন খরমিল সুলতান মুইযযুদ্দীনের সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি ছিলেন।

৩. এক জিতলের মূল্য যদি এক টাকার ১২৮০ ভাগ হয় তবে এক লক্ষ জিতলের মূল্য পরিমাণ হইবে আটাত্তর টাকা আট আনা। ভাল জিতলের মূল্য, সচরাচর যাহা ধরা হয়, তাহার চেয়ে অধিক ছিল, অথবা এই পুস্তকে এবং তবকাত-ই-নাসিরীতে লিখা এক লক্ষ জিতল ভুল হইবে। তারিকিবাত-উল-মুলুকে মূল্য পঞ্চাশ লাখ জিতল লেখা আছে আর বদাওনী লিখিয়াছেন এক লক্ষ তংগা।

৪. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই তঘমাজ ও সরহিন্দ নাম দেওয়া আছে। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী, আয়বক নামটি পরিবর্তন করিয়া তমঘাজ রাখা হইয়াছিল। আর তাহাকে তাবারিন্দার আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মেজর রাভার্টী বলেন যে ঐ সময়ে খুব সম্ভব তঘমাজ সর্বপ্রকারে আলতামশের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল, কারণ তাহাকে তৎক্ষণাৎই তাবারিন্দার আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন কারণ নাই। আয়বকের সমস্ত ইতিহাসটি একটি পংক্তিতে লেখা হইয়াছে, তাহাতে ইহা মনে করা যায় না যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ যথেষ্ট সময় পরে তাহাকে তাবারিন্দার আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আলতামশকেও সম্ভবতঃ বহু পরে কুতবুদ্দীনের 'পুত্র' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল।

তিনি তাহাকে ঐ স্থানের আমীর নিযুক্ত করেন; আর ইহার পর বরণ[১] এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলটি তাহার নিকট সমর্পণ করা হয়; আর যেহেতু কুতবুদ্দীন পুনঃপুনঃ তাহার মধ্যে বীরত্বের চিহ্ন এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা লক্ষ্য করেন, তিনি বদাওন দেশটি তাহাকে প্রদান করেন।

খোখরগণের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য যখন সুলতান মুইযযুদ্দীন সাম ভারতে আগমন করেন এবং তাহার নির্দেশ অনুযায়ী সুলতান কুতবুদ্দীন ও তাহার নিজের সেনাবাহিনীসহ তাহার পরিচর্যার জন্য গমন করেন, তখন আলতামশও বদাওনের সেনাবাহিনী সহ সুলতান কুতবুদ্দীনের সঙ্গে যোগ দেন। আলতামশ শৌর্য ও বীর্যে এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ বর্মের সাজে সজ্জিত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে পানির উপর দিয়া গিয়া শত্রুদের আক্রমণ করেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন তাহার মহাবীরত্ব এবং উদ্যমশীলতা লক্ষ্য করেন এবং তাহাকে ডাকিয়া পাঠান আর তাহাকে পুরস্কার দান এবং রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা সম্মানিত করেন; আর তিনি সুলতান কুতবুদ্দীনের নিকট বিশেষভাবে তাহার পদোন্নতি এবং তাহাকে দয়া প্রদর্শনের সুপারিশ করেন। আর ঠিক ঐ সময়েই সুলতানের নির্দেশে তাহার দাসত্ব মোচনের হুকুমনামা লিখিত হয় এবং তিনি ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করিয়া আমীর-উল উমরা পদে উন্নীত হন।

সুলতান কুতবুদ্দীন যখন লাহোরে ইন্তেকাল করেন, তখন সিপাহসালার ইসমাইল, দিল্লীর আমীর দাদ (প্রধান বিচারক) এবং অন্যান্য আমীরগণের অনুরোধে[২] মালিক আলতামশ তাহার অনুচরগণ এবং বদাওনের সেনাবাহিনীসহ আগমন করেন; আর দিল্লী দখলে নিয়া সুলতান শামসুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন এবং আঃ হিঃ ৬০৭ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বহু সংখ্যক কুৎবী আমীর ও মালিক তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন; কিন্তু কতিপয় মুইযযী এবং কুৎবী আমীর, যাহারা দিল্লীর চতুর্দিকস্থ বিভিন্ন স্থান হইতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন; কিন্তু যেহেতু তাহার মহত্বের প্রদীপ ঐশী সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহার নির্বোধ শত্রুগণ ইহা নির্বাপিত করিতে যে চেষ্টা করেন, তাহাতে তাহাদের নিজেদের অপমান ছাড়া আর কোন ফল হয় নাই; আর তাহারা সকলেই

১. বরণ আধুনিক বুলন্দ শহর। ঐ সময়ে এবং পরবর্তীকালেও কিছু সময় বদাওন জায়গীরটি রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

২. সিপাহসালার এবং আমীর-ই-দাদ এক ব্যক্তি কি দুই জন এই সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপিতে পার্থক্য আছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহারা ভিন্ন ব্যক্তি দেখান আছে এবং এই স্থানে ঐ পাঠই গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিষ্ঠুর তরবারির খাপ্তে পরিণত হয় ; আর তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রান্তর ইহাদের অস্তিত্বের কাঁটা ও আগাছামুক্ত হইয়া যায়।

শ্লোক

আল্লাহর স্বীকৃত, ধার্মিক লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিও না
কারণ এরূপ স্বীকৃত জনকে অপসারণ করা দুরূহ।

ইহার পর মুইযযী সুলতান তাজউদ্দীন ইয়েলদুয[১] যিনি (বর্তমানে) ঘযনীর রাজা, তাহার জন্য একটি চাঁদোয়া এবং রাজকীয় অন্যান্য প্রতীকসমূহ প্রেরণ করেন ; আর কিছু কাল পর সুলতান তাজউদ্দীন খোয়ারিযমের বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইয়া লাহোরে আগমন করেন এবং ইহা তাহার দখলে নেন। সুলতান শামসুদ্দীন তাহাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হন এবং আঃ হিঃ ৬১২ সনে তরাইন অঞ্চলে তাহাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় ; আর সুলতান তাজউদ্দীন পরাজিত হন এবং তাহাকে বন্দী করা হয়। তাহাকে দিল্লীতে আনয়ন করা হয় এবং বদাওনে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন।

আঃ হিঃ ৬১৪ সনে[২] সুলতান শামসুদ্দীন আর মালিক নাসিরুদ্দীন কবাজাহ, যিনি সুলতান কুতবুদ্দীনের জামাতা ছিলেন, এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ; আর ইহাতে সুলতান শামসুদ্দীন বিজয়ী হন। লাহোরের সন্নিকটে মালিক নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর প্রতিবার সুলতান শামসুদ্দীন জয়লাভ করেন ; শেষ পর্যন্ত সুলতান শামসুদ্দীন অগ্রসর হইয়া যান এবং নাসিরুদ্দীনকে আক্রমণ করেন। শেষোক্ত জন উছের দুর্গটি সুদৃঢ় করেন এবং নিজে ভকর দুর্গে গমন করেন। উযির নিযামুল মুলক [মুহম্মদ জুনায়দী] এবং অন্যান্য কতিপয় সেনাপতিকে শামসুদ্দীন মালিক নাসিরুদ্দীনের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য মনোনীত করেন ; আর সুলতান স্বয়ং উছ

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই অংশের পাঠে কিছুটা পার্থক্য আছে। একটি পাণ্ডুলিপির পাঠ তেমন বোধগম্য নয়। ইহাতে এইরূপ আছে ; ইহার পর সুলতান তাজউদ্দীন মুইযযী, যিনি ঘযনীর রাজা ছিলেন এবং যাহার জন্য সুলতান মাহমুদ বিন মুহম্মদ সাম একটি চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ (অর্থাৎ দুই শাখা শিং যুক্ত বর্শা, যাহা রাজাদের সম্মুখে বহন করা হয়) ফিরোযকোহ হইতে প্রেরণ করেন" ইত্যাদি। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে সু তান মাহমুদ বিন মুহম্মদ নামের কোন উল্লেখ নাই ; আর এইগুলিতে 'দুরবাশ' শব্দের পরিবর্তে আছে যথাক্রমে ইমারত, আলাত এবং আদওযাত। তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে, সুলতান তাজউদ্দীন ইয়েলদুয, লাহোর এবং ঘযনীন হইতে তাহার (শামসুদ্দীন আলতামশ) সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং তাহাকে একটি রাষ্ট্রীয় মর্যাদার চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ প্রেরণ করেন।

২. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী এই ঘটনাবলী আঃ হিঃ ৬২৪ সনে সংঘটিত হয়। বদাওনী কিন্তু বলেন যে এই ঘটনাগুলি আঃ হিঃ ৬১৪ সনে ঘটিয়াছিল।

অবরোধ করেন ; আর দুই মাস পঁচিশ দিন অবরোধের পর ইহা অধিকার করেন।[১] এই দুর্গ দখলের সংবাদ যখন মালিক নাসিরুদ্দীনের নিকট পৌঁছে, তখন তিনি তাহার পুত্র আলাউদ্দীন বহরাম শাহকে সুলতান শামসুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন এবং শান্তি স্থাপনের আবেদন জানান। ইহার অল্প পরেই ভকর দখলের সংবাদ আসিয়া পৌঁছে। তাহারা বলে যে দুর্গ অধিকার করিবার পর মালিক নাসিরুদ্দীন নদীতে ডুবিয়া যান।[২]

এই ঘটনার পর আঃ হিঃ ৬১৮ সনে সুলতান শামসুদ্দীন খোয়ারিযম শাহ চেঙ্গিস খান কর্তৃক পরাজিত হইয়া লাহোর অভিমুখে আগমন করেন। সুলতান শামসুদ্দীন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ[৩] তাহাকে বাধা দিতে গমন করেন। সুলতান জালালুদ্দীন তাহার সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া সিন্ধু এবং সিওয়াস্তান অভিমুখে গমন করেন এবং তথা হইতে কজ এবং মাকরান হইয়া পলায়ন করেন। ইহার পর আঃ হিঃ ৬২২ সনে সুলতান শামসুদ্দীন তাহার সেনাবাহিনীসহ লক্ষণাবতী এবং বিহার অভিমুখে অগ্রসর হন এবং সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন খলজীকে আয়ত্তে আনয়ন করেন ; সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন খলজীর বিবরণ এবং তিনি যে বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ; সুলতান শামসুদ্দীন বাঙ্গালা দেশে নিজ নামে খোৎবা পাঠ করান এবং মুদ্রা প্রচলন করেন আর তাহার নিকট হইতে আটত্রিশটি হস্তী আর আশি হাজার রৌপ্য তংগা লাভ করেন। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুলতান নাসিরুদ্দীন উপাধি দান করেন ; আর লক্ষণাবতী রাজ্যটি তাহার দায়িত্বে[৪] অর্পণ করিয়া এবং তাহাকে একটি চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ মঞ্জুর করিয়া তাহাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যান এবং তিনি স্বয়ং তাহার রাজধানী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। মালিক নাসিরুদ্দীন ঘিয়াসুদ্দীন খলজীর, যিনি ঐ অঞ্চলের রাজা

১. তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে দুর্গের পাদদেশে সংঘর্ষ তিন মাস ধরিয়া চলে। আর ইহার পর দুর্গ বন্দীবাহিনী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে।

২. তিনি দৈবক্রমে ডুবিয়া যান না আর কিছু ঘটিয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট বলা যায় না।

৩. তবকাত-ই-নাসিরীতে একস্থানে আছে যে শামসুদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে "তাহার সেনাবাহিনী হইতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন।" আবার অন্য এক স্থানে আছে যে তিনি "হিন্দুস্থানের সেনাবাহিনীসহ দিল্লী হইতে লাহোর অভিমুখে গমন করেন, আর সুলতান জালালুদ্দীন খোয়ারিযম শাহ হিন্দুস্থানের সেনাবাহিনীর সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া হিন্দুস্থানের অভিমুখে চলিয়া যান।"

৪. এই দায়িত্ব প্রথমে শুধু নাম মাত্র ছিল ; কারণ ঘিয়াসুদ্দীন খলজী তাহার পরাজয় ও মৃত্যু পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ মালিক বা সুলতান নাসিরুদ্দীনকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাওয়া হয় যেন সুযোগ বুঝিয়া তিনি লক্ষণাবতী জয় করিতে পারেন।

ছিলেন, সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে পরাজিত করেন। তিনি তাহাকে বন্দী করেন এবং হত্যা করেন। প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য তাহার হস্তগত হয়। তিনি দিল্লীর অধিকাংশ খ্যাতনামা এবং সুপরিচিত লোককে মনে রাখেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকট উপহার প্রেরণ করেন।

আঃ হিঃ ৬২৩ সনে মুলতানে রণথম্ভোর জয়ের দৃঢ় সংকল্প করেন এবং তাহার সেনাবাহিনীসহ ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া দুর্গটি অধিকার করেন। আঃ হিঃ ৬২৪ সনে তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ মন্দওয়ার দুর্গ জয়ের জন্য অগ্রসর হন, এবং ঐ দুর্গটি আর শিবালিকের সম্পূর্ণটা তাহার দখলে আনয়ন করেন।[১] এই বৎসরেই তিনি তাহার রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আমীর রুহানী, যিনি ঐ যুগের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং যিনি চেঙ্গিস খানের দুর্ঘটনার পর বুখারা হইতে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন এইসব বিজয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে কতিপয় প্রশংসা সূচক কবিতা রচনা করেন। নিম্নের শ্লোকগুলি ঐগুলিরই অংশ ঃ

ফেরেস্তা জিবরাইল, আকাশের অধিবাসীগণের নিকট বহন করেন,
সুলতান শামসুদ্দীনের বিজয় বার্তা, তিনি মহান সুলতান :
হে পবিত্র ফেরেস্তাগণ, যাহারা সর্বোচ্চ বেহেশতে অবস্থান করেন ;
এই মহা সংবাদের জন্য স্বর্গে মিনার আর উচ্চ খিলান নির্মাণ কর ;
ইসলামের সম্রাট, মুলাহিদা হাথ নিকট হইতে
গগনচুম্বি দুর্গসমূহ ছিনাইয়া গিয়াছে
এই ধর্ম যোদ্ধার বাহু এবং তরবারিতে
আবেগপ্রবণ হায়দরের আত্মা প্রশংসা বণ্টন করে।

---

১. দুর্গটির নাম দুইটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে মন্দার, এবং অপর দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মন্দোয়ার। তবকাত-ই-নাসিরীর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে আছে মন্দোয়ার, আর অন্যান্যগুলিতে আছে মন্দুর ও মন্দু ; বদাওনীর কোন কপিতে আছে মন্দোয়ার আবার কোনটিতে আছে মন্দু। মিরাত-ই-জাহান নুমাতে আছে মন্দোয়ার, তবকাত-উত-তাওয়াজিনে আছে মন্দাওয়ার আর ফিরিশতাতে আছে মন্দু। মেজর রাভার্টী মনে করেন যে ইহা মন্দাওয়ার হইবে, কিন্তু ইহা মন্দোয়ারও হইতে পারে। মন্দোয়ার (টডের মতে মন্দোর) যোধপুরের পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত, পরিহারগণের রাজধানী ছিল। টড বলেন যে মন্দোর, পরিহার রাজা মোকুলের নিকট হইতে রাহুপ নিয়া যান. আর তিনি "চিতোর লাভ করেন এবং অল্প কিছুদিন পরেই শেমসুদ্দীন (শামসুদ্দীন) দ্বারা আক্রান্ত হন ; রাহুপ তাহার মোকাবিলা করেন এবং নগোরের যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন।" ফলে দেখা যায় যে উভয় পক্ষই জয়লাভের দাবী করে। হিমালয়ের দক্ষিণান্ত, গঙ্গা শতদ্রুর মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগটিই শিবালিক অঞ্চলরূপে পরিচিত ছিল, দক্ষিণে ইহা কোহ-ই শিবালিকে অবস্থিত হানসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; নাগোর ও শিবালিক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কোন কোন লেখক বলেন যে শিবালিক পশ্চিমে কাশ্মিরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আঃ হিঃ ৬২৬ সনে সুলতান শামসুদ্দীনের জন্য আরব হইতে খলাফতের অঙ্গাবরণ সহ দূত আগমন করেন। সুলতান শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের শর্তাবলী পালন করেন এবং দার-উল-খলাফতের অঙ্গাবরণ পরিধান করেন। ঐ অঙ্গাবরণ পরিধান করিয়া তিনি যারপর নাই সুখ ও আনন্দ অনুকরণ করেন। তিনি অধিকাংশ আমীরকে সম্মানীয় পোশাক প্রদান করেন; আর শহরে খিলান নির্মিত হয়; আর আনন্দের ঢাক বাজান হয়।

এই বৎসরেই লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা সুলতান নাসিরুদ্দীনের ইন্তেকালের সংবাদ আসে। সুলতান শামসুদ্দীন তাহার জন্য শোক অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন; আর তাহার কনিষ্ঠতর পুত্রকে তাহার নাম প্রদান করেন; আর তাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেন। তাহার সম্মানেই তবকাত-ই-নাসিরীর নামকরণ করা হয়।

বিবরণে ফিরিয়া আসিতেছি, আঃ হিঃ ৬২৭ সনে সুলতান তাহার সৈন্যগণসহ লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন করেন এবং সুলতান নাসিরুদ্দীনের ইন্তেকালের পর ঐ স্থানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তাহা প্রশমিত করেন। তিনি লক্ষণাবতীর দায়িত্ব-ভার ইযযুলমুলক মালিক আলাউদ্দিন খানিকে[১] অর্পণ করেন এবং তাহার রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৬২৯ সনে তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ গোয়ালিয়র বিজয়ের জন্য গমন করেন, আর এক বৎসরকাল ইহা অবরোধ করিয়া রাখেন। শেষপর্যন্ত দুর্গটির শাসনকর্তা মিলাক দেও বসিল[২] রাত্রিকালে পলায়ন করেন এবং দুর্গটি সুলতানের দখলে আসে। বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করা হয়, আর ইহাদের মধ্য হইতে তিনশত জনকে হত্যা করা হয়। মালিক তাজুদ্দীন রেযা, যিনি রাষ্ট্রের মুন্সি ছিলেন এই দুর্গটি জয়ের বিষয়ে এই চতুষ্পদী কবিতাটি রচনা করেন, আর ইহা দুইটির প্রবেশ-দ্বারে একটি পাথরে খোদাই করিয়া দেওয়া হয়।

প্রত্যেকটি দুর্গ যাহা সুলতানদের সুলতান অধিকার করেন
তিনি আল্লাহর সাহায্যে আর ধর্মের সহায়তায় জয় করেন।

১. পূর্বে দেওয়া হয়েছে।
২. নামটির প্রথম অংশটি সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই একরূপ আছে; মিলক দেও; কিন্তু শেষ অংশটি ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ভিন্নরূপ আছে। মেজর রাভার্টী তবকাত-ই-নাসিরী এবং অন্যান্য পুস্তক আলোচনা করিয়া নামটি মান দিও-এর পুত্র মঙ্গল দিও হইবে বলিয়া মনে করেন। মিঃ টমাস (পাঠান রাজাগণ) মনে করেন যে এই নামটি সম্প্রতি বিশাল দেবের পুত্র ত্রৈলোক্য দেব হইবে, তিনি ছিলেন একজন চন্দেল রাজা।

গোয়ালিয়রের[১] সেই দুর্ভেদ্য দুর্গটি
তিনি ছয় শত ত্রিশ সনে অধিকার করেন।

ইহার পরে সুলতান ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আঃ হিঃ ৬৩১ সনে তিনি মালব দেশটি আক্রমণ করেন এবং ভিলসা দুর্গটি দখল করেন। তিনি ইজুয়িন শহরটিও অধিকার করেন। আর তিন শত বৎসর পূর্বে লিখিত[২] এবং অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং নিরেট মহাকাল মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। ইহাকে ইহার ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া দেন; আর যে বিক্রমজিত হইতে হিন্দুরা তাহাদের সাল গণনা করে, তিনি তাহার প্রতিকৃতি এবং অন্যান্য কতিপয় মূর্তি, যেগুলি গলান তামা দ্বারা তৈরী করা হইয়াছিল, নিয়া যান আর এইগুলি জামে মসজিদের[৩] সম্মুখস্থ প্রান্তরে স্থাপন করেন, যাহাতে এইগুলি লোকেরা পদদলিত করিতে পারে।

তিনি তাহার সৈন্যদলসহ দ্বিতীয়বার মুলতান[৪] অভিমুখে অগ্রসর হন। এই যাত্রা অশুভসূচক হইয়া উঠে; আর তিনি এক রোগে আক্রান্ত হইয়া যান; আর তিনি যখন দিল্লী পৌঁছেন, আর আঃ হিঃ ৬৩৩ সনের ২০ই শাবান তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন।

খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ারের[৫] (তাহার উপরে যেন আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়) লেখায়, যেগুলি শেখ ফরিদ গঞ্জ শকর (তাহাদের কবর যেন আল্লাহ পবিত্র করেন)

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি কালিওয়ার দেওয়া আছে।
২. এই অংশটির পাঠ এইরূপও হইতে পারে "যাহা নির্মাণ করিতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল।"
৩. শাহ জাহান কর্তৃক নির্মিত বর্তমান জামে মসজিদটি নয়; প্রথম জামে মসজিদ যাহা কুতবুদ্দীন নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বর্তমানে যাহা কুতবী মসজিদ নামে পরিচিত।
৪. তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে সুলতান বানিয়ান গমন করিয়াছিলেন। মেজর রাভার্টী মনে করেন যে লবণ পর্বতের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলটিই বানিযান নামে পরিচিত ছিল। বদাওনী এবং ফিরিশতা তবকাত-ই-আকবরীর অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন মুলতান, কিন্তু তাহা সম্ভবতঃ ভুল।
৫. এই দরবেশের নামানুসারেই, সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বকের নামানুসারে নয়, কুতব মিনারের নামকরণ করা হয়। তিনি বোগদাদের নিকটস্থ উশ এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতে আগমন করেন এবং সুলতান নাসিরুদ্দীন কবাজাহ এর সময়ে সর্বপ্রথমে মুলতান অভিমুখে গমন করেন। পরে তিনি দিল্লী আগমন করেন। তাহাকে এত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হইত যে সুলতান শামসুদ্দীন স্বয়ং, তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শহরের বাহিরে গমন করেন এবং তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও তাহার সঙ্গে শহরে আগমন করেন। শহরে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ তিনি গিলুখরিতে বাস করিতে থাকেন। শেখ-উল-ইসলাম শেখ জালালুদ্দীন বস্তামী যখন ইন্তেকাল করেন তখন সুলতান তাহাকে ঐ পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন, কিন্তু দরবেশ তাহা অস্বীকার করেন। তিনি আঃহিঃ ৬৩৩ সনের ২৪শে রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন।

সংগ্রহ করিয়াছেন, বলা হইয়াছে যে সুলতানের মাথায় একটা জলাশয় খননের কল্পনা জাগে। ইহার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান বিশেষে খাজার সাহায্যের জন্য তিনি তাহার নিকট গমন করেন এবং তাহার সাহায্য চাহেন। সুলতান বহুসংখ্যক স্থানে গমন করেন। কিন্তু সবগুলি হইতেই তিনি চলিয়া আসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যে স্থানে শামসী জলাশয়টি আছে (অর্থাৎ শামসুদ্দীনের নামানুসারে যে জলাশয়ের নামকরণ করা হইয়াছিল) ঐ স্থানে গমন করেন এবং তাহা পছন্দ করেন। যখন রাত্রি হইল, তখন সুলতান স্বপ্নে মহানবীকে (আল্লাহর অনুগ্রহ ও শান্তি যেন তাহার উপর বর্ষিত হয়) ঐ স্থানের কেন্দ্রস্থলে একটি অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। মহানবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শামসুদ্দীন, তুমি কি আশা করিতেছ?" সুলতান প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে আল্লাহর নবী আমি একটি জলাশয় খনন করিতে চাইতেছি।" তিনি নির্দেশ দিলেন "তাহা এই স্থানে খনন কর।" মহানবীর (আল্লাহর অনুগ্রহ এবং শান্তি যেন তাহার বর্ষিত হয়) অশ্বটি ইহার খুর দিয়া মাটিতে আঘাত করিল এবং পানির এক স্রোত নির্গত হইতে আরম্ভ করিল। সুলতান তাহার নিদ্রা হইতে জাগিয়া গেলেন, আর রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই তিনি খাজা কুতবুদ্দীনের (আল্লাহ যেন তাহার কবর পবিত্র রাখেন) খেদমতে গমন করেন এবং যাহা ঘটিয়াছে তাহা তাহার নিকট বিবৃত করেন। খাজা (তাহার কবর যেন পবিত্র থাকে) বলেন যে সুলতান তাহাকে ঐ স্থানে নিয়া যান আর এক বাতির আলোকে তাহারা দেখিতে পান যে একটি প্রস্রবণ নির্গত হইতেছে।

একটি গল্প আছে যে, মালিক শামসুদ্দীন আলতামশ যখন বোগদাদে দরিদ্র পরিবেশে[১] ছিলেন, তখন বহু সংখ্যক দরবেশ তাহার প্রভুর গৃহে সমবেত হইতেন আর এমন সংগীত এবং ধর্মীয় উল্লাস উপভোগ করিতেন যেরূপ সচরাচর দরবেশগণ এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার লোকেরা উপভোগ করেন। প্রতি রাত্রে মালিক আলতামশ মন প্রাণ দিয়া দরবেশগণের খেদমত করিতেন আর তাহাদের সংগীত শুনিয়া কাঁদিতেন।[২] কাজী হামিদুদ্দীন নাগোরী এই সমাবেশের প্রধান ছিলেন। যেহেতু মালিক আলতামশের খেদমতে দরবেশগণ প্রীত হইয়াছিলেন, তাহারা তাহার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; আর এই দৃষ্টির ফলেই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলা

১. এই অংশটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়: বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিব পাঠেও পার্থক্য আছে।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই এই স্থানে আছে "মোমবাতিব মাথা ধরিয়াছিলেন।" যাহার কোন অর্থ বোধগম্য নয়, ফলে এই স্থানের পাঠ সামান্য বদল করা হইয়াছে। পর পৃষ্ঠায় যখন কাযী হিসামুদ্দীন সুলতানকে এই ব্যাপারটি স্মরণ করাইয়া দেন তখন তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেই অনুযায়ীই পাঠ দেওয়া হইল।

তাহাকে সুলতান পদে উন্নীত করেন। এক যুগ পরে, তিনি যখন হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করেন, আর কাযি হামিদুদ্দীন নাগোরী দিল্লীতে সত্য সন্ধানীদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন, তখন দরবেশগণ সর্বদাই তাহার বক্তৃতার কক্ষে সংগীত ও নৃত্য করিতেন। দুইজন বাহ্য জগতের পণ্ডিত লোক, যাহাদের একজনের নাম ছিল মুল্লা ইমামুদ্দীন আর অপর জনের নাম ছিল মুল্লা জালালুদ্দীন, সংগীত ও নৃত্যের প্রথা নীতি বিরোধী গণ্য করিয়া কাযির এইরূপ কার্য সম্পাদন করিতে নিষেধ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন।

সুলতান কাযিকে ডাকিয়া পাঠান এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলেন। ঐ দুইজন লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সংগীত ও নৃত্য আইনসঙ্গত কিনা। কাযি জবাব দিলেন, যে সব লোক সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদী, তাহাদের জন্য এই সব বেআইনী ; আর আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ সম্পন্ন লোকের জন্য আইনসঙ্গত। অতঃপর সুলতানের দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "সম্রাট শুভ স্মৃতিতে অবশ্যই আছে যে এক রাত্রিতে দরবেশগণ এবং ভাবাবেগ আচ্ছন্ন লোকেরা যখন আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন, আর আপনি আপনার প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী, ঐ সভায় লোকদের খেদমত করিয়াছিলেন আর আপনার ভাবের উদয় হইলে আপনি কাঁদিয়াছিলেন। দরবেশগণ আপনার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন আর ঐ শুভ লক্ষণযুক্ত দৃষ্টিপাতের ফলেই আপনি আপনার বর্তমান উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন।' ঐ পরিবেশের কথা সুলতানের মনে পড়িল আর তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাযিকে তাহার পার্শ্বে বসাইলেন আর তাহাকে বহু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ইহার পর তিনি ভাবাবেগের অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ করিতেন আর দরবেশগণ কর্তৃক প্রদত্ত উপকারিতার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতেন।

ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনে এবং দায়িত্ব পালনে সুলতান অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। শুক্রবারগুলিতে তিনি মসজিদে গমন করিতেন এবং সকল নির্ধারিত এবং প্রচলিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। ইহাতে দিল্লীর মুলাহিদগণ (প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধবাদীগণ) রাগান্বিত হন।[১] তাহারা একত্র ষড়যন্ত্র করে এবং জুমার নামাজের সময় যখন লোকেরা নিজেদের নামাজে নিযুক্ত থাকিবে তখন সুলতানকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত করে। তাহারা একত্র হয় আর এক শুক্রবার তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া

১. মিনহাজুদ্দীন মুলাহিদগণ কর্তৃক সুলতানের উপর এই আক্রমণের ব্যাপারটি উল্লেখ করেন নাই, যদিও তিনি তাহাদের দ্বারা আঃ হিঃ ৬৩৪ সনে জামে মসজিদে একটি জমাতের উপর অনুরূপ আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন।

মসজিদে গমন করে এবং তাহাদের তরবারি টানিয়া লইয়া কতিপয় লোককে শহীদ করে। মহান ও পবিত্র আল্লাহ এই লোকগুলির দুষ্ট পরিকল্পনা হইতে রক্ষা করেন; আর সাধারণ লোকেরা গৃহের ছাদে উঠিয়া এবং দেওয়ালে চড়িয়া পাথর-এর তার দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া এই দলটিকে ধ্বংসের ধূলায় নিক্ষেপ করে এবং অস্তিত্বের লজ্জা হইতে এই পৃথিবীকে মুক্ত করে।

শ্লোক

দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সর্বদাই তাহাদের শয়তানীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে
বৃশ্চিকের ন্যায়, যাহা কদাচিত গৃহে গমন করে।[১]

তাহার জীবনের শেষ দিকে, বোগদাদের উযির ফখর-উল-মুলক উসামী, যিনি তথায় ত্রিশ বৎসর কাল উযির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাহার বাহ্যিক ও আন্তরিক মহত্ত্ব এবং উৎকর্ষতার জন্য সুবিখ্যাত এবং সুপরিচিত ছিলেন, কতিপয় বৈষয়িক কারণে, যাহা প্রায়ই মহৎ লোকের দুঃখ ও মানসিক যাতনার কারণ হয়, তাহারা স্বদেশ ত্যাগ করেন এবং দিল্লী আগমন করেন। তাহার আগমনে সুলতান নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করিলেন এবং সর্বপ্রকার সৌজন্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহাকে শহরে আনয়ন করিলেন। তাহাকে উযির পদে নিযুক্ত করিলেন আর তাহাকে সর্বপ্রকার রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশের রাজত্বকাল ছিল ছাব্বিশ বৎসর।

সুলতান রুকনুদ্দীন ফিরোয শাহ, সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্র

আঃ হিঃ ৬২৫ সনে[২] তাহার পিতা তাহাকে পরগণা বদাওন প্রদান করেন এবং তাহাকে একটি চাঁদোয়া আর একটি দুরবাশ বা দুই শিংওয়ালা বল্লম প্রদান করেন। ইহার পর গোয়ালিয়র বিজয়ের পর সুলতান যখন দিল্লী আগমন করিলেন, তিনি লাহোর অঞ্চলটির দায়িত্বভার তাহাকে সমর্পণ করিলেন। সুলতান যখন তাহার শেষ যাত্রায় সিওয়াস্তান[৩] হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি লাহোর হইতে রুক-নুদ্দীন ফিরোয শাহকে তাহার সঙ্গে আনয়ন করেন; আর তাহার ইন্তেকালের পর

১. দুষ্ট প্রকৃতির লোকের আর বৃশ্চিকের ব্যবহারের সামঞ্জস্য ঠিক সুস্পষ্ট নয়।
২. তবকাত-ই-নাসিরী এবং আগেকার ইতিহাসগুলিতে এই তারিখই দেওয়া আছে; কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন আঃ হিঃ ৬২৬; তাহার দেওয়া এই তারিখ সঠিক মনে হয় না।
৩. তবকাত-ই-নাসিরী বলে যে "সিন্ধু নদী এবং বানিয়ান হইতে।"

আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ আঃ হিঃ ৬৩৩ সনের (২১ শে শাবান)[১] মঙ্গলবার ফিরোয শাহকে দিল্লীতে সিংহাসনে স্থাপন করেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী উচ্চ নীচ সকলের জন্যই উপহার প্রদান এবং অর্থ ছিটানোর অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা হয়। কবিগণ প্রশংসা এবং অভিনন্দনের বিজয়সূচক গীতি কবিতা রচনা করেন এবং পুরস্কার এবং অনুগ্রহ লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের মুন্সি মালিক তাজুদ্দীন রেজা একটি সুদীর্ঘ গীতি কবিতা রচনা করেন এবং উপহার এবং পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন; ইহা হইতে স্মারকরূপে দুইটি শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

চিরন্তন সাম্রাজ্য যেন রাজার প্রতি
বিশেষতঃ তরুণ রাজার পক্ষে শুভ লক্ষণ যুক্ত হয়,
ইয়ামীন উদদৌলা রুকনুদ্দীন যিনি আসিয়াছেন।[২]

তিনি যখন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ভোগ বিলাসের প্রতি আসক্তি তাহাকে সরকারী কার্যাবলী হইতে দূরে রাখিল। কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি ধনরত্ন অপব্যয় করেন এবং বিলাইয়া দেন। হিন্দুস্তানের শাসনভার তাহার মাতার হস্তে চলিয়া যায়; তিনি ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাসী এবং শাহ তুর্কান নামে পরিচিত ছিলেন। যেহেতু তিনি প্রচুর ক্ষমতা এবং প্রভাব অর্জন করেন, তিনি হারেমের অন্যান্য মহিলাগণের বহু অসুবিধার সৃষ্টি করেন। ভূতপূর্ব সুলতানের জীবিত-কালে তিনি ইহাদের সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত ছিলেন।[৩] শেষোক্ত জনের এক কনিষ্ঠ পুত্র ছিল আর তাহার নাম ছিল কুতবুদ্দীন,[৪] তিনি তাহাকে হত্যা করান; আর কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলেন। রুকনুদ্দীনের উপহারের অধিকাংশই ছিল নর্তকীদের এবং নীচ জাতীয় লোক, ভাড় এবং কৌতুককারীদের প্রতি।

ছোট বড়, উচ্চ নীচ সকলের মনই তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে; আর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মালিক ঘিয়াসুদ্দীন, যাহার হস্তে অযোধ্যার শাসনভার ন্যস্ত

১. তারিখ ও মাস তবকাত-ই-নাসিরী হইতে নেওয়া হইয়াছে।

২. শেষ পংক্তির অর্থ বুঝা যায় না।

৩. তবকাত-ই-নাসিরীর লেখক বলেন যে তিনি হারেমের অন্যান্য মহিলাদের হিংসা এবং ঈর্ষার পাত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। তবকাত-ই-আকবরীর লেখক যেমন বলিয়াছেন তিনিই তাহাদের প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করিতেন। আর সে মুহূর্তে তিনি তাহাদের কয়েক জনকে অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে হত্যা করান আর অন্যান্যদের সঙ্গেও অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যবহার করেন।

৪. তিনি ছিলেন শামসুদ্দীন আলতামশের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ এবং ঐ সময়ে প্রায় শিশু ছিলেন, এবং এক রক্ষিতার গর্ভে তাহার জন্ম হইয়াছিল। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী তাহাকে প্রথমে অন্ধ করিয়া ফেলা হয় এবং পরে হত্যা করা হয়।

ছিল, আনুগত্যের মস্তক ফিরাইয়া নেন। সুলতানের গভর্ণর মালিক ইযযুদ্দীন কবির খান এবং হানসীর গভর্ণর মালিক সরফুদ্দীন কুজি পরস্পরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং শত্রুতার পতাকা উত্তোলন করেন। ইহাদের ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান রুকনুদ্দীন এক বিশাল বাহিনী সৈন্যসহ দিল্লী হইতে বহির্গত হন এবং কিলুখরিতে[১] শিবির স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের উযির নিযামুল মুলক মুহম্মদ জুবায়দী অতিরিক্ত ভয় ও শঙ্কায় কিলুখরি হইতে পলায়ন করেন এবং কোল শহরে গমন করেন এবং মালিক ইযযুদ্দীন মালারীর[২] সঙ্গে যোগদান করেন।

সুলতান রুকনুদ্দীন পাঞ্জাবের[৩] বিশৃঙ্খলসামূহ দমন করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করেন এবং কুহরাম অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন মনসুরপুর এবং তরাইনের সন্নিকটে উপস্থিত হন তাহার সঙ্গীয় আমীরগণের মধ্যে নিম্নলিখিতগণ যথা, তাজ-উল মুলক মুহম্মদ[৪] দবির (মুঘি) এবং বহাউদ্দীন হুসেন এবং মালিক করিমুদ্দীন যাহিদ (দরবেশ) এবং যিয়াউল মুলক সরওয়ানী এবং খাজা রশিদ এবং আমীর ফখরুদ্দীন সেনাবাহিনী হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।[৫] তাহারা সুলতান শামসুদ্দীনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুলতান রাযিয়ার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। আর তাহাকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাহারা সুলতান রুকনুদ্দীনের মাতা শাহ তুর্কানকে বন্দী করেন এবং তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সুলতান রাযিযা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যেমন সাহস এবং উদারতা এবং জ্ঞান এবং বিবেচনা আর তিনি পুরুষোচিত গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। তাহার পিতা তাহার প্রতি অত্যন্ত যত্ন নিতেন আর তাহার

১. ইহা ছিল দিল্লীর একটি শহরতলী অথবা বহু নতুন শহরগুলির একটি। কোন কোন লেখক বলেন যে আঃ হিঃ ৬৮৬ সনে সুলতান মুইযযুদ্দীন কাযকোবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ঠিক নহে। ইহা আরও অনেক পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

২. ইনি বদাওনের অধীন ছিলেন।

৩. লাহোরে অধীনস্থ মালিক আলাউদ্দীন জানিও বিদ্রোহ করিয়াছিলেন।

৪. তবকাত-ই-নাসিরী ইহার নাম লিখিয়াছে তাজ-উল-মুলক মাহমুদ।

৫. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী এই লোকগুলি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে নাই; কিন্তু তাহারা এবং অন্যান্য কতিপয় তাজিক কর্মচারী, তুর্কী আমীর এবং অন্দরমহলের ক্রীতদাসগণ কর্তৃক নিহত হয়। তবকাত-ই-নাসিরী, তবকাত-ই-আকবরীর চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য, ফলে তবকাত-ই-নাসিরীর অভিমতই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ফিরিশ্‌তা এবং বদাওনী উভয়েই তবকাত-ই-আকবরী অনুসরণ করিয়াছেন। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী সুলতান রুকনুদ্দীনের মাতা এবং সুলতান রাযিয়ার মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ হওয়ার ফলেই সুলতান রুকনুদ্দীনকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। শহরের অধিবাসীগণ সুলতান রাযিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন, রাজকীয় কসর (কেল্লা) আক্রমণ করে এবং শাহ তুর্কানকে বন্দী করে।

জীবদ্দশায় তাহাকে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী শিক্ষা দান করেন এবং কিছু ক্ষমতাও প্রদান করেন।

সুলতান রুকনুদ্দীনের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কিলুখরি পৌঁছেন। সুলতান রাযিয়া তাহাকে বাধা দিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাকে বন্দী করা হয় এবং দিল্লী আনয়ন করিয়া কারারুদ্ধ করা হয় আর ইহার অল্পকাল পরেই কারাগারে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাহার রাজত্বকাল ছিল ছয় মাস আটাশ দিন।

সুলতান রাজিয়া[১]

যে বৎসর সুলতান শামসুদ্দীন গোয়ালিয়র দুর্গটি অধিকার করেন, সেই বৎসর তিনি সুলতান রাযিয়ার মধ্যে যে অসামান্য বুদ্ধিমত্তা এবং সুবিবেচনা দেখিতে পান তাহার ফলে তিনি তাহার কতিপয় আমীরকে একত্র সমবেত করেন, আর তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী করা সম্বন্ধে কতিপয় নির্দেশ দান করেন। তাহারা সাহস সঞ্চয় করিয়া তাহার নিকট নিবেদন করেন যে একটি মেয়েকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা সুবিবেচনার কাজ হইবে না। আর যখন তাহার দক্ষ ও বুদ্ধিমান পুত্র সন্তান আছেন সুলতান বলিলেন ঃ আমি আমার পুত্রদের মদ্যপান, খেলাধুলা, আর নানা প্রকার বে-আইনী ও নীতিহীন কার্যে রত দেখিতেছি। আমার মনে হয় না যে তাহাদের বাহু সাম্রাজ্যের ভার বহন করিতে সক্ষম হইবে। রাযিয়া যদিও চেহারায় একজন মহিলা, তবু তাহার মানসিক গুণাবলীতে সে একজন পুরুষ, আর প্রকৃতপক্ষে সে আমার পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সংক্ষেপে, আঃ হিঃ ৬৩৫ সনে যখন সুলতান রাযিয়া সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন, তিনি তাহার পিতার সময়ের প্রচলিত নিয়ম-কানুনসমূহ পুনঃ প্রবর্তন করেন; যদিও এইগুলি রুকনুদ্দীনের শাসনকালে অর্থহীন এবং পরিত্যাজ্য হইয়া পড়িয়াছিল; আর তিনি ন্যায়পরায়ণতা এবং সদাশয়তার পথ অনুসরণ করেন।

নিযাম-উল মুলক মুহম্মদ জুবায়দী, যিনি সাম্রাজ্যের উযির ছিলেন এবং মালিক জানি এবং কুজি এবং মালিক ইযযুদ্দীন আয়ায, যাহারা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রাযিয়ার

১. মেজর রাভার্তী তাহার নাম লিখিয়াছেন রাযিয়াত। যদিও তাহার লিখা নামটিই ব্যাকরণসম্মত, তবু তাহার রাযিয়া নামটিই ইতিহাসে চালু হইয়া গিয়াছে বলিয়া এই নামটিই এই পুস্তকে রাখা হইয়াছে।

দরবারে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহারা বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত আমীর-গণের নিকট পত্র লিখেন এবং তাহাদিগকেও এরূপ করিতে প্ররোচনা দেন। এইরূপ অবস্থায় অযোধ্যার জায়গীরদার মালিক ইযযুদ্দীন হানসী[১] সুলতান রাযিয়াকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে আগমন করেন। তিনি যখন গঙ্গা অতিক্রম করেন তখন পূর্ব বর্ণিত শত্রুভাবাপন্ন আমীরগণ অগ্রসর হন এবং তাহাকে বন্দী করেন; আর এই সময়ে তিনি এক রোগে আক্রান্ত হইবার ফলে ইন্তেকাল করেন। ইহার পর, সুলতান রাযিয়া তাহার দক্ষ ব্যবহার এবং তেজস্বী পরিকল্পনার দ্বারা অকর্মণ্য আমীরগণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে সক্ষম হন[২] এবং তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দেন এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেন। সুলতান রাযিয়া এই পলাতকগণের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। মালিক কুজি এবং তাহার ভ্রাতাকে বন্দী করা হয় এবং হত্যা করা হয়। মালিক জানি পায়েল[৩] প্রদেশে নিহত হন এবং তাহার শির দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। মালিক নিযাম-উল মুলক সবমুর পার্বত্য অঞ্চল অভিমুখে চলিয়া যান এবং তথায় ইন্তেকাল করেন।

সুলতান রাযিয়ার ক্ষমতা যখন বৃদ্ধি পাইল এবং তাহার শাসন যখন সুশৃঙ্খল হইল তখন খাজা মুহাযযবকে উযির পদে নিযুক্ত করা হইল; তিনি নিযাম-উল-মুলক জুবায়দীর সহকারী ছিলেন এবং তাহাকে নিযাম-উল-মুলক উপাধি দেওয়া হইল। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হইল ফখরুদ্দীন আয়বককে আর তাহাকে কুতলয খান উপাধি দেওয়া হইল। লাহোর প্রদেশটি দেওয়া হইল মালিক কবির খান আয়বককে আর লক্ষণাবতী, দিউল, দরবন্দ এবং বিভিন্ন শহর ও প্রদেশের প্রত্যেকটি এক একজন

১. তবকাত-ই-নাসিরীতে তাহার নাম দেওয়া আছে মালিক নুসরত (নসরত) উদ্দীন তয়াবসি মুইযযী। মেজর রাভার্টী এক টীকায় বলেন যে, শামসুদ্দীন আলতামশের কনিষ্ঠতম পুত্র গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ শাহের বিদ্রোহের পর, রুকনুদ্দীনের রাজত্বকালে সুলতান রাযিয়া তাহাকে অযোধ্যা প্রদেশের অধীনে নিযুক্ত করেন।

২. মেজর রেভার্টী এই মতটি গ্রহণ করেন নাই যে, সুলতান আমীরদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। কিন্তু ইহা সত্য না হওয়ার কোন কারণ নাই। তবকাত-ই-নাসিরীতেও আছে যে আমীরগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহা সুলতান রাযিয়ার ব্যবস্থাপনার ফলে সংঘটিত হওয়া কোন প্রকারেই অসম্ভব হইতে পারে না।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে; অন্যান্যগুলিতে আছে ববল, বয়েল এবং ময়েল। বদাওনী এবং ফিরিশ্‌তায় ইহা ববল, বকুল এবং বাবুল আছে। রাভার্টী বলেন পায়ল বা পায়েল একটি অতি প্রাচীন স্থানের নাম, আর ইহা হইতে জেলাটিরও এই নাম হয়; দিল্লী ও লুধিয়ানার এক পথের উপরে এই জেলা অবস্থিত।

আমীরকে দেওয়া হইল। ঠিক এই সময়েই সরফুদ্দীন আয়বক ইন্তেকাল করেন আর তাহার স্থলে কুতবুদ্দীন হাসানকে[১] নিযুক্ত করা হয়; আর এক বিশাল সেনাবাহিনী সহ তাহাকে রণথম্ভোরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। সুলতান শামসুদ্দীনের ইন্তেকালের পর হিন্দুগণ এই দুর্গে যে সব মুসলমানদের অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি তাহাদের অবরোধ মুক্ত করেন এবং দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনেন; কিন্তু স্থানটি দখলে রাখিবার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। তিনি রণথম্ভোর অভিমুখে গমন করিলে মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন আইতাকিনকে গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়; আর আস্তাবলসমূহের তত্ত্বাবধায়ক আবিসীনীয় জামালুদ্দীন ইয়াকুত[২] সুলতান রাযিয়ার চাকুরীতে উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেন এবং আমীরদের ঈর্ষার কারণে পরিণত হন। তিনি (তাহার সঙ্গে) এমন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন যে সুলতান রাযিয়া অশ্বে আরোহণ করিতেন তখন তিনি তাহার বাহুর নীচে নিজের হাত রাখিতেন এবং তাহাকে অশ্বে বসাইয়া দিতেন।[৩] সুলতান রাযিয়া পর্দা ত্যাগ করেন এবং পুরুষের পোশাক পরিধান করিতেন। তিনি কবা (কোট) গায়ে দিতেন আর কুলাহ (চুঙ্গওয়ালা টুপি) মাথায় দিতেন আর সিংহাসনে বসিতেন এবং প্রকাশ্য দরবার করিতেন।

আঃ হিঃ ৬৩৭ সনে লাহোরের গভর্ণর মালিক ইযযুদ্দীন আবার আনুগত্যের পথ হইতে সরিয়া যান এবং শত্রুতার ভিত্তি স্থাপন করেন। সুলতান রাযিয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন; আর তিনি আন্তরিক ব্যবহার করেন এবং তাহার একজন অনুচরে পরিণত হন। সুলতান রাযিয়া মালিক করাকাশের অধীনস্থ মুলতান প্রদেশটিও মালিক ইযযুদ্দীনকে প্রদান করেন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। এই বৎসরেই তিনি এক বিশাল বাহিনীসহ তাবারিন্দাহ গমন করেন। পথিমধ্যে তুর্কি আমীরগণ তাহাকে আক্রমণ করেন এবং জামালুদ্দীন ইয়াকুবকে হত্যা করেন। তাহাকে আমীর-উল-ওমরা

১. তাহাকে হাসান এবং হুসেন উভয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। মেজর রাভার্টীর মতে শেষোক্ত নামটিই শুদ্ধ। তিনি ছিলেন আলী ঘুরীর পুত্র এবং মুঘলদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তিনি ঘুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

২. এই গ্রন্থের লেখকের অনুসরণে ফিরিশতা তাহাকে আমীর-উল-ওমরায় পরিণত করিয়াছেন। মেজর রাভার্টী বলেন যে আমীর-উল-ওমরা পদটি আকবরের সময় হইতে আরম্ভ হয়। সুলতান রাযিয়ার সময়ে এই পদের অস্তিত্ব ছিল না। যিয়াউদ্দীন জুবায়দীকে কিন্তু মালিক-উল-ওমরা উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

৩. সুলতান রাযিয়া এবং জামালুদ্দীন ইয়াকুতের মধ্যের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবকাত-ই-নাসিরী তাহাকে অশ্বে বা হস্তীতে আরোহণ করিতে জামালুদ্দীন ইয়াকুত কোন সাহায্য করিতেন এরূপ কোন উল্লেখ নাই। তবকাত-ই-আকবরীর অনুসরণ করিয়া ফিরিশতা এবং বদাওনী তাদের মধ্যে অন্তরূপ সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। বদাওনী বলেন যে সুলতান রাযিয়া অশ্ব বা হস্তীতে আরোহণ করিবার সময় জামালুদ্দীন ইয়াকুতের উপর ভর দিতেন।

নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা সুলতান রাযিয়াকে তাবারিন্দাহ দুর্গে কারারুদ্ধ করেন। তাহারা সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্র মুইযযুদ্দীন বহরাম শাহকে সিংহাসনে বসান এবং দিল্লী দখল করেন। এই সময়ে তাবারিন্দাহর গভর্ণর মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন আলতুনিয়া নিকাহ[১] অনুষ্ঠান পালন করিয়া সুলতান রাযিয়াকে বিবাহ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একদল খোখর এবং জাট-এর ঐ সব অঞ্চলের সকল জমিদারগণকে সংগ্রহ করেন এবং কতিপয় আমীরকে তাহার দলে ভিড়ান এবং তৎপর আলতুনিয়া সেনাবাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতান মুইযযুদ্দীন বহরাম শাহ এক বিরাট বাহিনীসহ কনিষ্ঠতর মালিক তিগিনকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়; সুলতান রাযিয়া পরাজিত হন এবং পুনরায় তাবারিন্দাহ ফিরিয়া যান। কিছুকাল পর তিনি তাহার বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের একত্র করেন এবং নুতনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া এবং নূতন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি দৃঢ় সংকল্পের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সুলতান (মুইযযুদ্দীন) বহরাম শাহ কনিষ্ঠতর মালিক তিগিনকে বিরাট এক দল সৈন্যসহ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে এবং তাহাকে ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। উভয় বাহিনী কইথালের সন্নিকটে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। পুনরায রাযিয়া পরাজিত হন এবং তিনি আর আলতুনিয়া জমিদারদের হস্তে পতিত হন এবং নিহত হন; আর অন্য এক মতবাদ অনুযায়ী তাহাদিগকে বন্দী করা হয এবং বহরাম শাহের সম্মুখে আনয়ন করা হয় আর তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করেন। এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৬৩৭ সনের ২৫শে রবিউল আউয়াল তারিখে।[২]

সুলতান রাযিয়ার শাসনকাল তিন বৎসর ছয মাস ছয় দিন বিস্তৃত হইয়াছিল।

সুলতান মুইযযুদ্দীন বহরাম শাহ, সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্র

আঃ হিঃ ৬৩৭ সনের ২৮ই রমযান সোমবার সুলতান মুইযযুদ্দীন বহরাম শাহ সভাসদ, এক আমীর এবং মালিকগণের সম্মতিক্রমে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ

১. তবকাত-উল-মুলুক এবং অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে আছে যে মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন আলতুনিয়া রাযিয়াকে বলপূর্বক বিবাহ করেন।

২. এই পুস্তকে দেওয়া এই বিবরণের সঙ্গে, তবকাত-ই-নাসিরীর বিবরণের কিছুটা পার্থক্য আছে; তবকাত-ই-নাসিরী অনেক সমসাময়িককালের লিখিত বিবরণ বিধায় ঐ পুস্তকের বিবরণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী সুলতান মুইযযুদ্দীন বহরাম শাহ স্বয়ং সুলতান রাযিয়া এবং আলতুনিয়ার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করেন; আর শেষোক্তগণ পরাজিত হন আর তাহারা যখন কইথাল পৌছেন, তখন তাহাদের সঙ্গীয় সৈন্যগণ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়; আর সুলতান রাযিয়া এবং আলতুনিয়া হিন্দুদের হস্তে নিপতিত হন এবং শহীদ হন। তাহাদের এই পরাজয় ঘটে আঃ হিঃ ৬৩৮ সনের ২৪শে রবিউল আউয়াল আর সুলতান রাযিয়া এবং মালিক আলতুনিয়া ২৫শে রবিউল আউয়াল নিহত হন।

করেন। যেহেতু মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন[১] সাম্রাজ্যের উযির নিযাম-উল-মুলক মুহযযব উদ্দীনের সম্মতিক্রমে সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং সুলতান মুইযযুদ্দীনের ভগ্নীকে নিকাহ্ অনুষ্ঠান দ্বারা বিবাহ্ করেন, ইনি ইতিপূর্বে কাযি ইখতিয়ারুদ্দীনের নিকাহ্ করা স্ত্রী ছিলেন ; আর তিনি সর্বদা একটি বিশালকায় হস্তী তাহার প্রবেশ দ্বারে বাঁধিয়া রাখিতেন, যদিও ঐ কালে সুলতান ছাড়া আর কেহ এরূপ হস্তী রাখিতে পারিত না। এই সব ব্যাপারে সুলতানের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। শেষোক্ত জন কয়েকজন নৃশংস লোককে (ফিদা-ই-কে)[২] নির্দেশ দেন এবং তাহারা তাহাদের ছোরা দ্বারা মালিক ইখতিয়ারুদ্দীনকে হত্যা করে। তাহারা মুহযযব উদ্দীনের পাশে ও দুইটি আঘাত করে কিন্তু তিনি প্রাণ নিয়া পলায়ন করেন।

ইহার পর মালিক বদর উদ্দীন সুনকর রুমি আমীর হাজিব (গৃহাধ্যক্ষ) নিযুক্ত হন। তিনি প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের সকল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে মালিক বদরুদ্দীন সুনকর একদল অবাধ্য লোকের প্ররোচনায় বিচারকগণ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণের সঙ্গে এক বিপ্লব সংঘটনের পরিকল্পনা করেন। ১৭ই সফর[৩] সোমবার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের সকলে সদর-উদ-মুলক (প্রধান বিচারক) তাজুদ্দীন যিনি সাম্রাজ্যের সম্পাদক ছিলেন, এবং সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করেন। তারপর নিযাম-উল-মুলককে আনয়নের জন্য সদর-উল-মুলককে প্রেরণ করেন, যাহাতে তিনিও এই আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ সদর-উল-মুলক[৪] সুলতান মুইযযুদ্দীনকে এই ব্যাপার অবহিত করেন। তিনি সুলতানের বিশ্বাসভাজন একজন লোককে এক কোণায় লুকাইয়া রাখেন[৫] এবং নিজে নিযাম উল-মুলকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে

১. ইনি ছিলেন মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন আইতকিন। মুইযুদ্দীন বহরাম তরুণ বয়স্ক হওয়ার ফলে তাহাকে এক বৎসরের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

২. ফিদা অর্থ বিসর্জন। ফিদাই বলা হয় এমন লোককে যে তাহার প্রতি সমর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে।

৩. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ১৭ই তারিখ, একটিতে আছে ৭ তারিখ, তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে ১৭ই তারিখ।

৪. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী নিযাম-উল-মুলকই সুলতানকে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ দেন। ইহা সম্ভাপর নয় যে সদর-উল-মুলক সুলতানকে সংবাদ দিবেন, বিশেষ করিয়া যখন ষড়যন্ত্র তাহার গৃহেই হইতেছে। ফিরিশ্‌তা তবকাত-ই-আকবরীর অনুসরণ করিয়াছেন।

৫. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী প্রধান বিচারক (সদর-উল-মুলক) যখন আগমন করেন তখন উযির নিযাম-উল-মুলকের নিকট সুলতানের বিশ্বাসভাজন একজন লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তাহাকে লুকাইয়া রাখেন আর সদর-উল-মুলক চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উযির ঐ লোকটিকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন।

এই সভার সংবাদ দেন ; এই সভার কার্যে জালালুদ্দীন কাশানী[১], কাযি কবিরুদ্দীন, শেখ মোহম্মদ সাওজী[২] এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। নিযাম-উল-মুলক এক অজুহাত দিয়া অন্য এক সময়ে যাইবেন বলিয়া জানান। সদর-উল-মুলক যে লোকটি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার মাধ্যমে সকল ঘটনা সুলতানের গোচরে আনেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ সভাস্থলে আগমন করেন ; ঐ স্থানে যে লোকজন ছিলেন তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন ; মালিক বদরুদ্দীন সুনকরকে বদাওন অভিমুখে প্রেরণ করেন ; আর কাযি জালালুদ্দীন কাশানীকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করেন ; আর কিছুকাল পরে যখন মালিক বদরুদ্দীন বদাওন হইতে দরবারে আগমন করেন সুলতান তাহাকে এবং মালিক তাজুদ্দীন মুন্সিকে[৩] ফাঁসি দিবার নির্দেশ দেন। তিনি বারহরাহ[৪] শহরের কাযি। কাযি শামসুদ্দীনকেও তিনি হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দেন। ইহার ফলে লোকদের মধ্যে অত্যন্ত ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়।

এই সব ঘটনাবলীর মধ্যে, আঃ হিঃ ৬৩৯ সনের জমাদি-উল আউয়াল সোমবার চেঙ্গিস খানের মুঘল বাহিনী লাহোর আক্রমণ করিয়া শহরটি অবরোধ করে। লাহোরের গভর্ণর মালিক করকাশ দেখিলেন যে শহরের লোকেরা তাহাকে সাহায্য করিবে না। তিনি মধ্য রাত্রিতে শহর হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। চেঙ্গিস খানের অগ্রগামীদের নিষ্ঠুরতার ফলে লাহোর শহরটি ধ্বংস এবং জনশূন্য হইয়া যায় আর অসংখ্য লোককে বন্দী করা হয়। এই সংবাদ যখন সুলতানের নিকট পৌঁছে তখন তিনি আমীরগণকে তাহার শ্বেত প্রাসাদে সমবেত করেন এবং তাহার প্রতি নূতন করিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং মুঘলদের ধ্বংসলীলায় বাধা দিবার জন্য সাম্রাজ্যের উযির নিযাম উল-মুলককে অন্যান্য আমীরগণসহ,

১. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কাশানী, একটিতে আছে কাশিয়ানী। তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে কাশানী। কাশান সমরকন্দের নিকটস্থ একটি গ্রামের নাম, আর কাশান ইরাকের একটি শহর।

২. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে আছে সাওজী, আর একটিতে আছে সাওচী। তবকাত-ই-নাসিরীতে লোকটির নাম বলা হইয়াছে শেখ মুহম্মদ-ই শামী (সিরিয়াবাসী)।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই নামটি এইরূপ আছে। তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে তাজুদ্দীন আলী মাশাভী।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে শহরটির নাম দেওয়া আছে মমহরাহ ; আর অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে বারহরাহ বা মরহরাহ। তবকাত-ই-নাসিরীতে স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে মিহির। তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে যে মিহিরের কাযি শামসুদ্দীনকে একটি হাতির পায়ের নীচে নিক্ষেপ করা হয় ; কিন্তু ইহা তিনি ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন বলিয়া নয় ; কাযি একজন দরবেশের উপর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, আর সেই দরবেশ এই সময় সুলতানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন এবং তাহার কথায়ই কাযিকে এইরূপ শাস্তি দেওয়া হয়।

লাহোর অভিমুখে প্রেরণ করেন।[১] সেনাবাহিনী যখন সুলতানপুর শহরের নিকটে বিতস্তা নদীর তীরে পৌঁছে, তখন নিযাম-উল-মুলক, যিনি মনে মনে সুলতানের প্রতি বিরূপ ছিলেন, আমীরগণের মন তাহার নিকট হইতে আলগা করিয়া দেন এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার ভিত্তি স্থাপন করিয়া সুলতানের নিকট এক নিবেদন প্রেরণ করেন যে তাহার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতক এক দল লোক প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে কোন কিছুই আশা করা যায় না। আর সুলতান স্বয়ং দেশের ঐ অঞ্চলে না আসিলে বিশৃঙ্খলা প্রশমিত করা যাইবে না। সুলতান তাহার সরলতার জন্য এবং তাহার প্রতি তিনি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার জন্য প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে ঐ লোকদের ফাঁসী হওয়া উচিত অথবা অন্যরূপ শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। আর উপযুক্ত সময়ে তাহারা তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি লাভ করিবে ; কিন্তু কয়েকদিনের জন্য তিনি যেন তাহাদের সঙ্গে তাল দিয়া চলেন। নিযাম-উল-মুলক এই ফরমানটি আমীরগণকে দেখান এবং ফলে তাহাদের সকলেই তাহার সঙ্গে যোগদান করেন।

সুলতান যখন এই সব ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন তখন তিনি আমীরগণকে আশ্বাস দিতে মহাসম্মানীয় শেখ-উল-ইসলাম, শেখ কুতবুদ্দীন বখতিয়ার উশি[২] কে প্রেরণ করেন ; কিন্তু তাহাদের কোন প্রকারেই সন্তুষ্ট করা গেল না। শেখ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সুলতান মুইযযুদ্দীনকে ধ্বংস করিবার জন্য নিযাম-উল মুলক এবং আমীরগণের সকলে দিল্লী আগমন করেন। তাহারা তাহাকে অবরোধ করেন আর প্রতিদিন সংঘর্ষ হইতে থাকে।

যেহেতু শহরের নাগরিকগণ আমীরগণের পক্ষে ছিলেন, ঐ বৎসরের ৮ই যিকাদাহ তারিখ শনিবারে তাহারা শহর দখল করে[৩] ; আর সুলতান মুইযযুদ্দীনকে কয়েকদিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া হত্যা করেন।

তাহার রাজত্বকাল ছিল দুই বৎসর এক মাস এবং পনর দিন।

১. দেখা যায় যে মুঘলদের প্রতিহত করিতে বা লাহোরের অবরোধ উত্তোলন করিতে বা সীমান্ত পাহারা দিতে (এই সবগুলি উদ্দেশ্যই উল্লেখ করা হইয়াছে) যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় তাহার সেনাপতি ছিলেন বুবের আমীর পুত্র মালিক কুতবুদ্দীন হুসেন, আর উযির শুধু ইহার অনুগমন করেন।

২. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী শেখ-উল-ইসলাম সৈয়দ কুতবুদ্দীনকেই সেনাবাহিনীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার উশি, যাহাকে আউলিয়ারূপে সম্মান করা হইত, আর যাহার নামানুসারে দিল্লীর কুতবুদ্দীন মিনারের নামকরণ করা হয়, এই ঘটনার ছয় বৎসর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। আরও দেখা যায় যে শেখ-উল-ইসলাম এই বিদ্রোহ প্রশমিত করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি ইহা আরও উত্তেজিত করিয়া তোলেন (তবকাত-ই-নাসিরী দেখুন)।

৩. শহরের চতুর্দিকে এবং মধ্যে ১৯ শাবান হইতে ৮ই যিকাদাহ পর্যন্ত সাতাত্তর দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে আর তবকাত-ই-নাসিরীর মতে, এই সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক নিহত হয় আর অন্যান্যরা

সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ

সুলতান বহরাম শাহকে যখন হত্যা করা হইল তখন মালিক ইযযুদ্দীন বলবন দিল্লীতে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন[১] এবং শহরে এক ঘোষণাপত্র জারি করিলেন আমীর ও মালিকগণ ইহা অনুমোদন করিলেন না ; আর তাহারা তৎক্ষণাৎ সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন এবং সুলতান জালালুদ্দীন এবং সুলতান রুকনুদ্দীনের পুত্র সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে যাহারা শ্বেত কেল্লায় কারারুদ্ধ ছিলেন, বাহির করিয়া আনেন ; আর তাহারা দিল্লীতে আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে আঃ হিঃ ৬৩৯ সনের যি-কাজা মাসে সিংহাসনে স্থাপন করেন। মালিক কুতবুদ্দীন হাসানকে সাম্রাজ্যের নায়েব বা প্রতিনিধি আর মুহযযবউদ্দীনকে নিযাম-উল মুলক পদমর্যাদায় সম্মানিত করেন। মালিক করাকাশ গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। যেহেতু নিযাম-উল-মুলক অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই একাই সাম্রাজ্যের রাশ ধরিতে চাহিয়াছিলেন[২], এই যুগের আমীর এবং ক্ষমতাশালী লোকেরা একত্র যোগদান করেন এবং আঃ হিঃ ৬৪০ সনের ২রা জমাদিউল আউয়াল বুধবার তাহাকে হত্যা করেন।

শ্লোক

ফুলের ন্যায় কাহারও ক্ষমতার গর্ব করিতে নাই
কারণ প্রবল বন্যা অচিরেই বাঁধ ভাসাইয়া দেয়।[৩]

সদর-উল মুলক নজমউদ্দীন আবু বকরকে উযির পদে নিযুক্ত করা হইল ; আর ঘিয়াসুদ্দীন বলবন[৪] ঐ সময়ে যাহার উপাধি ছিল উলুখ খান, গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

আহত হয় এবং শহরের চতুষ্পার্শ্বের সবগুলি স্থান ধ্বংস হয়। এই বিশৃঙ্খলা দীর্ঘস্থায়ী হইবার কারণ এই ছিল যে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ফারুখী নামে এক প্রধান আমীরের প্রভাবে ছিলেন আর তিনি কোনরূপ আপোষে সম্মত হইতে ছিলেন না। এই আপোষের শর্ত কি ছিল জানা যায় না।

১. তিনি প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবকাত-ই-নাসিরীর এক স্থানের টীকায় আছে যে তিনি রাজকীয় কসর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তাহার সার্বভৌমত্ব গ্রহণ সম্পর্কে এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। কিন্তু পুস্তকের পাঠে আছে যে রাজকীয় আবাসে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

২. অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা তিনি একা ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী তিনি কোন জিলাটি তাহার নিজের জায়গীররূপে দখল করেন ; ইতিপূর্বেই তিনি নৌবত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার বাসগৃহের প্রবেশ দ্বারে একটি একটি হস্তী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তুর্কী আমীরগণের নিকট হইতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া নেন। সম্ভবতঃ দিল্লী শহরের সম্মুখস্থ রাণীর সরোবরের প্রান্তরে অবস্থিত শিবিরের মধ্যেই তাহাকে হত্যা করা হয়।

৩. এই শ্লোকটির অর্থ সুস্পষ্ট নয় ; এইটিই সঠিক অনুবাদ।

৪. তবকাত-ই-নাসিরীতে দুইজন বলবনের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হইয়াছে ; নাগোর জায়গীরটির দে যা

নাগোর, সিন্ধু এবং আজমীর দেওয়া হইল জ্যেষ্ঠ ইযযুদ্দীন বলবনকে। বদাওন পরগণার কর্তৃত্ব দেওয়া হইল মালিক তাজুদ্দীনকে ; আর সাম্রাজ্যের সবগুলি পরগণাই আমীরগণের অবস্থা অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। আর সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করা হইল। আর লোকেরা তৃপ্ত ও সুখী হইল।

এই সময়ে মালিক ইযযুদ্দীন তুঘা খান[১] যিনি তাহার নিজের অঞ্চল লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন করিলেন। শরফ-উল মুলক আশারীকে সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট প্রেরণ করিলেন। সুলতান অযোধ্যার শাসনকর্তা কাযি জালালুদ্দীনের হস্তে ইযযুদ্দীন তুঘা খানের জন্য লক্ষণাবতীর দিকে একটি লাল চাদোয়া এবং একটি বিশেষ সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহার দুই চাচাকেও কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ; আর কান্‌জকু অঞ্চলটি মালিক জালালুদ্দীনের কর্তৃত্বে স্থাপন করিলেন ; আর বহরাইচ[২] এবং ইহার অধীনস্থ অঞ্চলটির দায়িত্বভার মালিক নাসিরুদ্দীনের হস্তে ন্যস্ত করিলেন ; আর তাহারা ঐ সব অঞ্চলে কালের মুখে তাহাদের পরোপকারীতার চিহ্ন রাখিয়া যান।

আঃ হিঃ ৬৪২ সনে মুঘল সেনাবাহিনী[৩] লক্ষণাবতী অঞ্চলে আগমন করিল। অনুমান করা হয় যে মুহম্মদ বখতিয়ার যে পথে তিব্বত ও খিতা অভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহারা ঐ পথেই আগমন করিয়াছিল। সুলতান আলাউদ্দীন, ইযযুদ্দীন তুখানকে সাহায্য করিবার জন্য বিরাট এক দল সৈন্যসহ তায়মুর খান এবং

হয় মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-কশালু খানকে, আর তিনি যে রাজবংশীয় তাহা বুঝাইতে তাহাকে একটি হস্তী রাখিবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি সুলতান আলতামশের জামাতা অথবা স্ত্রীর ভ্রাতা ছিলেন। আর তিনিই নিজেকে সুলতান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে নাগোর, মন্দোয়ার এবং আজমীর তাহাকে দেওয়া হয়। অপর বলবন হইলেন খিয়াসুদ্দীন বলবন-ই-খুর্দ, যিনি পরে উলুঘ খান উপাধি লাভ করেন।

১. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী তাহার সম্পূর্ণ নাম ছিল ইযযুদ্দীন তুঘরিল-ই-তুখান খান। কথিত জালালুদ্দীন অযোধ্যায় কাযি ছিলেন, হাকিম ছিলেন না।

২. মেজর রাভার্টী ইহাকে ভরাইচ লিখিয়াছেন। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি সুস্পষ্টরূপে বাহরাইচ আছে। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা ভরনজ ও ভরাইজ হইতে পারে। মালিক নাসিরুদ্দীনের বয়স তখন মাত্র পনর বৎসর, আর অপর জন আরও কম বয়স্ক ছিলেন।

৩. ইহা সম্ভবত ভুল। তবকাত ই-নাসিরীর লেখক এই সময়ে লক্ষণাবতী অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অথবা তারিখ-ই-মুবারক শাহী. রৌযাত-উস-সফা এবং যুবদাত-উত-তাওয়ারিখ ইত্যাদির লেখকগণ মুঘলগণ কর্তৃক লক্ষণাবতী আক্রমণের কোন উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ নিযামুদ্দীন মিনহাজের ইতিহাসের যে কপি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ভুল ছিল, যাহার ফলে জাজনগরের হিন্দুগণের বদলে চেঙ্গিস খানের বাহিনী হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে জাজনগরের (ত্রিপুরার) হিন্দুগণ লক্ষণাবতী আক্রমণ করিয়াছিল, মুঘলগণ নয়।

করা বেগকে[১] লক্ষণাবতী প্রেরণ করেন। মুঘলগণ পরাজিত হইবার পর তাহারা চলিয়া গেলে, ইযযুদ্দীন তুঘান আর মালিক করা বেগের মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হয়। সুলতান লক্ষণাবতী তায়মুর খানকে প্রদান করেন, আর তুঘান খান দিল্লীতে আসিয়া সুলতানের চাকুরীতে যোগ দেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে মুঘল বাহিনী উছের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। সুলতান তাহার আমীরগণকে আহ্বান করিলেন এবং অত্যন্ত দ্রুত উছ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন বিয়াহ্ নদীর তীরে পৌঁছিলেন মুঘল বাহিনী, যাহারা উছ অবরোধ করিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিয়া পলায়ন করে। সুলতান বিজয় ও সাফল্য লাভ করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার পর সুলতান আলাউদ্দীন ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষতার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যান এবং ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠেন।[২] ইহার ফলে সকল আমীর এবং ক্ষমতা-শালী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে এবং সকলে একত্র হইয়া সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের নিকট পত্র লিখেন এবং তলব করেন। এই সময়ে তিনি বহরাইচে ছিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ যখন দিল্লী পৌঁছেন, তখন আঃ হিঃ ৬৪৪ সনে[৩] আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে বন্দী এবং কারারুদ্ধ করা হয় আর কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাহার রাজত্বকাল ছিল চারি বৎসর এক মাস এবং এক দিন।

সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ

তিনি ছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশের কনিষ্ঠতম পুত্র এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু রাজা ছিলেন। আর পবিত্র ও বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। তিনি

১. এই স্থানের নামগুলির মধ্যেও কিছু গোলমাল আছে বলিয়া মনে হয়। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করা হইয়াছিল মালিক কমরউদ্দীন কিরান-ই-তমুর খানের অধীনে। টমাস (পাঠান রাজাগণ) ইহার নাম লিখিয়াছেন তমর খান। তবকাত-ই-নাসিরীতে করা বেগ নামীয় কোন মালিকের উল্লেখ নাই। মনে হয় নিযামুদ্দীন আহমদ কমরউদ্দীন কিরান-ই-তমুর খানকেই দুই জন মনে করিয়াছেন এবং তাহাদের নাম লিখিয়াছেন তারামুর খান এবং করা বেগ।

২. নিযামুদ্দীন আহমদ সুলতানের চরিত্রে সহসা এই পরিবর্তন ঘটিবার কোন কারণ দেওয়া হয় নাই। তবকাত-ই-নাসিরীর লেখক বলেন যে তিনি সেনাবাহিনীর কতিপয় নিকৃষ্ট লোকের প্রভাবে আসেন আর তিনি তাহার মালিকগণকে বন্দী ও হত্যা করিতে আরম্ভ করেন। আর তিনি লাম্পট্য, ভোগ বিলাস, মদ্য পানে আসক্ত হইয়া পড়েন আর শিকারে অতিরিক্ত মত্ত হইয়া উঠেন। টমাস বলেন যে শিবিরের জীবন যাত্রা আর সামরিক জঙ্গী তাহার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার লাভ করে ফলে তিনি বিপথে গমন করেন এবং অদমনীয় নিষ্ঠুরতা করিতে থাকেন। আলাউদ্দীন মাসুদ শাহের সিংহাসনচ্যুতি সম্পন্ন করিতে বিশেষ কোন রক্তপাতের প্রয়োজন হয় নাই। নাসিরুদ্দীনকে কি প্রকারে বহরাইচ হইতে দিল্লীতে আনয়ন করা হয়, তাহার বিবরণ তবকাত-ই-নাসিরীতে দেওয়া আছে।

৩. ২৩শে মহরম।

পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সমাদর করিতেন। আর বিজ্ঞ ও মহান ব্যক্তিদের পোষণ করিতেন। তাহার প্রশংসনীয় এবং পরোপকারী গুণাবলী তবকাত-ই-নাসিরীতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে। এই পুস্তকটি তাহার নামেই সংকলিত হয়। আঃ হিঃ ৬৪৪ সনে[১] তিনি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ের আমীর এবং মালিকগণ তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন; আর ধনী নির্ধন সকলকেই উপহার ও দান খয়রাত করা হয়। কবিগণ সাফল্যের কবিতা রচনা করেন এবং উপহার ও পুরস্কার লাভ করিয়া সুখী হন। কাযি মিনহাজ একটি দীর্ঘ গীতি কবিতা রচনা করেন এবং ইহা (সুলতানকে) উপহার দেন; নিম্নের শ্লোকগুলি ইহা হইতেই উদ্ধৃত করা হইল ঃ

মহা প্রভু যিনি দানশীলতায় হাতিম[২] আর শক্তিতে রুস্তম[৩]
তিনি নাসিরুদ্দুনিয়া ওয়া দিন মাহমুদ, আলতামশের পুত্র
ঐ পৃথিবীর অধিপতি; যাহার প্রাসাদের চূড়া হইত, আকাশের ছাদ
উচ্চতা আর আড়ম্বরে, নীচু বলা যাইতে পারে।[৪]
মুদ্রা! তাহার শুভ উপাধি দ্বারা অলংকৃত হইয়াছে;
মোনাজাত! তাহার নাম দ্বারা ধন্য হইয়াছে।

উযির পদে মালিক ঘিয়াসুদ্দীন বলবনকে নিযুক্ত করা হইল। তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস এবং তাহার (সুলতানের) পিতার জামাতা।[৫] তাহাকে উলুঘ খান উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয় এবং তাহাকে একটি চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ প্রদান করা হয় আর সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার তাহার পরিণত বিচার বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করা হয়। তাহারা বলে যে উলুঘ খানের নিকট শাসনকার্যের দায়িত্বভার অর্পণ

১. যে দিন আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে কারারুদ্ধ করা হয়, ঐ দিনেই অর্থাৎ ২৩শে মহরম তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।
২. হাতিম তাই-এর দানশীলতা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।
৩. প্রাচীন পারস্যের জাতীয় বীর।
৪. এই পংক্তিটির একটি অংশের পাঠ অন্য পাণ্ডুলিপিতে ভিন্নরূপ আছে। কিন্তু তাহার অর্থ বোধগম্য নয়।
৫. মেজর রাভার্টীর মতে ইহা ভুল। তাহার মতে ইযযাদ্দীন বলবন-ই-কশলু খানই সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশের জামাতা অথবা স্ত্রীর ভ্রাতা ছিলেন, ঘিয়াসুদ্দীন বলবন নহে। সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে যখন ঘিয়াসুদ্দীন বলবনকে গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়, তখন নিযামুদ্দীন বলিয়াছেন যে তাহার উলুঘ খান উপাধি ছিল। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, সে সময় তাহাকে এই উপাধি দেওয়া হয় নাই। সুলতান নাসিরুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের সময়েও তাহাকে এই উপাধি দেওয়া হয় নাই। তিন বৎসর পরে আঃ হিঃ ৬৪৭ সনে তাহাকে এই উপাধি দেওয়া হয়।

করিবার সময় (সুলতান) বলেন, "আমি আপনাকে আমার নায়েব নিযুক্ত করিতেছি এবং সাম্রাজ্যের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণভার আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি। এমন কোন কিছু করিবেন না, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার নিকট যাহার আপনি জবাবদিহী করিতে পারিবেন না এবং আমাকে এবং আপনাকে যাহার জন্য অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইতে হয়।" মালিক বলবন উলুঘ খান এমনভাবে নায়েবের শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন যে শাসন সম্পর্কিত সবকিছুই তাহার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়া পড়িল এবং কোন রাষ্ট্রীয় কার্যেই অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা রহিল না।

তাহার সিংহাসনে আরোহণের বৎসরের রজব মাসে সুলতান নাসিরুদ্দীন তাহার সেনাবাহিনী সহ মুলতান[১], অভিমুখে অগ্রসর হন এবং যি কাজা মাসের প্রথম তারিখে তিনি লাহোরের নদী (ইরাবতী) অতিক্রম করেন এবং উলুঘ খানকে সেনা-বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে জুদ পার্বত্য অঞ্চলে এবং নন্দনার জেলা সমূহকে প্রেরণ করেন আর তিনি স্বয়ং সিন্ধু[২] নদীর তীরে দশ দিন অপেক্ষা করেন। উলুঘ খান জুদ পর্বতমালা এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল লুঠতরাজ ও বিধ্বস্ত করেন এবং খোখরগণ এবং ঐ স্থানের অন্যান্য দুর্দান্ত প্রকৃতির অধিবাসীদের নিহত[৩] করেন। আর তৎপর সুলতানের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। শেষোক্ত জন তখন পশুর খাদ্যের অভাবে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।[৪]

আঃ হিঃ ৬৪৫ সনের ২রা শাবান তারিখে সুলতান দোয়াব[৫] অভিমুখে অগ্রসর হন আর ঐ বৎসরেই ১০ই যিকাজাহ তারিখে তিনি করাহ[৬] অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তথায় উলুঘ খানকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন আর শেষোক্ত জন সম্মুখে

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে মুলতান. কিন্তু তবকাত-ই-নাসিরীর দুইটি ছাড়া আর সবগুলি পাণ্ডু-লিপিতেই আছে বলিয়ান ; ঐ সময়ে সিন্ধ সাগর দোয়াবের উপর দিকের পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত্য এলাকাটি এই নামে পরিচিত ছিল।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই এইরূপ দেওয়া আছে, কিন্তু তবকাত-ই-নাসিরীর মতে সুলতান সুধরাহ বা সুধরা (চন্দ্রভাগা নদীর এক অংশের নাম) নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন।

৩. ইহার কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই, সম্ভবতঃ তাহারা বিদ্রোহ করিয়া থাকিবে।

৪. তবকাত-ই-আকবরী অনুযায়ী উলুঘ খানকেই তাহার সৈন্যদের রসদের অভাব হওয়ায় বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, সুলতানকে নয়।

৫. তবকাত ই-নাসিরী অনুযায়ী কান্যকুব্জ অঞ্চলে তলসন্দহ নামে একটি অতি শক্তিশালী দুর্গ সর্বপ্রথমে দখল করা হয়।

৬. ঐ স্থানের জায়গীরদার মালিক ইখতিয়ারুদ্দীন করা কুশ খা-নে-ই আইতকিন পূর্ব বৎসর নিহত হইবার ফলেই সম্ভবতঃ করাহ অভিযানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু কে বা কাহারা এবং কেন তাহাকে হত্যা করিয়াছিল তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় নাই।

অগ্রসর হন এবং দলাকি এবং মলকি[১] নামক স্থানসমূহ লুঠতরাজ ও বিধ্বস্ত করেন, এবং সুলতানের খেদমতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৬৪৬ সনের শাবান মাসের ৬ তারিখে সুলতান রণথম্ভোর অভিমুখে অগ্রসর হন; আর ঐ দুর্গের সন্নিকটস্থ অবাধ্য লোকদিগকে শাস্তি দান করেন এবং তৎপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এই বৎসরেই কাযি ইমাদুদ্দীন শফুরখানির[২] বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়; এবং তাহাকে তাহার পদ হইতে বরখাস্ত করা হয় আর তৎপর ইমাদুদ্দীন রায়হানের প্রচেষ্টায় তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করা হয়।

আঃ হিঃ ৬৪৭ সনে[৩] সুলতান উলুঘ খানের কন্যাকে বিয়াহ করেন আর পর বৎসর (আঃ হিঃ ৬৪৮ সনে) তিনি তাহার সেনাবাহিনীসহ মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন এবং বিয়াহ নদীর তীরে, শের খান সাম্রাজ্যের বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেন। এই বৎসরেরই ৬ই রবিউল আউয়াল মুলতান পৌঁছেন, আর কয়েকদিন পর মালিক ইযযুদ্দীনকে উছ অভিমুখে গমনের অনুমতি দান করা হয় আর সুলতান স্বয়ং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।[৪]

---

১. এই পংক্তিটি সুস্পষ্ট নয়। তবকাত-ই নাসিরীতে এই নামগুলি সম্বন্ধে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে: এই স্থানে দলকি এবং মলকির মধ্যে একটি , দেওয়া আছে কিন্তু আর এক স্থানে ইহাদের মধ্যে কোন , নাই। ফলে প্রথম স্থানে দলকি ও মলকি দ্বারা কোন একটি অঞ্চল বুঝাইতেছে, আর দ্বিতীয় স্থানে দলকি মলকি একজন রাজা। শুধু এইটুকু বুঝা যায় যে এই রাজার রাজ্য জুন বা জমুণ নদীর সন্নিকটে কালঞ্জর ও কাবাহ এর মধ্যে অবস্থিত, আর তাহার অসংখ্য অনুচর এবং প্রচুর সম্পদ ছিল, আর দেশটি অত্যন্ত দুর্গম আর ঐ সময় পর্যন্ত কোন মুসলমান বাহিনী ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে নাই।

২. তবকাত-ই-নাসিরীতে কাযির নাম দেওয়া হইয়াছে জামালুদ্দীন শফুরখানি। তবকাত-ই-আকবরীতে যে লোকের চেষ্টায় তাহার প্রাণদণ্ড হয়, তাহার নামটিই ভুলবশতঃ কাযির নাম রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ছিল তাহার উল্লেখ নাই।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে সন দেওয়া আছে ৬৪০, আর দুইটি পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া আছে ৬৪৮ আঃ হিঃ সঠিক সন হইল আঃ হিঃ ৬৪৭ সন।

৪. আঃ হিঃ ৬৪৮ সনের ঘটনাবলীর তবকাত-ই-নাসিরীতে ভিন্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহার লেখক বলেন যে তিনি মুলতান গমন করেন আর তথায় ১১ই সফর, তিনি মালিক শের খান-ই-সুনকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপর তিনি মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৬ই রবিউল আউয়াল তথায় পৌঁছেন, তথায় তিনি মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-কশলু খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর লেখক দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন আর মালিক ইযযুদ্দীন উছে প্রত্যাবর্তন করেন। মৌলানা মিনহাজুদ্দীনের এই ভ্রমণ, তবকাত-ই-আকবরীর লেখক নিযামুদ্দীন আহমদ ঐ গ্রন্থের পাঠ হইতে ভুলবশতঃ সুলতানের অভিযান রূপে গণ্য করেন, আর ইহারই ফলে এই পুস্তকে এই ঘটনাবলী ভুল লেখা হইয়াছে। ফিরিশতা এবং অন্যান্য লেখকগণ তবকাত-ই-আকবরী অনুসরণ করিবার ফলে এই ভুল তাহাদের গ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে।

আঃ হিঃ ৬৪৯ সনে নাগোরের জায়গীরদার মালিক ইযযুদ্দীন বলবন আনুগত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হন এবং অবাধ্য আচরণ করিতে থাকেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে নাগোরের অভিমুখে যাত্রা করেন। মালিক ইযযুদ্দীন তাহাকে প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং রাজকীয় দরবারে যোগদান করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন তখন বিজয় ও সাফল্য সহকারে দিল্লী আগমন করেন। এই বৎসরেই ৫ই শাবান[১] তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ গোয়ালিয়র, চন্দেরী এবং মালব অভিমুখে গমন করেন; আর ঐ অঞ্চলের রাজা জাহর দেও[২] তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক বাহিনীসহ অগ্রসর হন; কিন্তু এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হন; আর নিরওয়ার দুর্গটি বলপূর্বক দখল করা হয়; আর সুলতান বিজয় ও সুখ্যাতির সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধে উলুঘ খান বলবন বহু সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। ইহার পর উছ বিজয়ের উদ্দেশ্যে শের খান মুলতান হইতে যাত্রা করেন আর মালিক ইযযুদ্দীন বলবনও নাগোর হইতে উছে গমন করেন এবং উছের দুর্গটি শের খানের নিকট অর্পণ করিয়া সুলতানের নিকট গমন করিয়া তাহার খেদমতে নিযুক্ত হন; আর বদাওন অঞ্চলটি তাহাকে জায়গীর রূপে দেওয়া হয়।[৩]

অতঃপর আঃ হিঃ ৬৫০ সনের ২২শে শাওয়াল সুলতান লাহোর হইয়া উছ ও মুলতান অভিমুখে যাত্রা করেন।[৪] এই অভিযানে, কুতলুঘ খান সনসাওয়ান অঞ্চল হইতে আর কাশলু খান ইযযুদ্দীন বদাওন হইতে তাহাদের সেনাদলসহ সুলতানের নিকট আগমন করেন[৫] এবং বিয়াহ নদীর তীর পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গমন করেন।

১. তবকাত-ই নাসিরী অনুযায়ী এই অভিযানে ২৫ শাবান মঙ্গলবার যাত্রা করা হয়।

২. এই রাজার নাম সম্বন্ধে তবকাত-ই-নাসিরীর ইংরাজী অনুবাদে দীর্ঘ টীকা দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন লেখক নামটি চাহর বা জাহর, অচর বা দেও লিখিয়াছে। মেজর রাভার্টী বলেন যে তবকাত-ই-আকবরীতে নামটি অচর দেওয়া আছে। কিন্তু তবকাত-ই-আকবরীতে এই নামটি দেওয়া আছে জাহর দেও। নিরওয়ার বা নুরওয়ার ভূপাল হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। টডের মতানুযায়ী, কচওয়াহা রাজপুতগণ কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয় এবং ইহা রাজাগণের আবাসস্থল ছিল এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ ইহা দখল করিতে থাকে।

৩. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী এই ঘটনাগুলি গোয়ালিয়র, চন্দেরী এবং মালব অভিযানের পূর্বে ঘটে, পরে নহে।

৪. মেজর রাভার্টী অনুমান করেন যে লাহোর হইয়া উছ ও মুলতান গমনের উদ্দেশ্য ছিল উলুঘ খানের আত্মীয় শের খানকে এই স্থানগুলি হইতে বঞ্চিত করা; আর উলুঘ খানের বিরুদ্ধে রায়হানী ষড়যন্ত্রের ইহাই হইল সূচনা।

৫. ইহা জিয়ানা বা বিয়ানা হইবে। ফিরিশতা তবকাত-ই-আকবরীর অনুকরণে এইরূপ ভুলই লিখিয়াছেন।

আঃ হিঃ ৬৫১ সনে[১] উলুঘ খান তাহার জায়গীর শিবালিক এবং হানসী গমনের অনুমতি লাভ করেন। আইনুল মুলক মুহম্মদ জুনায়দীকে উযির নিযুক্ত করা হয়; মালিক ইযযুদ্দীন কাশলু খান[২] গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন আর খান-ই-আযমের ভ্রাতা আয়বককে জায়গীররূপে দেওয়া হয় করাহ। ইমাদুদ্দীন রায়হান ভকিল-ই-দরবার নিযুক্ত হইলেন; আর সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই বৎসরেই শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে পুনরায় তিনি দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন এবং বিয়াহ নদীর সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথা হইতে তিনি তাহার সেনাবাহিনীকে সম্মুখে প্রেরণ করিলেন এবং তবরহিন্দাহ, উছ এবং মুলতান অধিকার করিলেন। এই স্থানগুলি শের খানের দখলে ছিল (কিন্তু তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয়) যখন তিনি সিন্ধুর লোকদের নিকট পরাজিত হন; এবং তুর্কীস্তান চলিয়া যান। এই স্থানগুলি তিনি আরসলান খানের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেন[৩] এবং তৎপর (দিল্লী) প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৬৫২ সনে সুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ বিজনৌর[৪] পর্বত-মালার পাদদেশে গমন করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করেন। অতঃপর তিনি

১. তবকাত-ই-নাসিরী হইতে জানা যায় যে আঃ হিঃ ৬৫০ সনের শেষ দিকে ইমাদুদ্দীন রায়হান গোপনে সুলতানের এবং মালিকদের মন উলুঘ খান-ই-আযমের প্রতি বিরূপ করিয়া তোলেন। আর তদনুযায়ী পর বৎসরের প্রথম দিকেই উলুঘ খানকে তাহার জায়গীরে পাঠাইয়া দেওয়া হয় আর তাহার বিরোধী দলীয় লোকেরা রাজধানীতে উচ্চ পদসমূহে নিযুক্ত হন।

২. তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী সরফুদ্দীন আয়বক-ই-কশলী খান, খান-ই-আযমের ভ্রাতা ছিলেন এবং গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আর অনুষ্ঠানসমূহের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। আর তাহাকেই কারাহ জায়গীর দেওয়া হয় এবং তথায় প্রেরণ করা হয়। তবকাত-ই-আকবরীতে তাহাকে দুই ভাগ করা হইয়াছে; তাহার এক ভাগকে ইযযুদ্দীন কশলু খান নাম দিয়া গৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছে, আর অপর ভাগকে কারাহ প্রেরণ করা হইয়াছে।

৩. দেখা যায় যে তাবারহিন্দাহ, উছ এবং মুলতান মালিক শের খানের অনুগামীদের দখলে ছিল; আর সুলতান ঐ সব লোকের নিকট হইতে এই স্থানগুলি নিয়া নেন এবং এইগুলি মালিক তাজুদ্দীন আরসলান খান-ই-মনজর, যাহাকে এই পুস্তকে আরসলান খান বলা হইয়াছে, এর নিকট প্রদান করেন। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সুলতান এই স্থানটি অধিকার করিলেন বা দখল করিলেন সেরূপ বলা চলে না। শের খান কাহারও হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাও সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। তবকাত-ই-নাসিরীর কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে যে তিনি সিন্ধু নদীর তীরে পরাজিত হন। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে যে তিনি সিন্ধুর কাফিরগণ কর্তৃক পরাজিত হন।

৪. মেজর রাভার্টী বলেন যে, এই অভিযানের বিবরণে তবকাত-ই-আকবরীর লেখক ভূগোল সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দুইটি অভিযানকে একটি অভিযানে পরিণত করিয়াছেন। যদিও তবকাত-ই-নাসিরীতে দুইটি অভিযানের কথাই লিখা আছে, মনে হয় দুইটি অভিযান ছিল না, অভিযান একটি ছিল। কারণ সুলতান বৎসরের শুরুতে দিল্লী ত্যাগ করেন আর ১৯ সফর বদাওন পৌঁছেন. এই ছয় সপ্তাহের সামান্য অধিক সময়ের মধ্যে দুইটি অভিযান করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিযামউদ্দীন আহমদ কঠিহারের স্থলে কৈথার লিখিয়াছেন এবং ভুলবশতঃ কুহরাম লিখিয়াছেন।

মিয়ানপুরে গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন এবং পর্বতমালার ধার ধরিয়া রহর নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। আর আঃ হিঃ ৬৫২ সনের সফর মাসের ১৫ তারিখ রবিবারে বাকলাহ মানিতে মালিক ইযযুদ্দীন রাযি-উল-মুলক যখন মাতাল অবস্থায় ছিলেন[১] তখন ঐ স্থানের জমিদারগণ কর্তৃক শহীদ হন। তাহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুলতান কৈথাল ও কুহরাম অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ঐ অঞ্চলের দুর্দান্ত লোকদের শাস্তি দিয়া বদাওন অভিমুখে গমন করেন। তিনি কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন এবং তৎপর দিল্লী আগমন করেন। তিনি তথায় ভোগ-বিলাসে ও আনন্দ-উপভোগে পাঁচ মাস কাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর সংবাদ আসে যে কতিপয় আমীর যেমন আরস্‌লান খান এবং বুত খান আয়বক খিতাই এবং উলুখ খান-ই-আযম মালিক জালালুদ্দীনের সহযোগিতায় বিদ্রোহ করিয়াছেন।

সুলতান দিল্লী হইতে তাবারহিন্দাহ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি যখন হানসীর সন্নিকটে উপস্থিত হন, উপরোল্লিখিত আমীরগণও তখন কুহরাম এবং কৈথাল অভিমুখে অগ্রসর হন।[২] এই স্থানে কতিপয় লোক মধ্যস্থ করেন এবং শান্তি স্থাপিত হয়; আর তাহারা (বিদ্রোহী আমীরগণ) অঙ্গীকারাবদ্ধ হন এবং শপথ গ্রহণ করেন এবং সুলতানের চাকুরী করেন। সুলতান লাহোর অঞ্চলের শাসনভার মালিক জালালুদ্দীনের নিকট সমর্পণ করেন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিঃ ৬৫৩ সনে সুলতান তাহার মাতা মালকা-ই-জাহানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, ইনি (সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশের ইন্তেকালের পর) কুতলুখ খানকে বিবাহ করিয়াছিলেন[৩] আর অযোধ্যা প্রদেশটি তাহার জায়গীররূপে শেষোক্ত জনকে দেওয়া হইল। তাহাকে ঐ স্থানের অভিমুখে গমনের অনুমতি দেওয়া হইল; অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু তাহাকে ঐ স্থান হইতে অপসারণ করা হয় এবং বহরাইচ প্রেরণ করা হয়। তিনি

---

১. ইহা ভুলবশতঃ বলা হইয়াছে। মালিক ইযযুদ্দীন রাযি-উল-মুলক ছিলেন দুরমুশের অধিবাসী অথবা তাহার পরিবার ঐ স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল। দুরমশি শব্দটিকে তবকাত-ই-আকবরীর লেখক দরমস্তি বা "মাতাল অবস্থায়" পাঠ করিয়াছেন, আর ফিরিশতা তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

২. ঠিক কি হইয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না; তবে মনে হয় যে সামান্য খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল আর সুলতানের শিবিরে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। অতঃপর সুলতান হাসসী অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন আর মালিক জালালুদ্দীন মাসুদ শাহ, তাহার ভ্রাতা এবং উলুখ খান-ই-আযম-এর অন্যান্য মালিকগণ কৈথাল অভিমুখে গমন করেন। অতঃপর গোলযোগ দূর হয় এবং শান্তি স্থাপন করা হয়।

৩. সম্ভবতঃ এই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু গোপনীয়তা রক্ষা করা হইয়াছিল।

তথা হইতে পলায়ন করেন এবং সন্তরের[১] নিকট গমন করেন। মালিক ইযযুদ্দীন কশলু খান এবং অন্যান্য কতিপয় আমীর তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং এক বিদ্রোহের ভিত্তি স্থাপন করেন। সুলতান এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ উলুঘ খান-ই বলবনকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।[২] উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, দিল্লীতে কতিপয় লোক, যেমন শেখ-উল-ইসলাম, সৈয়দ কুতবুদ্দীন এবং কাযি শামসুদ্দীন বহরাইচী, কুতলুঘ খান এবং কাশলু খানকে রাজধানীতে আগমন করিয়া তাহা দখল করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আর তাহারা গোপনে নাগরিকগণকে তাহাদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উলুঘ খান-ই-বলবন এই ঘটনা জানিতে পারেন এবং প্রকৃত ঘটনা সুলতানের নিকট নিবেদন করেন এবং প্রস্তাব করেন যে তিনি যেন এই লোকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। সুলতান প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করেন; আর ষড়যন্ত্রকারী আমীরগণকে তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে চলিয়া যাইতে হয়। কুতলুঘ খান এবং মালিক কশলু খান যখন সীমানা হইতে দুই দিনে এক শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লীতে পৌঁছিলেন, তখন তাহারা ঐ স্থানে তাহাদের সমর্থকগণকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তাহারাও ছত্রভঙ্গ হইয়া যান। উলুঘ খান সুলতানের সাহায্যে তাহাদের পর পরই আসিয়া পৌঁছেন।

১. তবকাত-ই-নাসিরীতে দেখা যায় যে, কুতলুঘ খান অযোধ্যা প্রদেশ ত্যাগ করিতে অসম্মত হন; আর তাহাকে বহিষ্কার করিবার জন্য মালিক বাক তামুরকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করা হয়। উভয় বাহিনী বদাওনের সন্নিকটে পরস্পরের সম্মুখীন হয় আর মালিক বাক তামুর নিহত হন। অতঃপর সুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। কুতলুঘ খান তাহার সম্মুখে পলায়ন করেন। অতঃপর সুলতান কালাইর নামক স্থানের অভিমুখে গমন করেন এবং উলুঘ খানকে কুতলুঘ খানের পশ্চাদপসরণের জন্য প্রেরণ করেন। কিছুকাল পর উলুঘ খান বহু লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারসহ প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলতানও তিনি দিল্লী ফিরিয়া যান। অতঃপর কুতলুঘ খান কারা ও মানিকপুর অভিমুখে গমন করেন। কিন্তু ঐ স্থানের জায়গীরদার কর্তৃক পরাজিত হন। তৎপর তিনি সন্তর অভিমুখে চলিয়া যান।

২. কুতলুঘ খান বিয়াহ ও লাহোরের উদ্দেশ্যে সন্তর গমন করেন। এই স্থানে হিন্দু জমিদারগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু ঐ স্থানে একদল সৈন্যসহ উলুঘ খানকে প্রেরণ করা হয়। কিছু যুদ্ধের পর তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন, অতঃপর ইযযুদ্দীন কশলু খান এবং অন্যান্যগণ কুতলুঘ খানের সঙ্গে যোগদান করে; ফলে উলুঘ খানকে একদল সৈন্যসহ পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। বিদ্রোহী আমীরগণ তখন সন্তর শহরে অবস্থিত অসন্তুষ্ট সভাসদগণের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং অবিরাম পথ চলিয়া অতর্কিতে শহর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। উলুঘ খান কিন্তু এইসবের সংবাদ সুলতানকে জানান। শেষোক্ত জন তখন অসন্তুষ্ট আমীরগণকে রাজধানী ত্যাগ করিয়া তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে গমনের নির্দেশ দান করেন আর শহর রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আমীরগণ ও পরিবারের প্রধানগণকে দুর্গ প্রাকারে পাহারায় নিযুক্ত করেন। বিয়ানার জায়গীরদার মালিক ফখরুদ্দীন সুনকর রুমি একদল সৈন্যসহ রাজধানীতে আগমন করেন এবং তাহা রক্ষার কাজে সাহায্য করেন।

এই বৎসরের শেষ দিকে মুঘল বাহিনী উছ ও মুলতানের সন্নিকটে আগমন করে, আর সুলতান তাহাদের প্রতিহত করিবার জন্য অগ্রসর হন কিন্তু তাহারা যুদ্ধ না করিয়াই চলিয়া যায় এবং সুলতানও প্রত্যাবর্তন করেন।[১] অতঃপর তিনি মালিক জালালুদ্দীন জানিকে[২] একটি অঙ্গাবরণ প্রদান করিয়া সম্মানীত করেন এবং তাহাকে লক্ষণাবতী অভিমুখে প্রেরণ করেন। আঃ হিঃ ৬৫৭ সনে লক্ষণাবতী হইতে দুইটি হস্তী এবং কতিপয় মণি-মাণিক্য আর প্রচুর বহুমূল্য বস্ত্র আসিয়া পৌঁছে। মালিক ইযযুদ্দীন কশলু খান, যাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বৎসরের রজব মাসে ইন্তেকাল করেন।

তাহারা বলে যে সুলতান নাসিরুদ্দীন প্রতি বৎসর কোরানের দুইটি কপি নকল করিতেন[৩] আর এইগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাহার ভরণ-পোষণে ব্যয় করিতেন। একবার এইরূপ ঘটে যে সুলতানের লিখিত কোরানের একটি কপি একজন আমীর উচ্চ মূল্যে (সাধারণতঃ ইহার যা মূল্য হওয়া উচিত তাহার চেয়ে অধিক মূল্যে) ক্রয় করেন। সুলতান এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হন এবং নির্দেশ দেন যে অতঃপর তাহার লিখিত কোরানসমূহ নিয়মিত মূল্যে গোপনে বিক্রয় করিতে হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে সুলতানের একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কোন পরিচারিকা ছিল না। আর শেষোক্ত জন নিজ হাতে তাহাদের পাক করিতেন। একদিন তিনি তাহাকে বলিলেন যে সর্বদা রুটি প্রস্তুত করিতে করিতে তাহার হাতে ব্যথা হইয়া গিয়াছে। তিনি যদি তাহার জন্য একজন ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়া দেন তবে খুব ভাল হয়, আর সে রুটি প্রস্তুত করিতে পারিবে। প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেনঃ রাজকীয় কোষাগার আল্লার বান্দাদের (প্রজাদের); ইহা তাহার নিজের সম্পত্তি নয় যে তিনি তাহার জন্য (ইহার অর্থ দ্বারা) একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিবেন। তিনি যদি ধৈর্য ধরেন, তবে মহান আল্লাহতায়ালা পরলোকে ইহার জন্য তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন।

১. সুলতানের বাহিনী রাজধানীর দৃষ্টিসীমার বাহিরে গমন করে নাই। মুঘলগণ সীমান্তের জিলাসমূহ বিধ্বস্ত করে এবং তৎপর চলিয়া যায়।

২. অন্যত্র তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে জালালুদ্দীন কুলিচ খান, মালিক আলাউদ্দীন জানির পুত্র। তাহাকে সুলতান বিরোধী বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সুলতানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তৎপর তাহাকে লক্ষণাবতী জায়গীর দেওয়া হয়।

৩. সুলতান অতি সাধারণ ধরোয়া জীবন যাপন করিতেন এবং কোরান নকল করিতেন। ইবনে বতুতা তাহার দিল্লী পরিভ্রমণের সময় তাহার হস্তলিখনের নমুনা দেখিতে পান। টমাস বলেন যে তাহার চমৎকার হস্তলিখনেরই প্রভাবেই সম্ভবতঃ তাহার মুদ্রাসমূহের লিখন অতি সুলিখিত ও অতি চমৎকার হইয়াছিল।

শ্লোক

সজাগ চক্ষুর কাছে পৃথিবীটা একটি স্বপ্ন
জ্ঞানীগণ স্বপ্নে আসক্ত হয় না।

আঃ হিঃ ৬৬৩ সনে সুলতান অসুস্থ হইয়া পড়েন আর আঃ হিঃ ৬৬৪ সনের ১১ই জমাদিউল আউয়াল তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করেন। তিনি কোন সন্তানাদি রাখিয়া যান নাই। তাহার রাজত্বকাল উনিশ বৎসর তিন মাস ও কয়েকদিন স্থায়ী হইয়াছিল।

সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন বলবন

সুলতান নাসিরুদ্দীন ইন্তেকাল করিলে সকল আমীর ও মালিকগণ উলুঘ খান-ই-বলবনকে, যাহাকে বলবন-ই-খুর্দ বলা হইত, আঃ হিঃ ৬৬৪ সনে শ্বেত কেল্লাতে সাম্রাজ্যের সিংহাসন স্থাপন করিলেন; আর আমীর ও সাধারণ লোক সকলেরই আনুগত্য সিংহাসনের সঙ্গে বাঁধা হইয়া গেল। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন সুলতান শামসুদ্দীনের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। 'চল্লিশ জন ক্রীতদাস দলের তিনি ছিলেন একজন। সুলতান শামসুদ্দীনের চল্লিশ জন তুর্কী ক্রীতদাস ছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই এক এক জন আমীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, আর তাহাদের সকলে হেহালগানী (চল্লিশ জনের দলটা ভ্রাতৃত্ব) নামে পরিচিত ছিল। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন ছিলেন একজন জ্ঞানী, পরিণত বুদ্ধি এবং মর্যাদাবান সুলতান এবং তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। সর্বক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করিতেন।

শ্লোক

পৃথিবীর জ্ঞান যে কি অমূল্য সম্পদ
পৃথিবী যেন কখনও ইহা হইতে বঞ্চিত না হয়,
সেই লোকই দুনিয়ায় মাথা তুলিতে পারে
এই পৃথিবীতে যাহার জ্ঞান লাভ হয়।

তিনি সাম্রাজ্যের কোন কাজ কখনও বিজ্ঞ ও মহান ব্যক্তিগণ ছাড়া কাহারও উপর ন্যস্ত করিতেন না। আর কখনও নীচ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের শাসনকার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। তিনি কখনও কাহাকেও কোন পদে নিযুক্ত করিতেন না বা কাহাকেও কোন কাজের দায়িত্ব দিতেন না, যতক্ষণ না তাহার পূর্ব পরিচয়, সততা, সৎগুণ এবং ধর্মপরায়ণতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হন, আর তিনি

কোন লোকের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহার অনুসন্ধান করিতেন। কোন লোককে কোন পদে নিযুক্ত করিবার পরেও যদি তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রে অথবা যোগ্যতায় তিনি সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিতেন। রাজত্বের শেষ পর্যন্ত, যাহা বাইশ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তিনি কখনও কোন নীচ লোকের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেন নাই; আর কখনও কোন কৌতুককারী এবং ভাড়কে দরবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

তাহারা বলে যে ফখর আমানী নামে একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর সুলতানের চাকুরী করিয়াছিলেন। তিনি সুলতানের একজন প্রিয় পাত্রের নিকট যান এবং তাহার নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া অনুরোধ করেন এবং প্রচুর অর্থও দিতে চাহেন যদি তিনি সুলতানের সঙ্গে তাহার এক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। আর ইহাও জানান যে এই সাক্ষাতে তিনি সুলতানকে প্রচুর অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিবেন। ইহা যখন সুলতানের নিকট নিবেদন করা হয় তখন তিনি বলেন যে লোকটি বাজারের একজন আমীর আর তিনি যদি তাহার সঙ্গে আলাপ করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের সুলতানের প্রতি যে ভয়ভীতি আছে তাহা চলিয়া যাইবে; আর তাহার ক্ষমতা এবং আড়ম্বরের হানি হইবে। সুলতানের সকল বৈশিষ্ট্যই প্রশংসনীয় ছিল; আর ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতায় পূর্বের আর কোন সুলতানই তাহার সমকক্ষ ছিল না। কথিত আছে যে দেহরক্ষীদের প্রধান মালিক বকবক তাহার চাকুরীতে নিযুক্ত একজন ফরাশকে (গালিচা বিছানো এবং আসবাবপত্র সাজানোর কাজে নিযুক্ত ভৃত্য) একটি লাঠি দিয়া কয়েকবার আঘাত করেন আর এই আঘাতের ফলে লোকটি মারা যায়। এই মালিক বকবককে (সুলতানের নির্দেশে) এই অপরাধের প্রতিশোধরূপে পায়ের তলায় বেত দ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করা হয়। মালিক কিরান আলাই-এর পিতা এবং সুলতানের একজন প্রিয় ক্রীতদাস হায়বত খান মাতাল অবস্থায় একজন লোককে হত্যা করেন। নিহত লোকটির উত্তরাধিকারিগণ সুলতানের নিকট আসিয়া ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে। সুলতান নির্দেশ দেন যে হায়বত খানকে একটি লাঠি দ্বারা পাঁচশতটি ঘা দিতে হইবে; আর তাহার পর তাহাকে নিহত লোকটির বিধবার হস্তে সমর্পণ করা হইবে। লোকেরা ঐ মহিলার নিকট সুপারিশ করে এবং স্থির করে যে তাহাকে পঞ্চাশ সহস্র তংগা দেওয়া হইবে; আর এইরূপে ঐ মহিলার নিকট হইতে তাহাকে উদ্ধার করা হয়। ইহার পর হায়বত খান লজ্জায় আর মৃত্যু পর্যন্ত তার কখনও গৃহ হইতে বাহির হন নাই। অনুরূপভাবে প্রতিশোধের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য কতিপয় আমীরও

তাহাদের অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের জন্য শাস্তি ভোগ করে। হত্যাকারী আমীর কি মালিক আর নিহত ব্যক্তি দীনহীন হইলেও সুলতানের নিকট তাহাতে কিছু আসিত যাইত না। সুলতান ধার্মিক লোকদের সমাবেশে যোগদান করিতেন এবং ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন এবং আবেগের উচ্ছাসে কাঁদিয়া ফেলিতেন। ধর্মের অনুশাসন ও নিষেধাজ্ঞা তিনি বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিতেন। সাম্রাজ্যের রীতিনীতি আর শাসনকার্যের আইন কানুন, যেগুলি সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্রগণের রাজত্বকালে অকেজো এবং অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছিল, সেগুলি নুতন অনুমোদন ও নব অনুপ্রেরণা লাভ করিল ; আর সুলতান এমন ভয়ভীতির সঞ্চার করিলেন যে কাহারও আনুগত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইবার মত বোকামী করিবার সাহস হইল না। সুলতান নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতার নিয়মকানুন এমনভাবে প্রয়োগ করিতেন যে দেশের সকল লোকই তাহার নির্দেশ পালন করিত এবং তাহার হুকুমনামা পরিপূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে গ্রহণ করিত। মালিক এবং আমীরগণের অধিকাংশ, যাহারা সুলতান শামসুদ্দীনের ইন্তেকালের পর তাহার পুত্রগণের দুর্বলতার সুযোগে গোয়াতুর্মি এবং অবাধ্যতার মাথা তুলিয়াছিল, বিনয়ী এবং বাধ্য হইল।

শ্লোক

পৃথিবীর প্রদীপ যখন ন্যায়পরায়ণতার আলোকে উদ্দীপ্ত হয়
ইহা নেকড়ে বাঘকেও ভেড়ার ন্যায় ব্যবহার শিক্ষা দেয়।

তিনি যখন সর্বসাধারণকে দর্শন দিতেন অথবা ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিতেন সে সব সময়ে তিনি তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রাজকীয় আড়ম্বর ও চাকচিক্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেষ্ট হইতেন। আসন গ্রহণে এবং আসন হইতে উত্থানে তিনি এমন আড়ম্বর ও ঔদ্ধত্য ও কঠোরতার সঙ্গে ভাব ধারণ করিতেন যে ইহা দর্শনে ভয়ভীতিতে দর্শকের হৃদয় গলিয়া যাইত। তাহার ক্ষমতার ভয়াবহতায় দূর ও নিকট উভয়ের দুর্দান্ত লোকদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন যে তিনি সুলতান শামসুদ্দীনের দরবারের খ্যাতনামা প্রবীন ব্যক্তিদের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, যে রাজা তাহার দরবারের ব্যবস্থাপনায় আর তাহার মিছিলের জাঁকজমকে সাম্রাজ্যের নিয়মকানুন রক্ষা করেন না, আর যাহার আচার-ব্যবহার এবং কথাবার্তায় রাজোচিত আড়ম্বর প্রকাশ পায় না, তবে তাহার শাসনের শত্রুগণের মনে অথবা তাহার সাম্রাজ্যের লোকদের মনে তাহার সম্বন্ধে ভয়ভীতি প্রবেশ করে না ; তার ফলে তাহার রাজ্য শাসন নানাভাবে বিপদগ্রস্ত হয়। সভার ব্যবস্থাপনায় সুন্দর সুন্দর গালিচার

এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্রে, সোনার কাজ করা পর্দা এবং নানা প্রকার উপাদেয় ফল ও অন্যান্য আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। আনন্দ-উৎসবের দিনগুলিতে তিনি দিনের শেষ পর্যন্ত এবং যতক্ষণ না তাহার খান ও আমীরগণের উপহারসমূহ তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া নিয়া যাওয়া শেষ হইত, ততক্ষণ তিনি সমাবেশে বসিয়া থাকিতেন। প্রত্যেক আমীরের ভেট যখন তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইত, তখন সভার অভ্যর্থনাকারীগণ ঐ আমীরের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের এবং তাহার কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বর্ণনা দিতেন। তাহার উৎসব সভাসমূহে গান গাওয়া হইত; কবিগণ প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করিতেন, আর উপহার এবং উপকার দ্বারা পুরস্কৃত হইতেন। তাহারা বলেন যে তাহার পুরাতন ভৃত্যগণের যাহারা তাহাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাহদের মধ্যে এমন একজনও নাই যে তাহাকে কখনও তাহার টুপি এবং মোজা এবং অঙ্গাবরণ ছাড়া দেখিয়াছেন। সমাবেশে তিনি কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন না, অন্য কেহই তথায় হাস্য করিতেন না। তিনি বলিতেন যে কোন রাজার চালচলনে মর্যাদা ও গাম্ভীর্য তাহার দেওয়া শাস্তির চেয়ে লোকের মনে অধিকতর ভয়ভীতির উদ্রেক করে; আর রাজার প্রতি ভয়ভীতির অভাবই বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ স্থষ্টির কারণ হয়। এমন কোন রাজা যদি সিংহাসনে আরোহণ করেন, অচিরেই বহু বিপদ দেখা দিবে এবং গণ্ডগোল ও বিদ্রোহ সংঘটিত হইবে; ন্যায়পরায়ণতার নিয়মকানুন বাতিল হইয়া যাইবে আর অত্যাচার ও উৎপীড়ণের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইবে। সর্বক্ষেত্রেই সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন প্রকৃষ্ট মধ্যপথ অবলম্বন করিতেন এবং প্রতি অবস্থার উপযোগী সময়ে দয়া বা ক্রোধ প্রদর্শন করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, যে সুলতান তাহার কাজে কর্মে এবং আচার-ব্যবহারে উৎপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন আর মহানবীর (তাহার উপর যেন আল্লাহর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হয়) অনুশাসনের পরিপন্থী কাজ করেন। আর এইরূপ কাজের শাস্তি আর কিছুই নয়, পরলোকে শাস্তি ভোগ করা আর ধ্বংস হওয়া। কোন রাজার পক্ষে এরূপ ব্যবহারের জন্য চারি প্রকারে উপায় ছাড়া আর কোন প্রকারে উপায় নাই ঃ

(১) যে তিনি তাহার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উপযুক্ত সময়ের জন্য সংরক্ষিত রাখিবেন আর একমাত্র লোকের সুখ-সমৃদ্ধিও আল্লাহ্‌র ভীতি ছাড়া তাহার চোখের উপর আর কোন লক্ষ্য থাকিবে না; (২) যে তিনি তাহার রাজ্যে প্রতারণা এবং অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হইতে দিবেন না; আর এরূপ কার্যের সব দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিবেন;

আর সর্বদা দুষ্ট প্রকৃতির এবং অবাধ্য লোকদিগকে তাহার শাস্তির ভয়ে রাখিবেন ; (৩) যে তিনি সকল কাজ ও দায়িত্ব জ্ঞানী, গুণসম্পন্ন, সৎ এবং আল্লাহকে ভয় করেন এরূপ লোকের উপর ন্যস্ত করিবেন ; আর তাহার রাজ্যে বিশ্বাসঘাতক লোকদের বসবাস করিতে দিবেন না। কারণ তাহারা লোকের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে ; আর (৪) যে বিচার কার্য নির্বাহ করিবার কাজে তিনি এমন পরিমাণের নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে যাহাতে তাহার রাজ্য হইতে সকল প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ণের শেষ চিহ্নও নিঃশেষে মুছিয়া যায়।

শ্লোক

ন্যায়পরায়ণতা হইতে স্থায়িত্ব আসে
রাজাদের অত্যাচার বায়ুপ্রবাহে প্রদীপের ন্যায়।

যখনই সুলতান বলবন কোন সরাই, সেতু অথবা কোন জলাভূমিতে পৌঁছিতেন, তিনি তথায় অপেক্ষা করিতেন ; আর আমীর এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে প্রেরণ করিতেন আর তাহারা লাঠি হাতে ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দিতেন ; আর তাহারা প্রথমে অসুস্থ, অক্ষম, নারী ও শিশুদের এবং দুর্বল ও পাতলা চতুষ্পদ জন্তুদের বিনা বাঁধায় তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে দিতেন। তিনি লোকদের পার করিবার কাজে সাহায্য করিতে তাহার হাতী ও অন্যান্য জন্তুদের নিযুক্ত করিতেন। এইরূপ স্থানে তিনি কয়েকদিন অপেক্ষা করিতেন, যাহাতে সকল লোক অনায়াসে ইহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

যে সময়ে তিনি খান পদমর্যাদায় ভূষিত ছিলেন, সে সময়ে সুলতান বলবন যদিও মদ্যপানে আসক্ত এবং সামাজিক সমাবেশ, যাহাতে তিনি মালিক ও আমীরগণকে দাওয়াত দিতেন ; পালন করিতেন ; আর জুয়া খেলিতেন ; তাহার লব্ধ অর্থ তাহার পরিচারকগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন ; আর তাহার সমাবেশসমূহে সর্বদাই উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বাগ্মী সভাসদগণ, মধুর সুরের সঙ্গীতজ্ঞগণ যোগ দিতেন ; কিন্তু তিনি যখন বাদশা হন তিনি কখনও এইগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন নাই এবং তাহার রাজ্যের সর্বত্র সুরার এবং সুরা পানীয়দের এবং অন্যায়কারীদের নাম পর্যন্ত মুছিয়া দেন। তিনি প্রথানুযায়ী রোজা রাখিতেন। সারারাত্রি জাগিয়া থাকিতেন, নিয়মিতভাবে শুক্রবারের জুমার নামাজ, সকাল সন্ধ্যার নামাজ আদায় করিতেন আর ওজু করিতে কখনও গাফিলতি করিতেন না। তিনি কখনও পণ্ডিত ও ধার্মিক লোকের সঙ্গে ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করিতেন না ; আহার করিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম ও আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনা করিতেন। তিনি পবিত্র লোকদের গৃহে গমন

করিতেন; আর তাহার ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর (দরবেশদের) কবর জিয়ারত করিতে গমন করিতেন। তিনি মহান লোকদের অন্তেষ্টীক্রিয়ায় যোগদান করিতেন আর শোক পালনকারীদের নিকট গমন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেন। যে সব লোক ইন্তেকাল করিতেন তিনি তাহাদের পুত্রগণ ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্মানীয় অঙ্গাবরণ দান করিতেন; আর ঐ সব লোকের বৃত্তি তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে দিতে থাকিতেন। তাহার এত অধিক ক্ষমতা ও আড়ম্বর থাকা সত্ত্বেও অশ্বে আরোহণ করিয়া বাহিরে গমনের সময়েও যদি তিনি শুনিতেন যে কোথাও ধর্মীয় সমাবেশ হইতেছে যেখানে ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ নামিয়া যাইতেন এবং তথায় গমন করিয়া আলোচনা শুনিতেন এবং (অনুভূতির উচ্ছ্বাসে) কাঁদিয়া ফেলিতেন।

কায় খুসরুর জাকজমক ইহা হইতেই স্পষ্ট
যে তিনি ন্যায়পরায়ণতা আর জ্ঞান দ্বারা তিনি পৃথিবী অলংকৃত করিযাছিলেন
উপাসনার দিনগুলিতে তিনি শুধু একটি কম্বল পরিধান করিতেন
আল্লাহর নিকটে তিনি মোনাজাত ও প্রশংসা দ্বারা চেষ্টা করিতেন।
তাহার মুখ মাটিতে রাখিয়া, আর হৃদয় উত্তপ্ত কড়ার ন্যায় করিয়া
তাহার হৃদয় এত বাগ্মী আর তাহার জিহ্বা এত নির্বাক।
তোমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দ্বারা যতক্ষণ না তাহার হৃদয় দর্শন কর
তুমি সকল উচ্চতা, আর সকল গভীরতা দেখিতে পাইবে না।

তাহার এই সব দয়াশীলতার বৈশিষ্টসমূহ থাকা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং বিদ্রোহীদের বেলা তিনি সর্বাধিক কঠোরতা এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেন! আর উৎপীড়কের পথ হইতে একচুলও বিচ্যুত হইতেন না। একটি লোকের বিদ্রোহের জন্য তিনি একটি সম্পূর্ণ বাহিনী বা একটি শহর ধ্বংস করিতে দ্বিধা করিতেন না। তিনি তাহার সাম্রাজ্যের শান্তিকে তাহার চোখের সম্মুখে সকলের উপরে স্থান দিতেন; আর এই কারণেই তিনি অধিকাংশ শামসী মালিককে যাহারা এককালে তাহার সঙ্গী ছিল, নানা কৌশলে ও ছল চাতুরীতে শেষ করিয়া দেন। তাহার ক্ষমতা এবং প্রতাপ যখন সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কতিপয় শামসী আমীর তাহার নিকট নিবেদন করেন যে যেহেতু তাহার ক্ষমতা এবং মর্যাদা প্রভৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার পক্ষে এখন গুজরাট, মালব এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য সেনাবাহিনী পরিচালনা করা উচিত হইবে। প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন যে, প্রতি বৎসর মুঘলগণ

এই দেশ আক্রমণ করে। তাহাদের নিকট হইতে এই দেশ রক্ষা করিতে হইলে তাহার পক্ষে দিল্লী ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী প্রদেশে যাওয়া সম্ভব নয়; কোন রাজার পক্ষে সর্ব-প্রথমে তাহার রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করিয়া তোলা উচিত; আর শুধু ইহার পরই অন্য দেশ বিজয়ের চেষ্টা করা উচিত; যে প্রাচীন নৃপতিগণের এক প্রবাদ আছে যে একজনের নিজের রাজ্য নিরাপদ ও শক্তিশালী করা অন্যের রাজ্যের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চেয়ে ভাল; আর যে রাজা তাহার রাজ্য নিরাপদ করিতে সামান্যতম গাফিলতিও করে সে আল্লাহর নিকটে অপরাধী হয়।

সুলতানের সিংহাসনে আরোহণের বৎসরে অর্থাৎ আঃ হিঃ ৬৬৪ সনে আরসলান খানের পুত্র তাতার খান[১] লক্ষণাবতী হইতে তিষট্টি হস্তী প্রেরণ করিলেন। (ইহার ফলে) লোকেরা শহরে তোরণ নির্মাণ করিলেন আর আনন্দ-উৎসব করিলেন। সুলতান বলবন বদাওন দরওয়াজার বাইরে নাসিরী চবুতরে (মঞ্চ) প্রকাশ্য দরবারে বসিলেন আর আমীর মালিক, কাযি এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ আগমন করিলেন এবং কর প্রদান করিলেন আর উপহার ও পুরস্কার দ্বারা সম্মানীত হইলেন। যেহেতু সুলতান বলবন শিকারের খুব ভক্ত ছিলেন, তিনি এক নির্দেশ দিয়াছিলেন যে শহরের চতুর্দিকে বিশ ক্রোশ পর্যন্ত শিকার সংরক্ষণ করিতে হইবে। তাহার চাকুরীতে মীর শিকার (প্রধান শিকারী) উচ্চ মর্যাদার পদ ছিল; আর তাহার চাকুরীতে বহু শিকারী নিযুক্ত ছিল। শীতকালে প্রতি ভোরে তিনি তাহার অশ্বে আরোহণ করিতেন এবং রেওয়ারী শহর পর্যন্ত চলিয়া যাইতেন, আবার কখনও আরও দূরে গমন করিতেন আর শিকার করিয়া রাত্রিতে শহরে প্রত্যাবর্তন করিতেন, কিন্তু তিনি কখনও শহরের বাহিরে রাত্রি যাপন করেন নাই। পর্যায়ক্রমে এক সহস্র অশ্বারোহী, যাহাদের প্রত্যেকে সুলতানের

[১] আরসলান খান (ই-সনজর) আঃ হিঃ ৬৫৭ সনে যখন তিনি কারার জায়গীরদার ছিলেন তখন লক্ষণাবতী আক্রমণ করেন। লক্ষণাবতীর জায়গীরদার মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-ইউয বাকী সেই সময়ে বঙ্গে অভিযান করিতে গমন করিয়াছিলেন এবং লক্ষণাবতীতে তখন কোন সৈন্য ছিল না। অধিবাসীগণ শহরের দেওয়ালের অভ্যন্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আত্মরক্ষা করিতে থাকে কিন্তু তিন দিন পর শহরটি অধিকৃত হয় আর তখন তিন দিন ধরিয়া লুঠতরাজ ধ্বংসলীলা চলিতে থাকে। এই সংবাদ পাইয়া মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-ইউয বাকী প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহার ও আরসলান খান-ই-সনজরের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর ইহাতে শেষোক্ত জন প্রাধান্য লাভ করে আর মালিক ইযযুদ্দীন বলবন-ই-ইউয বাকী বন্দী হন, আর কথিত আছে যে তিনি নিহত হন। দেখা যায় যে ইহার পর আরসলান খান বাংলাদেশের গভর্ণর হন আর তাহার পর তাহার পুত্র তাতার খান গভর্ণর হন। আর বলবন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাতার খান কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলার গভর্ণর পদে আসীন আছেন। এই তাতার খানই হস্তীগুলি প্রেরণ করেন।

নিকট পরিচিত দিলেন, আর অন্যান্য শ্রেণীর মধ্য হইতে যেমন নায়েক (সার্জেণ্ট) এবং তীরন্দাজ, এক সহস্র লোক তাহার রেকাবের অনুগমন করিত। ইহাদের সকলেই সুলতানের টেবিল হইতে আহার লাভ করিত। হালাকু খান যখন বোগদাদে সুলতানের এই শিকারের অভ্যাসের কথা অবগত হইলেন তখন তিনি বলিলেন যে বলবন একজন সুবিজ্ঞ সুলতান; বাহ্যতঃ তিনি লোককে দেখাইতেন যে তিনি শিকারে গমন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অশ্বারোহণের চর্চা করিতে যাইতেন আর তাহার সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিতেন; আর সর্বদা এই রাজ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। সুলতান বলবন যখন ইহা শুনিতে পাইলেন তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। আর হালাকুর বিবেচনা প্রশংসা করিলেন; আর বলিলেন যাহারা রাজ্য জয় ও শাসন করিয়াছে, শুধু তাহারাই জানে কি করিয়া রাজ্য শাসন করিতে হয়।

সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্রগণের গাফিলতি এবং দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় বহুবিধ বাধাবিপত্তি অনুপ্রবেশ করিয়াছিল; আর তাহাদের দেওয়া নির্দেশাবলী এবং প্রবর্তিত বিধানসমূহ পালনের চেয়ে অমান্য করা দ্বারাই সেগুলিকে সম্মানীত করা হইত। শহরের চতুর্দিকে বাসস্থানকারী মেওয়াতী দলগুলিকে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে ধ্বংস করেন; ইহারা এই স্থানের নিকটস্থ অঞ্চলসমূহ জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল; পথ-ঘাটে ডাকাতি করিত আর রাত্রিবেলা শহরে প্রবেশ করিত। গৃহাদি ভাঙ্গিয়া বহু সম্পত্তি নিয়া যাইত। এই সব ডাকাতির ফলে চতুর্দিক হইতে আগত রাস্তাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; আর ব্যবসায়ীগণ আসা যাওয়া করিতে পারিত না। আর শহরের মক্কার দিকের (পশ্চিম দিকের) দরওয়াজাও তাহাদের ভয়ে দ্বিতীয় নামাজের পর বন্ধ করিয়া দিতে হইত; ফলে বৈকালিক নামাজের পর কেহই দরবেশদের দরগাহে জিয়ারত করিত যাইতে পারিত না। পুনঃ পুনঃ ডাকাতগণ সুলতানের জলাশয়ের সন্নিকটে আসিয়া পড়িত; আর পানিবাহক এবং ক্রীতদাসীগণের যাহারা পানি নিতে আসিত তাহাদের বিপদ ঘটাইত। ঐ বৎসরেই সুলতান এই ডাকাতদের ধ্বংস সাধন অন্যান্য সব কাজের পূর্বে সম্পন্ন করা উচিত মনে করিয়া জঙ্গল কাটিয়া এবং মূলসহ তুলিয়া পরিষ্কার করাইলেন আর বহু সংখ্যক ডাকাতকে তরবারির খাদ্য করিলেন। তিনি কাওয়াল কর (কিলোগাবি)-এ একটি সুন্দর দুর্গ নির্মাণ করিলেন আর শহরের সন্নিকটে বিভিন্ন স্থানে থানা প্রতিষ্ঠা করিলেন; আর এই সব স্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাহার সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন; যাহাতে প্রত্যেকে তাহার উপর ভার দেওয়া এলাকা পাহারা দিতে পারে। ইহার পর মেওয়াতীদের অত্যাচার

হইতে নাগরিকগণ অব্যাহতি লাভ করে। সুলতান যখন জঙ্গল কাটা এবং মেওয়াতী-গণকে নির্মূল করা সম্পূর্ণ করেন তখন তিনি দোয়াবের শহর এবং গ্রামগুলি শক্তিশালী জায়গীরদারগণকে প্রদান করেন আর তাহারা দুর্দান্ত লোকদের লুটতরাজ এবং হয়রান করেন; আর তাহাদিগকে হত্যা করে আর তাহাদের পরিবার এবং সন্তানদের বন্দী করেন; আর তাহাদের সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ সম্পূর্ণরূপে দূর করেন। ইহার পর দুইবার সুলতান তাহার রাজধানীর বাহিরে গমন করেন এবং তাহার সেনাবাহিনী কৈথাল এবং পাতিয়ালী অভিমুখে পরিচালনা করেন এবং এই জেলাগুলির উছৃঙ্খল এবং দুর্দান্ত লোকদিগকে তরবারি দ্বারা হত্যা করেন। তিনি হিন্দুস্তানের পথ উন্মুক্ত করেন। ভারতের লোকেরা এই নামের যে বিশেষ অর্থ করেন তাহা দ্বারা জৌনপুর এবং বিহার এবং বাঙ্গালা বুঝায়, এই পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সব লুটতরাজ এবং ধ্বংসের অভিযান হইতে তিনি বন্দী এবং গবাদি পশুতে প্রচুর লুণ্ঠিত সম্পদ দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিনি কৈথাল এবং পাতিয়ালী এবং ভোজপুরে, যাহা পথঘাটের ডাকাতদের বাসস্থান ও কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, সুদৃঢ় দুর্গ এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি এই দুর্গগুলি আফগানদের হস্তে সমর্পণ করেন আর শহরগুলিতে দলে দলে আফগান প্রতিষ্ঠা করিয়া এইগুলিকে শক্তিশালী করেন।

এই সময়েই তিনি হিসারী-জালালী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ডাকাতদের একটি আস্তানা ছিল এবং এই স্থানে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাজগুলি শেষ করিতে না করিতেই তিনি সংবাদ পান যে কাটেহারের লোকেরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে; ইহার কারণ হইল বদাওন এবং আমরোহার জায়গীরদারদের দুর্বলতা। সুলতান কৈথাল ও পাতিয়ালী হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হইবার জন্য নির্দেশ দিলেন আর তিনি লোককে দেখাইলেন যে তিনি পাহাড়শ্রেণীর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইবেন। অতঃপর রাজকীয় মঞ্চ বাহির করিয়া আনিবার পূর্বেই তিনি পাঁচ সহস্র সাহসী অশ্বারোহীসহ যাত্রা করিলেন এবং অবিরাম পথ চলিয়া দুই রাত্রির মধ্যে তিনি কাটেহারের ফেরীতে গঙ্গা অতিক্রম করিলেন; আর কাটেহার অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি লুটতরাজ ও হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। মহিলা ও শিশু ছাড়া আর কাহাকেও জীবিত রাখা হইল না; আর পুরুষদের মধ্যে যে কেহ আট বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছে তাহাকেই তরবারির খাদ্য করা হইল। তাহারা মৃতের পাহাড়ের সৃষ্টি করিল। ঐ সময় হইতে জালালুদ্দীনের সময় পর্যন্ত কোন উচ্ছৃঙ্খল লোক তথায় মাথা তুলিতে পারে নাই; আর বদাওন ও আমরোহা অঞ্চলগুলি কাটেহারের' লোকদের শয়তানী হইতে রক্ষা পাইল। ইহার পর সুলতান বলবন বিজয় ও সাফল্য লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছুকাল পর তিনি পুনরায়

তাহার বাহিনী পাহাড়ের প্রান্তের অভিমুখে পরিচালনা করিলেন : আর ঐ স্থানগুলি লুট করিলেন। এই অভিযানে সৈন্যগণ বহু সংখ্যক অশ্ব লাভ করিল, ফলে অশ্বের মূল্য কমিয়া ত্রিশ বা চল্লিশ তংগায় নামিয়া আসিল। সুলতান বলবন পুনরায় বিজয় ও সাফল্য লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন; আর প্রতিবার তিনি যখন শিবির হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখন কাযিগণ এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ দুই বা তিন পর্যায় অগ্রবর্তী হইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেন. আর শহরের লোকেরা গম্বুজ তৈরী করিত আর আনন্দ উৎসব করিত। শুকরিয়া আদায়রূপে যাহা কিছু দান করা হইত, তাহাই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হইত।

কিছুকাল পরে তিনি লাহোর অভিমুখে গমন করিলেন এবং মুঘলগণ যে দুর্গটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল তাহার পুনঃ নির্মাণ করিলেন; আর লাহোরের চতুর্দিকস্থ যে অঞ্চলটি তাহারা জনশূন্য ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা পুনরায় সমৃদ্ধিশালী করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে কতিপয় লোক যাহারা অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, তাহারা সুলতান বলবনের নিকট বলিল যে বিরাট এক দল সৈন্য যাহারা সুলতান শামসুদ্দীনের সময়ে জায়গীর লাভ করিয়াছিল, তাহারা এখনও সেই সব জায়গীর ভোগ করিতেছে। এই সব জায়গীরে বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে আর নিজেদের কর্মক্ষমতা নাই, তাহাদিগকে সামরিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে আর তাহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সংস্থান হয়; আর জায়গীরের বাকী অংশটি ফেরৎ নিতে হইবে। ইহার ফলে লোকের মধ্যে অসন্তোষ ও দুঃখের সৃষ্টি হইল। বহু সংখ্যক লোক আমীর-উল উমরা ফখরুদ্দীন কোতোয়ালের নিকট উপহার নিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার নিকট এই ব্যাপার নিবেদন করিল। মালিক-উল উমরা তাহাদের উপহার গ্রহণ করিলেন না আর বলিলেন, যদি তিনি তাহাদের নিকট হইতে ঘুষ নেন তবে তাহার কথায় বিশেষ কোন ফল হইবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকট গমন করিলেন এবং উদ্বিগ্ন ও বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় তাহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুলতান তাহার বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করিলেন এবং ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে সুলতান বৃদ্ধদের (নাম) বাতিল করিয়া দিয়াছেন আর তাহাদের জীবন ধারণের উপায় নিয়া গিয়াছেন; আর যেহেতু তিনি জানেন না যে তাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাই তিনি চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া আছেন, যদি তাহারা কেয়ামতের দিনেও বৃদ্ধদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করেন।

সুলতান বুঝিতে পারিলেন তিনি কিসের ইঙ্গিত করিতেছেন ; মালিক-উল-উমরার কথায় তিনি ব্যথিত হইলেন এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে বৃদ্ধ লোকদের বৃত্তি দেওয়া চলিতে থাকুক আর তাহা ফেরৎ নেওয়া হইল না।

শ্লোক

সুলতানের অনুগ্রহ তাহাদের পক্ষেই শুভসূচক
যাহারা অভাবী লোকের সাহায্য করেন।

ইহার কিছুকাল পরে সুলতান বলবনের চাচাত ভাই শের খান ইন্তেকাল করেন ; তাহারা বলে যে সুলতান নির্দেশ দিয়াছিলেন যে তাহার পানীয়তে[1] যেন বিষ দেওয়া হয়। শের খান আলতামশের একজন ক্রীতদাস ছিলেন, চল্লিশ দাসের ভ্রাতৃত্বের একজন; আর ইনি আমির পদে উন্নীত হইযাছিলেন। তিনি তাবারহিন্দাহ এবং ভাটনীর দুর্গদ্বয় নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর শেষোক্ত স্থানে তিনি একটি সুউচ্চ গম্বুজও[2] নির্মাণ করিরাছিলেন। তিনি সুনাম, লাহোর, দেবলপুর জায়গীরগুলি এবং মুঘলদের আক্রমণের পথে যে সমস্ত স্থান ছিল সেগুলির সব সুলতান নাসির-উদ্দীনের রাজত্বকাল হইতে সুলতান বলবনের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাহার অধিকারে রাখেন,[3] তিনি বহুবার মুঘলদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের পরাজিত করিয়া ঘযনীনে সুলতান নাসিরুদ্দীনের নামে খোৎবা পাঠ করাইয়াছিলেন ; আর তাহার বীরত্ব এবং সাহসিকতা আর তাহার সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের ফলে মুঘলদের পক্ষে হিন্দুস্তানে আগমন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যেহেতু তিনি জানিতেন যে সুলতান বলবন শামসী ক্রীতদাসগণের হত্যার চেষ্টা করিতেছে, তাই তিনি কখনও দিল্লী আগমন করেন নাই। তাহার ইন্তেকালের পর সুলতান বলবন সুনাম এবং সামানা জায়গীরদ্বয় তামিউর খানকে প্রদান করেন, তিনিও চল্লিশ ক্রীতদাসের দলের

১. যে শব্দটি ব্যবহার করা হইযাছে তাহার অর্থ হইল এক প্রকারের সুরা। ইহা বালি হইতে প্রস্তুত হয়।
২. যিয়া বারণীর মতে শের খান ভাটনীরে একটি সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং ভাত্তিন্দা এবং ভাট-নীর দুর্গদ্বয় নির্মাণ করেন। ভাত্তিন্দার পরিবর্তে একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে তবরহিন্দাহ আর অন্যান্যগুলিতে আছে তাবারহিন্দাহ।
৩. যিয়া বারণী এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবকাত-ই-নাসিরী অনুযায়ী কিন্তু কোন সময়েই নির্বিবাদে এইগুলি ভোগ করিতে পারেন নাই এবং সুলতান শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পনের বৎসর পূর্বে তাবারাহিন্দা মালিক নসরত খান সুনকর-ই-সুফির কর্তৃত্বে স্থাপন করা হয় আর কোল, বিয়ানা, বলারাম, জলিসর, বলতারাহ, মিহির এবং মহাওয়ান জায়গীরগুলি এবং গোয়ালিয়র দুর্গটি শের খানের দায়িত্বে দেওয়া হয়, আর যখন তবকাত-ই-নাসিরী তাহার ইতিহাসের পাতাগুলি লিখিত হয় তখন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

একজন ছিলেন ; আর অন্যান্য জায়গীরগুলি (যেগুলি শের খান ভোগ করিতেন) অন্যান্য আমীরদের প্রদান করেন। যে মুঘলগণ শের খানের আমলে হিন্দুস্তানের নিকটে আসিতে সক্ষম হইত না, পুনরায় এই দেশের সীমান্তে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য সুলতান বলবন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতানকে মুলতান প্রেরণ করিলেন আর তিনি শহীদ খান রূপে খ্যাতি লাভ করেন, আর তাহার উপাধি ছিল কান খান আর তিনি জৈবিক ও মানসিক গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন।

তাহাকে প্রেরণের পূর্বে তিনি তাহাকে একটি রাষ্ট্রীয় চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ প্রদান করেন এবং তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিন্ধু এবং তাহার অধীনস্থ স্থানসমূহ এবং সমস্ত রাজ্যসমূহ তাহাকে প্রদান করা হয়। বহু সংখ্যক আমীর এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে এবং বহু সংখ্যক সহচর তাহার সঙ্গে মুলতান প্রেরণ করা হয়। সুলতানের নিকট তাহার ভ্রাতাদের চেয়ে মুহম্মদ সুলতান অধিকতর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি সর্বদা বিদ্বান এবং গুণী লোকের সঙ্গে বসিতেন বা আলাপ আলোচনা করিতেন। মুলতানে আমীর খুসরু এবং আমীর হাসান পাঁচ বৎসর কাল তাহার চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহার অন্যান্য সভাসদগণের ন্যায় বৃত্তি ও পুরস্কার পাই-তেন। তিনি তাহার অন্যান্য সভাসদগণের চেয়ে তাহাদের অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতেন; আর তাহাদের পদ্য এবং গদ্য রচনায় মহা-আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি এত মধুর স্বভাবের এবং নম্র ব্যবহারের ছিলেন যে সারা দিন রাত্রি তিনি যদি ক্ষমতার আসনে বসিয়া থাকিতেন তবু একবারের জন্যও তিনি তাহার হাটু তুলিতেন না। তিনি একমাত্র হক্ক (আহ্ঃ আল্লাহ) ছবক ছাড়া কখনও আর কোন শপথ নিতেন না আর অসাবধান মুহূর্তে এবং সুরা পান অবস্থায় ও কখনও তাহার মুখ হইতে কঠিন কথা বাহির হইত না।

শ্লোক

বিনয় লোককে মহত্ব দান করে। তুমিও
তোমার স্বভাবে ইহার মাধুর্য আন তবে তুমিও মহৎ হইবে।

শেখ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাহারা বলে যে শেখ উসমান সারমন্দি, যিনি এই যুগের একজন প্রখ্যাত দরবেশ ছিলেন, মুলতান আগমন করিয়াছিলেন। শাহযাদা তাহাকে সম্মান করেন, তাহাকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করেন এবং আবেদন করেন যেন তিনি মুলতানে অবস্থান করেন এবং তাহার জন্য একটি খানকাহ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন ; আর তাহার ভরণপোষণের জন্য কয়েকটি গ্রাম

প্রদান করিতে চাহেন। শেখ ইহাতে সম্মত হন না। তিনি তাহার ভবঘুরে জীবনই পছন্দ করিলেন। একদিন এই শেখ এবং শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পুত্র শেখ সদরুদ্দীন শাহযাদা এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অন্যান্য দরবেশগণ যখন তাহাদের আরবী কবিতা শ্রবণ করিলেন তখন উল্লসিত হইয়া উঠিলেন আর তাহারা সকলেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি (শাহযাদা) তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন আর তাহার হাতদ্বয় তাহার বুকে রক্ষিত ছিল আর তিনি তাহার অনুভবের উচ্ছ্বাসে অনবরত কাঁদিতে লাগিলেন। উপদেশপ্রদ আরবী কবিতা প্রায়ই তাহার সমাবেশে আবৃত্তি করা হইত। এই সব উপলক্ষে তিনি অন্য সব কাজ ছাড়িয়া দিতেন এবং এইগুলি শুনিতেন আর তাহার যাতনা প্রদর্শন করিতেন আর অশ্রু বিসর্জন করিতেন।

তাহারা বলে যে সুলতান শামসুদ্দীনের এক কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, মত্ত অবস্থায়, তিনি তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করিয়া তাহাকে তালাক দেন। যেহেতু ইহাকে অন্যত্র বিবাহ দিবার অনুষ্ঠান পালন ব্যতিরেকে আর কোন উপায় না থাকার ফলে মহিলাটিকে শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পুত্র শেখ সদরুদ্দীনের নিকট বিবাহ দেওয়া হয় এবং যৌনমিলন দ্বারা তাহা আইনসিদ্ধ হইলে যখন মহিলাটিকে তালাক দিতে শেখকে বলা হইল, তখন মহিলাটি তাহাকে বলিলেন যে তিনি ঐ বিশ্বাসঘাতক লোকটির নিকট হইতে তাহার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; আর আল্লাহ্ ইহা অনুমোদন করিবেন না যে তাহাকে পুনরায় তাহার দয়ার উপর সমর্পণ করা হইবে। অতঃপর শেখ বলিলেন যে তিনি একজন মহিলার চেয়ে ছোট হইতে পারিবেন না; এবং তাহাকে তালাক দিলেন না। মুহম্মদ সুলতান তাহার বিচ্ছেদের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হন। কিন্তু ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে ঠিক ঐ সময়েই মুঘলগণ আক্রমণ করিল; আর তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই স্থির করিলেন যে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহার সেনাদলকে পরিচালনা করাই তাহার প্রথম কাজ। তিনি তাহাই করিলেন এবং শহীদ হইলেন। দুইবার তিনি মুলতান হইতে শিরাযে সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়া শেখ সাদীকে (আল্লাহর করুণা যেন তাহার উপর বর্ষিত হয়) তলব করেন এবং তাহাকে অর্থ প্রেরণ করেন, তিনি তাহার জন্য মুলতানে একটি খানকা নির্মাণ করিতে এবং বহু সংখ্যক গ্রাম তাহার উপকারের জন্য প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শেখ তাহার বৃদ্ধ বয়স এবং অচল অবস্থার জন্য আসিতে পারিলেন না; আর এই দুইবারের প্রত্যেকবারই তিনি তাহার স্বহস্তে লিখিত তাহার কবিতার এক খণ্ড তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন; আর তিনি না আসিতে পারিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আমীর খসরুর জন্য সুপারিশ করিলেন।

মুহম্মদ সুলতান তাহার পিতার নিকট আনুগত্য প্রকাশের জন্য প্রতি বৎসর মুলতান হইতে দিল্লী আগমন করিতেন ; আর বহুমূল্য এবং মনোরম জিনিসপত্র উপহার দিতেন এবং তাহার পিতার নিকট হইতে সদয় ব্যবহার লাভ করিতেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করিতেন। ঐ বৎসরে, যাহার পর আর তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই, সুলতান বলবন তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিবার সময়ে তাহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন : "আমি আমার সারা জীবন একজন মালিক এবং একজন বাদশারূপে কাটাইযাছি, এবং আমি নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। সার্বভৌমত্বের দাযিত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি যাহাতে আমার ইন্তেকালের পর এইগুলি তোমার কাজে লাগিতে পারে। প্রথম উপদেশটি হইল এই যে, তুমি যখন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসন গ্রহণ কর, তুমি মনে করিবে না যে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পালন, যাহা প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লার প্রতিনিধিত্ব করা, সাধারণ ও সহজ কাজ ; আর এই পদের মর্যাদা যাহা অতি জাঁকজমকপূর্ণ, তাহাকে মন্দ কাজ এবং নীচ প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া ম্লান ও হীন করিও না ; আর এই মহান কাজে নীচ এবং দুষ্ট লোককে কখনও তোমার অংশীদার করিও না।

শ্লোক

নীচ ও হীন লোককে কখনও তোমার নিকটে আসিতে দিও না
বিদ্বেষপরায়ণকে তুমি কখনও পরোপকারী করিতে পারিবে না।

আর একটি উপদেশ হইল এই যে, তুমি তোমার পদের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা উপযুক্ত স্থানের জন্য সংরক্ষিত রাখিবে ; আর বাসনা চরিতার্থ করা হইতে বিরত থাকিবে ; আর কখনও আল্লাহর প্রদর্শিত পথ ছাড়া কোন কাজ করিবে না ; আর তোমার ধনরত্ন আল্লাহর পবিত্র উপহার, তুমি কখনও এই ধনরত্ন আল্লাহর মহিমা কীর্তনে অথবা তোমার প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য ছাড়া ব্যয় করিবে না। আর একটি হইল এই যে, তুমি সর্বদা সত্য ধর্মের শত্রুগণকে, দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের এবং অত্যাচারীদের তোমার পায়ের নীচে দলিত করিয়া রাখিবে। আর একটি হইল এই যে, তুমি সর্বদা তোমার প্রতিনিধিগণের এবং অফিসারগণের এবং তাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকিবে আর তাহাদিগকে সৎকাজ করিতে এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জন করিতে উৎসাহ দিবে। আর একটি হইল এই যে, তুমি তোমার প্রজাদের উপরে ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্রমনা কার্যে এবং শাসনকর্তা নিয়োগ করিবে ; যাহাতে তাহাদের মধ্যে আল্লাহর ধর্ম এবং ন্যায়বিচারের মহিমা আরও প্রকাশিত হইতে

পারে। আর একটি হইল এই যে, প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে তুমি সর্বদা রাজকীয় মর্যাদা ও আড়ম্বর রক্ষা করিয়া চলিবে আর কখনও কোন নিষিদ্ধ বা বেআইনী কাজে আসক্ত হইবে না।

শ্লোক

হে পাহরাদার, তুমি নিজেই তোমার মর্যাদা আর শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পার,
কারণ নীচদের সঙ্গে মেলামেশা তোমার মর্যাদার হানি করিবে।

আর একটি হইল এই যে, উদ্যমশীল, ধার্মিক এবং কৃতজ্ঞ লোকের প্রতি উপকার এবং সম্মান প্রদর্শন করিবে; আর তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে গাফিলতি করিবে না; আর সুদক্ষ এবং বুদ্ধিমান লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে, ইহারাই রাজ্যের সম্মান ও মর্যাদা দান করে; আর দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নিকট হইতে এবং যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি কোন ভয় নাই, কখনও তাহাদের নিকট হইতে বিশ্বস্ততা আশা করিও না; আর মনে রাখিও যে তোমার রাজ্যের এবং ধর্মের মঙ্গল নির্ভর করে এইরূপ লোকদের তোমার সন্নিকট হইতে বহিষ্কার করাতে।

শ্লোক

বিশুদ্ধ প্রকৃতির কাহাকেও তোমার নিকট হইতে দূরে সরাইও না;
আর মন্দ স্বভাবের লোকের নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকিও;
দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা কাহারও প্রতি বিশ্বাসভাজন হয় না;
মন্দ হইতে যাহার উদ্ভব সে সর্বদা মন্দই আকড়াইয়া থাকে।

আর একটি উপদেশ হইল এই যে, মহানুভবতা আর রাজত্ব পরস্পরের পরিপূরক আর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এবং দার্শনিকগণ এই দুইটিতে জমজের সাথে তুলনা করিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে রাজার চেতনা, চেতনার রাজা হওয়া উচিত, আর রাজার এই চেতনা যদি অন্য লোকের চেতনার মত হয়, তবে রাজা ও সাধারণ লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না; আর রাজত্ব নীচ চেতনার সঙ্গে কখনও একত্র হইতে পারে না। আর একটি হইল এই যে, তুমি যখন কাহাকেও উচ্চপদে উন্নীত কর তখন তাহার কোন সামান্য অপরাধের জন্য তাহাকে নীচে নামাইয়া দিও না. আর যে আন্তরিকভাবে তোমার মঙ্গল কামনা করে শুধু কোন রাষ্ট্রীয় কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে তাহাকে দুঃখ দিও না আর তোমার বন্ধুদের তোমার শত্রুতে পরিণত করিও না।

শ্লোক

প্রতিটি প্রধান যাহাকে তুমি উন্নীত করিয়াছ
যতক্ষণ পার তাহাকে আর নীচে নিক্ষেপ করিও না।

যদি ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় কোন কারণে তুমি কাহাকেও শাস্তি দান কর তবু (তাহার সঙ্গে) শান্তি স্থাপনের পথ খোলা রাখিবে ; আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের কাহাকেও যাতনা দেওয়াতে কখনও তাড়াহুড়া করিবে না ; কারণ তাহাদের সম্মানে যে কোন ক্ষত সৃষ্টি হয় তাহা দ্রুত বা সহজে মিলায় না। আর একটি হইল এই যে, কুতর্কপূর্ণ লোকের কথায় কান দিও না ; আর এরূপ লোককে তোমার নিকট আসিতে দিও না ; যেহেতু ইহাতে তোমার দরবারের অনুগামীদের আর তোমার মহত্বের হিতাকাঙ্ক্ষীদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করিবে না ; আর তোমার রাজ্যের কার্যাবলীতে মহা বিপদ দেখা দিবে। আর একটি হইল এই যে, এমন কোন কাজে নামিও না, যতক্ষণ তুমি ইহার ফলাফল কি হইতে পারে তাহা জানিতে না পার ; কারণ কোন আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ ফেলিয়া রাখা রাজার মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

শ্লোক

যতক্ষণ তোমার পদক্ষেপ দৃঢ় করিতে না পার
ততক্ষণ কোন কাজে হাত দিও না।

আর একটি উপদেশ হইল এই যে, জ্ঞানী লোকের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কিছু চেষ্টা করিবে না ; আর যে কাজ তোমার কোন অধীনস্থ লোক দ্বারা সমান দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হতে পারে সেরূপ কাজ করা হইতে সর্বদা বিরত থাকিবে। ভাল লোক আর মন্দ লোকের মধ্যে বাছাই করার ক্ষমতাই শাসনকার্যের প্রকৃত পরীক্ষা ; আর সকল ব্যাপারেই মধ্যপন্থা অনুসরণ করিবে ; কারণ কঠোরতা আর নিষ্ঠুরতা সার্বজনীন ঘৃণার উদ্রেক করে ; আর অলসতা এবং গাফিলতি দুর্দান্তদের মাথায় উৎপীড়ন ও বিদ্রোহের চিন্তা আনয়ন করে। সর্বশেষে, সর্বদা তোমার নিজের নিরাপত্তার প্রতি সর্বাপেক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করিবে কারণ তাহাতেই তোমার লোকদের নিরাপত্তা নির্ভর করে ; আর তোমার দরবার বিশ্বস্ত ও সৎ পাহারাদার ও নায়েকদের দ্বারা সুরক্ষিত রাখিবে। সর্বদা তোমার ভ্রাতার প্রতি দয়াশীল হইবে, আর তাহার সম্বন্ধে কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করিও না ; আর তাহাকে তোমার বাহু ও নির্ভর গণ্য করিবে আর তাহার জায়গীরগুলি তাহাকে প্রদান করিও।" তাহাকে

এইসব উপদেশ দান করিয়া এবং তাহাকে রাজত্বের প্রতীকসমূহ প্রদান করিয়া সুলতান তাহার পুত্রকে মুলতান অভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

এই বৎসরেই সুলতান তাহার কনিষ্ঠতর পুত্র বুঘরা খানকে, যাহার উপাধি ছিল নাসিরুদ্দীন, সামানা প্রেরণ করেন এবং ঐ নামীয় জায়গীর এবং সুনাম তাহাকে প্রদান করেন। তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিবার সময় তিনি তাহাকে কিছু উপদেশ দেন এবং বলেন, "ঐ স্থানে পৌঁছিয়া তুমি তোমার পুরাতন সৈন্যগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিও আর যত সংখ্যক প্রয়োজন তত নূতন সৈন্য নিয়োগ করিও; আর মুঘলদের আক্রমণ সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে; আর রাষ্ট্রের সকল কা জই তোমার উচিত হইবে জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করা, তাহারা তোমার বিশ্বাসভাজন হওয়া উচিত। কোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকিলে বা তুমি হতবুদ্ধি হইলে তুমি সে ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য আমাকে জানাইবে, যাহাতে তুমি আমার নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে পার।" অতঃপর তিনি তাহাকে মদ্য পান করিতে নিষেধ করিলেন, "ইহার পরেও যদি তুমি সুরা পান কর তবে আমি তোমাকে এই সব জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিব এবং এইগুলির পরিবর্তে অন্য জায়গীর দিব; কিন্তু তুমি সর্বদাই আমার চোখে নীচ ও ঘৃণ্য হইয়া থাকিবে।" বুঘরা খান তাহার পিতার উপদেশগুলিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গ্রহণ করিলেন; ন্যায়পরায়ণতা তাহার অভ্যাসে পরিণত করিলেন; সকল বদ অভ্যাস ত্যাগ করিলেন; আর এমন একজন হইয়া উঠিলেন যে মুঘলগণ যদি হিন্দুস্তান আক্রমণ করে তবে মুলতান হইতে মুহম্মদ সুলতান, সামানা হইতে বুঘরা খান আর দিল্লী হইতে মালিক বারবক বেগ তারসকে তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতিহত করিতে প্রেরণ করা যাইত; আর যে সময়ে তাহারা সুলতানপুরের নিকটস্থ বিয়াহ নদীতে পৌঁছিত ইহারা সম্পূর্ণরূপে ইহাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমন করিতে সক্ষম হইত।

সুলতান বলবনের শাসন স্থায়িত্ব লাভের পর আর তাহার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পরাজিত হইয়া অদৃশ্য হইবার পর তুঘরাল, যিনি একজন তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন এবং তৎপরতা, কর্মক্ষমতা, উদারতা এবং সাহসিকতা এইসব গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন, এবং লক্ষ্মণাবতী অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন, দেখিলেন যে সুলতান বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, আর তাহার উভয় পুত্রকেই মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার কাজে ব্যস্ততার সহিত নিয়োজিত আছেন; আর ইহা মনে করিলেন যে তিনি প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী এবং সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং একরোখাভাবে বিদ্রোহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং তিনি জাজনগর হইতে যে ধনরত্ন এবং হস্তীসমূহ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার সমস্তই নিজে দখল করিলেন এবং

ইহার কোন অংশই সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন না। অতঃপর তিনি রাজকীয় চাঁদোয়া ধারণ করিলেন এবং নিজেকে সুলতান মঘিসুদ্দীন উপাধি দান করিলেন আর বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন। যেহেতু তিনি অতি দয়াশীল ছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাহার উপহারসমূহে অমিতব্যয়ী ছিলেন, দেশের অধিবাসীগণ তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং তাহার শাসন গ্রহণ করিল ; আর তাহার ব্যাপারসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

শ্লোক

মহানুভব রাজার কখনও অনুচরের অভাব হয় না
কেহই তাহার নিকট কখনও মূল্যহীন হয় না।

তুঘরালের বিদ্রোহের সংবাদ যখন দিল্লীতে পেঁৗছিল, তখন সুলতান এক সৈন্য-বাহিনী প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন ; আর মালিক আয়তকিন মুয়েদরাযকে, যাহার উপাধি ছিল আমীন খান, আর তিনি ছিলেন অযোধ্যার জায়গীরদার, প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন ; আর তিনি অন্যান্য আমীরগণকে যেমন তমর খান শামসী এবং আলী খান শামসীর পুত্র মালিক তাজুদ্দীনকে তুঘরালকে শাস্তি দিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। মালিক আয়তকিন যখন তাহার সেনাবাহিনী সহ সরযূ নদী অতিক্রম করিলেন এবং লক্ষণাবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন তুঘরাল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার মোকাবিলা করিলেন ; আর যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল তাহাকে পরাজিত করিলেন। এই কার্যের ফলে তুঘরাল প্রচুর ক্ষমতা এবং মর্যাদা লাভ করিলেন। এই দুঃসংবাদ পাইয়া সুলতান যারপর নাই বিরক্ত এবং দুঃখিত হইলেন এবং মালিক আয়তকিনকে অযোধ্যার দরওয়াজায় ফাঁসি দিয়া শাস্তি দান করিলেন। অতঃপর তিনি তুঘরালের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অপর এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু শেষোক্ত জন ইহাকেও পরাজিত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান আরও অধিক রাগান্বিত এবং প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইলেন ; আর উন্নত চেতনা এবং রাজকীয় দৃঢ় সংকল্প দ্বারা স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে এক সুবৃহৎ নৌ-বহর প্রস্তুত করিয়া যমুনা এবং গঙ্গা নদীতে তাহা সমবেত করিতে হইবে, আর তিনি স্বয়ং সামানা এবং সুনাম অভিমুখে এক শিকার অভিযানে যাত্রা করিলেন ; আর রাজ-কীয় রক্ষীবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক সুনজকে সামানার নায়েব গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া বুঘরা খানকে তাহার ব্যক্তিগত সেনাদল সহ তাহার সঙ্গে নিলেন এবং সামানা হইতে দোয়াবে প্রত্যাবর্তন করিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিলেন এবং লক্ষণাবতীর পথে অগ্রসর হইলেন। তিনি মালিক-উল-উমরাকে দিল্লীতে প্রতিনিধি রাখিয়া আসিলেন ;

আর তাহার মহা আগ্রহের জন্য এবং তাহার (সেনাদলের) উচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে, তিনি বর্ষাকালের দিকেও কর্ণপাত করিলেন না, এবং বিনা বাধায় লক্ষণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সাংসারিক জীবনে সবকিছুই
ধীরে সুস্থে করা ভাল। কিন্তু শাসনকার্যের বেলায়
পৃথিবী তাহারই যাহার গতি দ্রুত হয়
জয়যাত্রার কালে বিলম্ব মারাত্মক হয়।

যেহেতু প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এবং রাস্তার অসুবিধার জন্য সুলতানের বিলম্ব হয়, তুঘরাল ইহার সুবিধা গ্রহণ করে আর তাহার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া, জাজনগর জয় করিবার উদ্দেশ্যে এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিবার জন্য ঐ স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন আর সুলতান যখন দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন লক্ষণাবতী তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন। (প্রদেশের) অধিবাসীগণ সুলতান বলবনের ক্রোধবহ্নির ভয়ে এবং তাহার সম্পদের লোভে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিল। সুলতান লক্ষণাবতী পেঁৗছিয়া তিনি তথায় কয়েকদিন অপেক্ষা করিলেন; আর তাহার সেনাবাহিনীকে পুনঃসজ্জিত করিয়া তুঘরালের পশ্চাদ্ধাবনে জাজনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি লক্ষণাবতীর বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন সিপাহসালার হিসামুদ্দীন এবং ভকিল-দার মালিক বারবককে। তিনি যখন সোনার গাঁও এর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, ঐ স্থানের গভর্ণর ভোজ রায় তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং নিজেকে তাহার অনুচরদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, তিনি স্বীকার করিলেন যে তুঘরাল যদি সমুদ্র পথে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তিনি তাহাকে বাধা দিবেন। অতঃপর সুলতান পরম দ্রুততার সহিত জাজনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কয়েক পর্যায় অগ্রসর হইবার পর তুঘরালের সকল সংবাদ অদৃশ্য হইয়া গেল; আর তাহার অবস্থান সম্বন্ধে কেহই আর কোন হদিস দিতে পারিল না। অতঃপর (সুলতান) মালিক বারবক বেগ তারসকে তাহার সঙ্গে সাত সহস্র বা-াই করা অশ্বারোহী নিবার নির্দেশ দিলেন; আর (প্রধান বাহিনীর) দশ বা বার ক্রোশ অগ্রবর্তী হইয়া গমনের হুকুম দিলেন। যদিও অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক দল আগে গমন করিয়া তুঘরিলের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিল, তাহারা কোথায়ও তাহার কোন চিহ্ন বা লক্ষণ দেখিতে পাইল না; অবশেষে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। একদিন অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষক বাহিনীর একটি দল, যাহাতে ছিলেন কোলের জায়গীরদার মালিক তীরন্দাধ এবং তাহার ভ্রাতা মালিক মুকুন্দর এবং অপর এক ব্যক্তি, যিনি তুঘরাল

কুশ নামে পরিচিত ছিলেন, ত্রিশ বা চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ পর্যবেক্ষকরূপে অগ্রবর্তী হইয়া গিয়াছিলেন। সহসা তাহারা তুঘরালের কয়েকজন সৈন্যের সাক্ষাৎ পায় এবং তাহাদের নিকট হইতে জানিতে পারে যে তাহারা যে স্থানে আছে ঐ স্থান হইতে তুঘরালের শিবির মাত্র আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত; আর শেষোক্ত জন ঐ দিন তথায় অপেক্ষা করিতেছেন, আর পরদিন তিনি জাজনগর পৌঁছিবেন। অশ্বারোহী পর্যবেক্ষকগণ যখন বাঁধের উপরে উঠিল তাহারা দেখিল তাহাদের সম্মুখে তুঘরালের মঞ্চে অবস্থান করিতেছে, আর তাহার সৈন্যগণ সম্পূর্ণ অসাবধান অবস্থায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছে। তাহারা তরবারি টানিয়া লইল এবং সহসা তুঘরালের মঞ্চের উপর নিপতিত হইল। শেষোক্ত জন আতঙ্কিত হইয়া গোসলখানা দিয়া পলায়ন করিলেন এবং জিনবিহীন একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার শিবিরের নিকটস্থ পানিতে লাফাইয়া পড়িলেন। ভয় ও আতঙ্কের ফলে তাহার সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং চতুর্দিকে পলায়ন করিল। মালিক মুকদ্দর এবং তুঘরাল কুশ তুঘরালের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং পানির তীরে তাহার নিকটস্থ হইলেন। তুঘরাল কুশ তাহার পার্শ্বে এক তীর বিদ্ধ করিলেন আর তিনি তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। মালিক মুকদ্দর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; আর তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া লইয়া দেহটি পানিতে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি তাহার শিরটি তাহার অঙ্গাবরণের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন; এবং নিজের হাত মুখ ধৌত করিবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। এই একই মুহূর্তে মালিক বারবক, যিনি অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন তথায় আগমন করিলেন এবং এক পত্রে বিজয় ঘোষণা করিয়া তুঘরালের শিরসহ তাহা সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরদিন তুঘরালের সৈন্যবাহিনীর লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং বন্দীগণ সহ মালিক বারবক স্বয়ং সুলতানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কিভাবে বিজয় লাভ হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। মালিক বারবক যে অসাবধানতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহার জন্য সুলতান অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন, আর তিনি মালিক তীরন্দায এবং সকল তুর্কীগণকে অনুগ্রহ প্রদর্শন ও উপহার দান করিলেন। তিনি মুকদ্দর এবং তুঘরাল কুশকে সম পরিমাণ পুরস্কার দান করিলেন। অতঃপর তিনি লক্ষণাবতী প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তুঘ-রালের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণকে শাস্তি দিলেন এবং তাহাদিগকে লক্ষণাবতীর বাজারে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দিলেন, আর এতদূর করিলেন যে তিনি একজন কলন্দরকেও শাস্তি দিলেন; যাহাকে তিনি (তুঘরাল) যেহেতু সম্মান করিতেন; আর তাহার বন্ধু অন্যান্য কলন্দরগণকেও সাজা দিলেন। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে তুঘরালের অন্যান্য সৈন্যদের দিল্লীতে সাজা দেওয়া হইবে। ইহার পর

তিনি বুঘরা খানকে একটি রাজকীয় চাঁদোয়া, একটি দুরবাশ এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রতীকসমূহ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে লক্ষণাবতী রাখিয়া গেলেন ; আর তৎপর তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তনের জন্য তাহার পতাকা উত্তোলন করিলেন।

তাহার বিদায় গ্রহণের সময় তিনি তাহার প্রিয় পুত্রকে কিছু উপদেশ দান করিলেন। প্রথম উপদেশটি হইল এই যে, (লক্ষণাবতীর শাসনকর্তার পক্ষে) দিল্লীর সুলতান আত্মীয় বা অনাত্মীয় যাহাই হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত নয় ; আর শেষোক্ত জন যদি লক্ষণাবতী আক্রমণ করেন, তখন ঐ প্রদেশের শাসনকর্তার উচিত হইত তাহার নিকট হইতে দূরে থাকা এবং কোন দূরবর্তী অঞ্চলে চলিয়া যাওয়া। তৎপর দিল্লীর সুলতান যখন তাহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন তিনি পুনরায় লক্ষণাবতীতে ফিরিতে পারেন এবং তাহার শাসনকার্য চালাইতে পারেন। দ্বিতীয় উপদেশটি হইল এই যে, তাহার প্রজাগণের নিকট হইতে রাজস্ব ধার্য করিতে (সুলতানের) মধ্য পথ অবলম্বন করা উচিত। তিনি এত কম ধার্য করিবেন না যাতে তাহার তাহারা অবাধ্য এবং দুর্দান্ত হইয়া উঠিতে পারে ; অথবা এত অধিক রাজস্ব আদায় করিবেন না যাহার ফলে তাহারা অসহায় এবং দরিদ্র হইয়া যায়। তাহার উচিত হইবে তাহার সেনাগণকে এমন ভাতা দেওয়া যাহাতে তাহারা বৎসরের শেষ হইতে আর এক বৎসরের শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং দারিদ্র্য ও ক্লেশ ভোগ না করে। আর একটি উপদেশ হইল এই যে, রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনে তিনি জ্ঞানী লোকের পরামর্শ ব্যতীত যেন কোন কাজে হাত না দেন, আর তাহারা যেন তাহার আন্তরিক শুভাকাঙ্খী হয়।

শ্লোক

শত তরবারির চেয়ে জ্ঞান অনেক উত্তম
শত মুকুটের চেয়ে রাজমুকুট উত্তম
নীতি দ্বারা কোন সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়
আর তরবারি দ্বারা এক হইতে দশ জনকে হত্যা করা যায়।

বিধান দিবার সময় রাজার উচিত রক্তের পিপাসা হইতে বিরত থাকা ; আর শুধু তাহার নিজের স্বার্থের জন্য ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কোন কাজ করা উচিত নয়। আর একটি উপদেশ হইল এই যে, কোন রাজার পক্ষে তাহার সেনাবাহিনী অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে গাফলতি করা উচিত নয় ঃ ইহা তাহার একটি প্রধান কর্তব্য ; আর তাহাদিগকে উৎসাহ দান করা তাহার একান্ত কর্তব্যরূপে গণ্য করা উচিত ; আর

তাহাদের ব্যাপারে কোন বিষয়েই চরম পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। যে কেহ তাহাকে এরূপ করিতে প্ররোচিত বা উত্তেজিত করে, তিনি তাহাকে যেন তাহার শত্রু গণ্য করেন এবং তাহার কথায় যেন কর্ণপাত না করেন, আর একটি উপদেশ হইল এই যে, একজন রাজা অবশ্যই নিজেকে তাহার ছত্রছায়ায় রাখিবে, যিনি এই পৃথিবীর প্রতি বিমুখ হইয়াছেন ; আর আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিয়াছেন।

শ্লোক

নির্ভরতার জন্য নিজেকে দরবেশের ছত্রছায়ায় স্থাপন কর
ইহা আলেকজাণ্ডারের শত প্রাচীরের চেয়ে শক্তিশালী।

যাহার মধ্যে পৃথিবীর প্রতি এক কণা ভালবাসাও বর্তমান আছে সুলতান যেন তাহার সঙ্গে কোন সংশ্রব না রাখেন আর তাহার কথা বা কাজের প্রতি যেন বিশ্বাস স্থাপন না করেন।

তাহার উপদেশের মুক্তায় তাহার পুত্রের কান ভারী করিয়া তিনি তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ; আর দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

যে সব শহর ও জনপদে তিনি পৌঁছিলেন সেগুলির প্রত্যেকটির শেখগণ, এবং বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন এবং উপহার ও নজর প্রদান করিলেন আর অঙ্গাবরণ এবং পুরস্কার দ্বারা সম্মানীত হইলেন। বড় শহরগুলিতে নাগরিকগণ বিজয় তোরণ নির্মাণ করিলেন এবং আনন্দ উৎসব করিলেন। তিনি যখন বদাওন ছাড়াইয়া গিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিলেন, সৈয়দ, কাযিগণ এবং দিল্লীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন আর প্রথানুযায়ী তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন ; আর রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানীত হইলেন। তিনি যখন দিল্লী পৌঁছিলেন, তিনি দান খয়রাত করিলেন এবং শোকক্রিয়া আদায়ের জন্য দান করিলেন : আর সকল যোগ্য লোককে খুশী করিলেন। তিনি পণ্ডিত লোকদের এবং দরবেশগণের গৃহেও গমন করিলেন এবং তাহাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাহাদের দান করিলেন, আর ঋণের জন্য যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন ; আর রাজস্ব খতিয়ানে দেখান রায়তদের বকেয়া খাজনাও মাফ করিয়া দিলেন। মালিক-উল-উমরা তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনে যে বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার জন্য নানারূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে সম্মানে ভূষিত করা হইল।

অতঃপর সুলতান দিল্লীর বাজারে ফাঁসি কাষ্ঠ প্রস্তুত করিবার আর তুঘরালের সেনাবাহিনীর বন্দীগণ, যাহারা দিল্লী হইতে লক্ষ্ণাবতী গমন করিয়াছিল এবং তাহার

সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে ঐ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার নির্দেশ দান করিলেন। যেহেতু অধিকাংশ বন্দীই তাহাদের আত্মীয়-স্বজন, সেজন্য নাগরিকগণ অত্যন্ত দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ও শোক প্রকাশ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সেনাবাহিনীর কাযি সেই যুগের একজন পবিত্র লোক ছিলেন, তিনি সুলতানের নিকট গমন করিলেন এবং করুণ কথা বলিয়া তাহার হৃদয় নরম করিলেন। অতঃপর তিনি অপরাধীদের জন্য সুপারিশ করিলেন আর সুলতান তাহার সুপারিশ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের অপরাধের উপরে ক্ষমার কলমের দাগ টানিয়া দিলেন। ইহার পর সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতান তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মুলতান হইতে আগমন করিলেন; আর মনোরম উপহার এবং যোগ্য কর প্রদান করিলেন। তাহার আগমনে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হইলেন; তাহাকে বহু সাদর সম্ভাষণ করিলেন; আর তৎপর তাহাকে বিদায় দিলেন। এই সময়ে বিরাট এক সেনাবাহিনীসহ তমর লাহোর ও দিবালপুরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হইল, আর মুহম্মদ সুলতান এবং তাহার কতিপয় আমীর শহীদ হইলেন। যুদ্ধে মীর খসরু বন্দী হন, কিন্তু তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। খাজা হাসান নিম্নের শোকসূচক কবিতাটি[1] লিখিয়া তাহা দিল্লী প্রেরণ করিলেনঃ অত্যাচারী আকাশ—যদিও কিছুক্ষণের জন্য ইহা অনুকূল থাকে এবং আন্তরিকতার আশ্বাস দেয়, কিন্তু অচিরে তাহা পরিবর্তিত হইয়া যায়; আর চঞ্চল নিয়তি যদিও কিছু সময় ইহা অনুকূল থাকে এবং বিশ্বস্ততার আশ্বাস দেয়, ইহাও অচিরেই পরিবর্তিত হইয়া যায়। বিশ্বাসঘাতক চোখওয়ালা আকাশ, যাহার উদারতার মণি নীচতায় পূর্ণ, যদি মাতালের ন্যায় দয়া প্রদর্শনের কোন কারণ ছাড়াই উহা কোন কিছু দান করিয়া দেয়, তবু শেষ পর্যন্ত যদিও লজ্জার অনুভূতি ইহাকে নিষেধ করে, তবু ইহা ছিটাইয়া দেয়, পৃথিবীর সুপরিচিত প্রথা হইল এই, অভিজ্ঞতা এবং পাকা কথা, আর যাহা আমরা দেখি আর যাহা আমরা শুনি, তাহাও অনুরূপ শিক্ষা দেয় যে যখনই কোন চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ইহা (পৃথিবী) ক্ষতির কালিমায় ইহার উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ কাল করিয়া দিতে চায়; আর যখনই কেহ মেঘের ন্যায় আমাদের মাথার উপরে উঠে, ইহা পৃথিবী তাহার মুক্তা (মহত্ব) কণায় কণায় দিগন্তের সর্ব দিকে ছিটাইয়া দেয়। হতবুদ্ধির উদ্যানের সমতল ক্ষেত্রে, আর এই হা-হুতাশের বাগানে, কাটা ছাড়া কোন ফুলই কখনও জন্মে নাই, আর কোন হৃদয়ই যাতনার কাটা হইতে রেহাই

১. শোকসূচক কবিতাটি এমন আলংকারিক ও রূপক ভাষায় লিখা হইয়াছে যে ইহা কিছু অংশের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

পায় নাই। আহ! তথায় কতকগুলি তরুণ গাছ আছে, যেগুলি দুর্ঘটনার শরৎকালের পরিণতি রূপে সতেজ সৌন্দর্যের পরিবর্তে পাণ্ডুর এবং কুঞ্চিত মুখ প্রদর্শন করে, আর কত ফুল সময়ের নিষ্ঠুর আঘাতে ধুলায় নিক্ষিপ্ত হইয়া পদদলিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।"

শ্লোক

দেখ! আমার সুন্দর বাগানে শরৎ কিরূপে তাহার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে
তথাকার তরুণ সাইপ্রেসে ইহা কি নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে।

পরলোকগত শাহযাদা কায়েন মালিক যাযির ইন্তেকাল ভাগ্যের এইরূপ উত্থান-পতনেরই একটি উদাহণ। আল্লাহ যেন তাহার কবর আলোকিত করেন আর তাহার করুণার দ্বারা যেন তাহার পাল্লা ভারী হয়। আঃ হিঃ ৬৯৩ সনের যিলহিজ্জা মাসের ৩রা তারিখে শুক্রবারে যখন

শ্লোক

চন্দ্র কাফিরের হৃদয়ের প্রেমের ন্যায় অদৃশ্য ছিল
আর সূর্য উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ইসলামের বাহিনীসহ আগমন করিলেন;

মহান শাহযাদা, যিনি রাষ্ট্রের গগনের সূর্য ছিলেন এবং যাহার মর্যাদার উজ্জ্বলতা তাহার কপাল হইতে বিচ্ছুরিত হইত এবং ধর্মযুদ্ধের জন্য যাহার উৎসাহ ছিল সুদৃঢ় তাহার শুভলক্ষণের পা রেকাবে স্থাপন করিলেন। তাহার যে বুদ্ধিমত্তা অতি দ্রুত সকল সমস্যার সমাধান করিত, তাহারা তাহার সেই বুদ্ধিমত্তার নিকট ব্যাখ্যা করিল যে ওমর তাহার সেনাবাহিনীসহ তিন ফরসঙ্গের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যখন ভোর হইল তখন তিনি তাহার শিবির হইতে অভিযানে যাত্রা করিলেন এবং অভিশপ্তদের নিকট হইতে এক ফরসঙ্গ দূরে অপেক্ষা করিলেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্ররূপে তিনি লাহোর নদীর তীরে অবস্থিত বাঘ শরিরের স্থান একটি পছন্দ করিলেন, যাহাতে তিনি তাহার সন্নিকটে দেহন্দি[১] নদীর পানি এবং একটি বিরাট জলাভূমি পাইতে পারেন। তিনি স্থানটি শক্তিশালী করিয়া সুরক্ষিত করেন এবং এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে কাফেরগণ যখন তাহার বিপরীত দিকে থাকিবে তখন উভয় পানিই তাহার

১. এই শব্দটি সঠিক বুঝা যায় না। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ওয়াহন্দি; আর অন্যান্যগুলিতে আছে দেহন্দি; কিন্তু দেখা যায় যে দিবালপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে, অযোধ্যার নিকটে দিহশাহ নামে একটি নদী ছিল।

সেনাবাহিনীর কাজে লাগিবে ; যেহেতু নদীর অবস্থানের জন্য তাহার সেনাবাহিনীর কোন অংশই পলায়ন করিতে পারিবে না, অথবা কাফেরদের দ্বারা তাহার সেনা-বাহিনীর কোন অংশই কোনরূপ বিপদে পড়িবে না। প্রকৃতপক্ষে এই সাবধানতামূলক ব্যবস্থাগুলি দ্বারা ঐ বিশ্ববিজয়ী খানের আশ্চর্যজনক রণকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হায় ! যখন দুর্ভাগ্য কাহাকেও পাইয়া বসে তখন কোন কৌশলই কোন কাজে আসে না ; আর সকল পরিকল্পনার মত সুত পাকাইয়া যায়।

শ্লোক

দুভাগ্য যাহার সাথী হইয়াছে
তাহার বিষয়সমূহ তাহার শত্রুর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়
ভাগ্য যখন পাগলের ন্যায় বিপথে যায়
জ্ঞান অন্ধের ন্যায় কূপে পতিত হয়।

ব্যাপার[১] এইরূপ ঘটে যে ঐ দিনে চন্দ্র এবং সূর্য, যাহারা রাজাদের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত, মীন রাশিতে অবস্থান করিতেছিল ; আর মঙ্গল যাহার মুখমণ্ডলের রক্তিমাভা রাষ্ট্রের আমীরগণের রক্ত হইত সৃষ্ট, ঐ বিশ্বের ভুল হইত নিধনের তীর এবং ধ্বংসের হুড়কা টানিলেন আর খানের জন্য, যিনি মিথুন রাশিতে সিংহের ন্যায় ছিলেন। বিপদের লক্ষণ এবং ধ্বংসের চিন্তা জলীয় চিহ্ন ভয় ও ধ্বংসের কথা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ; আর "ভ্রাতাগণ পরস্পরের নিকট হইতে পলায়ন করিল" এই পাঠ সত্যের) পাতায় লিখিত ছিল। সংক্ষেপে, মধ্যদিনে যখন আকাশের অশ্বারোহী মধ্যাহ্ন গগনে অবস্থান করিতেছিল, বিশ্ব ও জুলকারী শাহযাদার জীবন ইহার ধ্বংস ক্ষণের নিকটস্থ হয়। সহসা ঐ কাফেরদের দিক হইতে ধূম্র (মেঘ) উত্থিত হইল ; আর ঐ একই ক্ষণে খান ঘাযি তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন আর তাহার সব সৈন্য অনুচর, তাহার অফিসার এবং লোকজনকে নির্দেশ দিলেন যেন এই পাঠ অনুযায়ী কাজ করিয়া যায়।" সকল কাফেরকে হত্যা কর যেহেতু তাহারা তোমাদের সকলকে বধ করিবে," আর তাহাদিগকে আলেকজাণ্ডারের প্রাচীরের চেয়ে শত গুণ শক্তিশালী এক পংক্তিতে সারিবদ্ধ করিলেন, এবং ডান ও বাম পার্শ্ব বাহিনী প্রস্তুত করিয়া উচ্চ গুণান্বিত নিজেকে তিনি কেন্দ্র বাহিনীতে স্থাপন করিলেন, তারকার মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পৌত্তলিক তাতারগণ, তাহাদের যেন

১. এই অংশটি অত্যন্ত ঘোলানো-কাঁপানো এবং বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে ; কিন্তু অংশের অর্থ বোধগম্য নয়।

ক্ষতি ও ধ্বংস সাধিত হয়, লাহোরের নদী অতিক্রম করিল এবং মুসলমান বাহিনীর মুখোমুখী হইল। মরুভূমিতে জন্ম এবং ধ্বংসের বন্ধু এই বর্বরগণ তাহাদের অভিশপ্ত মস্তকে পেচার পালক লাগাইয়াছিল। তুর্কী এবং খলজ মালিকগণ, এবং হিন্দুস্তানের আমীরগণ এবং সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী লইয়া গঠিত ইসলামের বাহিনী যুদ্ধের নামাজের প্রান্তরে তাহাদের হস্ত উত্তোলন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আল্লাহ মহান'; কারণ মহানবী (আল্লাহর অনুগ্রহ এবং শান্তি যেন তাহার উপর বর্ষিত হয়), জেহাদকে নামাজের সমতুল্য গণ্য করিয়াছেন; আর বলিয়াছেন যে আমলে ক্ষুদ্রতরের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হইতে বৃহত্তমের বিরুদ্ধে জেহাদে গমন করি। তাহাদের প্রথম আক্রমণেই মুঘল উপজাতিদের কতিপয় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোককে তাহাদের তারবারির আওতায় আনয়ন করেন; আর শাহযাদার অধীনস্থ মালিকগণের বর্শা শত্রুর দেহে এমন আঘাত হানে যে তাহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে বর্শার উচ্চতা পর্যন্ত রক্ত উত্থিত হয়, আর শাহযাদার খেদমতে রত তুর্কীদের তীরের পালকসমূহ তাতারদের দেহে এমনভাবে প্রবিষ্ট হয় হয় যে সকল শূন্যস্থান পূর্ণ হইয়া যায়।

শ্লোক

প্রথম আক্রমণেই শাহযাদার তীর নিক্ষিপ্ত হয়;
তাতারগণ সকলে এক সঙ্গে অকর্মণ্য হইয়া যায়।

সিংহ-হৃদয় প্রভু যতবার তাহার তরবারির, যাহা তাহার বিশ্বাসের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ছিল এবং যুদ্ধের সারি হইতে ছুটিয়া অগ্রসর হইত, দ্বারা আঘাত করিলেন, তাহার প্রতিবারই তাহার বীরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়া পড়া উচিত এবং ব্যঙ্গময় হইয়া তাহাকে বলিল, "শুধু আজকের মত এই সব অভিশপ্ত লোকদের ধ্বংস সাধনের কাজ আপনার মহত্বের ক্রীতদাসদের হাতে ছাড়িয়া দিন, আর আপনি নিজে অগ্রসর হইবেন না; কারণ তরবারির দুইটি মুখ আছে; আর হত্যার তরবারি মাতাল হওয়ার ফলে তাহা নির্লজ্জ। সর্বশক্তিমানের বিধানে কাহার কি হয় তাহা বলা যায় না। আপনার পরম উৎকর্ষকায় আমার চোখ বুজিয়া আসিতেছে (অর্থাৎ আমার চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছে)।"

শ্লোক

যাইও না। কারণ আমি তোমার পদধুলি আমার চোখে মাখি
যাইও না! কারণ আমি মন্দ চোখের দৃষ্টির জন্য ভীত হইয়াছি।
আকাশ এমন উজ্জ্বল মুখ কখনও দেখে নাই
ঐ আগুনে আমি নিজেকে উৎসর্গ করিতেছি।

প্রচেষ্টার প্রান্তরে তিনি যখন জেহাদে নিরত ছিলেন সেই সময়ে প্রতিটি অস্ত্র তাহার অবস্থায় উপযোগী জিহ্বায় কথা বলিল। বর্শা বলিলঃ ও শাহ্যাদা! আপনার হাত আমার উপর হইতে তুলিয়া নিন কারণ আমার ফলকের জিহ্বা অতিরিক্ত আঘাত এবং নিধনের ফলে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে; শত্রুকে মুখে আঘাত করিবার মত কোন শক্তি আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ্ না করুন আমি যখন আঘাত করি তখন যেন তাহা ব্যর্থ না হয়।" তীর বলিল, "ওহ! আপনি! যাহার অব্যর্থ লক্ষ্য গাছের পাতার গোটার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দেয়, এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের আক্রমণ করিতে চাইবেন না; কারণ আমি স্বয়ং আমার গতিপথে আমার মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করিতে পারি। আল্লাহ্ না করুন, যদি আমাদের সরু চক্ষু তুর্কী, যে পঞ্চম গৃহে অবস্থান করিতেছে, তোমার প্রতি যদি উৎপীড়ন আর ধ্বংসের পথে, শত্রুতা আর ঈর্ষ পরায়ণতা ধনুক হইতে, অষ্টম গৃহের দরজায় লুক্কায়িত অবস্থান হইতে ধ্বংসের একটি তীর নিক্ষেপ করে," ফাঁস দড়ি বলিল, "আপনি আজ ঐ স্থানের সূত্র চিন্তার হাত হইতে ছুটিয়া যাইতে দিবেন না; কারণ এই তাড়াহুড়ার যুদ্ধ এবং অবিবেচনা প্রসূত সংঘর্ষের ফলে আমি যাতনায় কাতর হইয়াছি। ভাগ্য চিন্তার ক্ষেত্রে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন, কারণ ইসলাম এবং মুসলমান আজ যেন সমৃদ্ধশালিতার তাঁবুর জট পাকানো রশি। আহ্! আল্লাহ্ এই লোকগুলির মধ্যে ফাঁস দড়ি নিক্ষেপের প্রথার বিস্তার লাভ হইতে দিও না।"

শ্লোক

আমি সানন্দে তোমার সম্মুখে ফাঁসে মাথা গালাইয়া দিয়াছি
হে আমার ফাঁস-দড়ি নিক্ষেপকারী,
তোমার কোকড়ানো চুলের ফাঁস-দড়ি নিক্ষেপ কর।

সংক্ষেপে ধর্ম রক্ষাকারী এবং পৌত্তলিকতার ধ্বংসকারী শাহ্যাদা মহা উদ্যম তেজের সঙ্গে মধ্যাহ্ন হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, তাহার সেনাবাহিনীর মধ্যভাগের সম্পূর্ণ দল সহ পৌত্তলিক দলটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

বিজয়ীদের আনন্দ উল্লাস এবং যুদ্ধের জন্য আগ্রহশীলদের চীৎকার মাটির কর্ণ আর আকাশের শ্রবণ শক্তি বধির করিয়া দিল; আর বর্শার মাথা হইতে যে জলন্ত জিহ্বা ছুটিয়া গেল, আর তরবারির জিহ্বা, যাহা আজরাইলের পরোয়ানা প্রদান করিতে একটি অক্ষরও ভুল করিল না, সকলেই এই উচ্চারণ করিল যে এই সেই দিন, যে দিনে মানুষ তাহার ভ্রাতাগণের নিকট হইতে পলায়ন করিবে। ভূ-পৃষ্ঠ, যাহারা

তাহাদের পুত্রগণকে হারাইয়াছে সেরূপ বৃদ্ধ লোকের চক্ষুর ন্যায় রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল ; আর আকাশের মুখ, যে পুত্রগণ তাহাদের পিতাকে হারাইয়াছে তাহাদের মস্তকের ন্যায় ধূলায় ঢাকিয়া গেল।

শ্লোক

হে পিতা ! তরবারির ইস্পাত কেন আগুনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে
যাহাতে ইহা আমার হৃদয়ে অনাথের চিহ্ন আঁকিয়া দিতে পারে।

এই বাধা বিপত্তির ঠিক মধ্যস্থলে, এই বিপদ ও গোলযোগের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সহসা ভাগ্যের লক্ষ্যস্থল হইতে একটি তীর আসিয়া জেহাদের বিস্তৃত প্রান্তরের ঐ বাজপাখীর পাখায় আসিয়া বিদ্ধ হইল ; আর তাহার দেহের খাঁচা হইতে আত্মার পাখী বেহেশতের উদ্যান অভিমুখে পলায়ন করিল। আর সেই মুহূর্তেই মুহম্মদদের, তাহার উপর যেন আল্লার অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হয়, ধর্মের মেরুদণ্ড অনাথের হৃদয়ের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যায়। আর আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি দীনহীনের কবরের ন্যায় ধ্বসিয়া পড়ে ! রাষ্ট্রের বাহু হইতে শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায় আর ইসলামের সুর্য হইতে দীপ্তি ঘুছিয়া যায়। ঠিক সূর্যাস্তের সময়ে শাহযাদার জীবনের চন্দ্র, যাহার ভাগ্য ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর পশ্চিমে অস্ত গেল। শোক প্রকাশকারীর ন্যায় আকাশ নীল অঙ্গাবরণ ধারণ করিল আর ইহার গণ্ড বাহিয়া কাল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বিশ্বস্ত শোকাচ্ছন্নের ন্যায় পানি কাল অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়াছে আর হিন্দুস্তানের লোকের নিকট শাহযাদার মৃত্যুর জন্য চীৎকার করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। বৃহস্পতি ঐ ধূলায় আচ্ছন্ন ঐ শবদেহের জন্য বেদনার্ত হইয়া তাহার রক্তাক্ত অঙ্গাবরণ এবং ছিন্ন বস্ত্র এবং পাগড়ী নীচে ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে। শাহাযাদার ইন্তেকালের ফলে মঙ্গল গ্রহের হৃদয় তুর্কীর চোখের ন্যায় সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার জীবনের চেহারা, নিগ্রোদের কোকড়ানো চুলের ন্যায় শক্ত ও কাল হইয়া গিয়াছে ; আর এই শোকের ফলে একটি কাটা রক্তের হৃদয় ভেদ করিয়া দিয়াছে। মাছ (অর্থাৎ মীন রাশি) হাফাইতেছে—যেন ইহা কশাই-এর কবলের পতিত একটি মেষ। লজ্জায় সূর্য উদিত হইল না ; যেহেতু ইহা এইরূপ দুর্ঘটনা বন্ধ করে নাই ; আর এইরূপ বিপর্যয় বন্ধ করে নাই ; এবং মাটিতে ডুবিয়া গেল। শুক্র যখন দেখিলেন এই যুদ্ধের ফলে সকল জীব কি দুঃখ দুর্দশায় পতিত হইয়াছে তখন তিনি তাহার তাম্বুরার সুর বদল করিয়া ফেলিলেন এবং এক ভিন্ন সুরে গাহিতে লাগিলেন। তিনি তাদের বাদ্য যন্ত্র বাজানোর বদলে তিনি ঐ মহানুভব শাহাযাদার, যিনি সর্বদা তাহার ভৃত্যগণের সকলের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিতেন, ইন্তেকালে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। বুধ,

যিনি একজন মুন্সির ন্যায় তাহার যুদ্ধ এবং অভিযানে বিজয়সমূহের তালিকা প্রণয়ন করিতেন। এই দুর্ঘটনার পরে তাহার দোয়াতদানের কালি দ্বারা তাহার মুখ কাল করিয়া লইলেন আর তাহার প্রণীত তালিকার পাতাগুলি দ্বারা তাহার জন্য একটি কাগজের অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিলেন। পৃথিবীর আলোড়নের ঐ দিনে উজ্জ্বল চন্দ্র অতি সরু অর্ধ চন্দ্রের আকারে দিগন্তে উদিত হইল।

শ্লোক

ধূলায় মুখ দিয়া তুমি শায়িত আছ হায় আমি তোমার
এইরূপ পরিণতি কামনা করি নাই।
হে আমার জীবনের চন্দ্র! তুমি মাটির নীচে চলিয়া যাইবে,
আমি ইহা কামনা করি নাই
তুমি যদি শিকারে গমন কর, তুমি যে ধূলা পদদলিত করিবে
তাহাই আমার স্থান
তোমার সঙ্গ আমার কাছে সুখকর! তোমার এই পরিণতি
আমি কামনা করি নাই।

মহান এবং পবিত্র আল্লাহ যেন ঐ বিজয়ী শাহাযাদার মর্যাদাবান বিশুদ্ধ এবং পবিত্র আত্মাকে উচ্চতর পদে এবং উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করেন। আর তাহাকে তাহার নিজস্ব সৌন্দর্যের মহত্বের আর গৌরবের পূর্ণ পাত্র যেন পান করান। তিনি এই দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ লোকটির প্রতি যে করুণা, এবং দয়া এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি যেন তাহার উচ্চতর পদ লাভের এবং তাহার ভুলভ্রান্তি মুছিয়া দিবার কারণ হয়। আমেন! হে সর্ব পৃথিবীর আর সর্ব মানুষের আল্লাহ!

এই সংবাদ যখন সুলতান বলবনের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি যারপরনাই দুঃখিত এবং শোকাভিভূত হইলেন। এই সময়ে তাহার বয়স আশি বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল আর যদিও তিনি নিজেকে শক্ত সমর্থ ও সাহসী দেখাইতে চেষ্টা করিতেন, এই দুর্ঘটনার জন্য যে অক্ষমতা এবং দুর্বলতা তাহার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সকলের নিকট প্রকট হইয়া উঠিল। এইসব ঘটনাবলীর পর সুলতান কায় খসরুকে একটি চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ প্রদান করিয়া তাহাকে তাহার পিতার স্থলে মুলতান প্রেরণ করেন। তিনি লক্ষণাবতী হইতে বুঘরা খানকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন; তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিচ্ছেদ আমাকে বিষণ্ণ এবং অক্ষম করিয়া দিয়াছে; আমি দেখিতেছি যে আমার পরলোকগমনের সময় আসন্ন। তুমি ছাড়া আমার আর কোন উত্তরাধিকারী নাই। এই সময়ে তোমার আমার

নিকট হইতে দূরে থাকা অনুচিত। তোমার পুত্র কায়কুবাদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র কায় খসরু উভয়েই তরুণ; এবং তাহাদের এই পৃথিবীর কোন অভিজ্ঞতা নাই। সাম্রাজ্য যদি তাহাদের হাতে পড়ে, তাহাদের অপরিণত বয়সের ফলে এবং ভোগ বিলাসের প্রতি তাহাদের আসক্তির ফলে তাহারা ইহা নিরাপদ রাখিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের কেহ যদি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে, তবে তোমার তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু তুমি যদি ঐ সিংহাসনে আরোহণ কর তবে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা তোমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবে এবং তোমার হুকুম মানিবে। কাজেই তোমার দিল্লী ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয়। বুঘরা খানের হৃদয়ে কিন্তু লক্ষণাবতী শাসন করিবারই অভিলাষ ছিল; আর যখন দেখা গেল যে সুলতান কিছুটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তিনি বিদায় না লইয়াই শিকারে গমনের ছুতায় লক্ষণাবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই সুলতানের রোগ বৃদ্ধি পাইল। এইবার সুলতান মালিক-উল উমরা ফখরুদ্দীন কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং কায় খসরুকে তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিবার নির্দেশ দান করিলেন। তিন দিন পর তিনি আল্লার করুণার সঙ্গে একত্র মিলিত হইলেন; তাঁই দার-উল আমানে (নিরাপদ নিবাস, রাজকীয় কবর খানা) তাহার কবর দেওয়া হইল।

যেহেতু কোতোয়াল ফখর-উল-উমরা এবং তাহার অনুচরগণ কায় খসরুর পিতা শহীদ শাহযাদার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, তাহারা কায় খসরুকে মিথ্যা ছলে মুলতান পাঠাইয়া দিলেন।

সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল বাইশ বৎসর কয়েক মাস স্থায়ী হইয়াছিল।

সুলতান মুইযযুদ্দীন কায়কুবাদ

সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন বলবনের ইন্তেকালের পর, বুঘরা খানের পুত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে কায়কুবাদকে সুলতান মুইযযুদ্দীন কায়কুবাদ উপাধি দান করিয়া সিংহাসনে বসানো হয়। এই শাহযাদা অতি চমৎকার নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সুলতান বলবন তাহাকে সর্বদা নিজের চোখে চোখে রাখিয়া লালন পালন এবং শিক্ষা দান করেন আর তাহার জন্য কঠোর শিক্ষক এবং অভিভাবক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ফলে এই সময় পর্যন্ত তাহার কোন আনন্দ উপভোগ করিবার এবং কোন বাসনা পূরণের সুযোগ হয় নাই। সহসা যখন তিনি সকল নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইলেন, যৌবনের প্রথম আগমনের ফলে আর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনার জন্য তিনি ভোগ বিলাসের

দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং শাসনের দায়িত্ব পালনের চেয়ে তাহারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিবার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। তিনি সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কারী এবং আত্মপূজারী হইয়া উঠেন; আর যেহেতু লোকেরা তাহাদের রাজার ধর্ম এবং আচরণের অনুকরণ করে, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলেই ভোগ বিলাস এবং আমোদ উৎসবে মত্ত হইয়া উঠে। সুলতান দিল্লী ত্যাগ করিলেন এবং যমুনার তীরে কিলোখেরীতে এক বিরাট দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং চমৎকার উদ্যান স্থাপন করিলেন আর ইহা তাহার রাজধানী করিলেন।

সুলতান মুইযযুদ্দীন ভোগ বিলাস এবং লাম্পট্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার ফলে, পৃথিবীর সর্বদিক হইতে তাহার দরবারে ভ্রষ্টা নারী, এবং ভাড়, এবং সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়ক-গায়িকা আসিয়া ভীড় করিল; আর যেহেতু ভারতে এই সব লোকের বহু শ্রেণী আছে, অসংযত জীবনযাত্রা এবং লাম্পট্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং শরাবখানা এবং বেশ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল; আর লোকের মন হইতে দুঃখ এবং দুশ্চিন্তা দূর হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল। সুলতানের দরবার সদা সর্বদা সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং সুমধুর গায়িকা এবং কৌতুকপ্রিয় লোক এবং চাটুকারদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকিত। ভোগ বিলাস এবং আমোদ প্রমোদ ছাড়া এক মুহূর্তও কাটিত না; আর লোকেরা উপহার এবং পুরস্কার দান করিয়া এবং অপব্যয় এবং অপচয়ে জীবন নির্বাহ করিত।

মালিক-উল উমরা কোতোয়ালের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা মালিক নিযামুদ্দীন সুলতানের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন; আর শাসনকার্যের সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে তাহার বিচার বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মালিক কওয়ামুদ্দীন ইলাকা, যিনি এই যুগের একজন অতুলনীয় লোক ছিলেন, উমদাত-উল-মুলক (প্রধান মন্ত্রী) এবং নায়েব ভকিল-দার (সহকারী প্রতিনিধি) নিযুক্ত হইলেন। যেহেতু মালিক নিযামুদ্দীন একজন সুচতুর এবং কপট লোক ছিলেন, বলবনী মালিকগণ, যাহারা মুইযযী সরকারের অফিসার এবং সহায়ক ছিলেন, তাহার লব্ধ ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির ফলে, ভীত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠেন; আর তাহার আনুকুল্য লাভের জন্য সচেষ্ট হন। রাষ্ট্রের সকল কাজে তাহারা তাহার ইচ্ছাকেই সর্বদা চোখের সম্মুখে রাখিত এবং দাসত্বের বন্ধন সুত্র তাহাদের হাত হইতে খসিয়া যাইতে দিত না। মালিক নিযামুদ্দীন ছিলেন সংকীর্ণমনা এবং লোভী। তিনি যখন দেখিলেন যে আমীর এবং মালিকগণ বিনীত এবং তাহার প্রতি অনুগত আর সুলতান মুইযযুদ্দীন লাম্পট্য এবং অসংযত জীবন যাত্রায় ডুবিয়া আছে, তখন ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্য লাভের, যাহার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন প্রকারেরই সম্পর্ক ছিল না, প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাহার মাথায় বাসা বাঁধে আর তিনি বলবন বংশকে নির্মূল করিবার জন্য আটসাঁট বাঁধিতে থাকেন। এই নির্বোধ

চিন্তা এবং উন্মত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুসরণে তিনি সুলতান মুইযযুদ্দীনকে বলিলেনঃ কায় খসরু আপনার সঙ্গে সাম্রাজ্যের সম-অংশীদার আর তিনি শাহাযাদা সুলভ গুণাবলীতে এবং রাজোচিত বৈশিষ্ট্য অলংকৃত।" তিনি তাহার মনে এই ধারণাও আনাইলেন যে আমীর এবং মালিকগণ তাহার পক্ষে অনুকূল মনোভাব পোষণ করে, আর এইরূপে তিনি তাহার নিকট হইতে তাহাকে (কায় খসরুকে) হত্যা করিবার এক হুকুমনামা আদায় করিলেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন ঐ কপট লোকটির কথা শুনিলেন এবং তাহা গ্রহণ করিলেন; এবং কায় খসরুকে তলব করিয়া এক নির্দেশনামা মুলতানে প্রেরণ করিলেন, এবং ঐ নিরপরাধ শাহাযাদাকে পথিমধ্যে হত্যা করিবার জন্য কতিপয় লোককে নিযুক্ত করিলেন। ঐ নির্দেশ অনুযায়ী অসহায় কায় খসরু দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু রুহটাকে তিনি শহীদ হইলেন। ইহার পর মালিক নিযামুদ্দীন উযির খাজা খতিবের বিরুদ্ধে এক অপরাধের এক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলেন এবং একটি গাধার পিঠে চড়াইয়া তাহাকে রাজধানীর চতুর্দিকে ঘুরাইয়া আনিলেন। আমীর এবং মালিকগণের মনে মালিক নিযামুদ্দীনের প্রতি যে ভয়ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল এবং সকল লোক তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিল।

এই সময়ে লাহোরের উপকণ্ঠে মুঘলদের আগমনের সংবাদ আসিল। তাহাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য মালিক বরবাক বেগ তারস এবং খান জাহানকে প্রেরণ করা হইল। লাহোরের উপকণ্ঠে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হইলে আর মুঘলদের অধিকাংশই নিহত হইল; আর তাহাদের বেশ কিছু সংখ্যককে বন্দী করা হইল এবং দিল্লী আনয়ন করা হইল। ইহার পর একদিন মালিক নিযামুদ্দীন সুলতান মুইযযুদ্দীনকে বলিলেন যে মুঘল আমীরগণ সকলেই একই শ্রেণীর এবং তাহাদের বহু অনুচর আছে। তাহারা যদি একত্র বা এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ করে তবে সে ক্ষতি-পূরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। এইরূপ মধুর এবং সত্য বলিয়া প্রতীয়মান কথা দ্বারা তিনি সুলতানকে প্রতারণা করিলেন এবং মুঘল আমীরদের নিধনের জন্য অনুমতি লাভ করিলেন; আর একদিনে তাহাদের সকলকে বন্দী করা হইল এবং হত্যা করা হইল। তাহাদের পরিবারগুলিকেও নির্মূল করিয়া দেওয়া হইল। কতিপয় বলবনী আমীর যাহারা মুঘল আমীরদের মিত্র ছিলেন অথবা তাহাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কারারুদ্ধ করা হইল এবং দূর-দূরান্তরের দুর্গসমূহে প্রেরণ করা হইল। প্রাচীন পরিবারগুলিকে ধ্বংস করা সম্বন্ধে মালিক নিযামুদ্দীনের কোন বিবেক দংশন ছিল না; এবং তিনি মুলতানের জায়গীরদার আমীর শাহবক এবং বরণের জায়গীর-দার আমীর ইয়েষ্কীকে, ইহারা সুলতান বলবনের আমীর ছিলেন, তিনি যে কোন

ছলছুতা খুঁজিয়া পাইলেন তাহাই প্রয়োগ করিয়া হত্যা করিলেন। তিনি সুলতানকে তাহার অনুগত করিয়া ফেলিলেন যে, যখনই যে কেহ যে কোন সময়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সুলতানের নিজের মঙ্গলের জন্য তাহার ছল চাতুরী এবং ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সামান্য দুই চারিটি কথাও সুলতানের নিকট বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মালিক নিযামুদ্দীনের নিকট পুনরাবৃত্তি করিতেন: আর লোকটি বন্দী করাইয়াই তাহার নিকট সমর্পণ করিতেন। মালিক নিযামুদ্দীনের স্ত্রী, যিনি মালিক-উল-উমরার কন্যা ছিলেন, সুলতানের হারেমে মহাপ্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন আর সুলতান তাহাকে 'মাতা' পদবীতে সম্বোধন করিতেন। তাহার মহা-ক্ষমতার জন্য আমীর এবং মালিকগণ তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে হীনভাবে অনুগত এবং দাসত্ব ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন; আর তাহারা জানিত এবং প্রয়োগ করিতে পারিত, সেরূপ সকল প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা তাহাকে খুশী করিতে এবং তাহার ছল চাতুরী হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত। তাহার প্রবেশ দ্বার উচ্চ নীচ সকলেরই আশ্রয়স্থলে পরিণত হইল; আর মুইযযী দরবারে মর্যাদা এবং গৌরব মুছিয়া গেল।

কবিতা

যে রাজা নীচ লোককে মর্যাদার উচ্চ শিখরে তুলিয়া দেয়
বৃহৎ ক্ষুদ্র সর্ব প্রকারের বিপদ ডাকিয়া আনে; হায়
যে আগুন পানিকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে
অবশ্যই নিজের উপর ঘৃণা এবং বিপদ ডাকিয়া আনে।

মালিক-উল-উমরা কোতোয়াল যখন মালিক নিযামুদ্দীনের, যিনি তাহার নিকট পুত্রতুল্য ছিলেন, এই সব বিপদজনক ষড়যন্ত্র এবং বিকারগ্রস্ত কারসাজী সম্বন্ধে অবহিত হইলেন, তখন তিনি তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আর বিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ দ্বারা এবং গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দ্বারা তাহার মাথা হইতে অবাস্তব পরিকল্পনাসমূহ এবং মন্দ অভিপ্রায়সমূহ দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু ইহা দ্বারা কোনই ফল হইল না। অপরিপক্ক বোধশক্তির এবং খারাবী মন সম্পন্ন ঐ লোকটি তাহার কথা শুনিলেন না; আর প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সবই ন্যায় আর তাহার বিপরীতটাই অন্যায়। কিন্তু যেহেতু আমি লোককে আমার শত্রুতে পরিণত করিয়াছি, আর আমার অভিপ্রায় কি তাহা তাহারা সকলেই জানে, এখন যদি আমি আমার প্রসারিত হস্ত গুটাইয়া আনি, তখন তাহারা আমার উপর হইতে তাহাদের হস্ত অপসারণ করিবে না।" মালিক-উল-উমরা মালিক

নিযামুদ্দীনের ষড়যন্ত্রের প্রতি তাহার ঘৃণা প্রকাশ করিলেন ; আর তাহার প্রতি যারপর-নাই বিরক্ত হইলেন। ইহা যখন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জানাজানি হইল, তখন তাহারা সকলেই মালিক-উল-উমরার প্রশংসা করিলেন ; আর রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাহার দুরদৃষ্টি এবং প্রচেষ্টা সকলের নিকটই প্রকাশ পাইল।

সংক্ষেপে, সুলতান মুইযযুদ্দীনের পিতা বুঘরা খান, যিনি লক্ষ্ণাবতীর অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন আর যাহার উপাধি ছিল সুলতান নাসিরুদ্দীন, শুনিতে পাইলেন যে সুলতান সর্বদাই অসংযত জীবন যাপন এবং লাম্পট্যে ডুবিয়া আছে এবং শাসন-কার্যের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না ; আর মালিক নিযামুদ্দীন সকল বলবনী আমীর এবং মালিক এবং সকল যোগ্য মন্ত্রী এবং অফিসারগণকে ধ্বংস সাধন করিয়া এখন বিদ্রোহ করিতে চাহিতেছে ; আর তাহার পুত্রকে বহু উপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন ; আর তিনি আকার ইঙ্গিতে সকল আমীর এবং মালিককেও সংবাদ দিলেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন যৌবনের অহমিকা এবং সুরার মাদকতাবশতঃ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না : আর তাহার পিতা তাহাকে যাহা লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোন প্রকার আশঙ্কা অনুভব করিলেন না। সুলতান নাসিরুদ্দীন যখন দেখিলেন যে তাহার অবর্তমানে তাহার উপদেশে কোনই কাজ হয় নাই, তখন তিনি তাহার পুত্রের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যাহাতে তিনি তাহার যাহা বলিবার তাহা মুখোমুখি বলিতে পারেন। তিনি নিজ হস্তে তাহার পুত্রকে এক পত্র লিখিয়া তাহা প্রেরণ করিলেন, আর ইহাতে বলিলেন ; "হে আমার পুত্র ; তোমাকে দেখিবার বাসনা আমার সকল শক্তি হরণ করিয়াছে ; আমাকে আর বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর করিয়া রাখিও না ; এবং তোমায় একবার দেখিবার অনুমতি দাও।" সুলতান মুইযযুদ্দীন যখন তাহার পিতার স্নেহমাখা পত্রখানা পাঠ করিলেন, তখন তাহার ভালবাসা পুনর্জীবিত হইল, এবং তিনি স্নেহশীল বার্তাসহ তাহার নিকট একটি পত্র লিখিলেন এবং তাহা তাহার সিংহাসনের নিকটস্থ এক লোকের দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন ; আর তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এইরূপে উভয় দিক হইতে স্নেহময় অনুভূতির শিকলে আলোড়ন উঠিল এবং পত্র এবং সংবাদ আদান প্রদানের পর স্থির হইল যে সুলতান মুইযযুদ্দীন দিল্লী হইতে অযোধ্যা গমন করিবেন, আর সুলতান নাসিরুদ্দীনও তাহার রাজধানী হইতে ঐ স্থানে আগমন করিবেন ; এবং উভয় সুলতান ঐ স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন এবং পরস্পরের সঙ্গ সুখ উপভোগ করিবেন। আমীর খসরুর কিরান-উল সাদাইন পিতা পুত্রের এই সাক্ষাৎকারেই বিবরণ। আমীর খসরুর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে সুলতান নাসিরুদ্দীন দিল্লী

অধিকার করিবার এবং তাহার পুত্রকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই লক্ষণাবতী হইতে যাত্রা করেন; আর সুলতান মুইযযুদ্দীনও যুদ্ধ এবং রক্তপাতের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন, আর অযোধ্যায় আপোশে ব্যাপার মিটমাট করা হয়।

সংক্ষেপে, সুলতান মুইযযুদ্দীন 'কাকী দ্রুত গতিতে তাহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে চাহিয়াছিলেন। মালিক নিযামুদ্দীন বলিলেন যে বাদশাহের পক্ষে এই সুদূরের পথ একাকী পরিভ্রমণ করা সঙ্গত হইবে না। [তিনি যুক্তি দিলেন যে] রাষ্ট্রের ব্যাপারে পিতা এবং পুত্রের সম্পর্কের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ইহা ন্যায়সঙ্গত যে সুলতান পরিপূর্ণ আড়ম্বর এবং সাম্রাজ্যের সর্বপ্রকার আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র এবং এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী সহ গমন করিবেন; যাহাতে সকল রায়, রাজা এবং জমিদার বাদশাহের জাঁকজমক এবং আড়ম্বর দেখিয়া ভয় এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়; এবং যাহাতে পরিপূর্ণ বিজয়, বাধ্যতা আনুগত্যের সহিত ব্যবহার করে। মালিক নিযামুদ্দীনের উপদেশ অনুযায়ী সুলতান এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী লইয়া অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং সর্ব প্রকার আড়ম্বর এবং রাজোচিত পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন যখন ইহা শুনিতে পাইলেন এবং জানিতে পারিলেন যে মালিক নিযামুদ্দীনের উপদেশ মতই এরূপ করা হইয়াছে, তখন তিনিও বহু সংখ্যক অনুচর এবং সেনাবাহিনী এবং হস্তীসহ তাহার পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লক্ষণাবতী হইতে যাত্রা করিলেন। দুই সেনাবাহিনী সরযুর দুই তীরে শিবির স্থাপন করিল। তিন দিন ধরিয়া সাক্ষাতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ এবং চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হইল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে পুত্র সিংহাসনে বসিয়া থাকিবে আর সুলতান নাসিরুদ্দীন নদী অতিক্রম করিয়া আসিবেন এবং তাহার পুত্রকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। সুলতান মুইযযুদ্দীন তাহার মঞ্চ প্রস্তুতের নির্দেশ দান করিলেন এবং কায় খসরু এবং কায়কুবাদের পূর্ণ আড়ম্বরে ইহাতে আসন গ্রহণ করিলেন এবং সাক্ষাতের স্থানটিকে সুসন্নিবেশিত এবং সুসজ্জিত করিবার নির্দেশ দিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন পার্শ্ববর্তী কক্ষের নিকটে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং তিন স্থানে ভূমি চুম্বনের অনুষ্ঠান পালন করিলেন। তৎপর তিনি যখন সিংহাসনের সম্মুখে আসিলেন, তখন সুলতান মুইযযুদ্দীন আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। তিনি সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাহার পিতার পায়ে পড়িলেন; আর তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের বুকে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া দর্শকগণের চোখে অশ্রু ঝরিতে আরম্ভ করিল। পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন এবং ইহার সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু পুত্র পুনরায় নামিয়া আসিলেন এবং পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন, আর নিজে সম্মানের সঙ্গে তাহার সম্মুখে বসিলেন। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তংগা বিতরণ করা হইল। কবিগণ গীতি কবিতা ও প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করিলেন; গায়কগণ গান করিল; আর আবাহনকারী এবং ঘোষকগণ ঘোষণা করিলেন, আর প্রথানুযায়ী মহা-সমাবেশের সম্পর্কীত রাজকীয় জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হইল। উভয় সুলতান পরস্পর আলাপ আলোচনায় প্রীত এবং মুগ্ধ হইলেন।

কিছুকাল পর সুলতান নাসিরুদ্দীন গাত্রোত্থান করিলেন, নদী অতিক্রমণ করিলেন এবং তাহার নিজের মঞ্চে গমন করিলেন। অতঃপর পিতা এবং পুত্র পরস্পরকে দুষ্প্রাপ্য এবং বহু মূল্য উপহার, সুস্বাদু ফল, মিষ্টান্ন দ্রব্য এবং উপাদেয় খাদ্য এবং পানীয় প্রেরণ করিলেন। উভয় বাহিনীর সৈন্যগণকে পরস্পরের বাসস্থানে গমনের এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। পর পর বেশ কয়েক দিন সুলতান নাসিরুদ্দীন তাহার পুত্রের মঞ্চে আগমন করিলেন। দুই সুলতান পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করিলেন, সভা অনুষ্ঠান করিলেন এবং নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ এবং আনন্দোৎসব করিলেন এবং পরস্পরের সঙ্গে পানীয় পান করিলেন। বিদায়ের দিন যখন সমাগত হইল, তখন সুলতান নাসিরুদ্দীন তাহার পুত্রকে বলিলেন, "জামশেদ বলিয়াছেন যে কোন রাজা যদি তাহার কোষাগারে যদি এমন অর্থ মজুদ না রাখে, যাহাতে তিনি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার দিনে তাহার সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করিতে না পারে এবং দুর্ঘটনা এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে যদি তিনি তাহার প্রজাদের উদ্ধার করিতে না পারেন, এমন রাজা মানুষের রাজা পদবাচ্যের উপযুক্ত নয়।" "আর তাহাকে আরও উপদেশ দিলেন যাহা বিশেষভাবে রাজাদের মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত। সুলতান মুইযযুদ্দীন বলিলেন যে যেহেতু তাহার কোন পৃষ্ঠপোষক বা সমবেদনাকারী নাই, কে তাহাকে অসাবধানতার নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিবে, সকল বিষয়ে যাহা কিছু ন্যায় এবং সঙ্গত তাহার সঙ্গে সুলতান যেন তাহাকে পরিচিত করাইয়া দেন; যাহাতে তিনি ইহা তাহার ব্যবহারের পথ প্রদর্শক করিতে পারেন এবং যাহাতে কোন প্রকারেই ইহা ভঙ্গ না হয় তাহা দেখিতে পারেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন পৈতৃক স্নেহের উল্লাসে বলিলেন "আমি এই ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমার জ্ঞানের কর্ণকে আমি উপদেশের মুক্তায় ভারী করিয়া দিতে পারি; যাহাতে যৌবন এবং ক্ষমতা এবং ভোগ বিলাসের বাসনার আনুসঙ্গিক সহযোগিতার ঘুম হইতে জাগাইতে পারি; আর পিতার প্রেম ও

স্নেহ দ্বারা যাহা কিছু করা সম্ভব যাহাতে তাহা করিতে পারি।" অতঃপর তিনি প্রত্যেককে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে মালিক নিযামুদ্দীন এবং কাওয়ামুদ্দীন, যিনি উমদাত-উল-মুলক, শুধু থাকিতে পারেন; যাহাতে তাহার যাহা বলার আছে তাহা যেন তাহাদের সম্মুখেই বলিতে পারেন। মন্ত্রী দুইজন আসিলেন। তৎপর সুলতান নাসিরুদ্দীন স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে বলিলেন, "হে পুত্র, আমি যখন শুনিলাম যে, তুমি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছ তখন আমি যারপরনাই প্রীত হইলাম। আমি জানিতাম যে আমার লক্ষণাবতী রাজ্য আছে; এখন আমি দিল্লী সাম্রাজ্যও লাভ করিলাম। কিন্তু এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে যে আমি তোমার ভোগ বিলাসের এবং অসংযত জীবন যাত্রায়, তোমার গাফিলতি এবং অমনযোগিতার গল্প শুনিতেছি। আর আমি অবাক হইতেছি যে তুমি এখনও নিরাপদে আছ। ঐ দিন হইতে আমি তোমার জন্য এবং আমার নিজের জন্য শোক যাপন করিয়াছি; আর আমি দিল্লীর এবং লক্ষণাবতী রাজ্যদ্বয় ধ্বংসের ক্রোড়ে পতিত হইয়াছে দেখিতেছি; আর তাহাদের জন্য সকল আশা ত্যাগ করিয়া আমার হৃদয় শূন্য করিয়া দিয়াছি; আর বিশেষ করিয়া ঐ দিনে, যখন আমি শুনিলাম যে, তুমি আমার পিতার কর্মচারীগণকে, যাহারা তাঁহার ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হইয়াছে, এবং যাহারা আন্তরিকভাবে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছ। যেহেতু তুমি তাহাদিগকে হত্যার নির্দেশ দিয়াছ, অন্যান্যগণ তোমার প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমার আর কোন আশা কোন ভরসা নাই। তুমি ইহা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ আমার পুত্র। যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি সিংহাসন অলংকৃত করিবার উপযুক্ত ছিলেন, তিনি আমার পিতার জীবদ্দশায়ই শহীদ হইয়াছেন, তাহার পুত্র, যে সুলতান হইবার যোগ্য ছিল, আর যে তোমার শক্তি এবং সহায়ক ছিল, যাহারা তোমার অমঙ্গল চিন্তা করে তাহাদের প্ররোচনায় তুমি তাহাকে ধ্বংস করাইয়াছ; যাহাতে তাহারা তোমাকেও শেষ করিয়া দিতে পারে; আর দিল্লীর সাম্রাজ্য এক অপরিচিত পরিবার এবং গোত্রের হস্তে চলিয়া যাইতে পারে, তাহারা এই পৃথিবীর বুকে আমাদের নাম মুছিয়া দিবে এবং আমাদের কোন চিহ্নই রাখিবে না; হে পুত্র, তোমার যদি নিজের প্রতি কোন সহানুভূতি না থাকে, তোমার পরিবার এবং তোমার সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। খেলাধূলায় নিজেকে ধ্বংস করিও না, তোমার নিজের অবস্থার প্রতি দয়া কর আর আমার এই কয়েকটি উপদেশের প্রতি মনোযোগ দিও। প্রথমটি হইল এই, তোমার নিজের জীবনের প্রতি দয়াশীল হও আর তোমার স্বভাবের সংস্কারে

মনোনিবেশ কর। তোমার গাত্রের রং গোলাপ এবং চুনির ন্যায় সতেজ এবং লাল ছিল; ইহা হলুদের চেয়ে হলদে হইয়া গিয়াছে। কামুকতা হইতে নিজেকে সংযত কর, যাহা তোমাকে দুর্বল এব কৃশ করিয়া দিয়াছে, ইহার পিছনে ছুটিও না; কারণ যখন জীবনই বিপদাপন্ন তখন কেহই কোন ভোগ বিলাস করিতে পারে না।

শ্লোক

কোন রাজার মাতাল বা পাগল হওয়া উচিত নয়;
তাহার কখনও কামুকতায় আসক্ত হওয়া উচিত নয়।
রাজার সর্বদাই রাখাল হওয়া উচিত
হায়! যদি কোন রাখাল কখনও মাতাল হয়।
রাখাল যদি লাল লাল সুরায় মত্ত হয়
ভেড়া তখন নেকড়ে পেটে নিদ্রা যাইবে।
সাম্রাজ্যের আর রাষ্ট্রের আইন কানুনে
স্থায়িত্বেই বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় উপদেশ হইল এই, যে আমীর এবং মালিকগণকে হত্যা করা হইতে তুমি বিরত থাকিবে; যাহাতে মন্ত্রী এবং কর্মচারীদের তোমার প্রতি যে আস্থা আছে যেন হ্রাস না পায়। এই দুইজন লোক আছেন, যথা মালিক নিযামুদ্দীন এবং কাওয়ামুদ্দীন যাহারা পরিণত বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞ মন্ত্রী। আমীরগণের মধ্য হইতে তুমি এরূপ আর একজন লোককে বাছিয়া নিবে; আর এই তিনজনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখিবে; আর ইহাদের প্রত্যেককে তোমার মহত্বের একটি খুঁটিরূপে গণ্য করিবে। যে সব কাজ করিবে তাহা ইহাদের মত এবং পরামর্শ নিয়া সম্পন্ন করিবে। ইহাদের একজনকেও ওজারতের দেওয়ান (অর্থাৎ উযির বা প্রধান মন্ত্রীর পদ) নিযুক্ত কর; দ্বিতীয় জনকে কর রিসালতের দেওয়ান (বা সম্পাদকের দায়িত্ব); তৃতীয় জনকে কর আরয-এর (আর্জির মন্ত্রী) আর চতুর্থ জনকে কর, ইনশার দেওয়ান (চিঠিপত্র প্রদানের মন্ত্রী)। তিন জনের প্রত্যেককে তোমার কাছে আসিবার সমান অধিকার দিবে; যদিও তাহাদের দায়িত্বের গুরুত্ব অনুযায়ী তাহাদের পদমর্যাদা ভিন্ন হইতে পারে। ইহাদের কাহাকেও এমন অধিক ক্ষমতা দিও না যাহার ফলে সে অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে। তৃতীয় উপদেশ হইল এই, রাষ্ট্রের যেসব গোপন তথ্য তোমাকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা তুমি ইহাদের তিনজনেরই উপস্থিতিতে করিবে। ইহাদের কোন একজনের প্রতি এত অধিক আস্থা স্থাপন করিও না, যাহার ফলে অন্যান্য হতাশ হইতে পারে। চতুর্থ উপদেশটি হইল এই যে, তুমি নিয়মিত নামাজ আদায় করিবে আর

রমযান মাসে রোজা রাখিবে; যাহাতে এই দুই কর্তব্য সম্পাদন না করিবার ফলে এই পৃথিবীতে এবং পরলোকে তোমার সর্বনাশ সাধন না হইতে পারে। আমি শুনিয়াছি যে এই যুগের একজন শঠতাপূর্ণ বিদ্বান ব্যক্তি তোমাকে খুশি করিবার জন্য রমযানের রোজার সময় তোমাকে খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দান করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, যে তুমি যদি একজন যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দান কর অথবা ষাট জন দরিদ্র লোককে খাদ্য দাও, তবে তাহা তোমার রোজার সময়ে খাদ্য গ্রহণের পাপ স্খলন হইবে। এরূপ পণ্ডিত লোকের কার্যকলাপ এবং কথাবার্তার প্রতি কোনরূপ সংশ্রব রাখিও না। ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ কখনও লোভী এবং ধনলিপ্সু পণ্ডিত লোকদের নিকট হইতে, যাহারা এই পৃথিবীকে তাহাদের আরাধনার লক্ষ্য করিয়া নিয়াছে, গ্রহণ করিও না। যাহারা এই পৃথিবী হইতে বিমুখ হইয়াছেন এবং যাহাদের চেতনার চোখে ধনসম্পদ এবং এই পৃথিবীর জিনিসপত্র মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে ধর্মের রীতি-নীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন একমাত্র তাহাদের নিকটই তুলিবে।" তিনি ইহা বলিলেন এবং কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি সুলতান মুইযযুদ্দীনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, তখন তিনি তাহাকে কানে কানে বলিলেন, "তুমি যত শীঘ্র সম্ভব ঘিয়াসুদ্দীনকে তাড়াইয়া দিও; কারণ সে যদি সুযোগ পায় তবে তোমাকে একদিনও বাঁচিয়া থাকিতে দিবে না।" তিনি ইহা বলিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিজের মঞ্চে চলিয়া গেলেন। ঐ দিন তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিলেন এবং তাহার বিশ্বাসভাজনের নিকটে বলিলেন, "আজ আমি আমার পুত্রের নিকট হইতে এবং দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

ইহার পর সুলতান মুইযযুদ্দীন অযোধ্যা হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি তাহার পিতার উপদেশ এবং শিক্ষাসমূহ মনে রাখিলেন; এবং নিজেকে ভোগ বিলাস এবং অসংযত জীবনযাত্রা হইতে দূরে রাখিলেন। ইহা সত্ত্বেও যে সুরা ও নারীর প্রতি মোহ তাহার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল আর তাহার আমোদ প্রমোদের সঙ্গিগণ থাকার ইঙ্গিতে অসংযত জীবনযাত্রার স্রোত প্রবাহিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাহাকে প্ররোচিত করিলেন, তবু তাহার পিতার উপদেশের ফলে যাহা সকলেই অবগত হইয়া গিয়াছিল এবং লজ্জা এবং বিনয়ের ফলে তিনি নিজেকে সংযত করিয়া রাখিলেন। যেহেতু তাহার সামাজিক সমাবেশের সংবাদ এবং তাহার ভোগ-বিলাস এবং অসংযত জীবনযাত্রায় আসক্ত থাকিবার কাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন দিক এবং অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দলে দলে সুন্দরী

বেশ্যাগণ এবং যে সব লোক ধনীদের কামুকতার খোরাক জোগাইবার ব্যবসায় লিপ্ত তাহারা তাহার দরবারে আসিত আর প্রতিদিন নিজেদের সুসজ্জিত করিয়া এবং নিজেদের তাহার সাহচর্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দেখা দিত এবং তাহার খেদমত করিতে চাহিত। যেহেতু সুলতান এইসব দলের সাহচর্যের জন্য তাহার হৃদয় দিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের কামনার জন্য নিজেদের জীবন বিকাইয়া দিয়াছিলেন যদিও তিনি তাহার পিতার উপদেশ মনে রাখিতে চেষ্টা করিলেন, তবু ক্ষণে ক্ষণে তাহার হৃদয়ের রশি তাহার হাত হইতে ছুটিয়া যাইতে লাগিল আর মুহূর্তে মুহূর্তে কামনার আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। অনিচ্ছা সত্বে তিনি এই বেশ্যাদের মুখ এবং দেহের দিকে চোরা দৃষ্টি হানিতে লাগিলেন এবং তাহার চোখের কোণ দিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটিল যে একজন সুচতুর যুবতী বেশ্যা, যে এই যুগের সুন্দরীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল এবং এই সময়ের অতুলনীয় সুন্দরীগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, একটি কারুকার্য খচিত টুপি মাথায়, সোনালী কাজ করা একটি আবরণ গায়ে দিয়া এবং জহরতের একটি কোমরবন্ধ কোমরে বাঁধিয়া, একটি আরবী অশ্বে চড়িয়া, যাত্রার সময়ে রাজকীয় চাঁদোয়ার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একশত প্রকারের তোষামোদ এবং ছিনালীপনা হাব-ভাব প্রদর্শন করিল, যাহা যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল এবং সুমধুর স্বরে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিল।

শ্লোক

হে প্রিয় তুমি আমার চোখে তোমার পদ স্থাপন কর
আমি তোমার পথের উপর আমার চক্ষু নিক্ষেপ করিব, যাহাতে তুমি
তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পার।

ইহার পর সে বলিল, "আমার বিশ্বাস এই গীতি কবিতার আরম্ভের পংক্তিগুলি এই ঘটনার পরিবেশের সঙ্গে আরও অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি সেগুলি আবৃত্তি করিতে পারিব না।" সুলতান বলিলেন, "ভয় করিও না, সেগুলি আবৃত্তি কর।" সে গাহিল—

হে রূপালী বর্ণের সাইপ্রেস, তুমি মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ,
তুমি এক আশ্চর্য রকম অঙ্গীকার ভঙ্গকারী! তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছ।

তাহার বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্য এবং মনোমুগ্ধকর অঙ্গসৌষ্ঠব এবং অঙ্গভঙ্গী দর্শনে সুলতান এত আশ্চর্যান্বিত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন সে মুহূর্তে তিনি তাহার

পিতার সকল উপদেশ ভুলিয়া গেলেন। তিনি নিজের প্রতি সকল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিলেন, এবং পথে দাঁড়াইয়া এই অঙ্গীকারভঙ্গকারীনীর সঙ্গে কথা বলিলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সুরা দিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ স্থানেই থাকিয়া গেলেন। তিনি তাহার আমোদ প্রমোদ সঙ্গীগণের এক সমাবেশ ডাকিলেন এবং বিমুগ্ধ হইয়া তাহার নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন ঃ

সুন্দরীর তোষামোদের ভয়ে আমি রাত্রিকালে মদ পরিহার করি
ভোরে সুরাপাত্রে ফিবির মুখ আমাকে আকর্ষণ করে।

ঐ সুচতুর অসতী রমণীটি যখন সুলতানের মুখ হইতে এই শ্লোকটি শুনিল, প্রত্যুত্তরে সে বলিল ঃ

আমার মুনির-ধ্যানভঙ্গকারী ছিনালীপনা, শত বৎসরের সন্ন্যাসীকেও
মাথার কেশগুচ্ছ ধরিয়া সুদূরের সুরার দোকানে নিয়া যায়।

তাহার বুদ্ধিমত্তার সৌন্দর্যে এবং তাহার নরম প্রত্যুত্তরের ঔজ্জ্বল্যে সুলতান বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তিনি তাহাকে তাহার পান-পাত্রবাহিকা নিযুক্ত করিলেন। বিনয় এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর সে বলিল—

যদিও আমি চন্দ্র হইতেও সুন্দরী
তবু আমি সুলতানের ইচ্ছার একজন ক্রীতদাসী।

এবং পেয়ালা পূর্ণ করিল এবং তাহা সুলতানের হস্তে প্রদান করিল। শেষোক্ত জন তাহার হাত হইতে ইহা গ্রহণ করিল এবং তাহার প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করিতে এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিলেন ঃ

পেয়ালা যখন আমাকে দিবার সময় হয়, তাহা আমার এই বন্ধুদের দাও ;
আর আমার পাশ দিয়া যাও,যাহাতে আমার সন্ধানী চক্ষু আমি ফিবির মুখে স্থির করিতে পারি
তুমি যদি আমার পেয়ালা বাহিকা হইবার ভান কর, হে প্রেয়সী
কার সাহস যে ঘোষণা করে মদ পাপপূর্ণ আর অপবিত্র।

তিনি ইহা বলিলেন আর পাত্র শূন্য করিয়া দিলেন। আমীর এবং মালিকগণ পুনরায় অসংযত জীবনযাত্রা এবং কামুকতায় লিপ্ত হইল। পরদিন সুলতান ঐ স্থান

হইতে যাত্রা করিলেন। দিল্লী পৌঁছান পর্যন্ত যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি আমোদ-প্রমোদের মজলিশ করিলেন এবং ভোগ বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন। তিনি কিলোখেরির দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। সুলতানের প্রত্যাবর্তনে নাগরিকগণ প্রচুর আনন্দোৎসব করিল এবং ভোজ উৎসব সম্পন্ন করিয়া এবং সুসজ্জিত তোরণ নির্মাণ করিল। সুলতান মুইযযুদ্দীনের সময়ে ভোগ বিলাসে গা ভাসানো, ভোজ এবং আনন্দোৎসব সম্পন্ন করা এত সার্বজনীন হইয়া উঠিল যে, শহরের প্রতি গলিতে এবং প্রতি অঞ্চলে লোকেরা প্রকাশ্যে মদ্য পান করিত এবং ভোজন উৎসব করিত। লোকের মন হইতে চিন্তাভাবনা দূর হইয়া গেল এব ইহাদের পরিবর্তে উদাসীনতা স্থান পাইল। এইরূপে কয়েক মাস গত হইলে পর সুলতান অসুস্থ হইয়া পড়িলেন আর তাহার মহা-কামুকতা এব অনবরত মদ্য পান তাহাকে দুর্বল এবং হীন করিয়া দিল।

এই সময়ে তিনি তাহার পিতার উপদেশ অনুযায়ী নিযামুদ্দীনকে অপসারণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না; এব ঝোঁকের মাথায় তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন, 'আপনি মুলতান চলিয়া যান এবং ঐ জায়গীরের দেখাশুনা করুন।' মালিক নিযামুদ্দীন জানিতেন যে সুলতান তাহাকে পথ হইতে দূরে সরাইতে চাহিতেছেন, এবং যাত্রা করিতে বিলম্ব করিলেন এবং নানারূপ ওজর আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু যাহারা সুলতানের নিকটস্থ ছিলেন এব যাহারা সর্বদাই মালিক নিযামুদ্দীনের মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন, যখনই তাহারা সুলতানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, তখনই তাহারা বিষ প্রয়োগে তাহাকে অপসারণ করিলেন।

শ্লোক

যেমন তিনি মানুষের রক্তপাতে কার্পণ্য করেন নাই
সময় তাহার রক্তে আপনার ছোরা প্রবিষ্ট করাইল

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতগণ তখন সামানার গভর্ণর মালিক জালালুদ্দীন ফিরোযকে, যিনি প্রাসাদ রক্ষীদের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তাহার জায়গীর হইতে ডাকাইয়া আনিলেন; আর তাহাকে সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং বরণ নামক জায়গীর দিলেন আর তাহাকে শায়েস্তা খান উপাধি দান করিলেন। তাহারা মালিক আইতামার কুজন বারবককে (অনুষ্ঠানের কার্যসচিব) এব মালিক আইতামার সুরখাহকে ভকিল-দার নিযুক্ত করিলেন; আর বিভিন্ন পদ নূতন করিয়া আমীরগণের মধ্যে বণ্টন করা হইল। ইতিমধ্যে সুলতানের অসুস্থতা খারাপের দিকে গেল। তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলেন, বিছানায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং

শাসনকার্য সম্পাদনে অপারগ হইয়া গেলেন, শক্তিশালী আমীরগণের সকলেরই সাম্রাজ্য হস্তগত করিবার চিন্তা প্রবেশ করিল ; প্রত্যেক হৃদয়ে পাগলামী এবং প্রত্যেক বুকে আশার উচ্চাকাঙ্খা বাসা বাঁধিল। কতিপয় বলবনী আমীর, তাহারা এই বংশের নিকট হইতে যে সব অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহার কৃতজ্ঞতায়, সুলতান মুইযযুদ্দীনের শিশু পুত্রকে হারেম হইতে বাহির করিয়া আনিলেন! আর তাহাকে সুলতান শামসুদ্দীন উপাধি দান করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। তাহারা নাসিরী চবুতরে রাজকীয় মঞ্চ প্রস্তুত করিলেন এবং শিশু সুলতানকে তথায় রাখিলেন। আমীর এবং মালিকগণ এই মঞ্চের চতুর্দিকে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুলতান মুইযযুদ্দীনের অবস্থা তখন চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে কিলোখেরির দুর্গে চিকিৎসাধীন রাখা হইল।

সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মালিক জালালুদ্দীন ফিরোয খলজী, সকল খলজীদের সহ, যাহাদের দলটি বেশ বড় ছিল, বাহাপুরে শিবির স্থাপন করিলেন এবং সৈন্য সমাবেশ করিলেন। বারবক মালিক আইতামার কুজন এবং ভকিল-দার মালিক আইতামার সুরখাহ এবং বলবনী আমীরগণের সকলে একত্রিত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে সব আমীর বিদেশী এবং প্রকৃত তুর্কী নয় তাহাদিগকে পথ হইতে অপসারণ করিতে হইবে। তাহারা তাহাদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিলেন। ঐ তালিকায় মালিক জালালুদ্দীন খলজীর নামও ছিল। শেষোক্তজন যখন ইহা অবগত হইলেন, তখন তিনি তাহার লোকজনকে একত্র করিলেন এবং সমস্ত খলজী আমীর এবং মালিককে একত্র করিলেন এবং তিনি অন্যান্য কতিপয় আমীরকেও তাহার দলে যোগ দেওয়াইলেন। এই সময়ে বারবক মালিক আইতামার কুজন অশ্বারোহণ করিলেন, যাহাতে তিনি মালিক জালালুদ্দীন ফিরোযকে ছল চাতুরী করিয়া (তাহাদের শিবিরে আসিতে প্ররোচিত করিতে পারেন এবং তথায় তাহাকে হত্যা করিতে পারেন। মালিক জালালুদ্দীন ফিরোয এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত ছিলেন, ফলে যেই মাত্র মালিক আইতামার কুজন তাঁবুর দরজায় আসিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে অশ্ব হইতে টানিয়া নামান হইল এবং টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল।

শ্লোক

বিশ্বাসঘাতকতার পথে তোমার পদ স্থাপন করিও না,
কারণ শেষ পর্যন্ত তুমি নিজেই ফাঁদে পড়বে।
এই পথের পথিকের নিকট হইতে তুমি কি শ্রবণ কর নাই
যে, যে কুপ খনন করে, সেই তাহাতে পড়িয়া মরে।

আর মালিক জালালুদ্দীনের বীর এবং সাহসী পুত্রগণ পাঁচশত অশ্বারোহীসহ রাজকীয় মঞ্চে গমন করিলেন এবং সুলতান শামসুদ্দীনকে সিংহাসন হইতে তুলিয়া এবং মালিক-উল-উমরার পুত্রগণকে বাহাপুরে তাহার পিতার নিকট নিয়া গেলেন। মালিক আইতামার সুরখাহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তাহারা পথিমধ্যে তাহাকে হত্যা করিলেন। যেহেতু দিল্লীর সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ লোকেরা খলজীদের প্রাধান্য লাভ পছন্দ করিত না, তাহারা সুলতান শামসুদ্দীনকে সাহায্য করিবার জন্য দলে দলে বাহির হইয়া আসিল এবং বদাওন দরওয়াজার সম্মুখে সমবেত হইয়া মালিক জালালুদ্দীন ফিরোযকে আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মালিক-উল-উমরা মালিক জালালুদ্দীনের হস্তে বন্দী তাহার পুত্রগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন; আর অধিকাংশ আমীর এবং মালিক শেষোক্ত জনের সঙ্গে যোগদান করিলেন। একজন মালিক, যাহার পিতা সুলতান মুইযযুদ্দীনের নির্দেশে নিহত হইয়াছিলেন, কিলোখরির প্রাসাদে গমন করিলেন, এবং মুমূর্ষ প্রায় সুলতানের দেহে কয়েকটি লাথি মারিয়া তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিলেন।

সুলতান মুইযযুদ্দীনের রাজত্বকাল তিন বৎসর এবং কয়েক মাস স্থায়ী হইয়াছিল।

সুলতান জালালুদ্দীন খলজী

প্রামাণ্য ইতিহাসগুলির একটিতে আমি দেখিয়াছি যে খলজ উপজাতি চেঙ্গিস খানের জামাতা কালিজ খানের বংশধর; আর তাহার ইতিহাস এইরূপ। তাহার স্ত্রী, চেঙ্গিস খানের কন্যার সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য হয়। চেঙ্গিস খানের ভয়ে তিনি তাহার সঙ্গে কোমলতা আর শিষ্টতার ভান করেন। তিনি সর্বদাই মুক্তির এবং পলায়নের পথ খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কোন উপায় দেখিতেছিলেন না। অবশেষে যখন চেঙ্গিস খান সিন্ধু নদীর তীরে সুলতান জালালুদ্দীনকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করেন এবং ইরান এবং তুরান সম্বন্ধে তাহার মন যখন সকল চিন্তাভাবনা হইতে মুক্ত হয় তখন তিনি তাহার স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন, আর প্রায় এই সময়েই পরলোকগমন করেন; কালিজ খান অতি সতর্কতার সহিত ঘুর এবং ঘজিস্তানের পার্বত্য অঞ্চল এবং ইহার সুরক্ষিত অবস্থা এবং দুর্গমত্তা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তাহার পরিবার এবং উপজাতির লোকজনসহ তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন; তাহার উপজাতির সংখ্যা ছিল তিন সহস্র পরিবার। যেহেতু চেঙ্গিস খান ইন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রগণের কেহই তাহার গতিবিধির কোন হদিস রাখিতেছিল না, তিনি তথায়

থাকিয়া যান, এবং তাহার বংশধরগণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেহেতু ঘুরের সুলতানগণ হিন্দুস্তান জয় করিলেন, খলজগণ তাহাদের সন্নিকটে থাকিবার ফলে, বিভিন্ন সময়ে ঐ দেশে আগমন করে, এবং তথায় চাকুরীতে প্রবেশ করে এবং উচ্চ পদে উন্নতি লাভ করে। সুলতান জালালুদ্দীনের পিতা এবং সুলতান মাহমুদ খলজীর পিতা, যাহারা মহা এবং সকল মালিক এবং সুলতানদের অন্যতম ছিলেন, কালিজ খানের পৌত্র ছিলেন। অক্ষর পরিবর্তনের ফলে কালিজ খালিজে পরিণত হয় এবং অধিক ব্যবহারের ফলে ইহা খলজ হইয়া যায়। সলজুকনামা তুর্কের লেখকের মতে কিন্তু জাফেটের এগার পুত্র ছিল, ইহাদের একজনের নাম ছিল খলজ। তাহার ব শধরগণকে বলা হয় খলজ।

স ক্ষেপে সুলতান জালালুদ্দীন প্রচুর সংখ্যক অনুচরসহ বাহাপুর হইতে যাত্রা করেন এবং কিলুখরির কেল্লায় গমন করেন এব' কয়েকদিনের জন্য তিনি তথায় সুলতান শামসুদ্দীনের নায়েবরূপে অবস্থান করেন। অতঃপর আঃ হিঃ ৬৮৮ সনের গোড়ার দিকে তিনি সিংহাসনে আরোহণ ক রন। তিনি সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক বাজু খানকে কারাহ প্রেরণ করেন এবং ঐ অঞ্চলটি তাহাকে প্রদান করেন। যে আমীরগণ তাহার দলে ছিলেন, এবং যাহারা তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন' তাহাদের সকলেই তাহার প্রতি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করে। যেহেতু রাজধানীর অধিবাসীগণ তাহার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করিত না, তিনি ইহা স্মরণ রাখিয়া শহরে গমন করিলেন না এবং সর্বদা সুলতানগণ যে সি হাসনে বসিতেন, তাহাতে তিনি উপবেশন করিলেন ন'। তিনি কিলুখরিতে অবস্থান করিলেন এবং মুইযযী কেল্লাটি (অর্থাৎ সুলতান মুইযযুদ্দীন যে কেল্লা নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন) নির্মাণ সম্পূর্ণ করিতে নির্দেশ দেন; আর ইহার সম্মুখে, যমুনা নদীর তীরে একটি নূতন উদ্যান স্থাপন করেন। আমীর এবং মালিকগণও তথায় গৃহাদি নির্মাণ করেন। পাথরের একটি দুর্গ প্রাকারের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই দুর্গ প্রাকার এব' গৃহাদি এবং মসজিদ এব, একটি বাজার নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হয়; আর ঐ স্থানের নামেই নূতন শহরটির নামকরণ করা হয়। সুলতান জালালুদ্দীনের শাসন স্থায়িত্ব লাভ করিলে, এবং তাহার ধর্মপ্রাণতা, এবং ধৈর্যশীলতা, এবং বিজয় এবং ন্যায়-পরায়ণতা এবং দানশীলতার রিপোর্ট লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে শহরের লোকেরা —তরুণ এবং বৃদ্ধ সকলেই তাহার নিকটে আগমন করে এব, আনুগত্য প্রকাশ করে। আর শেখগণ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এব' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ উপহার এবং উপকার লাভ করেন। বিভিন্ন জায়গীরের দায়িত্ব এবং দরবারের চাকুরীসমূহ আমীরগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। সুলতানের সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র খান-ই-খানান উপাধি লাভ

করেন, তাহার দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খান এবং তাহার তৃতীয় পুত্র কদর খান উপাধি পান ; আর প্রত্যেককেই একটি পরগণা বা অঞ্চল বরাদ্দ করা হয়। সুলতানের ভ্রাতা বাঘরাশ খান উপাধি লাভ করেন এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। সুলতানের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা আলাউদ্দীন এবং উলুঘ খান যথাক্রমে আমীর বুযুর্গ (প্রথম আমীর) এবং আখিরিয়াক (দ্বিতীয় আমীর) নিযুক্ত হন ; আর সুলতানের ভাগিনেয় মালিক আহমদ হাব নায়েব (সহকারী) এবং বারবক (অনুষ্ঠানসমূহের কর্ম-সচিব) নিযুক্ত হন, এবং মালিক খুররম হন ভকিল-দার (দরবারে সুলতানের প্রতিনিধি)। খাজা খতির উযির নিযুক্ত হন ; আর মালিক-উল-উমরা হন কোতোয়াল। উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এখন শান্তি এবং সন্তোষ দেখা দেয়। অতঃপর সুলতান মহাজাঁকজমক এবং আড়ম্বর সহকারে এবং তাহার সেনাবাহিনী চমৎকার পরিবেশ নিয়া শহরে প্রবেশ করেন। প্রাসাদের দরওয়াজায় তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করেন এবং দুইবার প্রার্থনায় নীচু হন ; আর সুলতানদের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বলেন, 'বহু বৎসর আমি এই সিংহাসনের সম্মুখে মাথা নত করিয়াছি। আজ আমি ইহাতে আমার পা রাখিতে পারিযাছি। ইহার জন্য কি প্রকারে আল্লাহর নিকট আমি যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।" অতঃপব তিনি তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং চুনি মণ্ডপের অভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায ইতিপূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী প্রবেশ দ্বারে তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। উমদাত-উল-মুলক, মালিক আহমদ হাব বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করিলেন যে চুনি মণ্ডপ এখন সুলতানের অধিকারে, এখন তাহার প্রবেশ দ্বারে অবতরণ করিবার কোনই কারণ নাই। সুলতান বলিলেন যে, সকল পরিবেশেই একজনের তাহার উপকারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। অতঃপর মালিক আহমদ হাব বলিলেন, যে মণ্ডপটি সুলতানদের বাসস্থান এবং সুলতানের এখন এই স্থানেই বাস করা উচিত। প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন যে, সুলতান বলবন যখন একজন খান ছিলেন তখন তিনি ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; আর ইহা এখন তাহার বংশধরগণের সম্পত্তি ; এবং তাহার ইহাতে কোন অধিকার নাই। মালিক আহমদ হাব জবাব দিলেন, যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এরূপ নিয়ম নিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুলতান জবাব দিলেন যে, তিনি ইসলামের আইন ভঙ্গ করিতে পারেন না এবং যাহা সত্য এবং ন্যায়, সাময়িক পার্থিব সুবিধার জন্য তাহার খেলাপ করিতে পারেন না।

শ্লোক

ধর্ম এবং যুক্তি কি কখনও এইরূপ বিধান দিতে পারে
যে জ্ঞানীগণ এই পৃথিবীর জন্য পরলোক বিসর্জন দিবে ?

অতঃপর তিনি চুনি মণ্ডপে পদব্রজে গমন করিলেন। তিনি সুলতান ঘিয়াসুদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধবশতঃ তিনি যে স্থানে বসিতেন, ঐ স্থানে বসিলেন না এবং আমীরদের জন্য নির্ধারিত স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি আমীর এবং মালিকগণকে বলিলেন, "আইতামার কুজন এবং আইতামার সুরখাহ্-এর বংশের ইহার থেকেও অধিক সর্বনাশ হইবে! কারণ তাহারা যদি আমার সঙ্গে শঠতাপূর্ণ এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ না করিত, তবে আমি এই বিপদে পড়িতাম না; আর আমার জীবনের বাকি দিনগুলি খান বা মালিকের দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াই কাটাইয়া দিতাম। এখন আমি আর কল্পনাও করিতে পারিতেছি না, ইহার পরিণাম কি হইবে। দেখিতে পাইতেছি যে সুলতান বলবনের ক্ষমতা এবং আড়ম্বর সত্ত্বেও, তাহার দীর্ঘকাল স্থায়ী শাসন, এবং তাহার মন্ত্রী এবং পরামর্শদাতাগণের মহত্ব সত্ত্বেও, সাম্রাজ্য তাহার বংশধরদের নিকটে রহিল না, ইহা কি আমার কাছেই থাকিবে? আর আমার পরে আমার বংশধর এবং আত্মীয়-স্বজনের কি পরিণতি হইবে?" উপস্থিত আমীরদের কতিপয়, যাহারা বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন তাহারা এই সব কথা শুনিয়া বিষণ্ন হইলেন এবং তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিলেন; অন্যান্য যাহারা তরুণ এবং হঠকারী, তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, "এই লোকটি সবেমাত্র একজন সুলতান হইয়াছেন; আর তিনি ইতিমধ্যেই তাহার শাসনের অবনতির আশঙ্কা করিতেছেন। যাহাদের শাসনকর্তার সর্বদা যে তেজস্বিতা এবং কঠোরতা থাকা প্রয়োজন, তাহা তাহার নিকট হইতে আশা করা যায় না।" ঐ দিনের শেষ দিকে সুলতান জালালুদ্দীন শহর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং কিলুখরি গমন করিলেন এবং ঐ স্থানেই তাহার রাজধানী করিলেন।

সুলতানের সিংহাসনারোহণের পর বৎসর সুলতান বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক ঝাজু, যিনি কারার জায়গীরদার ছিলেন, বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন; এবং তাহার নিজ নামে খোৎবা পাঠ করাইলেন এবং মুদ্রা প্রস্তুত করিলেন; আর নিজেকে সুলতান মঘিসুদ্দীন উপাধি দান করিলেন। অযোধ্যার গভর্ণর আমীর আলী সরজান্দর, যাহাকে হাতিম খান বলা হইত, আর যে সমস্ত বলবনী মালিকগণের ঐ অঞ্চলে জায়গীর ছিল, তাহাদের সকলে তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কারণ তিনি আশা করিতেছিলেন যে নাগরিকগণ যেহেতু খলজীদের শাসন পছন্দ করিতেছিলেন না, তাহারা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে। সুলতান জালালুদ্দীন এই বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খান-ই খানানকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি রাখিয়া তাহার প্রাচীন মন্ত্রীগণ এবং পরামর্শদাতাগণসহ এবং এক সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া মালিক ঝাজুকে

আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খান তাহার বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুলতান তাহাকে অগ্রবর্তী রক্ষী-বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সাহসী এবং পূর্ব পরীক্ষিত যোদ্ধাগণকে দিলেন, তিনি যে নির্দেশ লাভ করিলেন তদনুযায়ী আরকলি খান তাহার সেনাদলসহ কলসকর[১] নদী অতিক্রম করিলেন। মালিক ঝাজু অপর দিক হইতে সকল বলবনী আমীর এবং মালিকগণ এবং অসংখ্য সেনা এবং ঐ দেশের সকল জমিদার ও খ্যাতনামা রাজাগণসহ তাহাকে বাধা দিবার জন্য আগমন করিলেন; আর এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হইল; আর তিনি পরাজিত হইলেন এবং তাহার সেনা বাহিনীর অধিকাংশ সেনাপতি বন্দী হইলেন। মালিক ঝাজু একজন দেশীয় প্রধানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু স্থানীয় গ্রামপ্রধান কর্তৃক বন্দী হইলেন এবং ঐ অবস্থায় তাহাকে সুলতানের নিকট আনয়ন করা হইল। আরকলি খান বন্দীদিগকে উটের পিঠে বসাইলেন এবং তাহাদিগকে গলায় লোহার বেড়ী এবং পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়া সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ অবস্থায় যখন তাহাদিগকে সুলতানের নিকট আনয়ন করা হইল এবং তাহার চক্ষু তাহাদের উপর পতিত হইল, তিনি তাহাদিগকে উটের পিঠ হইতে নামাইতে এবং পায়ের শৃঙ্খল অপসারণ করিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে ইহাদের মধ্যে যাহারা সুলতান বলবনের সময়ে পদস্থ এবং সম্মানীয় লোক ছিলেন, তাহাদিগকে হামামে (গোসলখানায়) নেওয়া হউক এবং তাহাদের হাত-মুখ ধৌত করানো হউক। অতঃপর তাহাদিগকে বিশেষ রাজকীয় অঙ্গাবরণে সজ্জিত করা হইল এবং আতর মাখানো হইল। তৎপরে তিনি তাহার প্রাসাদে এক ভোজের আয়োজন করিলেন এবং তাহাদিগকে ইহাতে নিমন্ত্রণ করিলেন আর তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে মদ্য পান করিতে বলিলেন।

শ্লোক

মন্দের জবাবে মন্দ করা অতি সহজ কাজ
যদি তুমি মানুষ হও, মন্দের জবাবে ভাল কর।

তাহারা লজ্জায় মাথা অবনত করিয়া রাখিলেন এবং নির্বাক হইয়া রহিলেন। সুলতান তাহাদের মনের আলোড়ন দূর করিবার জন্য বলিলেন, "তোমরা তোমাদের উপকারীর জন্য তোমাদের তরবারি উত্তোলন করিয়াছিলে এবং তোমরা যে নিমক খাইয়াছ এবং তোমরা আনুগত্যের যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে সেই অনুযায়ী কাজ

---

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ আছে, আর একটিতে আছে কলাকর, এবং অপর একটিতে আছে কলতুলকর।

করিয়াছ। তোমাদের পক্ষে ইহা দোষের কাজ নয়।" তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী মালিক ঝাজুকে একটি পাল্কীতে চড়ান হইল এবং তাহাকে মুলতানে প্রেরণ করা হইল; আর তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তাহাকে ঐ স্থানে একটি গৃহে আটক করিয়া রাখা হয় এবং সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাহাকে যেন ভোগ-বিলাসের সকল উপকরণ, যাহা তিনি চাহেন, তাহা যেন সরবরাহ করা হয়। সুলতান বন্দীদের প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেন তাহাতে মালিক আহমদ হাব এবং খলজী আমীরগণের সকলে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহারা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে এই লোকের দলটির মৃত্যুই উপযুক্ত শাস্তি ছিল। তিনি তাহার পরিবর্তে তাহাদের প্রতি যে মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাম্রাজ্যের নিয়মের পরিপন্থী এবং শাসনতন্ত্রের নীতির পক্ষে অমঙ্গল-জনক। তাহারা যুক্তি দিলেন যে যাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাহাদিগকে যদি যোগ্য শাস্তি দেওয়া না হয় এবং তাহাদের রক্তপাত যদি না করা হয়, ক্ষমতা লাভের বাসনা এবং সাম্রাজ্যের প্রলোভন তখন সকলের মাথায়ই প্রবেশ করিবে আর অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হইবে। তাহারা বলিলেন, সুলতান বলবন বিদ্রোহীদের যে সাজা দিতেন এবং রক্তের যে সাগর বহাইয়া দিতেন, সে সবের অধিকাংশই সুলতানের চোখের সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছে; আর সেইগুলির ভীতি এখনও লোকের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই। তৎপর তাহারা বলিলেন, যে যদি তাহারা নিজেরাই শত্রুদের হস্তে পতিত হইতেন, তবে তাহারা কি পৃথিবীর বুকে খলজী নামের কোন চিহ্ন রাখিতেন? ফলে তাহারা যুক্তি দিলেন যে তাহাদিগকে শাস্তি না দেওয়া সুষ্ঠু নীতি নয়।

শ্লোক

বিদ্রোহীদের শিরচ্ছেদ করাই মঙ্গলজনক
বিশ্বাসঘাতক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করাই মঙ্গল,
সাইপ্রেস বৃক্ষে নূতন সতেজ সবুজ শাখা গজাইবে না
যতক্ষণ না তুমি পুরাতন ও জীর্ণ শাখাগুলি কাটিয়া না দাও।

প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন: "তোমরা সকলে যাহা বলিতেছ তাহাই ঠিক এবং সাম্রাজ্যের নীতির নিয়ম কানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমি কি করিতে পারি? সত্তর বৎসর ধরিয়া আমি একজন মুসলমানের জীবন যাপন করিয়াছি; আর কখনও কোন মুসলমানের রক্তপাত ঘটাই নাই। বর্তমানে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি এবং আর কয়েক বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকিব। আমি কোন মুসলমানের রক্তে আমার হাত রক্তিম করিতে এবং নিজের জন্য স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী নামও লাভ করিতে চাই না।

আর আমরা যদি তাহাদের হাতে পড়িতাম এবং তাহারা আমাদের রক্তপাত ঘটাইত, আগামী কল্য, শেষ বিচারের দিনে, ইহার জবাবদিহীর দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়েই পড়িত, আমাদের নয়। বহু বৎসর আমি সুলতান বলবনের একজন কর্মচারী ছিলাম, আর তাহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতার ঋণ আমার স্কন্ধে ভারী হইয়া আছে। আমি তাহার সাম্রাজ্য দখল করিয়াছি। ইহার উপরে আমি যদি তাহার অনুচরগণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করি তবে তাহা চরম নীচতা প্রদর্শন এবং অন্যায় করা হইবে।" সুলতান বদাওন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা আলাউদ্দীনকে, যাহাকে তিনি নিজে লালন পালন করিয়াছেন, ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং কারা জায়গীরটি তাহাকে প্রদান করিয়া তাহাকে ঐ স্থানে প্রেরণ করিলেন। তিনি যখন সাফল্য এবং বিজয়ের মুকুট পরিধান করিয়া দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন নাগরিকগণ সুসজ্জিত গম্বুজ নির্মাণ করিলেন এবং আনন্দোৎসব করিলেন।

সুলতান জালালুদ্দীনের ধৈর্য এবং দুঃখ দেওয়ার অনিচ্ছার ফলে আমীর এবং মালিকগণের অনেকেই বলিলেন যে কি করিয়া একটি দেশ শাসন করিতে হয় এবং সাম্রাজ্য আয়ত্তে রাখিতে হয় তাহা তিনি জানেন না। কথিত আছে যে চোর-ডাকাতকে পুনঃপুনঃ ধরা হইত এবং তাহার নিকট আনয়ন করা হইত। তিনি তাহা-দিগকে পুনরায় এরূপ অপরাধ না করিবার শপথ করাইতেন এবং তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। তিনি বলিতেন যে যদিও কোন যুদ্ধে তিনি একটি সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিতে পারেন এবং অজস্র রক্তপাত করিতে পারেন, কিন্তু কোন লোককে বাঁধিয়া তাহার নিকট লইয়া আসিলে তিনি তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিতে পারেন না। একবার এক সশস্ত্র রাজপথের দস্যুকে ধরিয়া তাহার নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি তাহাদের একজনকেও ফাঁসীর আদেশ দান করেন নাই; কিন্তু তাহাদের সকলকে নৌকায় চড়াইয়া লক্ষণাবতীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ সময়ের মধ্যে তিনি কখনও অর্থদণ্ড এবং জরিমানা, এবং কারারুদ্ধকরণ এবং উৎপীড়ন করা এবং অন্য লোকের সম্পদের লোভ, যাহা স্বেচ্ছাচারী উৎপীড়কদের বৈশিষ্ট্য, সম্পাদন করেন নাই। কথিত আছে যে কতিপয় অকৃতজ্ঞ দুরাত্মা; যাহাদের স্বভাবে শয়তানী বদ্ধমূল ছিল এবং যাহারা সম্পূর্ণরূপে মানবিক অনুভূতিহীন ছিল, সভা অনুষ্ঠান করিলেন, যাহাতে তাহারা মদ্যপান করিলেন এবং কি করিয়া সুলতানের পতন ঘটান যায় তাহার আলোচনা করেন। এই সব সভার সংবাদ যখন তাহার নিকট পৌঁছিল, তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না; আর বলিলেন যে যে সব লোক মাতাল, তাহারা মত্ত অবস্থায় যে সব কথা বলে সে সবের জন্য তাহাদিগকে দায়ী করা উচিত নয়। এক দিন মালিক তাজুদ্দীন কুজে তাহার গৃহের এক মদ্যপানের মজলিসে

কতিপয় মহা-আমীরকে দাওয়াত দিলেন। তাহারা সকলে যখন মাতাল হইয়া উঠিলেন, তখন তাহারা বলিলেন, "সুলতান জালালুদ্দীন রাজা হইবার উপযুক্ত নয়। মালিক তাজুদ্দীনই সিংহাসনের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি।" তাহারা সকলেই তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল। তাহাদের একজন বলিলেন, "আমি এই শিকারের ছুরিটি দ্বারাই তাহাকে শেষ করিতে পারি," অপর একজন বলিলেন, "আমি ঐ তরবারি দ্বারা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারি।" অন্যান্যরাও অনুরূপ বড়াই করিলেন। সুলতান যখন ইহা শুনিলেন তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য তিনি তাহার তরবারি খাপ হইতে টানিয়া লইলেন এবং তাহা তাহাদের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত পুরুষ থাক, তবে সে এই তরবারি তুলিয়া লও এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াও; যাহাতে সে জানিতে পারে যে প্রকৃত সাহস কাহাকে বলে।" মালিক নসরত আব্বাছ ছিলেন কৌতুকপ্রিয় এবং মধুর স্বভাবের লোক কিন্তু তিনিও ঐ সভায় কিছু বাজে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহান সম্রাট অবশ্যই অবগত আছেন যে মত্ত অবস্থায় মাতালেরা যাহা বলে তাহার কোন অর্থ হয় না। সুলতান আমাদিগকে নিজের পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন। আমরা জানি যে আমরা কখনও আপনার ন্যায় ধীর স্থির, এবং সহিষ্ণু এবং মর্যাদাবান সুলতান আর পাইব না। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে আমরা ষড়যন্ত্র করিতে পারি না। সুলতানও আমাদের ন্যায় বিশ্বস্ত মালিক এবং মালিকযাদা আর পাইবেন না, আর আমরা ইহাও জানি যে তিনি আমাদের সর্বনাশ এবং বিনাশে সম্মত হইবেন না।" এই কথাগুলি সুলতানের মনে সাড়া জাগাইল; তাহার রাগ পড়িয়া গেল; তিনি মদ আনাইলেন; এবং স্বহস্তে মালিক নসরত আব্বাছকে পেয়ালা আগাইয়া দিলেন। একই সময়ে তিনি ষড়যন্ত্রকারীগণকে তাহাদের স্ব স্ব জায়গীরে গমন করিতে এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিতে নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক

ধৈর্যের তরবারি ইস্পাতের তরবারির চেয়ে ক্ষুরধার
ইহার বিজয় শত সৈন্য দলের চেয়েও উত্তম।

তাহার নিকটস্থ লোকেরা কোন অপরাধ করিলে তিনি অপরাধীকে দৈহিক শাস্তি দান করিতেন না; অথবা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিতেন না। তিনি কোন লোককে কোন জায়গীর দান করিলে তিনি আর তাহা ফিরাইয়া নিতেন না।

কথিত আছে যে তিনি যখন সুলতান বলবনের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এবং সামানার জায়গীরদার ছিলেন, তখন ঐ যুগের একজন কবি মৌলানা সিরাজুদ্দীন সাদী ভরণ-পোষণের ভাতারূপে সামানার জায়গীরের একটি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান জালালুদ্দীন[১] অন্যান্য বরাদ্দকারীর ন্যায় মৌলানার নিকট হইতেও খাজনা দাবী করিলেন। ইহাতে মৌলানা অসন্তুষ্ট হন এবং সুলতানের (ঘিয়াসুদ্দীন বলবন অথবা মুইযযুদ্দীন কায়কুবাদ) প্রশংসাসূচক কবিতা লিখেন; আর এইগুলিতে তাহার অফিসারগণ সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। সুলতান জালালুদ্দীন অন্যান্য কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকিবার ফলে মৌলানার প্রতি কোন মনোযোগ দিতে পারেন নাই। মৌলানা অন্তরে ব্যথা পাইলেন এবং সুলতান জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে কিছু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিলেন এবং এইগুলিকে 'খলজনামা' নামকরণ করিলেন। ঐ সময়ে সুলতান জালালুদ্দীন সামানার গভর্ণর ছিলেন। খলজনামাতে কতিপয় তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা ছিল, ইহা সুলতানের নিকট পেঁৗছে। সুলতান এই বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলির জন্য তাহার উপর প্রতিশোধ নিবেন চেষ্টা করিবেন এই ভয়ে মৌলানা সামানা ত্যাগ করিলেন এবং অন্য এক স্থানে বসবাস আরম্ভ করিলেন। প্রায় এই সময়েই সুলতান মুন্দাহিরদের কতিপয় গ্রাম বিধ্বস্ত করেন। একজন মুন্দাহির সুলতানের মোকাবিলা করিলেন এবং তাহার মুখমণ্ডলে একটি ক্ষতের সৃষ্টি করিলেন, যাহার চিহ্ন মরণের সময় পর্যন্ত ছিল। সুলতান জালালুদ্দীন যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন মৌলানা সিরাজুদ্দীন এব ঐ মুন্দাহিরটি তাহাদের গলায় ফাঁস-দড়ি লাগাইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপারটা সুলতানের গোচরে আনা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন; আর মৌলানাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন; তাহাকে উপহার এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রদান করিলেন; তাহার জন্য পেনসন নির্ধারণ করিয়া দিলেন; আর নির্দেশ দিলেন যে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় তিনিও ঐ সময় হইতে সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং অভিবাদন করিবেন। তিনি মুন্দাহিরটিকেও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।

একদিন সুলতান তাহার স্ত্রী মালকা ই জাহানকে বলিলেনঃ উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ এবং কাযিগণ যখন তোমাকে তাহাদের অভিনন্দন জানাইতে হারেমের প্রবেশ দ্বারে আগমন করিবে, তখন তাহাদের তুমি বলিয়া দিও যে তাহারা যেন আমাকে অনুরোধ করে যেন তাহারা আমাকে খোৎবাতে 'আল্লাহর যোদ্ধা' রূপে

১. এই কাহিনীটির বর্ণনায় লেখক জালালুদ্দীনকে তাহার সুলতান হইবার পূর্বের সময়েও তাহাকে সুলতান অভিহিত করিয়াছেন, ফলে কাহিনীটি বর্ণনার ধরনে কিছুটা গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে।

বর্ণনা করিবার জন্য যেন আমি তাহাদিগকে অনুমতি দান করি। প্রায় ঐ সময়েই সুলতানের কনিষ্ঠতম পুত্র কদর খানের সঙ্গে সুলতান মুইযযুদ্দীনের কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়; আর মহা-অফিসারগণ তাহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে গমন করেন। তাহারা ঐ সংবাদটি (যাহা মালকা-ই-জাহান তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন) অনুমোদন করেন এবং বলেন যে যেহেতু সুলতান পুনঃপুনঃ মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, ফলে ইহা যে শুধু অনুমোদনযোগ্য তাহাই নয়, অধিকন্তু ইহা ন্যায় এবং সঙ্গত যে তাহাকে "আল্লাহর যোদ্ধা" রূপে অভিহিত করা হইবে। মাসের প্রথম দিনে যখন মহা-অফিসারগণ এবং কাযিগণ সুলতানকে তাহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে গমন করিলেন এবং হস্ত চুম্বন করিবার অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানীত হইলেন, তখন কাযি ফখরুদ্দীন বাকলাহ, যিনি এই যুগের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কপটতা করিয়া তাহার প্রকৃত অভিমত গোপন করিলেন এবং উপস্থিত অন্যান্যদের মুখ দিয়া সুলতানের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাহাদের উচিত খোৎবায় সুলতানকে আল্লাহর যোদ্ধা রূপে বর্ণনা করা। সুলতান বলিলেন, "আমি জানি, আমারই অনুরোধে মালকা-ই-জাহান আপনাদের এইরূপ প্রস্তাব করিতে বলিয়াছে, কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই আমি বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, আমি কোন সময়েই কোন পার্থিব উদ্দেশ্যের মিশ্রণ ছাড়া, শুধু আল্লাহর কাজেই আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করি নাই এবং আমি যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি অনুতপ্ত হইয়াছি এবং এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

সুলতান জালালুদ্দীন যখন সাম্রাজ্যের বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন তখন তিনি আমীর খুসরুর প্রতি বহু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আর তাহাকে 'কোরানের' রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আর তাহাকে সাদা অঙ্গাবরণ এবং কোমরবন্ধ, যাহা মহা-আমীরদের জন্য সংরক্ষিত, প্রদান করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন। সুলতান যে সব লোককে তাহার মদ্যপানের মজলিশে দাওয়াত দিতেন তাহাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মেলামেশা করিতেন এবং তাহাদের আনুষ্ঠানিক কায়দা কানুন পালনের প্রয়োজন হইত না; আর তাহাদিগকে প্রায় সম-পর্যায়ের গণ্য করিতেন। সামাজিক সমাবেশে তাহার সঙ্গী ছিলেন মালিক তাজুদ্দীন কুজি, মালিক ফখরুদ্দীন কুজি, মালিক ইযযুদ্দীন ঘুরি, মালিক করা বেগ, মালিক নসরত সব্বাহ, মালিক আহমদ হাব, মালিক কামালুদ্দীন, আবুল মা 'আলী, মালিক নাসিরুদ্দীন কুহ-রামি এবং মালিক সায়দুদ্দীন মনতাকি। ঐ সময়ে এই মালিকগণ তাহাদের স্বভাবের কোমলতা, তাহাদের আচার-ব্যবহারের মাধুর্য, এবং তাহাদের সাহস এবং পৌরুষের জন্য

অতুলনীয় ছিলেন। তাজুদ্দীন ইরাকী, আমীর খুসরু, মীর হাসান, মুয়েদ জাজরমী, মুয়েদ দেওয়ানা, আমীর আরসলান কলাহী, ইখতিয়ার বাঘ এবং বাকি খতিব সভাসদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; আর ইহাদের প্রত্যেকেই কবিতা রচনায় এবং ইতিহাস জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। সুলতানের দরবার সদা-সর্বদা আমীর খাস এবং হামিদ রাজার ন্যায় মধুর কণ্ঠে গীতি কবিতা আবৃত্তিকারী এবং হায়বত খানের পুত্রগণ এবং নিযাম খরিতদারের ন্যায় আকর্ষণীয় পেয়ালা বাহকগণ এবং মুহম্মদ শাহ জঙ্গী এবং ফতু খান এবং নসরত খানের ন্যায় অতুলনীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ দ্বারা অলংকৃত থাকিত। আমীর খুসরু সুলতানের দরবারে নূতন নূতন গীতি কবিতা উপহার দিতেন এবং তাহাকে পুরস্কার দান এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত।

ঐ সময়ের অদ্ভুত ঘটনাসমূহের মধ্যে ছিল সিদি মাওলার ঘটনা। এই বিষয়টি সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করা যায়। সিদি মাওলা নামে এক দরবেশ দিল্লীতে আবির্ভূত হইলেন এবং তথায় বসবাস আরম্ভ করিলেন। তিনি লোকের নিকট দান খয়রাতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। যেহেতু তিনি কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতেন না এবং তাহার কোন নির্ধারিত পেনসন বা ভাতা ছিল না, লোকেরা তাহার অত্যধিক ব্যয় এবং অপরিমিত উপহার দান দেখিয়া বিস্মিত হয়। বহু লোকে বলে যে তিনি রসায়নে এবং স্বাভাবিক যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি একটি মহা খানকার ভিত্তি স্থাপন করেন; আর ইহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। জল ও স্থলে আগত অধিকাংশ পরিব্রাজক এই স্থানে অপেক্ষা করিতেন আর প্রতিদিন তাহার টেবিল দুইবার পাতা হইত। এক সহস্র মণ ময়দা, পাঁচশত মণ ভাজা গোশত এবং তিন শত মণ চিনি দৈনিক খাওয়া হইত; আর সর্ব স্তরের লোক তাহার টেবিলে খাদ্য গ্রহণ করিত এবং বহু লোক খানকার দরওয়াজায় হাজিরা দিত। সুলতান জালালুদ্দীনের অধিকাংশ আমীর এবং মালিক সিদি মাওলার শিষ্য এবং বন্ধু হন। তিনি মহা কৃচ্ছ সাধন অভ্যাস করিতেন আর খাদ্যরূপে শুকনা রুটি এবং বাগানের শাক সব্জী মাত্র আহার করিতেন। তাহার কোন স্ত্রী বা ক্রীতদাসী ছিল না। তিনি নামাজ পড়িতেন; কিন্তু শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়িতেন না; প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত প্রথানুযায়ী নামাজের জন্য একত্র সমবেত হইবার নিয়ম কানুন তিনি পালন করিতেন না। সিদি মাওলা দিল্লী আগমনের পূর্বে তিনি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন এবং কুতব-ই-আলম ফরিদ-উল-হক ওয়াদ্দীনের, আল্লার করুণা যেন তাহার উপর বর্ষিত হয়; খেদমত করিয়াছিলেন এবং তিনি কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় শেখ বলিলেন, "তোমার কাছে

সুলতানদের আগমনের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিও; আর জনতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিও না; আর যশের পিছনে ছুটিও না।"

শ্লোক

তোমার হৃদয় আগুনে নিবদ্ধ করিও না! কারণ যদিও ইহা
তোমার মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে
এমন এক সময় আসিবে যখন ইহা শত শস্যাগার ছাই করিয়া দিবে।

কিন্তু সিদি মাওলা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

শ্লোক

লোভের কান শত কাহিনী শুনিতে পায়
কিন্তু কোন কথাই কোন রেখাপাত করে না।

তিনি সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খানানকে তাহার ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং শিষ্য করিলেন এবং তাহাকে 'পুত্র' নামে সম্বোধন করিলেন। তিনি এই যুগের একজন মহান-লোক কাযি জালাল কাশানীকে তাহার বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খীতে পরিণত করিলেন। কতিপয় বলবনী আমীর, যাহাদের বর্তমান শাসন কালে কোন অবলম্বন ছিল না, সর্বদা তথায় উপস্থিত থাকিতেন এবং খানকার খেদমত করিতেন; কারণ তাহারা সদা সর্বদাই সিদি মাওলার নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। লোকেরা ভাবিতে আরম্ভ করিল যে তিনি এই সব লোকের সাহায্যে দেশটি দখল করিতে চাহিতেছেন। ইহা যখন সুলতান জালালুদ্দীনের গোচরে আসিল, তখন তিনি নির্দেশ জারি করিলেন এবং সিদি মাওলা এবং তাহার শিষ্যগণকে বন্দী করা হইল এবং তাহার নিকট আনয়ন করা হইল। যদিও নিরীহ লোকটি নিরপরাধ বলিয়া দাবী করিলেন এবং শপথ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হইল না। সুলতান বাহাপুরের প্রান্তরে এক অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার নির্দেশ দিলেন। ইহা করা হইল এবং আগুনের শিখা আকাশে উত্থিত হইল। তিনি শহরের বিদ্বান এবং মহান লোকদের তথায় উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন যে সিদি মাওলা এবং তাহার শিষ্যদের টানিয়া আগুনে ফেলিতে হইবে; যাহাতে তাহার সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যাচাই হইয়া যাইতে পারে। ঐ সময়কালীন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহার নিকট নিবেদন করিলেন যে আগুনের ধর্ম-ই পুড়ান; ইহাকে সত্য মিথ্যার পরীক্ষারূপে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং আইনে নিষিদ্ধ। পণ্ডিতগণের নিকট

হইতে ইহা শুনিয়া সুলতান এই অমানুষিক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইতে বিরত রহিলেন। কিন্তু তিনি কাযি জালালকে, যাহার বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ করা হইয়াছিল, বদায়ুনে তথাকার কাযি হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য যে সব মালিকগণকে তিনি সিদি মাওলার শুভাকাঙ্খী বলিয়া জানিতেন, তাহাদিগকে তিনি দেশের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে পাঠাইয়া দিলেন। আর তাহাদের কিছু সংখ্যককে অন্যান্যভাবেও শাস্তি দিবার নির্দেশ দিলেন। সিদি মাওলাকে যখন গ্রেফতার করিয়া সুলতানের নিকট আনয়ন করা হইল তখন শেষোক্ত জন তাহার সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করিলেন; তিনি জবাব দিলেন ঃ এবং আইন অনুযায়ী অথবা যুক্তি অনুযায়ী, কোন অপরাধই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হইল না। অতঃপর সুলতান, হায়দরী কলন্দরগণের (ফকির) প্রধান শেখ আবু বকর তুষি হায়দরীর দিকে ফিরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হে দরবেশগণ! এই অত্যাচারীর নিকট হইতে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর!" বহরী নামে এক জন হঠকারী কলন্দর লাফাইয়া উঠিলেন এবং একটি ক্ষুর দ্বারা সিদি মাওলাকে কয়েকবার আঘাত করিলেন এবং একটি বস্তা সেলাইয়ের সুচ দ্বারা তাহাকে আহত করিলেন। সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খান তাহার হস্তী চালককে সিদি মাওলার উপর দিয়া হস্তী চালাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সে তাহাই করিল এবং তাহাকে শহীদে পরিণত করিল। প্রবাদ আছে যে, যে দিনে সিদি মাওলাকে হত্যা করা হয়, সেই দিনে এক ঝড় উত্থিত হয় এবং পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। ঐ বৎসর অনাবৃষ্টি হয় এবং দিল্লীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুগণ দলে দলে শিশুদের যমুনাতে নিক্ষেপ করে এবং ধ্বংসের সাগরে ডুবিয়া যায়।

এই বৎসরে আঃ হিঃ ৬৮৯ সনে সুলতান এক দল সৈন্য লইয়া রণথম্বোর অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খানকে তাহার নায়েবরূপে কিলুখরি রাখিয়া যান, কারণ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খানান ইতিপূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, পৌঁছামাত্রই তিনি ঝাইন[১] দখল করিলেন এবং ঐ স্থানের মন্দিরটি ধ্বংস করিলেন! প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করিলেন এবং বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গেলেন। রণথোম্বের রাজা নিজেকে কেল্লায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সুলতান কয়েকদিন দুর্গটি অবরোধ করিয়া রাখিলেন এবং তৎপর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি বলিলেন, "দুর্গটি অধিকার করা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তাহার জন্য একটি লোকেরও জীবন দেওয়া যাইতে পারে।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ঝানে, আর অপর তিনটিতে আছে যথাক্রমে ঝান, ঝাবন এবং ঝাইন।

শ্লোক

আমার পৌরুষের সঙ্গে আমি শপথ করিতেছি যে পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও মাটি এক বিন্দু রক্তপাতেরও উপযোগী নয়।

আমি যদি দুর্গটি অধিকার করিতাম এবং আল্লার সৃষ্ট এই জীবগুলিকে তরবারির দ্বারা হত্যা করিতাম, আগামী কাল যখন নিহত লোকদের বিধবা এবং অনাথগণ আমার নিকট আসিত এবং আমার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িত তখন আমার অবস্থা কিরূপ হইত: আর দুর্গটি অধিকারের স্বাদ আমার মুখে বিষের চেয়েও কি তিক্ত হইত না?"

আঃ হিঃ ৬৯১ সনে চেঙ্গিজ খানের মুঘলগণ এক বিরাট বাহিনীসহ হিন্দুস্তান অভিযান করিল। সুলতান তাহাদের প্রতিহত করিবার জন্য শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন। উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং মোকাবিলা করিল, অভিযানপ্রিয় যোদ্ধাগণ বহু খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হইল। মুঘল নেতাগণ সুলতানের বাহিনীর প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সুলতান মুঘলদের নেতাকে 'পুত্র', যিনি হালাকু খানের একজন আত্মীয় ছিলেন, আখ্যা দিলেন, আর তিনি সুলতানকে 'পিতা' সম্বোধন করিলেন এবং তাহারা কিছু দূরত্ব রাখিয়া পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন[১] উভয় পক্ষ হইতে পছন্দসই উপহার এবং ভেট প্রেরণ করা হইল, অতঃপর মুঘল বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিল; কিন্তু চেঙ্গিস খানের পৌত্র আলঘু, কতিপয় মুঘল আমীর সহ সুলতানের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাহারা সকলেই মুসলমান হইলেন, আর আলঘুর নিকট সুলতানের এক কন্যাকে বিবাহ দিয়া তাহাকে সম্মানীত করা হইল। মুঘলদের বাসস্থানের জন্য ঘিয়াসপুর বরাদ্দ করা হইল; আর ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হইল মুঘলপুর। আর মুঘলগণ নব-মুসলমান নাম লাভ করিল।

বৎসরের শেষ দিকে সুলতান মন্দুর[২] বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন এবং চতুর্দিকস্থ অঞ্চলটি লুণ্ঠন এবং বিধ্বস্ত করিলেন। প্রায় এই সময়েই সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক আলাউদ্দীন আবেদন করিলেন যেন তাহাকে ভিলসা আক্রমণ করিবার এবং ঐ অঞ্চলগুলি লুণ্ঠন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভ করিলেন এবং ঐ অঞ্চলে গমন করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিলেন এবং সুলতানের খেদমতের জন্য প্রচুর

১. দেখা যায় যে 'পিতা' এবং 'পুত্র' এর পরস্পরের প্রতি তেমন আস্থা ছিল না।
২. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি মন্দু দেওয়া আছে; অন্যগুলিতে ইনদু, হনদু, ও হনদ সোর দেওয়া আছে; প্রকৃত স্থান কোন্‌টি বলা দুষ্কর। সম্ভবতঃ মন্দু বা মন্দাওয়ার হইবে।

লুণ্ঠিত দ্রব্য আনয়ন করিলেন। তিনি দুইটি তাম্র মূর্তি আনয়ন করিলেন; এইগুলি ঐ অঞ্চলের হিন্দুগণ পূজা করিত আর এইগুলিকে বদাওন দরওয়াজার সম্মুখে মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন যাহাতে লোকে এইগুলিকে পদদলিত করিতে পারে। মালিক আলাউদ্দীনের এই সাফল্য সুলতানের প্রশংসা লাভ করিল এবং তিনি তাহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করিলেন; আর তাহাকে বহু রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। তিনি তাহাকে অতিরিক্ত জায়গীর রূপে অযোধ্যা অঞ্চলটি প্রদান করিলেন। মালিক আলাউদ্দীন যখন দেখিলেন যে সুলতান তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুকূল মনোভাব পোষণ করিতেছেন, তখন তিনি এক আবেদন পেশ করিলেন যেন তাহার জায়গীরের অতিরিক্ত রাজস্ব হইতে তাহাকে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়, যাহাতে তিনি তাহার পুরাতন এবং নব নিযুক্ত সৈন্যদের সাহায্যে চন্দেরী দেশটি এবং ইহার নিকটবর্তী স্থানসমূহ, যাহাতে প্রচুর ধন সম্পদ আছে, তিনি আক্রমণ করিতে পারেন এবং বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য আনয়ন করিতে পারেন; আর তাহার সুলতানের চোখে আরও উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারেন, সুলতান তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন; আর মালিক আলাউদ্দীন তাহার নিকট হইয়া বিদায় লইয়া দিল্লী হইতে কারা গমন করিলেন। তিনি কিন্তু তাহার শাশুড়ী মালকা ই-জাহানের হস্তে বিশেষভাবে অপদস্থ হইয়াছিলেন এবং তাহার অত্যাচার এবং উৎপীড়ন তাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; আর তিনি কখনও তাহার এই দুঃখ-দুর্দশার কথা সুলতানের গোচরে আনিতে সক্ষম হন নাই, কারণ সুলতানের উপর মালকা-ই-জাহানের অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ফলে তিনি কিছুকাল যাবৎ চিন্তা করিতেছিলেন যে তিনি কোন ছল ছুতায় সুলতানের রাজ্যের বাহিরের কোন স্থানে চলিয়া যাইবেন; আর দেশটি দখল করিয়া তথায় বসবাস করিবেন। যেহেতু এইবার তিনি এক সুযোগ পাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহা সুবিধা গ্রহণ করিলেন; আর তাহাদের পুরাতন এবং নূতন সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া তাহার বিশেষ বন্ধু মালিক আলা উল-মুলককে তাহার নায়েবরূপে কারা এবং অযোধ্যায় রাখিয়া কারা হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি দেওগীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন কিন্তু ভান করিলেন যেন তিনি চন্দেরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ লুণ্ঠন এবং বিধ্বস্ত করিতে যাইতেছেন। তিনি ইলিচপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার নিকট হইতে কিছুদিন ধরিয়া কোন সংবাদ না আসিবার ফলে মালিক আলা-উল মুলক সুলতানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাকে লিখিলেন যে মালিক আলাউদ্দীন চন্দেরী অঞ্চলটি লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিতেছেন; আর তাহার বিজয় সংবাদ বহন করিয়া তাহার নিবেদন দুই এক দিনের মধ্যেই সুলতানের নিকট পৌঁছিবে। সুলতান এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইলেন; কারণ মালিক আলাউদ্দীন মালকা-ই-জাহানের হস্তে যে

দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিয়াছেন, তাহা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। তিনি ছিলেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা, আর তাছাড়া তরুণ বয়স হইতে তিনি তাহাকে লালন পালন করিয়াছেন। ফলে তাহার নিকট হইতে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ কখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। এই সময়ে দেওগীরের রাজা রাম দেও তাহার পুত্র সহ কোন দূরবর্তী স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে মালিক আলাউদ্দীন দেওগীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি রায় এবং রাজাদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া তাহার মোকাবিলা করিলেন। মালিক আলাউদ্দীন ঐ বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিলেন; এবং দেওগীর অধিকার করিলেন। শেষ পর্যন্ত রাম দেও আসিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রাম দেও-এর প্রাসাদের আস্তাবল হইতে চল্লিশটি হস্তী এবং কয়েক সহস্র অশ্ব মালিক আলাউদ্দীনের হস্তগত হইল; আর স্বর্ণ এবং রৌপ্য এবং মণি এবং মুক্তা এবং বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্র এবং বস্ত্রে মিলিয়া এত প্রচুর পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হইল যে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। যেহেতু দীর্ঘকাল ধরিয়া মালিক আলাউদ্দীনের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল না, সুলতান এক শিকার এবং আমোদ প্রমোদের অভিযানে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মালিক আলাউদ্দীনের স্মারকলিপি (তাহার বিজয়ের সংবাদ দিয়া) আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই, সুলতানের সেনাবাহিনীতে এক গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে মালিক আলাউদ্দীন দেওগীর জয় করিয়াছেন; এবং বহু হস্তী এবং অশ্ব এবং অসংখ্য পরিমাণ দ্রব্য সম্ভার ও ধন সম্পদ লাভ করিয়াছেন; এবং কারা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান অত্যন্ত প্রীত হইলেন; কি ঐ যুগের জ্ঞানী লোকগণ, জানিতেন যে মালিক আলাউদ্দীন এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি সুলতানের অনুমতি না লইয়াই সম্পন্ন করিয়াছেন; আর প্রচুর পরিমাণ ধন সম্পদ লাভ করিয়াছেন; আর তাহারা ইহাও জানিতেন যে তাহার হারামের (স্ত্রীর) সঙ্গে মালকা-ই-জাহানের সঙ্গে তাহার বিশেষ শত্রুতা আছে, তাই তাহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন যে তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার মনোভাব পোষণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার শেষোক্ত জনের নিকট ইহা ব্যক্ত করিলেন না; এক দিন সুলতান তাহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাগণের এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন; এবং তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আলাউদ্দীন দেওগীর হইতে এত সব অশ্ব, হস্তী এবং সম্পদ নিয়া আসিতেছে; আমার এখন কি করা উচিত! আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকিব; অথবা আমি ত্বরায় গিয়া তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিব; অথবা আমি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিব?" মালিক আহমদ হাব তাহার সঠিক চিন্তা এবং সুস্থ বিচার-বুদ্ধির

জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিবেদন করিলেন যে কাহারও সম্পদের প্রাচুর্য, অভিযানের সাফল্য এবং আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ, অহমিকা এবং বিদ্রোহের সৃষ্টি করে; আর সে লোক যতই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয় না কেন সে মাতাল ও পাগল হইয়া যায়। তিনি বলিলেন, "কারার প্রতারক এবং ঠকগণ, যাহারা মালিক বাজুকে আনুগত্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই এখন তাহার চারিদিকে সমবেত হইয়াছে; আর তাহারা তাহাকে সুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকেই দেওগীর গমন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। কে জানে তাহার মনে কি আছে? সুলতানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞের কাজ হইত অতি দ্রুত চন্দেরী গমন করা, যাহাতে তিনি মালিক আলাউদ্দীনের পূর্বেই তথায় পেঁৗছিতে পারেন। শেষোক্তজন যখন শুনিতে পাইবেন যে সুলতান অতি নিকটেই আছে, তখন তিনি তাহার আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন না এবং সুলতানের নিকট আসিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাহার লুণ্ঠিত সম্পদ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, সম্রাটের নিকট হাজির করিবেন। সুলতান তাহার নিকট হইতে তাহার হস্তীসমূহ, জিনিসপত্র এবং তাহার সমস্ত ধনরত্ন, যাহা তাহার বিদ্রোহের কারণ হইতে পারে, নিয়া নিবেন এবং সেগুলিকে দিল্লীতে নিয়া যাইবেন। সুলতান যদি ইহাকে তুচ্ছ ব্যাপাররূপে গণ্য করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করিয়া দিল্লী গমন করেন; আর মালিক আলাউদ্দীন যদি এতগুলি হস্তী, এবং অশ্ব এবং এত প্রচুর পরিমাণ ধন সম্পদ, যাহা ক্ষমতা এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি, সহ কারা গমন করে, এবং তথায় তাহার সকল বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে সুলতান নিজের ধ্বংস নিজেই ডাকিয়া আনিবেন এবং তাহার পরিবার বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

শ্লোক

যাহারা অনুগত এবং বিশ্বস্ত বন্ধুদের কথায় কর্ণপাত করে না
তাহারা তাহাদের শত্রুদের হৃদয়ে আনন্দ এবং সুখ দান করে।

মালিক আহমদ হাবের কথাগুলি সুলতানের বিশেষ মনে ধরিল না। তিনি বলিলেন, "মালিক আলাউদ্দীন আমার পুত্রের ন্যায়; আমি তাহাকে মানুষ করিয়াছি; সে কখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না এবং সে কখনও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবে না।" অতঃপর তিনি সভায় উপস্থিত অন্যান্যদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "এই বিষয়ে আপনারা কি পরামর্শ দেন?" মালিক ফখরুদ্দীন কুজি, যদিও তিনি জানিতেন যে মালিক আহমদ হাব অতি উত্তম পরামর্শ দিয়াছে, তবু যখন দেখিলেন,

যে সুলতান এই মতের বিরোধী, তিনি তহার প্রকৃত মত গোপন করিলেন এবং বলিলেন, "মালিক আলাউদ্দীনের প্রত্যাবর্তনের এবং তাহার প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য আনয়নের খবর এখনও তাহার নিকট হইতে কোন নিবেদন অথবা বিশ্বস্ত লোকদের সাক্ষ্য দ্বারা সঠিক-ভাবে জানা যায় নাই, যাহার ফলে উহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম বা আমাদের যুক্তির ভিত্তি করিতে পারিতাম। ধরুন যদিও সংবাদ সত্যই হয় আর আমরা আমাদের সেনাবাহিনীসহ তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই এবং তাহার সম্মুখে গিয়া মুখোমুখি হই ; যেহেতু তিনি বিনা অনুমতিতে গমন করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব নয় যে তাহার মনে আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ করিবে এবং তিনি যে স্থান হইতে আগমন করিতেছেন পুনরায় তথায় ফিরিয়া যান এবং অন্ধভাবে কোন দিকে ধাবিত হন ; আর তখন আমাদিগকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে, আর বর্ষাকাল সমাগত হইয়া আসিয়াছে, এই সময়ে তিনি যেখানে যান আমাদের তথায় যাইতে হইবে। একটি সুপরিচিত প্রবাদ আছে যে, কাহারও পানির নিকটে আসিবার পূর্বে মোজা খুলিয়া ফেলা উচিত নয়। আবার মনে করুন যে মালিক আলাউদ্দীন তাহার হস্তীসমূহ এবং ধনরত্ন এবং জিনিসপত্রসহ নিরাপদে কারা পৌঁছিয়াছেন ; আর ইহা যদি স্পষ্টই দেখা যায় যে তাহার মাথায় এক বিদ্বেষপরায়ণ এবং মন্দ পরিকল্পনা প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহাকে কি সম্রাটের বাহিনীর এক আক্রমণেই শেষ করিয়া দেওয়া যাইবে না?" মালিক আহমদ হাব বলিলেন, "মালিক আলাউদ্দীন যদি তাহার হস্তীসমূহ এবং ধনরত্ন সহ নিরাপদে কারা পৌঁছেন এবং সরযূ অতিক্রম করিয়া লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন করেন, তখন কেহই আর তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবে না।"

শ্লোক

তোমার শত্রুকে তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা করিও না
কারণ আমি ক্ষুদ্র একটি পাথরকে একটি বৃহৎ পর্বতে পরিণত হইতে দেখিয়াছি !

ইহা শুনিয়া সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বলিলেন, "মালিক আহমদ হাব সর্বদাই মালিক আলাউদ্দীন সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করেন। শেষোক্ত জনকে আমি কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি ; এবং তাহাকে আমার পুত্র করিয়াছি। ইহা সম্ভবপর যে আমার পুত্রদের কেহ আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে ; কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব।" মালিক আহমদ হাব সভায় তাহার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আপশোষ করিলেন এবং পর পৃষ্ঠার শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

শ্লোক

ভাগ্য যখন কাহারও প্রতি বিমুখ হয় *
কেহই তখন তাহাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারে না।

সুলতান মালিক ফখরুদ্দীনের জ্ঞানের প্রশংসা করিলেন; এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই মালিক আলাউদ্দীনের কারা প্রত্যাবর্তনের সংবাদ আসিল; আর তাহার আবেদনও আসিয়া পৌঁছিল। ইহাতে তিনি লিখিলেন, "এই অভিযানে আমি লুণ্ঠিত দ্রব্যরূপে সংগ্রহ করিযা আনিয়াছি, একত্রিশটি হস্তী, বহু সংখ্যক অশ্ব, এবং যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ এবং মণি এবং মুক্তা এবং সকল প্রকারের জিনিসপত্র এবং বস্ত্র, আর আমি সব কিছুই আপনার সম্মুখে হাজির করিতে চাই; কিন্তু যেহেতু আমি বহু দিন অনুপস্থিত ছিলাম এবং যেহেতু আমি আপনার বিনা অনুমতিতেই এই অভিযানে গমন করিয়াছি, আমার মনে এবং আপনার যে সমস্ত কর্মচারী আমার সঙ্গে ছিল তাহাদের সকলের মনে ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। যদি একটি ফরমান জারি করা হয় যাহাতে আমার এবং আমার সঙ্গীগণকে আমাদের নিরাপত্তার কিছু আশ্বাস দেওয়া হয়, তবে আমার নিজেদের সম্বন্ধে কোন ভয় ভাবনা না করিয়া আপনার দ্বারে নিজেদের হাজির করিতে পারি।" তিনি এরূপ কাহিনী বলিয়া সুলতান জালালুদ্দীনকে প্রতারণা করিলেন; আর একই সময়ে লক্ষণাবতীতে এক অভিযান করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। সরযূতে নৌকা সংগ্রহ করিবার নির্দেশ দিয়া তিনি যাফর খানকে অযোধ্যা প্রেরণ করিলেন; আর তিনি তাহার অফিসার এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেন যে, যে মুহূর্তে তাহারা শুনিতে পাইবে যে সুলতান জালালুদ্দীন দিল্লী হইতে কারা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহারা সরযূ অতিক্রম করিবে এবং লক্ষণাবতী অঞ্চলে প্রবেশ করিবে এবং তাহা দখল করিয়া তথায় শাসন পরিচালনা করিবে। সুলতান জালালুদ্দীন নিজের হাতে তাহার নিকট একটি স্নেহশীল পত্র লিখিলেন। ইহাতে তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীগণকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন এবং তাহার অতি বিশ্বস্ত দুইজন লোকের হস্তে ইহা প্রেরণ করিলেন। এই লোকগুলি যখন কারা পৌঁছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে মালিক আলাউদ্দীন সম্পূর্ণরূপে সুলতানের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন; আর তিনি ঐ স্থানে অবস্থিত আমীরগণের সকলকে সুলতানের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু মালিক আলাউদ্দীন তাহাদের উপর যেন কড়া নজর রাখিলেন যে তাহারা প্রকৃত অবস্থা সুলতানকে নিবেদন করিতে পারিলেন না।

ইহার পর কিছুকাল গত হইল মালিক আলাউদ্দীন তাহার ভ্রাতা আলমাস বেগকে, তিনিও সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা ছিলেন, একটি পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন যে যেহেতু তিনি সুলতানের অনুমতি ছাড়াই এমন এক অভি-যান পরিচালনা করিয়াছেন, যাহা বৈষয়িক ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকেরা তাহার মনে ভয় ঢুকাইয়া দিয়াছে, কিন্তু যেহেতু তিনি একই সাথে সুলতানের পুত্র এবং ক্রীতদাস, শেষোক্তজন যদি দ্রুত পথ চলিয়া একাকী আগমন করেন এবং তাহাকে হাতে ধরিয়া দিল্লী নিয়া যান, তবে তিনি সানন্দে আনুগত্য প্রকাশ করিবেন এবং খেদমত করিবেন; কিন্তু সুলতান যদি ইহা না করেন, তবে তিনি বিষ পান করিবেন এবং আত্মহত্যা করিবেন অথবা কোন একদিকে চলিয়া যাইবেন। আলমাস বেগ চিঠিটি সুলতানকে পড়িতে দিলেন। শেষোক্ত জন তাহাকে দ্রুত গিয়া মালিক আলাউদ্দীনকে শান্ত করিতে আদেশ দিলেন; আর বলিলেন যে তিনি শীঘ্রই তাহার অনুসরণ করিবেন। আলমাস বেগ তৎক্ষণাৎ একটি নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং পানিতে বাতাসের ন্যায় দ্রুতবেগে গমন করিলেন। সপ্তম দিনে তিনি মালিক আলাউদ্দীন যেখানে ছিলেন সেই স্থানে পৌঁছিলেন। শেষোক্ত জন তাহার ভ্রাতার আগমনে মহা আনন্দিত এবং খুশী হইলেন। তিনি এইবার তাহার লক্ষণাবতী অভিযান সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু যাহারা তাহার বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং তাহার অন্তরঙ্গ ছিলেন তাহারা বলিলেন যে তাহাদের পক্ষে লক্ষণাবতীতে গমনের আর প্রয়োজন হইবে না, যেহেতু সুলতান জালালুদ্দীন, হস্তীসমূহের এবং ধনসম্পদের লোভ সাম-লাইতে না পারিয়া ঐ বর্ষাকালেই তাহাদের নিকট আগমন করিবেন। তখন তাহারা ঐ স্থানে তাহাকে শেষ করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন। অতঃপর তাহারা বিজয় অভিযানে এবং সাম্রাজ্য দখলে তৎপর হইবেন। মালিক আলাউদ্দীনের নিকট এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত এবং সঠিক বলিয়া মনে হইল। যেহেতু মৃত্যু তখন মালিক জালা-লুদ্দীনের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তিনি তাহার আন্তরিক শুভাকাঙ্খীদের কথা শুনিলেন না, এবং তাহার কতিপয় বিশেষ অনুচর এবং এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। একই সময়ে তিনি সেনাবাহিনী এবং সমস্ত রাজকীয় সাজসরঞ্জামসহ আহমদ হাবকে স্থলপথে প্রেরণ করিলেন।

শ্লোক

কেহ যখন তাহার বন্ধুদের পরামর্শে কর্ণপাত করে না
উপরের ফেরেশতারা তখন তাহাকে শাস্তি দান করে।

৭ই রমযান যখন সুলতান কারা পৌঁছিলেন, তখন মালিক আলাউদ্দীন তাঁহার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত করিয়া নিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছেন ; এবং কারা এবং মানিকপুরের মধ্যস্থলে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। সুলতানের আগমন সংবাদ লাভ করিয়া তিনি তাহার ভ্রাতা আলমাস বেগকে সুলতানের খেদমতের জন্য প্রেরণ করিলেন ; আর তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি যেন যে কোন প্রতারণা করিতে পারেন তাহাই প্রয়োগ করিয়া সুলতান এবং তাহার সেনাবাহিনীকে আলাদা করিয়া ফেলেন এবং প্রথমোক্তজনকে একাকী আনয়ন করেন। আলমাস বেগ নিজেকে সুলতানের সম্মুখে হাজির করিলেন, এবং ভূমি চুম্বন করিবার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিলেন এবং নিবেদন করিলেন, "পৃথিবীর প্রভুর নির্দেশমত যদি আমি তৎক্ষণাৎ চলিয়া না আসিতাম এবং আমার ভ্রাতাকে সান্ত্বনা না দিতাম, তবে এত দিনে তিনি কোন এক অজানা স্থানে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু আমার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তাহার মনে কিছু শঙ্কা রহিয়া গিয়াছে ; আর তিনি যদি মহান সম্রাটকে এত বেশী সংখ্যক অশ্বারোহী সহ দেখিতে পান, তবে এখনও এরূপ সম্ভাবনা আছে যে তাহার পুনরায় নূতনভাবে মতিভ্রম হইবে এবং পুনরায় কোন এক দিকে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন।" সুলতান তাহার এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নির্দেশ দিলেন যে তাহার সঙ্গে যে অশ্বারোহী সৈন্যগণ আছে তাহারা যেখানে আছে সেখানেই অপেক্ষা করিবে। তিনি নিজে তাহার ব্যক্তিগত পরিচারকগণসহ অগ্রে গমন করিলেন। তিনি যখন পথের কিছু অংশ অতিক্রম করিয়াছেন তখন সেই প্রধান প্রতারক আলমাস বেগ তাহার মিথ্যা ভাষণের জিহ্বা আলগা করিলেন এবং বলিলেন, "আমার ভ্রাতা এখন হাতের কাছেই আছেন। মহান সম্রাটের সঙ্গে এখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত যে লোকজন আছে, তিনি যদি তাহাদের দেখিতে পান তবে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, যে ভয় ও ভীতি তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে তিনি আপনার দয়া এবং স্নেহ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িতে পারেন।" অতঃপর সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী তাহার অনুচরগণের সকলেই তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহারা যখন গঙ্গার নিকটবর্তী হইলেন, যাহারা সুলতানের নিকটে ছিলেন তাহারা কিছু দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে আলাউদ্দীনের সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং যেন কোন এক সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা আলাউদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইলেন ; এবং আলমাস বেগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। ভকিল-দার মালিক খুররম আলমাস বেগকে বলিলেন : "আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম এবং নিজেদের আমাদের সৈন্যদের নিকট

হইতে আলাদা করিয়া লইয়াছিলাম এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও ফেলিয়া দিয়াছি। আপনাদের সেনাবাহিনী দেখা যাইতেছে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং প্রস্তুত হইয়া আছে।'' আলমাস বেগ বলিলেন ঃ 'আমার ভ্রাতা তাহার সেনাবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া প্রস্তুত রাখিয়াছেন এবং যুদ্ধসাজে সাজাইয়া সুলতানের সম্মুখে তাহার পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত করিবেন।'' প্রবাদে আছে যে ভাগ্য যখন কাহারও বিরূপ হয় তখন তাহা তাহাকে অন্ধ করিয়া দেয়; এই প্রবাদ অনুযায়ী সুলতান প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা করিলেন না, যদি যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই নিকট ইহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, আর তিনি আলমাস বেগকে ইহাও বলিলেন; "আমি রোজা রাখিয়া এই দূরের পথ আলাউদ্দীনকে দেখিতে আসিয়াছি, আর আমার জন্য তাহার এতটুকু দয়া হয় না, যে তাহার নৌকায় আরামে বসিয়া আছে এবং আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিতেছে না। শয়তান-প্রতারক আলমাস বেগ প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ "আমার ভ্রাতা মহান সম্রাটের সঙ্গে খালি হাতে দেখা করিতে চান না; তিনি তাহার করের জিনিসপত্র, যেমন হস্তীসমূহ এবং অন্যান্য মনোমুগ্ধকর জিনিসপত্রসহ সম্রাটের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিবেন। আর তাছাড়া তিনি আপনার রোজা খুলিবার জন্যও সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আশা করিতেছেন যে, মহান সম্রাট তাহার সঙ্গেই রোজা খুলিবেন, যাহাতে তিনি এই সম্মান দ্বারা তাহার বন্ধু বান্ধবদের এবং সমপর্যায়ের লোকদের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন।'' তাহাদের প্রতারণার কোন চিন্তাই সুলতান জালালুদ্দীনের মনে উদিত হয় নাই, এবং তিনি ১৭ই রমযান বৈকালে যখন নদীর তীরে পৌঁছিলেন তখন তিনি অসাবধানে নৌকায় বসিয়া কোরান শরীফ পাঠ করিতেছিলেন। তখন আলা-উদ্দীন আগাইয়া আসিলেন; এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। এবং সুলতানের পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন। শেষোক্ত জন তাহার ভালবাসা এবং স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ তাহার গায়ে মৃদু আঘাত করিলেন: আর অন্যান্যভাবেও তাহার প্রতি তাহার দয়া প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে বহু যত্ন করিয়া লালন পালন করিয়াছি এবং তোমাকে বড় করিয়াছি; আর সদা সর্বদাই তুমি আমার চোখে আমার পুত্রদের চেয়েও প্রিয়। তখন আমি কি করিয়া তোমার ক্ষতি সাধনের চিন্তা করিতে পারি?" তিনি ইহা বলিলেন এবং আলাউদ্দীনের হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার নৌকার দিকে টানিলেন। এই সময়ে মালিক আলাউদ্দীন সুলতানকে হত্যার জন্য তিনি যে লোকদের মনোনিত করিয়া এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব তাহাদের দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এক ইঙ্গিত করিলেন। সামানার নীচ লোকদের নিকৃষ্টতম মাহমুদ সলিম তাহার তরবারি দ্বারা সুলতানকে আহত করিলেন। শেষোক্ত জন

আঘাত পাইয়া নৌকার দিকে দৌড়াইলেন ; আর চীৎকার করিয়া উঠিলেন : "ওহ্ ! দুরাত্মা আলাউদ্দীন, তুমি একি করিয়াছ !" ইখতিয়ারুদ্দীন হুর, যিনি সুলতানের নিকট হইতে বহু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, পেছন দিক হইতে আসিলেন এবং সুলতানকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন ; আর তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তাহা আলাউদ্দীনের নিকট নিয়া গেলেন। অতঃপর তাহারা নিরীহ নিহত সুলতানের শির একটি বল্লমে করিয়া কারা এবং মানিকপুর প্রদক্ষিণ করিলেন ; আর তৎপর তাহা অযোধ্যায় নিয়া গেলেন। সুলতানের বিশেষ পরিচারকগণ, যাহারা নৌকায় ছিলেন, তাহারাও নিহত হইলেন। এক বিশ্বাসযোগ্য প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, সুলতান জালালুদ্দীনের কারা আগমনের ঠিক পূর্বেই মালিক আলাউদ্দীন শেখ কুর্ক মজযুবের, যাহাকে কারা শহরে সমাহিত করা হইয়াছে, নিকট তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গমন করেন ; এবং প্রার্থীর ন্যায় তাহার খেদমত করেন। 'মজযুব' তাহার মাথা উত্তোলন করেন এবং বলেন :

শ্লোক

"যে কেহ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে
তাহার শির নৌকায়, দেহ গাঙ্গে !"

সংক্ষেপে তাহারা সুলতান জালালুদ্দীনের চাঁদোয়া মালিক আলাউদ্দীনের মাথার উপরে উত্তোলন করিলেন এবং তাহাকে সম্রাট ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীনের হত্যাকাণ্ডে তাহার সঙ্গে যে সব লোক জড়িত ছিলেন তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই নানা প্রকারের দুর্ঘটনায় পতিত হইলেন, এবং দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইলেন। সলিমের পুত্র মাহমুদ এক বৎসর পরেই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইলেন ; আর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুঞ্চিত হইয়া গেল এবং খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। ইখতিয়ারুদ্দীন হুর পাগল হইয়া গেলেন আর তাহার যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন আর বলিতেন, "সুলতান জালালুদ্দীনের হাতে একটি তরবারি আছে ; আর আমার মাথা কাটিয়া ফেলিতেছে।" অকৃতজ্ঞ মালিক আলাউদ্দীন স্বয়ং, যদিও কিছু-কাল তিনি সমৃদ্ধির সঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন তবু শেষ পর্যন্ত নিয়তি তাহাকে তাহার কাজের উপযুক্ত শাস্তি দিতে ত্রুটি করে নাই ; এবং তাহার উপর প্রতিশোধ নিয়াছে ; আর তাহার বংশধরদের নাম বা কোন চিহ্ন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে অবশিষ্ট নাই !

শ্লোক

সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ যথেচ্ছা প্রক্ষিপ্ত নয়
পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ মহান নিয়ন্তাবিহীন নয় !

ভাবিয়া দেখ! তোমাকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে! কাল কি করিয়া কাজ করে
তুমি যাহা কিছু কর, সময়ে তাহার প্রতিদান পাইবে।

সুলতান জালালুদ্দীনের শহীদ হইবার সংবাদ যখন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মালিক আহমদ হাবের নিকট পৌঁছিল, তিনি যে স্থানে ছিলেন তথা হইতে ফিরিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুলতানের স্ত্রী মালকা-ই-জাহান তাহার বোকামীর ফলে, তাহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রুকনুদ্দীন ইব্রাহীমকে, যিনি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তখনও বয়োপ্রাপ্ত হন নাই, অতি ত্বরা করিয়া মহা আমীরগণের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া সিংহাসন স্থাপন করিলেন। তিনি কিলুখরি ত্যাগ করিয়া দিল্লী আগমন করিলেন এবং সবুজ মণ্ডপে বসবাস আরম্ভ করিলেন আর বিভিন্ন উচ্চ পদ এবং বড় বড় জায়গীরগুলি আমীর ও মালিকগণের মধ্যে বিলি বণ্টন করিয়া দিলেন। আরকলি খান ছিলেন সুলতানের প্রকৃত পুত্র এবং উত্তরাধিকারী এবং তিনি রাজোচিত গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। তিনি মুলতানে রহিয়া গেলেন এবং দিল্লী আগমন করিলেন না। মালিক আলাউদ্দীন ঘোর বর্ষার মধ্যেই দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পর্যায়-ক্রমে পথ অতিক্রম করিয়া যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার স্বর্ণ এবং ধনরত্ন দ্বারা এমনভাবে লোকের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন যে প্রত্যেকেই তাহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল; আর সুলতান জালালুদ্দীনের হত্যার ফলে যে শত্রুতার মনোভাব তাহাদের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল। তাহার বলেঃ

শ্লোক

পাপের তামার জন্য দানশীলতাই রসায়ন
সকল মন্দের প্রতিষেধক দয়াশীলতা।

মালিক আলাউদ্দীন প্রতিদিন স্বর্ণ দ্বারা একটি বালিস্তা (বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপের এক প্রকার যন্ত্র) পূর্ণ করিতেন এবং তাহা তাহার সৈন্যদের মধ্যে ছিটাইয়া দিতেন। যে কেহ তাহার চাকুরীতে প্রবেশ করিত, তাহাদের প্রত্যেকে ঐ সময়ের প্রচলিত মজুরীর প্রতি দশটির (মুদ্রা) জন্য পাইত বিশ বা ত্রিশটি। এইরূপে তিনি লোকের হৃদয় জয় করিলেন।

শ্লোক

তুমি যদি মহত্ত্ব লাভ করিতে চাও, তবে তোমার হৃদয়কে মহানুভব কর।

কথিত আছে যে, তিনি যখন বদাওনে আগমন করেন, তখন তিনি তাহার সৈন্য সমাবেশ করেন; আর তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ষাট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য। জালালী আমীর এবং মালিকগণ চতুর্দিক হইতে আগমন করিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীনের স্বর্ণ এবং তিনি যে উচ্চ বেতন দিতেন তাহার প্রলোভনে তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। মালকা ই-জাহানের আশা ভরসা নির্মূল হইয়া গেলে তিনি আরকলি খানকে তলব করিলেন; কিন্তু তিনি সংবাদ দিলেন যে ব্যাপার এতদূর আগাইয়া গিয়াছে যে এখন আর ইহার কোন প্রতিকার করা সম্ভব নয়।

শ্লোক

কোন ঝর্ণার শুরুতে একটি মাথার কাঁটা দিয়া তাহা বন্ধ করা যায়!
কিন্তু ইহা যখন পূর্ণ হয়, তখন হস্তীপৃষ্ঠেও ইহা অতিক্রম করা যায় না।

এই সংবাদ শুনিয়া মালিক আলাউদ্দীনের সংকল্প দৃঢ়তর হইল এবং তিনি কথের ফেরীতে যমুনা নদী অতিক্রম করিলেন এবং জুদের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। রুকনুদ্দীন ইব্রাহীমও তাঁহার সৈন্যগণকে তাহার সম্মুখে সন্নিবেশিত করেন; এবং তৎপর পশ্চাদপসরণের ভান করেন। রাত্রিকালে জালালী আমীরগণের অধিকাংশ তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং মালিক আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করেন। প্রথমোক্ত জন যখন দেখিলেন যে ব্যাপার প্রতিকারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি তাহার মাতাকে এবং মালিক রজব এবং কুতবুদ্দীন উ-মুই এবং আহমদ হাব এব অন্যান্য কতিপয় লোক যাহারা তখনও তাহাদের নিমকহারামী করে নাই তাহাদিগকে সঙ্গে নিলেন এবং মুলতানের পথ ধরিলেন।

সুলতান জালালুদ্দীনের রাজত্বকাল ছিল সাত বৎসর এবং সাত মাস।

সুলতান আলাউদ্দীন খলজী

তিনি আঃ হিঃ ৬৯৫ সনে দিল্লীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাহার ভ্রাতা আলমাস খানকে, উলুঘ খান উপাধি দিলেন এবং মালিক নসরত জালেসরিকে দিলেন নসরত খান এবং মালিক হাবরুদ্দীনকে দিলেন যাফর খান এবং তাহার শ্যালক সনজরকে দিলেন আলী খান উপাধি। আলী খান ছিলেন তাহার মন্ত্রণা সভার সভাপতি। তাহার যে সব বন্ধু তখনও আমীর হন নাই, তিনি তাহাদিগকে ঐ পদে উন্নীত করিলেন; আর যাহারা আমীর ছিলেন তাহাদিগকে উচ্চতর পদে উন্নীত করিলেন এবং বৃহত্তর জায়গীর প্রদান করিলেন। তিনি তাহার অফিসার এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন যাহাতে তাহারা

নূতন সৈন্য ভর্তি করিতে পারে। এইরূপে তাহার সেনাবাহিনী এক বিরাট বাহিনীতে পরিণত হইল। তিনি যখন তাহার সেনাবাহিনীসহ শিবির প্রান্তরে ছাউনী ফেলিলেন তখন রাজধানীর উচ্চনীচ সকলেই তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিতে এবং তাহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আগমন করিলেন। তাহার নামে খোৎবা পাঠ করা হইল এবং মুদ্রা প্রচলন করা হইল এবং অন্যান্য রাজকীয় অনুষ্ঠানাদিও নিয়মিত পালন করা হইল। মালিক আলাউদ্দীন রাজোচিত জাঁকজমক এবং আড়ম্বরে শহরে প্রবেশ করিলেন; এবং সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং সুলতান আলা-উদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন। ঐ স্থান হইতে তিনি চুনি মণ্ডপে গমন করিলেন এবং তাহাকে তাহার সাম্রাজ্যের দরবারে পরিণত করিলেন। নাগরিকগণ ভোজ-উৎসব পালন করিলেন এবং সুশোভিত গম্বুজ নির্মাণ করিলেন; আর অলিগলি মদে ভাসিয়া গেল; এবং লোকেরা খেলাধূলা এবং আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া উঠিল। সম্পদের প্রাচুর্যের অহমিকায় আর যৌবনের মাতলামীতে সুলতান আলা-উদ্দীন অসংযত জীবনযাত্রা এবং ভোগ বিলাসে গা ভাসাইয়া দিলেন, আর তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়া এবং উপহার দিয়া লোকজনকে তাহার প্রতি অনুগত এবং সিংহাসনের অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন। তিনি প্রত্যেককেই একটি পদ এবং একটি উপাধি দিয়া সম্মানীত করিলেন; আর (আমীরগণের মধ্যে) পরগণা এবং প্রদেশগুলি বিলি করিলেন। খাজা খতিব তাহার ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন, তাহাকে উযির পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হইল। কাযি সদরুদ্দীন আরিফ, যাহার উপাধি ছিল সদর-ই-জাহান, সাম্রাজ্যের প্রধান কাযি নিযুক্ত হইলেন এবং সৈয়দ আজম (মহা গৌরবান্বিত সৈয়দ) এবং শেখ-উল ইসলাম উপাধিদ্বয় তাহাকে দেওয়া হইল। ভূতপূর্ব সৈয়দ আজম, খতিব এবং শেখ উল ইসলাম এই উভয় পদই অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাকে খতিব (প্রচারক) পদে পুনর্বহাল করা হইল। ইনশা (যোগাযোগ করণ) পদটি দেওয়া হইল উমদাত উল মুলক হামিদুদ্দীন; মালিক ইযযুদ্দীনকে, যিনি দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে ভূষিত ছিলেন, সুলতানের নিকটে রাখিয়া তাহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হইল। নসরত খান সাম্রাজ্যের নায়েব ছিলেন, তাহাকে কোতোয়াল (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করা হইল এবং মালিক ফখরুদ্দীন কুজি রাজধানীর দারোগা নিযুক্ত হইলেন। যাফর খানকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হইল; মালিক আবাজী জালালী তাজিরবেগী (বাণিজ্য সচিব) এবং মালিক হুরণ বর নায়েব বারবেগী পদ লাভ করিলেন। তারিখ-ই-ফিরোয শাহীর লেখক যিয়া বার্ণীর চাচা মালিক আলাউল মুলক কারা এবং অযোধ্যা জায়গীরদ্বয় লাভ করিলেন। ব ভকিল-দার পদটি দেওয়া হইল

উপরোক্ত যিয়ার পিতা মালিক জুনাই কদিমকে এব মুয়েদউল মুলক বরণ শহরের নায়েব এবং খাজা পদে নিযুক্ত হইলেন। সকল যোগ্য লোকের সকল সম্পত্তি এবং ট্রাস্ট পুনর্বহাল করা হইল এবং তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ নির্বাহের জন্য তাহাদিগকে অন্যান্য বৃত্তিও দেওয়া হইল। সেনাবাহিনীর সকলকে ঐ বৎসরে তাহাদের প্রধানতঃ ভাতার উপরে ছয় মাসের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হইল এবং ইহা দ্বারা প্রত্যেককে ঐ বৎসরে খুসী করা হইল। সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে আরাম-আয়েশ এবং সুখ-সমৃদ্ধি প্রবেশ করিল এবং সুলতান জালালুদ্দীনের হত্যার ন্যায় মহা অপরাধ ও চোখের আড়াল করিয়া রাখা হইল এবং লোকের মন হইতে মুছিয়া ফেলা হইল। সুলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি এই নীতি অনুসারে ঃ

শ্লোক

যতক্ষণ দাবীদারের শির তাহার ঘাড়ে অবস্থিত থাকে
রাজ্য তখন বিদ্রোহের পোশাক পরিধান করে।

স্থির করিলেন যে মুলতানে অবস্থিত সুলতান জালালুদ্দীনের পুত্রগণকে ধ্বংস করার বিষয়টির প্রতিই তাহার অতি দ্রুত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তদনযায়ী চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ উলুঘ খান এবং যাফর খানকে এই কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তদনুযায়ী তাহারা তথায় গমন করিলেন এবং শহরটি অবরোধ করিলেন। দুই মাস পর মুলতানের কোতোয়াল এবং তথায় অবস্থিত অন্যান্য আমীরগণ আরকলি খান এবং তাহার ভ্রাতাগণকে পরিত্যাগ করিলেন এবং শহর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উলুঘ খান এবং যাফর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সুলতানের পুত্রগণ মহা-দুর্দশায় পতিত হইয়া তখন শেখ রুকনুদ্দীন (আল্লাহ যেন তাহার কবর পবিত্র করেন) মধ্যস্থতায় নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিয়া উলুঘ খানের নিকট আগমন করেন। উলুঘ খান তাহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করেন; এবং তাহার মঞ্চের নিকটে তাহাদের জন্য স্থান নির্ধারণ করেন এবং তাহার জয়লাভ ঘোষণা করিয়া দিল্লীতে এক পত্র প্রেরণ করেন। তাহারা মঞ্চ হইতে চিঠিটি পাঠ করেন এবং গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং জয় ঢাক বাজান। অতঃপর উলুঘ খান সুলতান জালালুদ্দীনের পুত্রগণ এবং যে সব আমীর এবং মালিক তাহাদের দলে ছিলেন; তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে দিল্লী হইতে এই কাজের জন্য প্রেরিত নসরত খান উলুঘ খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং সুলতান জালালুদ্দীনের পুত্রগণের এবং তাহার জামাতা আলঘুর এবং নায়েব আমীর হাজিব (সহকারী গৃহাধ্যক্ষ) মালিক আহমদ হাবের চক্ষুর উপর দিয়া পেন্সিল টানিয়া দিলেন (তাহাদিগকে অন্ধ

করিবার জন্য); এবং তাহাদের সম্পত্তি এবং অনুচরদের দখল করিয়া লইলেন। দুই অসহায় শাহযাদাকে হানসীতে কারারুদ্ধ রাখা হইল; আরকলি খানের দুই পুত্রকে হত্যা করা হইল; আর আহমদ হাবকে এবং সুলতান জালালুদ্দীনের স্ত্রীগণকে এবং তাহার পুত্রগণের স্ত্রীদের দিল্লী আনয়ন করা হয় এবং তথায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

সিংহাসনারোহণের পর দ্বিতীয় বৎসরে নসরত খানকে উযির নিযুক্ত করা হইল; আর মালিক আলাউল মুলককে ঐ স্থানে অবস্থিত আমীরগণ এবং ধনরত্নসহ কারা হইতে আগমনের জন্য তলব করা হইল; আর দিল্লীর কোতোয়ালের পদটি তাহাকে দেওয়া হইল; এই পদটি মালিক-উল-উমরা অধিকার করিয়াছিলেন। সুলতান তাহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় সুবিধা লাভের জন্য জালালী আমীরগণকে যে সব সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, অতঃপর নসরত খান সে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন; আর এই উপায়ে কোষাগারে এক বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিলেন।

এই বৎসরেই মুঘলবাহিনী সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্তানে প্রবেশ করিল। সুলতান আলাউদ্দীন উলুঘ খান ও যাফর খানকে অন্যান্য আমীরগণসহ তাহাদের আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। উভয় বাহিনী জারনমহমুর[১] পরস্পরের সম্মুখীন হইল। যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তাহাতে মুঘলগণ পরাজিত হইল এবং তাহাদের বহু সংখ্যক নিহত হইল এবং বহু সংখ্যক বন্দী করা হইল। এই বিজয়ের সংবাদ যখন দিল্লী পৌঁছিল তখন নাগরিকগণ জয় ঢাক বাজাইলেন এবং গম্বুজ নির্মাণ করিলেন এবং আনন্দোৎসব করিলেন। ইহার পর যে সব জালালী আমীরগণ তাহাদের ভূতপূর্ব প্রভুকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত জনের নিকট হইতে উচ্চ পদ আর বড় বড় জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বন্দী করা হইল; তাহাদের

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে জাব মিথুব, আর দুইটিতে আছে জাব নমহমুর। যিয়া বার্ণীর তারিখ-ই-ফিরোযশাহীর ছাপান পুস্তকে নামটি জালন্ধার দেওয়া আছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে জাদওয়া ও মনজুর এবং জুবত মহদ। তারিখ-ই-ফিরোযশাহীর এক অংশের মেজর ফুলার যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার এক টিকায় টি. ডব্লিউ. টোলবার্ট, সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে মুঘল আক্রমণের পর্যালোচনা করিতে গিয়া (১) যিয়া-ই-বার্ণী (২) নিযামুদ্দীন আহমদ হারাভী (৩) বদাওনী এবং (৪) ফিরিশতা অনুযায়ী এই যুদ্ধের ক্ষেত্র বলা হইয়াছে (১) নং অনুযায়ী জারি মনজুর, (২) নং অনুযায়ী সিন্ধু দেশের জারণ মঞ্জহর, (৩) নং অনুযায়ী জারণ মনজুর এবং (৪) নং অনুযায়ী লাহোর লিখিয়াছেন। তবকাত-ই-আকবরীতে সিন্ধু দেশের জারণ মঞ্জহর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে এইবার মুঘলগণ সিন্ধু দেশ আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে হিন্দ, সিন্দু নয়। ফিরিশতা মুঘল বাহিনীর সেনাপতির নাম লিখিয়াছেন আমীর দাউদ, যদিও পূর্ববর্তী লেখকগণের কেহই তাহার এইরূপ নাম দেন নাই।

কিছু সংখ্যককে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ; আর কিছু সংখ্যককে দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলিতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইল, আর তাহাদের জিনিসপত্র এবং বিষয় সম্পত্তি কোষাগারে আনয়ন করা হইল এবং তাহাদের গৃহাদি এবং পরিবাসমূহ বিনষ্ট করা হইল। সমস্ত জালালী আমীরের মধ্যে মালিক কুতবুদ্দীন আলাই, মালিক নাসিরুদ্দীন, শাহনাহ-ই-পিল (হস্তীদের রক্ষক) এবং মালিক আমীর জামান, কদর খানের পিতা, যাহারা কখনও সুলতানের পুত্রগণের বিরোধিতা করেন নাই এবং কখনও সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করেন নাই, নিরাপদ রহিলেন এবং কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না। উপরোক্ত বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা নসরত খান এই বৎসরের মধ্যেই এক কোটি সংগ্রহ করিলেন ; আর এই অর্থ কোষাগারে জমা দিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর তৃতীয় বৎসরে সুলতান উলুঘ খান এবং নসরত খানকে এক বিশাল বাহিনী সৈন্যসহ গুজরাট আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা নহরওয়ালা এই প্রদেশের সবগুলি শহর লুণ্ঠন এবং বিধ্বস্ত করিলেন নহরওয়ালার গভর্ণর রায় করণ পলায়ন করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের দেওগিরীর রাজার সঙ্গে যোগদান করিলেন ; আর তাহার স্ত্রীগণ এবং কন্যা (যাহার নাম ছিল দেবল রাণী), তাহার ধন-রত্ন, হস্তীসমূহ এবং তাহার যাহা কিছু ছিল সবকিছু সেনাবাহিনীর হস্তগত হইল। সোমনাথের যে মূর্তি সুলতান মাহমুদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার স্থলে ব্রাহ্মণগণ যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং পূজা করিতেছিল, উলুঘ খান এবং নসরত খান তাহাও দিল্লী আনয়ন করিলেন এবং এমন স্থানে ইহা স্থাপন করিলেন যেখানে লোকে ইহাকে পদদলিত করিবে। নসরত খান কামবায়াত গমন করিলেন এবং ঐ স্থানে যে সব ব্যবসায়ী বাস করিতেন এবং প্রভুত সম্পদশালী ছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে এমন প্রচুর পরিমাণ ধন-রত্ন, মণি-মুক্তা, এবং অন্যান্য মনোরম জিনিসপত্র সংগ্রহ করিলেন যাহার কোন লেখা-জোখা নাই। তিনি কাফুর হাজারদিনারীকে প্রভুর নিকট হইতে বলপূর্বক ছিনাইয়া আনিলেন (সুলতান আলাউদ্দীন তাহার প্রতি তাহার যে আকর্ষণ হয় তাহার ফলে পরবর্তীকালে তাহাকে নায়েব-ই-মুলক অর্থাৎ সাম্রাজ্যের সহকারী শাসনকর্তা) এবং তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। গুজরাট বিধ্বস্ত এবং লুট করিয়া উলুঘ খান এবং নসরত খান যখন বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারসহ প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন তাহারা সেনাবাহিনীর নিকট হইতে তাহাদের নেওয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ দাবী করেন এবং তাহা আদায় করেন এবং তাহাদের বলপূর্বক আদায়করণ সকল সীমা অতিক্রম করে। কতিপয় আমীর যাহাদিগকে নব-মুসলমান বলা হইত, অন্যান্য যাহারা এই বলপূর্বক আদায় করিবার ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন এবং উলুঘ খানের

আমীর-ই-হাজিব মালিক ইযযুদ্দীনকে নসরত খানের ভ্রাতা) আক্রমণ করিলেন ; এবং তাহাকে হত্যা করিয়া উলুঘ খানের মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। শেষোক্ত জন অপর এক দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং নসরত খানের মঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের ভাগিনেয় মঞ্চে নিদ্রা যাইতেছিলেন। বিদ্রোহী আমীরগণ তাহাকেই উলুঘ খান মনে করিয়া হত্যা করিলেন। অতঃপর নসরত খান দ্রুত তাহার লোকজনকে একত্র সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন৷ আর তাহারা বিভিন্ন দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। উলুঘ খান এবং নসরত খান লুণ্ঠিত মালামাল সম্বন্ধে আরও বিশদ তদন্ত করা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহারা যে সব ধন সম্পদ, হস্তী এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসম্ভার লাভ করিয়াছিলেন তাহাই দিল্লী নিয়া গেলেন। সুলতান আলাউদ্দীন যে সব আমীর এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের স্ত্রী এবং সন্তানগণকে বন্দী করিলেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্নরূপ শাস্তি প্রদান করিলেন। নসরত খান, তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিবার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, যে সব লোক এই হত্যা সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহাদের পরিবারের মহিলাগণকে কতিপয় ঝাড়ুদারের নিকট প্রদান করেন, আর তিনি নির্দেশ দিলেন যে শিশুগণকে মহিলাদের উপরে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে হইবে। ইহার পূর্বে তাহাদের আত্মীয় স্বজনের অপরাধের জন্য মহিলা এবং শিশুগণকে শাস্তি দিবার প্রথা দিল্লীতে প্রচলিত ছিল না।

এই বৎসর সালদী[১] নামে এক মুঘল এবং তাহার ভ্রাতা সিবিস্তান আগমন করেন এবং তাহা অধিকার করেন। যাফর খানকে এক বিরাট বাহিনীসহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় ; আর এই বিজয়ী সেনাপতি সিবিস্তান অবরোধ করেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহা জয় করেন ; এবং সালদী এবং তাহার ভ্রাতা এবং তাহাদের পরিবার এবং সন্তানগণকে এবং সঙ্গীয় অন্যান্য মুঘলগণকে তাহাদের গলায় তালা লাগাইয়া দিল্লী প্রেরণ করেন। এই বৎসরেরই শেষে কুতলাঘ খাজা এবং তাহার পুত্র কয়েক সহস্র মুঘলসহ মাওয়ারা উন্নাহার হইতে হিন্দুস্তান জয় করিতে আগমন করেন। তাহারা সিন্ধু নদী অতিক্রম করিলেন ; আর যেহেতু তাহারা দেশটি জয় করিতে আসিয়াছিলেন তাহারা তাহাদের পথিমধ্যের গ্রাম এবং শহরগুলি কোনরূপ ক্ষতি সাধন বা লুটতরাজ করেন নাই, কারণ

১. যিয়া-ই-বার্ণী বর্ণনা দিয়াছেন কি করিয়া সলদী সিবিস্তান দুর্গটি অধিকার করেন এবং কিভাবে যাফর খান পুনরায় ইহা তাহার নিকট হইতে উদ্ধার করেন। বদাওনী মুঘলদের এই অভিযানের কোন উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা মুঘল সেনাপতির নাম লিখিয়াছেন চলদি খান।

তাহারা এইগুলিকে তাহাদের রাজ্যের অঙ্গরূপে গণ্য করিলেন। তাহারা দিল্লীর সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন এবং অবরোধ আরম্ভ করিলেন (যেহেতু মুঘলদের ভয়ে ভীত হইয়া নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের শহর এবং গ্রাম হইতে এত প্রচুর সংখ্যক লোক শহরে আগমন করিল যে স্থানটি এত বেশী জনপূর্ণ হইয়া উঠিল যে মসজিদ গুলিতে, অলিগলিতে এবং বাজারসমূহে এবং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থান ও রহিল না। অতিরিক্ত জন সমাগমের ফলে লোকেরা চরম দুর্দশায় পতিত হইল এবং শস্য এবং রসদ আনয়নের পথসমূহও বন্ধ হইয়া গেল। আর সব কিছুই দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। সুলতান আলাউদ্দীন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমীর এবং মালিকগণকে তলব করিয়া আনিলেন এবং সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী এবং সুসজ্জিত করিয়া রাজকীয় জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে শহর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সিরিতে শিবির স্থাপন করিলেন আর শহরটি এবং কোষাগারসমূহ রক্ষা করিবার জন্য এবং হারেম (প্রাসাদে মহিলাদের আবাসস্থল) পাহারা দিবার জন্য দিল্লীর কোতোয়াল মালিক মালা-উল-মূলককে পেছনে রাখিয়া আসিলেন। কথিত আছে যে কতিপয় আমীর (সুলতানের নিকট) নিবেদন করেন যে যুদ্ধ বিগ্রহ সর্বদাই বিপদ জনক। আর লাঠির দুইটি প্রান্ত আছে (অর্থাৎ ইহা উভয় পক্ষকেই আঘাত করিতে পারে); ফলে যতক্ষণ সম্ভব চেষ্টা চালানো উচিত কৌশলে ব্যাপারটির সমাধান করা, এবং যুদ্ধ পরিহার করিয়া চলা।।

শ্লোক

তোমার হস্তীর শক্তি আর সিংহের নখর থাকিলেও
শান্তি, হে বন্ধু, সর্বদাই যুদ্ধের চেয়ে অনেক ভাল।

সুলতান আলাউদ্দীন বলিলেন, "সাম্রাজ্য আর যুদ্ধ হইতে বিরত থাক পরস্পর বিরোধী।"

শ্লোক

যে সম্রাটের মুকুট পরিধান করে
তাহার মাথা একটি গেজের[১] ন্যায় সর্বদাই নিক্ষেপ করে।

তিনি বলিলেন, "একজন সুলতানের পক্ষে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাও শোভন নয়।" তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন এবং সংগ্রামের পতাকা উত্তোলন করিলেন। কুতলাঘ খাজা তাহার দিকেও সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং

১. যে বস্তু নিক্ষেপ করিবার যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হয়।

মহাপৌরুষ এবং বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। যাফর খান ডান পার্শ্ব বাহিনীর নেতৃত্ব করিতেছিলেন, তিনি মুঘল বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন এবং ইহাকে গোলমালে ফেলিয়া দিলেন এবং বিধ্বস্ত করিলেন; এবং মুঘলগণ পলায়ন করিল। যাফর খান তাহাদিগকে আঠার ক্রোশ দূর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। উলুঘ খান বাম পার্শ্ব-বাহিনীর নেতৃত্ব করিতেছিলেন, তাহার প্রতি তাহার এক আক্রোশ[১] বশতঃ এই পশ্চাদ্ধাবনে যোগদান করিলেন না। তাহাকে একাকীই যাইতে দিলেন। সহসা কতিপয় মুঘল আমীর, যাহারা পথিমধ্যে লুকাইয়া ছিলেন, দেখিলেন যে যাফর খান একাকীই যাইতেছেন, এবং তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য তাহার পিছনে কোন সৈন্য নাই। তাহারা পিছন দিক হইতে তাহার উপর নিপতিত হইলেন এবং চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়া তাহার অশ্বের হাটুর পশ্চাৎদিকের তন্ত্রী কাটিয়া ইহাকে খোঁড়া করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি শুধু পায়ের উপর দাঁড়াইয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যদিও কুতলাঘ খাজা তাহাকে জীবিত বন্দী করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি ইহা করিতে সক্ষম হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহার সৈন্যগণকে তাহার প্রতি তীর বর্ষণের নির্দেশ দান করিলেন; আর এইরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করিল। তাহারা তাহার দলে অন্যান্য যেসব আমীর ছিলেন তাহা-দিগকেও হত্যা করিল। কুতলাঘ খাজা ঐ দিনে হিন্দুস্তানীদের শৌর্যের ভয়ে ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার পূর্বে তাহার অশ্বের রশি টানেন নাই; এবং অতি দ্রুত-গতিতে তাহার দেশে ফিরিয়া যান। মুঘলদের মধ্যে বীরত্ব এবং এক সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য যাফর খানের নাম প্রবাদে পরিণত হয়; ফলে যদি কোন অশ্ব ইহাকে দেওয়া পানি পান না করিতে চায় তখন তাহারা বলে "সম্ভবতঃ ইহা যাফর খানকে দেখিয়াছে।" সুলতান আলাউদ্দীন যাফর খানের সাহস এবং বীরত্বের জন্য ঈর্ষান্বিত এবং ভীত ছিলেন, তিনি তাহার হত্যা দ্বিতীয় বিজয়রূপে গণ্য করিলেন; আর কিলি হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আনন্দ উৎসব করিলেন এবং ভোজ সমাবেশ করিলেন; আর আমোদ-প্রমোদ এবং ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন হইলেন।

—

১. যিয়া-ই-বার্ণী বলেন যে মুঘলগণের হস্ত হইতে সিবিস্তান বিজয়ে যাফর খান যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সুলতান এবং উলুঘ খান উভয়েই তাহার প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ এবং ভীত হইয়া পড়েন। আলাউদ্দীন কি করিয়া তাহাকে শেষ করা যায় তাহার চিন্তা করিতে-ছিলেন। একটি পরিকল্পনা এইরূপ ছিল যে তাহাকে লক্ষণাবতীতে প্রেরণ করা যাইতে পারে। আর ঐ স্থান হইতে হস্তী এবং কর সুলতানের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য তাহাকে বলা যাইতে পারে। আর একটি পরিকল্পনা ছিল তাহাকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা অথবা অন্ধ করিয়া দিয়া পথ হইতে অপসারণ করা।

যেহেতু এই তিন বৎসরে তাহার অধিকাংশ পরিকল্পনা তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী সম্পন্ন হয়, এবং যেহেতু তাহার বহু স্ত্রী ছিল, ফলে তাহার সন্তানের সংখ্যাও ছিল বহু; আর সিংহাসনে তাহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদারও ছিল না, তাই তিনি অদ্ভুত কলাকৌশল এবং অপূর্ব কার্য প্রদর্শনের অভিলাষ করেন। ইহাদের মধ্যে একটি হইল এই যে, পবিত্র মহানবী, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং শান্তি যেন তাহার উপর বর্ষিত হয়, তাহার নিজস্ব ক্ষমতা এবং মহত্বের ফলে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহাবীগণের সহায়তায় সেগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং অনুমোদন করান, সুতরাং তিনি ও তাহার চারি জন বন্ধুর যথা উলুঘ খান, নসরত খান, যাফর খান[১] এবং আলপ খানের শক্তি উগ্তমের দ্বারা এক নূতন ধর্ম এবং আইনের প্রবর্তন করিবেন, যাহাতে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সময়ের পাতায় তাহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকে। মগ্তপানের মজলিশসমূহে, এবং ব্যক্তিগত আলোচনা সভাসমূহে তিনি এই বিষয় সম্বন্ধে আমীর এবং মালিকগণের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে কিভাবে এবং কি উপায়ে তিনি নূতন ধর্মটি উদ্ভাবন করিবেন, যাহা তাহার ইন্তেকালের পরেও প্রচলিত থাকিবে এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় উদ্ভট পরিকল্পনাটি, যাহা তাহার স্বাস্থ্য, ধনরত্ন এবং সেনাবাহিনী এবং অনুরূপ জিনিসপত্রের চমৎকারিত্ব তাহার মনে সৃষ্ট করিল, তাহা হইল এই যে, তিনি দিল্লীর শাসনভার তাহার বিশ্বস্ত অনুচরগণের একজনের নিকট দিয়া যাইবেন এবং তিনি স্বয়ং রোমের আলেকজাণ্ডারের দ্বিতীয় সংস্করণরূপে পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ চতুর্থাংশের দেশগুলি বিজয়ে বহির্গত হইবেন। আর তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাহাকে খোৎবার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নামে অভিহিত করিতে হইবে আর এই পদবীটিই তাহার মুদ্রায় মুদ্রিত করিতে হইবে। তারপর সভাসদগণ এবং তাহার আমোদ প্রমোদের সাথীগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলে জানিতেন যে তিনি তাহার স্বভাবে কত কর্কশ এবং কঠোর, তাই তাহারা তাহার এই অসম্ভব পরিকল্পনার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন; আর তাহার উন্নত চিন্তাধারা এবং তাহার উর্ধ্বমুখী উচ্চকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করিলেন। দিল্লীর কোতোয়াল মালিক আলাউল-মুলক অত্যধিক মেদবহুল হওয়ার ফলে তিনি শুধু প্রতি মাসের পহেলা তারিখে সুলতানকে অভিবাদন করিতে গমন করিতেন এবং তাহার মগ্তপানের মজলিশে যোগদান করিতেন।

এইরূপ এক উপলক্ষে যখন তিনি তাঁহার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সুলতানের নিকট গমন করিলেন এবং মজলিশে যোগদান করিলেন সুলতান আলাউদ্দীন তাহার

১. যিয়া-ই-বার্ণী স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন যে তখনও যাফর খান জীবিত ছিলেন।

এই দুই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ চাহিলেন। আলাউল-মূলক তাহার ওজন কথা শব্দ প্রয়োগ করিয়া এবং পরম আনন্দদায়ক ছোট ছোট কাহিনী দ্বারা তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়া বিচারবুদ্ধি এবং ইতিহাসভিত্তিক যুক্তি দ্বারা সুলতানকে বুঝাইলেন যে আইন প্রণয়নের পরিকল্পনাটি বাতিল করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে; কারণ এইরূপ কোন পরিকল্পনার পরিণতি এই হইবে যে, তাহার শাসন এবং সাম্রাজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

শ্লোক

যতদূর আমি বুঝিতে পারি, সেই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
যে তোমাকে বলে, ঐ তোমার পথে কাঁটা দেখা যাইতেছে।'

সুলতান আলাউদ্দীন বহু চিন্তা ভাবনা এবং সযত্ন বিবেচনার পর বলিলেন "আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সমস্তই যথার্থ, এবং বিনাকির প্রকৃত সত্য উদঘাটন করিয়াছেন, ইহাই মঙ্গল হইবে যে ইহার পর এইরূপ কথা আমার মুখ হইতে আর বাহির হইবে না। কিন্তু আমার দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনার কি বলিবার আছে ইহাও কি ভুল না ইহা ঠিক আছে? মালিক আলাউল মূলক বলিলেনঃ "সুলতানের এই পরিকল্পনা তাহার মহান মনোবলের পরিচায়ক। পূর্বের রাজাগণও এই রূপ বিজয় অভিযানে বহির্গত হইয়াছেন। পৃথিবীর প্রভু নিশ্চয়ই পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ চতুর্থাংশের দেশগুলিকে তাহার নিজের শৌর্য বীর্য দ্বারা এবং তাহার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা এবং ধনরত্নের দ্বারা তাহার অধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন; কিন্তু তিনি যখন দিল্লী ত্যাগ করিবেন এবং অজানা দেশে গমন করিবেন এবং দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিবেন; এমন কে আছে যে তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে পারে; আবার ইহার পর তিনি যখন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিবেন অথবা অন্য কোন দেশে গমন করিবেন, কেহই বলিতে পারে না যে যাহাদের তিনি নব-বিজিত রাজ্যগুলি রাখিয়া যাইবেন তাহারা তখনও তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবেন কি না অথবা ঐ রাজ্যগুলি তাহার অধীনে থাকিবে কি না। কারণ বর্তমান কালকে আলেকজাণ্ডারের কালের সঙ্গে তুলনা করা যায় না; কারণ ঐ সব পূর্ববর্তী সময়গুলিতে প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অনেক কম ছিল। ঐ কালের পর বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; তখনকার লোকেরা কোন চুক্তি সম্পাদন করিলে তাহা ভঙ্গ করিত না, স্থানের দূরত্ব অথবা সময়ের প্রবাহেও ইহার কোন তারতম্য হইত না। আর তাছাড়া আলেকজাণ্ডারের, এরিস্টটলের ন্যায় একজন উযির ছিলেন,

যিনি রোমের প্রখ্যাত লোকদের এবং সাধারণ লোকদের সকলকেই ইহার বিস্তীর্ণ এলাকা সত্ত্বেও কোন সেনাবাহিনী বা ধনরত্নের সাহায্য ছাড়াই সন্তুষ্ট এবং তাহার প্রতি আস্থাবান রাখিয়াছিলেন। তাহার সুস্থ বিচারবুদ্ধির এবং প্রগাঢ় জ্ঞানের ফলে তাহার প্রভুর অন্যান্য দেশ জয় সহজ হইয়া উঠে। আর শেষোক্ত জনের অবর্তমানের কালে যাহা বত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ঐ দার্শনিকের বিজ্ঞ নীতির ফলে রোম দেশ কোনরূপ দুর্ঘটনায় পতিত হয় নাই। বিশ্ব বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া আলেকজাণ্ডার যখন রোম দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি সকল অধিবাসীকেই তাহার প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত দেখিতে পান। সুলতান যদি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় তাহার আমীর এবং রায়তগণের প্রতি অনুরূপ আস্থা রাখিতে পারেন তবে এই পরিকল্পনা, যাহা তাহার মনে জাগিয়াছে, ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ হইবে; আর তাহার চেষ্টা না করাই সঠিক নীতির পরিপন্থী হইবে।" সুলতান আলাউদ্দীন সতর্ক বিবেচনার পর আলা-উল-মূলককে বলিলেন "আপনি যে সব বিষয় বিবেচনা করিতে বলিতেছেন, তাহা করিলে এবং বিশ্ববিজয়ের যদি কোন চেষ্টা না করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য নিয়াই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখি তবে আমার সেনাবাহিনী আর আমার ধনসম্পদ কি কাজে লাগিবে; আর আমিই বা ইহাদের দ্বারা কি লাভবান হইব; আর কি করিয়া আমি বিশ্ববিজয়ী রূপে পরিচিত হইতে পারি, ইহা ছাড়া আমার আর যে কোন লক্ষ্য নাই?" মালিক আলা-উল-মূলক অনুগতভাবে ভুমি চুম্বন করিলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিলেন: "সুলতানের সম্মুখে তাহার এইরূপ দুইটি কাজ আছে যে তিনি যদি এইগুলি সমাধা করিতে তাহার সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী এবং ধনসম্পদ নিয়োগ করেন তবে তাহাতেও কুলাইবে না। ইহাদের প্রথমটি হইল ভারতের কতিপয় শহর অধিকার করা যেমন রণথম্বোর এবং চিতোর আর চন্দেরী এবং মালব আর পূর্ব দিকে অযোধ্যা বা সরযূ নদী পর্যন্ত, আর আরব সাগর পর্যন্ত সিবালিক। এই দেশগুলি অবাধ্য লোকদের এবং ডাকাতদের আশ্রয় স্থলগুলি যদি আপনার শাসনের অধীনে আসে তবে হিন্দুস্তানের সমতল ভূমির সম্পূর্ণটাই সমস্ত বিশৃঙ্খলা এবং বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। দ্বিতীয় কাজটি হইল মুঘলদের বিরুদ্ধে দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া। মুঘলদের পথে যে সব দুর্গ অবস্থিত আছে যেমন দিবালপুর, মুলতান এবং সামানা শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত করা উচিত। এই দুইটি কাজ সম্পূর্ণ করা হইয়া গেলে সুলতানের পক্ষে প্রশান্ত মন নিয়া রাজধানী দিল্লীতে বিশ্রাম করা সম্ভব হইবে এবং তখন তিনি তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণকে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিতে পারিবেন, যাহাতে তাহারা দূরবর্তী দেশগুলি তাহার শাসনের অধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হন, আর এইরূপে দেশ বিজয়ী রূপে আপনার নাম এবং শক্তিশালী শাসকরূপে আপনার খ্যাতি পৃথিবীর

সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে; কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে শুধু সুলতান যদি অতিরিক্ত মদ্যপান এবং প্রতিনিয়ত শিকার করা এবং অনবরত ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকা হইতে বিরত থাকেন।" উপরোল্লিখিত মন্তব্যগুলি যখন সুলতান আলাউদ্দীন শুনিলেন, তখন তিনি এই উপদেশের বিজ্ঞতা এবং এই নীতির সৌন্দর্যের প্রশংসা এবং সুখ্যাতি করিলেন এবং মালিক আলাউল-মুলককে একটি স্বর্ণের কারুকার্য করা অঙ্গাবরণ, যাহাতে সিংহের ছবি খচিত ছিল এবং একটি মূল্যবান কোমরবন্ধ[১] এব দশ সহস্র তংগা এবং জহরতের কাজ করা জিন ও লাগামসহ দুইটি অশ্ব আর দুইটি গ্রাম পুরস্কার রূপে প্রদান করিলেন আর ঐ সমাবেশে উপস্থিত অন্যান্য আমীরগণও এই সব মন্তব্যে আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদের প্রত্যেকেই তাহাকে কয়েক সহস্র তংগা এবং দুইটি অশ্ব প্রেরণ করিলেন আর তাহাদের সকলেই তাহার জ্ঞানের প্রশংসা করিলেন।

যেহেতু রণথম্বোর দিল্লীর নিকটে অবস্থিত ছিল এবং পিথোরার পৌত্র[২] হামির দেও মহা প্রতিপত্তির সঙ্গে তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন, সুলতান আলাউদ্দীন প্রথমে ইহা অধিকার করিবার দৃঢ় সংকল্প করিলেন। তিনি সামানা হইতে উলুঘ খানকে তলব করিলেন; এবং তাহাকে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিবার জন্য মনোনীত করিলেন; এবং কারার জায়গীরদার নসরত খানকে তাহার সঙ্গে গমনের জন্য নির্দেশ দান করিলেন। তাহারা ঝাইন গমন করিলেন এবং তাহা দখল করিলেন এবং রণথম্বোর দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং ইহা দখল করিবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইলেন। সহসা দুর্গের অভ্যন্তর হইতে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর আসিয়া নসরত খানকে আঘাত করিল এবং তাহাকে নিহত করিল। সুলতান আলাউদ্দীন খান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি রণথম্বোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তহলিতে[৩] পৌঁছিয়া তিনি তথায় কয়েকদিন অপেক্ষা করেন এবং প্রতিদিন তিনি সন্নিকটস্থ সমভূমিগুলিতে শিকার করিতে গমন করিতেন।[৪] একদিন তিনি তাহার অভ্যাসমত শিকার করিতে গমন করেন। কিন্তু ইহাতে অধিক বিলম্ব হইয়া যায় এবং তিনি তাহার শিবিরে পৌঁছিতে পারেন না এবং বাহিরে রহিয়া যান। পরদিন তিনি তাহার লোকজনকে শিকারের চক্র গঠন করিতে বলিলেন; আর

১. যিয়া-ই-বার্ণীর মতে স্বর্ণের কোমরবন্ধটির ওজন ছিল আধ মণ।

২. পিথোরা ১১৯২ সনে নিহত হন, সুতরাং হামির দেও তাহার পৌত্র হইতে পারেন না, যেহেতু বর্তমান অভিযান ঐ সময় হইতে একশত বৎসর পরে সংঘটিত হয়। এই সম্পর্ক বুঝাইতে নবসাহ শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ বংশধর বুঝাইতেছে।

৩. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি আছে তহলন্তি, অন্যান্যগুলিতে আছে তহলিত। ইলিয়টের অনুবাদে ইহা তিলপত দেওয়া আছে।

৪. পাণ্ডুলিপিতে 'কামারগাহ শিকার' লিখা হইয়াছে। ইহার অর্থ একটি বিস্তৃত স্থান ঘিরিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শিকার একটি গণ্ডীর মধ্যে তাড়াইয়া আনা হয় তখন সুলতান সেগুলি শিকার করেন।

তিনি অন্যান্য কতিপয় লোকসহ এক নির্জন স্থানে গমন করিলেন এবং একটি পাহাড়ের উপরে বসিয়া পড়িলেন; যাহাতে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে যেন তিনি শিকার করিতে সক্ষম হন। সহসা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আকত খান, যিনি ভকিল-দার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কতিপয় নব মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যসহ ঐ স্থানে আগমন করেন। এই অশ্বারোহীগণ তাহার পুরাতন অনুচর ছিল, তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিল। যেহেতু তাহারা তাহার প্রতি তীর ছুঁড়িতেছিল; তিনি পাহাড়টি হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং পাহাড়ের পিছনে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু তাহার বাহুতে তীরের দুইটি আঘাত লাগে। আকত খান অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সুলতানের শিরচ্ছেদ করিবার উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু পাইকদের যে দলটি সুলতানের চতুর্দিকে ছিল, তাহারা সম্মুখে ছুটিয়া গেল, এবং সম্মতির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিল আর জানাইল যে সুলতান ইতিমধ্যেই নিহত হইয়াছেন। আকত খান তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং অতি দ্রুত গতিতে শিবিরের দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি রাজকীয় মঞ্চে গমন করিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে তিনি সুলতানকে হত্যা করিয়াছেন। লোকে বিশ্বাস করিল যে তিনি সত্য কথাই বলিতেছেন। প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ স্থানে এবং পদে গমন করিলেন এবং তাহার নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রত্যেকেই তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। ঘোষকগণ ঘোষণা করিলেন, পাঠকগণ কোরান পাঠ করিলেন আর গায়কগণ গান করিলেন। আকত খান ছিলেন তরুণ এবং নীচমনা, তিনি তৎক্ষণাৎ হারেমে (মহিলাদের আবাসস্থল) গমনের উদ্যোগ করিলেন। হারেমের রক্ষক মালিক দিনার, যিনি তাহার লোকজনকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং প্রস্তুত রাখিয়া হারেমের দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তাহাকে যাইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন, "আপনি যতক্ষণ আমাকে সুলতানের শির প্রদর্শন না করেন ততক্ষণ আপনাকে যাইতে দিব না।" সুলতান আলাউদ্দীন যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন, তিনি তাহার ক্ষতগুলি বাঁধিয়া লইলেন এবং জানিতেন যে আকত খান কতিপয় আমীরের যোগাযোগেই এই কাজ করিয়াছে। তিনি পঞ্চাশ বা ষাটজন লোক তাহার সঙ্গে লইয়া ঝাইন-এ উলুঘ খানের নিকট গমনের সংকল্প এবং তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল এবং উপযুক্ত হইবে তাহাই করিবেন স্থির করিলেন। উমদাত-উল-মুলকের পুত্র মালিক হামিদুদ্দীন, যিনি স্বয়ং ঝাইনের ভকিল-দার ছিলেন এবং এই যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোকদের অন্যতম ছিলেন, সুলতানকে ঝাইন গমন হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন এবং সুলতানকে তৎক্ষণাৎ তাহার মঞ্চে গমনের উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন: "আকত

খান এখনও নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। যখনই সেনাবাহিনী রাজকীয় চাঁদোয়া দেখিবে, তখনই তাহারা ইহার নিকটে ভীড় করিবে; আর আকত খার লোকজন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে; কিন্তু যদি কোন বিলম্ব হয়, তবে এই অপকর্মের প্রতিকার করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে।" সুলতান তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং মঞ্চের দিকে ধাবিত হইলেন; প্রতিটি অশ্বারোহী যে পথিমধ্যে তাহাকে দেখিল, তাহার সঙ্গে যোগদান করিল; তিনি মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে প্রায় পাঁচশত লোক তাহার সঙ্গে ভিড়িয়া গেল। তিনি যখন শিবিরের নিকটস্থ হইলেন তখন তিনি একটি ছোট পাহাড়ের উপর উঠিলেন এবং নিজেকে প্রদর্শন করিলেন। আকত খানের লোকজন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল আর প্রত্যেকেই সুলতানের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আকত খান অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং আফঘানপুর অভিমুখে দ্রুত চলিয়া গেলেন। সুলতান পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন; তিনি তাহার মঞ্চে প্রবেশ করিলেন; আর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রকাশ্য দরবার করিলেন। অতঃপর তিনি মালিক ইখযুদ্দীন তুঘান খান এবং মালিক নাসিরুদ্দীন নূর খানকে আকত খানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা আফঘানপুরে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন এবং তাহা সুলতানের নিকট হাজির করিলেন; আর ইহা শিবিরগুলিতে প্রদর্শন করা হইল।

শ্লোক

বড়াই করিয়া কাহারও ক্ষমতাবানের আসনে বসা উচিত নহে
যতক্ষণ না তিনি স্বয়ং গৌরবের আবরণে ভূষিত হন।

সুলতান তাহার ভ্রাতা কুতলঘ খান এবং তাহার কতিপয় বিশেষ বন্ধুকে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দিলেন। আর তিনি অন্যান্যদের কারারুদ্ধ করিয়া দূরবর্তী দুর্গসমূহে প্রেরণের নির্দেশ দান করেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করেন এবং রণথম্বোরে আগমন করিয়া তাহা অবরোধ করেন এবং তাহা দখল করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে সুলতানের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র উমর খান এবং মঞ্জু খান বদাওনে বিদ্রোহ করিয়াছেন। সুলতান তাহাদের বিরুদ্ধে কতিপয় আমীরকে প্রেরণ করিলেন, তদনুযায়ী শেষোক্তগণ তথায় গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া তাহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন। তিনি তাহাদের চোখের উপর দিয়া পেন্সিল টানিয়া

দিবার (অন্ধ করিয়া দিবার) নির্দেশ দান করিলেন; আর তাহাদের পরিবারগুলিকে ধ্বংস করিবার নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক

তুমি যদি তোমার উপকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর
আকাশের ন্যায় উঁচু হইলেও তোমার পতন অনিবার্য।

ইহার পর, রণথম্বোরের অবরোধ চলিতে থাকাকালেই মালিক উল উমরার স্বগোত্রীয় হাজি মাওলা নামে একটি লোক[১] ইহাকে উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া কতিপয় দুরাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া বিশৃঙ্খলার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তিনি একটি জাল ফরমান বাহির করিলেন; আর বদাওন দরওয়াজা দ্বারা রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া শহরের কোতোয়ালকে সংবাদ পাঠাইলেন এবং তাহাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন যাহাতে তিনি ইহা তাহার নিকট পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন। যে মুহূর্তে কোতোয়াল তরমদি[২] বাহির হইয়া আসিলেন, হাজি মাওলা, তাহার সঙ্গে যে দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকগুলি ছিল, তাহাদের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করিলেন; এবং লোকের নিকট প্রচার করিলেন যে তিনি সুলতানের নির্দেশেই তাহাকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন প্রবেশ-দ্বারের রক্ষকদিগকে দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন; আর নতুন কেল্লার রক্ষক আলাউদ্দীন আয়াযের নিকট এক লোক প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন যে সুলতানের নিকট হইতে এক ফরমান আসিয়াছে; এবং তাহার তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাহা পাঠ করিতে হইবে। আলাউদ্দীন আয়াষ লোকটির বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন; তিনি তাহার লোকজন সংগ্রহ করিলেন; এবং কেল্লার প্রবেশ দ্বারসমূহ শক্তিশালী করিলেন। অতঃপর হাজি মাওলা চুনি মণ্ডপে গমন করিলেন, বন্দীদের মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে নিলেন। তথায় অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব, এবং ধনরত্ন তিনি তাহার সঙ্গে যে ইতর লোকগুলি আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি শাহ নবাসা মুহতাসিব (অর্থাৎ এক সম্রাটের পৌত্র, যিনি একজন পুলিশ কর্মচারীও ছিলেন, যিনি ওজন এবং পরিমাপসমূহ পরীক্ষা করিতেন এবং সাধারণ নীতি বিহর্গিত কার্যের অপরাধসমূহের বিচার করিতেন)

১. ইলিয়টের ইতিহাসের (অনুবাদ) তৃতীয় খণ্ডে লোকটির এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, হাজি নামীয় একজন লোক, একজন মাওলা, বা ভূতপূর্ব কোতোয়াল আমীর-উল-উমরা ফখরুদ্দীনের ক্রীতদাস।
২. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যথা: তরমদি, বরমদি, রত্নমদি, ইত্যাদি। ইলিয়টের যিয়া-ই-বার্ণীর অনুবাদে নামটি দেওয়া আছে তরমুযি।

নামীয় একজন আলভীকে (অর্থাৎ আলীর বংশধর) বলপূর্বক বাহির করিয়া আনিলেন। যিনি তাহার মাতার মাধ্যমে সুলতান শামসুদ্দীনের বংশধর ছিলেন, এবং তাহাকে চুনি মণ্ডপে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তিনি মহান লোকদের এবং কাযিগণকে তলব করিলেন এবং ঐ লোকটির নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিলেন। এইসব ঘটনাবলীর সংবাদ যখন সুলতানের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি ইহা প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু দুর্গটি দখল করিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং এতটুকুও বিচলিত হইলেন না। এক সপ্তাহ তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, যখন মালিক হামিদুদ্দীন আমীর কু[১] তাহার পুত্রগণসহ, যাহারা তাহাদের বীরত্বের জন্য প্রখ্যাত ছিলেন, বদাওন দরওয়াজা খুলিয়া ফেলিলেন এবং শহরে প্রবেশ করিলেন এবং যাফর খানের এক দল অশ্বারোহী অনুচর যাহারা এক সমাবেশে হাজির হইবার জন্য আমরোহা হইতে আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্গে নিয়া যান। বহন্দরকাল[২] দরওয়াজার সম্মুখে ইহাদের সঙ্গে হাজি মাওলার এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমীর কু তাহার অশ্ব হইতে অবতরণ করেন এবং হাজি মাওলার সঙ্গে মস্ত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেন এবং নীচে চাপিয়া ধরেন; আর তিনি আহত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে নিহত না করা পর্যন্ত ছাড়িয়া দেন নাই। অতঃপর তাহারা চুনি মণ্ডপে গমন করেন এবং হাজি মাওলা যে আলভীকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাহাকে হত্যা করেন; আর তাহার শির একটি বর্শায় তুলিয়া শহর প্রদক্ষিণ করান; আর বিজয়ের বার্তাসহ একটি চিঠি দিয়া ইহা সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন তখন উলুঘ খানকে দিল্লী প্রেরণ করেন এবং তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সকলকে শাস্তি দান করেন। তিনি ভূতপূর্ব কোতোয়াল মালিক-উল উমরার পুত্রগণকে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দান করেন, ইহার একমাত্র কারণ ছিল এই যে হাজি মাওলা তাহাদের গোত্রের লোক ছিলেন, যদিও এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তাহারা কোনই অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাদের পরিবারসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়।

ইহার পর সুলতান আলাউদ্দীন বহু অসুবিধা এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া রণথম্বোর অধিকার করেন। তিনি হামির দেও, এবং তাহার সমস্ত গোত্র এবং

---

১. এই কু কে ছিলেন এবং কোথায় ছিলেন কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ এই অংশে বিভিন্ন রূপ; একটিতে আছে, হামিদুদ্দীন, আমীর কোয়ার পুত্রগণসহ, দুইটিতে আছে, হামিদুদ্দীন, তাহার পুত্রগণ সহ কু। এই শেষোক্ত পাঠটিই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে। তারিখ-ই-ফিরোয-শাহীর এই অংশটির ইলিয়টের অনুবাদে এইরূপ দেওয়া আছে "কোহ এর আমীর, মালিক হামিদুদ্দীন, তাহার পুত্রগণ এবং আত্মীয় স্বজনসহ, সকলেই সাহসী লোক ছিলেন যখনী দরওয়াজা উন্মুক্ত করেন এবং শহরে প্রবেশ করেন।"

২. এই দরওয়াজার নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে। ইলিয়টের অনুবাদে দেওয়া আছে "ভন্দরকাল দরওয়াজা।"

পরিবারকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন। কথিত আছে যে মীর মুহম্মদ শাহ এবং এক দল বিদ্রোহী জালোর[১] হইতে পলায়ন করেন এবং রণথম্বোরে আশ্রয় গ্রহণ করেন ইহাদের অধিকাংশই দুর্গ অধিকারের সময় নিহত হয়। মীর মুহম্মদ শাহ আহত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। সুলতানের দৃষ্টি যখন তাহার উপর পতিত হইল তখন তাহার করুণার উদ্রেক হইল এবং তিনি বলিলেনঃ আমি যদি তোমার ক্ষতগুলির পরিচর্যা করিবার নির্দেশ দেই এবং এই আসন্ন বিপদ হইতে তোমাকে বাঁচাই, তবে তুমি কি করিবে; আর ইহার পর তুমি কিরূপ ব্যবহার করিবে?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেনঃ 'আমি যদি আমার এই ক্ষতগুলি হইতে সারিয়া উঠি তবে আমি আপনাকে হত্যা করিব এব হামির দেও এর পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিব।

শ্লোক

যাহার স্বভাব-মন্দ, সে কাহার সঙ্গে বিশ্বাস রাখে না।
যাহার বংশ খারাপ, সে কখনও অন্যায় কাজ হইতে বিরত হয় না।।

অতঃপর সুলতান তাহাকে একটি মত্ত হস্তীর পায়ের নীচে ফেলিবার নির্দেশ দিলেন, আর তিনি হস্তীপদতলে পিষ্ট হইয়া নিহত হইলেন। কিছুক্ষণ পর, তিনি যখন চিন্তা করিলেন যে এই লোকটি তাহার উপকারীর প্রতি কিরূপ বিশ্বস্ত এবং অনুগত ছিল, তখন তিনি তাহাকে ভালভাবে কবর দিবার নির্দেশ দিলেন। সংক্ষেপে, সুলতান আলাউদ্দীন রণথম্বোর এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলটি জায়গীররূপে উলুঘ খানকে প্রদান করিলেন; এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর উলুঘ খান অসুস্থ হইয়া পড়েন, এবং পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন।

ঐ সময়ে বারবার দুর্ঘটনা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবার ফলে সুলতান আলাউদ্দীন তাহার বিজ্ঞ আমীরগণকে, যাহারা তাহাদের বুদ্ধিমত্তা এবং অভিজ্ঞতার জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, জিজ্ঞাসা করেন যে এই পুনঃ পুনঃ দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ কি হইতে পারে। তাহারা জবাব দিলেন যে মাত্র চারিটি কারণ হইতে পারে। প্রথম, লোকের অবস্থার ভালমন্দ সম্বন্ধে সুলতানের অজ্ঞতা; দ্বিতীয়, লোকের মদ্যপানে আসক্তি, তাহারা যখন মদ্যপান করে, তখন মন্দ স্বভাব প্রকাশ পায় এবং বহু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; তৃতীয়, আমীরগণের মধ্যে বন্ধুত্ব, এবং আত্মীয়তা এবং একত্র হওয়া, চতুর্থ, সম্পদ, ইহা যখন নিম্ন শ্রেণীর, নীচমনা লোকের হস্তগত হয়, তখন দুষ্ট পরিকল্পনা এবং উদ্ভট চিন্তা

১. ইলিয়টের পুস্তকে আছে যে ইহারা ছিলেন নব-মুসলমান, যাহারা গুজরাটের বিদ্রোহ হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

তাহাদের কল্পনায় স্থান লাভ করে। সুলতান আমীরগণের মত সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন; আর নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেকটি গ্রাম, যাহা কেহ সৎকার্যের দান রূপে অথবা কর্মের প্রতিদানরূপে অথবা সম্পত্তিরূপে দখল করিতে থাকুক না কেন, তাহা রাজকীয় সম্পত্তি হইবে, আর যাহারই ধনসম্পদ আছে, তাহাই যে কোন ছলছুতায়, যাহাই চিন্তা ভাবনা করিয়া স্থির করা যাইত, তাহাতেই তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে এবং কোষাগারে আনয়ন করিতে হইবে। ইহাতে লোকেরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইল; আর সর্বদাই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য উদ্বিগ্ন থাকিত; আর বিদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলার নাম কখনও তাহাদের মুখেও আসিত না। শহরের প্রত্যেকটি অঞ্চলে এবং প্রতি অলিতে গলিতে এবং গৃহে গুপ্তচর কাজ করিত: আর ইহা এত চরম পর্যায়ে নিয়া যাওয়া হয় যে আমীরগণ এবং সম্পদশালী লোকেরা পর্যন্ত পরস্পর মেলা মেশা করিতে পারিত না অথবা পরস্পরের গৃহে আনাগোনা করিতে পারিত না। যে সব আসবাবপত্র সুলতানের বিশেষ উৎসবাদির সমাবেশে ব্যবহার করা হইত, যাহা বহু মূল্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেগুলি বদাওন দরবারস্থ সম্মুখে নিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল; আর সুরা মাটিতে ঢালিয়া ফেলা হইল; যাহাতে লোকেরা মদ্যপান নিষিদ্ধ করিবার কথা অবগত হইতে পারে। রাজধানীতে ঘোষণা প্রচার করা হইল এবং মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধীয় নির্দেশ এবং বিধান রাজ্যের সবত্র প্রেরণ করা হইল। বোকা এবং অজ্ঞান লোকেরা যাহারা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল, এবং যাহারা ইহা হইতে বিরত হওয়ার কথা চিন্তা করিতেও পারিত না, নানারূপ ছলে এবং কৌশলে মদ্য আনয়ন করিত; আর কেহ কেহ ইহা গোপনে গৃহে চোলাই করিত। সুলতান যখন এইসব পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হইলেন, তখন তিনি বদাওন দরওয়াজার নিকটে, সদা সর্বদা লোক চলাচল করে এমন কোন স্থানে একটি কূপ খননের নির্দেশ দিলেন; যাহাতে এইসব লোকের জন্য ইহা কারাগাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই কূপে যে সব লোককে কারারুদ্ধ করা হইত, তাহাদের অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আর যে অল্প সংখ্যক লোকের প্রাণ রক্ষা হইত, তাহাদিগকেও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার পূর্বে সুদীর্ঘকাল চিকিৎসাধীন থাকিতে হইত। লোকেরা মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করিবার পর এবং এই বিষয়ের বিধিবিধান যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সুলতান এক নির্দেশ জারি করেন যে যদি কোন সম্ভ্রান্ত লোক তাহার গৃহে একাকী মদ্যপান করে, এবং মদ্যপানের মজলিশ না করে, তবে ইহার জন্য তাহাকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে না। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে আমীরগণ এবং খ্যাতনামা লোকদের সকলে পরস্পরকে পরস্পরের গৃহে আমন্ত্রণ করিতে পারিবেন না এবং ভোজ-উৎসব করিতে পারিবেন না; এবং সুলতানের অনুমতি ভিন্ন কোন বৈবাহিক বা অন্য কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে

পারিবেন না। এই ব্যাপারেও এত কড়াকড়ি কার্য হইত যে লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিল, এবং আমীরগণ পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

এইসব নিয়ম-কানুন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর, সুলতান দেশে আরও কতিপয় নিয়ম-কানুন প্রচলন করিবার সংকল্প করেন, যেগুলির ফলে সবল এবং দুর্বল উভয় প্রকার লোকের অবস্থারই উন্নতি হইতে পারে; যাহাতে প্রধানগণ এবং চৌধুরীগণ (বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং পেশার প্রধান দুর্বল লোকদের প্রতি যে অত্যাচার এবং উৎপীড়ন করে তাহা বন্ধ করা যায়। তিনি নির্দেশ দেন যে দাড়িপাল্লার ওজন করিয়া কোন অংশ হ্রাস না করিয়া উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাষ্ট্র নিয়া নিবে, আর প্রধানগণ, চৌধুরী-গণ এবং অন্যান্য সকল রায়তকেই এক পর্যায়ে ফেলা হইল; তাহাতে সবলের বোঝা দুর্বলের উপর চাপান হইল না। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে চৌধুরীগণ যাহা তাহাদের পাওনারূপে আদায় করিত তাহা আদায় করিয়া কোষাগারে জমা দিতে হইবে, এবং প্রতিটি গরু, এবং মহিষ এবং ভেড়ার জন্য মাথা পিছু গোচারণ কর আদায় করিতে হইবে। প্রশাসনিক কর্মচারী এবং কেরাণীগণের কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তদন্ত এরূপ চরমে নেওয়া হইল যে তাহারা এক জিতলও আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হইত না। ইহাদের কেহ যদি তাহার নির্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করিত, তবে ইহা তৎক্ষণাৎ পাটওয়ারীর (গ্রামের হিসাবরক্ষক) কাগজপত্র তাহার নামে উঠিয়া যাইত; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাহার নিকট হইতে চরম কঠোরতার সঙ্গে এবং অপমানের সহিত আদায় করা হইত। লোকেরা প্রশাসনিক চাকুরীসমূহ এবং সকল প্রকার কেরাণীর চাকুরীসমূহ দোষণীয় কোনকিছুরূপে ছাড়িয়া দিল। প্রধানগণ এবং চৌধুরীগণ ইতিপূর্বে সর্বদাই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলাফেরা করিত এবং অস্ত্রশস্ত্র বহন করিত এবং সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করিত, আর এখন তাহাদের অবস্থা এত খারাপ হইল যে তাহাদের স্ত্রীগণকে অন্য লোকের বাড়ীতে কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত এবং তাহারা বেতনরূপে যাহা পাইত তাহা দ্বারা নিজেদের আহার্য দ্রব্য কিনিতে হইত।

সুলতান আলাউদ্দীন পুনঃপুনঃ বলিতেন যে শাসনতান্ত্রিক নির্দেশাবলী এবং নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণরূপে রাজার বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে, আর (মহানবীর) আইনের সঙ্গে এইগুলির কোনরূপ সংশ্রব নাই। বিরোধের বিচার, মামলার রায় এবং আরাধনার পদ্ধতি কাযিগণের এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণের এক্তিয়ারে আছে। তদনুযায়ী তিনি দেশের সুষ্ঠু শাসনের জন্য নিজের মনে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই কার্যে পরিণত করিতেন; আর তিনি যাহা করিতেন তাহা আইনসম্মত কিনা তাহা নিয়া মাথা

ঘামাইতেন না। পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিয়ানার কাযি যিয়াউদ্দীন, মৌলানা যহীর লঙ্গ এবং মৌলানা মুশাইয়াদ কুহরামি আমীরদের সঙ্গে বাহিরের টেবিলে বসিতেন; কিন্তু বিয়ানার কাযি মুঘিসুদ্দীনকে সুলতানের নিজের টেবিলে বসিবার অনুমতি দেওয়া হইত। একদিন সুলতান তাহাকে বলিলেন: "আমি আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই।" কাযি মুঘিসুদ্দীন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "খুব সম্ভব আমার ইন্তেকাল আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। যেহেতু আমি শুধু ইহাই বলিব যাহা আইনের কেতাব-সমূহে আছে; আর সম্ভবতঃ তাহা সুলতানের মতের সংগে খাপ খাইবে না।" সুলতান বলিলেন: "যাহা সত্য তাহাই বলিবেন। আপনাকে ইহার জন্য কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে না।" প্রথমে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আইন অনুযায়ী কোন হিন্দুকে বিশুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায় কিনা; অথবা যাহাকে জিযিয়া কর দিবার শর্তে তাহার ধর্ম পালন করিতে দেওয়া হয় তাহাকে পৌত্তলিক বলা যায় কি না; অথবা সাধারণ করদাতারূপে?" প্রত্যুত্তরে কাযি বলিলেন যে, "যদি সুলতানের কর আদায়কারীগণ তাহার নিকট হইতে অর্থ বা কর দাবী করে এবং সে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে তাহা প্রদান করে; আর যদি কর আদায়কারী তাহার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যাহা অপমানজনক এবং সে কোনরূপ ওজর আপত্তি বা ঘৃণা না করিয়া নীরবে সহ্য করে; কারণ কাফিরদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে যতদিন তাহারা জিযিয়া কর প্রদান করে ততদিন তাহাদের চুপচাপ থাকিতে দাও; আর তাহাদের সম্বন্ধে আইনে সুপণ্ডিত লোকেরা নির্দেশ দিয়াছেন যে, হয় তাহাদিগকে হত্যা কর অথবা তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য কর; আর মহানবীর (তাঁহার উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং শান্তি বর্ষিত হউক) একটি হাদিসও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত; কিন্তু মহান ইমাম হানাফী (তাঁহার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হউক), এইরূপ বিধান দিয়াছেন যে জিযিয়া কর নেওয়া তাহাদের হত্যা না করিবার প্রতিদান; আর তাহাদের রক্ত-পাত ঘটান নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ফলে তাহাদের নিকট হইতে জিযিয়া এবং কর এত কঠোরতার সঙ্গে আদায় করিতে হইবে যে তাহা যেন তাহাদিগকে হত্যা করিবারই সামিল হয়।" সুলতান হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন: "আপনি এখন যাহা কেতাবের বিধান বলিয়া বর্ণনা করিলেন, আমি ইহার সবই নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়াছি; আর হিন্দুদের প্রতি তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেছি।" পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; "রাজস্ব আদায়কারী যখন কোন ঘুষ আদায় করে এবং শঠতাপূর্বক রাজস্ব কমাইয়া দেয়, তবে ইহাকে কি এক প্রকার চুরি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; আর তাহাকে কি একজন চোরের ন্যায় শাস্তি দিতে হইবে?" প্রত্যুত্তরে কাযি বলিলেন, "রাজস্ব আদায়কারী যদি তাহার ভরণ-পোষণের জন্য কোষাগার হইতে যথেষ্ট

পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে, তবে ইহার অতিরিক্ত যাহা কিছু ঘুষ, ইত্যাদিরূপে আত্মসাৎ করে, তবে তাহা তাহার নিকট হইতে সর্বপ্রকার কঠোরতা এবং অপমান সহকারে আদায় করিয়া নেওয়া উচিত ; কিন্তু সম্পত্তি অপহরণের জন্য যে বিশেষ বিধান আছে হাত কাটিয়া দেওয়া, তাহা তাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।" সুলতান বলিলেনঃ "আমি এইমাত্র জানি যে যেদিন হইতে আমি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছি, সেইদিন হইতে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কঠোরতা এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা যে কেহ যাহা কিছু তসরফ করিয়াছে এবং নিজে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার সবই আদায় করিয়া নিয়াছি এব তাহা কোষাগারে জমা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। অপহরণ এবং তসরুফের পথসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর অর্থলোভীর আত্মসাতের হস্ত খাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" পুনরায় সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি দেওগীর হইতে যে প্রচুর সম্পদ আনয়ন করিয়াছি, তাহা কি আমার সম্পত্তি না রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পত্তি ?' কাযি বলিলেন, "যেহেতু সুলতান ঐ সমস্ত সম্পদ সেনাবাহিনীর ক্ষমতা এব প্রচেষ্টার দ্বারা লাভ করিয়াছেন, ফলে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে ; আর ইহা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ, সুলতানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।" সুলতান রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া গেলেন এব বলিলেনঃ 'আমি যখন একজন মালিক ছিলাম, সেই সময় আমি চরম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যে ধনসম্পদ আহরণ করিয়াছি, এবং যাহা আমি সেই সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেই নাই, তাহা কি করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হইতে পারে ?" প্রত্যুত্তরে কাযি বলিলেনঃ "যে সমস্ত ধনসম্পদ সুলতান তাহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং যাহা স গ্রহ এবং আহরণ করিতে তিনি সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, তাহা অবশ্যই তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; কিন্তু যে ধনসম্পদ সুলতান দেওগীর হইতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।" ইহার পর কাযি দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; এবং বলিলেনঃ "সুলতানের সম্মুখে আমি যদি এমন কিছু ব্যক্ত করি যাহা আইনের কেতাবগুলির পরিপন্থী, আর আমার এই মিথ্যাভাষণ সম্বন্ধে যদি অন্য কেহ সুলতানকে অবহিত করেন, তবে তাহা ন্যায়সঙ্গতরূপেই সুলতানের ক্রোধ বৃদ্ধি করিবে। তখন সুলতানের চোখে আমার অবস্থা কি দাঁড়াইবে ? আর তাহাতে আমি কি রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হইব না ?" সুলতান পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আমার বা আমার নিকটতম বংশধরগণের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর কি অধিকার আছে ?" কাযি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেনঃ "আমি যদি আইন অনুযায়ী কথা বলি তবে সুলতান আমাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিতে দ্বিধা করিবেন না ; আর আমি যদি দ্ব্যর্থবোধক বা মিথ্যা কথা বলি তবে আমি

চিরন্তন শান্তি ভোগ করিব।" সুলতান বলিলেন: "যাহা সত্য এবং ন্যায্য তাহাই বলুন; এবং তাহার জন্য আপনাকে কোনরূপে দোষারোপ করা হইবে না।' কাযি বলিলেন: "সুলতান যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করেন এবং মহান খলিফাগণের (আল্লাহ যেন তাহাদিগকে বেহেশত নাজেল করেন) উদাহরণ অনুসরণ করেন তিনি নিজের জন্য ততটুকুই গ্রহণ করিতে পারেন, যতটুকু তিনি তাহার একজন ভৃত্যের জন্য বরাদ্দ করেন; আর তিনি যদি কোন মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, তবে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে ততটুকুই নিবেন, যাহা তিনি তাহার একজন প্রধান আমীরকে প্রদান করেন, যাহার চেয়ে বেশী তিনি আর কাহাকেও প্রদান করেন না; কিন্তু তিনি যদি ধর্মীয় ব্যাপারে সুপণ্ডিত লোকদের[১] মত অনুযায়ী কার্য করেন, যাহারা এইরূপ ক্ষেত্রে অননুমত হাদিসের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিজয়ী সুলতানদের ইচ্ছার সঙ্গে সায় দিয়া যান, তবে তিনি আমীরগণের চেয়েও কিছু পরিমাণ বেশী নিতে পারেন। কোন অবস্থাতেই তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে ইহার অতিরিক্ত কোন কিছু নিজ প্রয়োজনে গ্রহণ করা আইনসঙ্গত নয়।" সুলতান পুনরায় অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন; আর বলিলেন: 'আপনি কি বলিতে চান যে যে সব অর্থ আমার হারেমে ব্যয় হয়, গৃহকর্মের বিভিন্ন বিভাগে ভৃত্যদের পুরস্কাররূপে যাহা দেওয়া হয়, এবং অন্যান্যভাবে যাহা খরচ হয়, তাহা বেআইনীভাবে খরচ করা হইতেছে?" কাযি বলিলেন: "যেহেতু সুলতান আমাকে আইন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার পক্ষে ইহাই ন্যায়সঙ্গত যে আইন পুস্তকসমূহের বিধান অনুযায়ী যাহা ন্যায়সঙ্গত আমি আপনাকে তাহাই বলিব; কিন্তু তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে রাষ্ট্রীয় কারণে যুক্তিযুক্ত কি হইবে, তখন আমি বিনা দ্বিধায় তাহাকে বলিব যে যাহা কিছু তিনি করেন, তাহাই ন্যায়সঙ্গত এবং সাম্রাজ্যের বিধি বিধান এবং নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পন্ন হইতেছে; আর প্রকৃতপক্ষে যাহা কিছু এই সব বিধি-বিধানের অতিরিক্ত, তাহা শুধু সাম্রাজ্যের জাঁকজমক এবং আড়ম্বরই বৃদ্ধি করে; আর ইহার ফলে বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা লাভ হয়।" ইহার পর সুলতান বলিলেন যে, "যে সব অশ্বারোহী সৈন্য সমাবেশে হাজির হয় নাই, তাহাদের সকলের নিকট হইতেই আমি তিন বৎসরের বেতন নিয়া নিয়াছি; আর সকল বিদ্রোহী এবং বিশৃঙ্খলাকারীকে তাহাদের সকল সন্তানাদি এবং আত্মীয় স্বজনসহ তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়াছি এবং তাহাদের যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, যে কোন স্থানেই ছিল, তাহার সবই আমি কোষাগারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, আর

১. যিয়া-ই-বার্ণী এই স্থানে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইল উলামা-ই-দুনিয়া, অর্থাৎ পৃথিবীর পণ্ডিত ব্যক্তিগণ; কিন্তু তবকাত-ই-আকবরীতে এই স্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে উলামায়ে দীন, অর্থাৎ ধর্মীয় মতবাদে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ।

তাহাদের পরিবারগুলিকে বিনষ্ট এবং ধ্বংস করিয়াছি। আমি চোর এবং মদ্যপায়ী এবং ব্যভিচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি কি বলিতে চান যে এইসব বে আইনী?' কাযি তাহার আসন হইতে দণ্ডায়মান হইলেন, কিছুদূর গমন করিলেন আর তাহার শির ভূমিতে স্থাপন করিয়া বলিলেনঃ 'ইহার সবই বে আইনী।' সুলতান রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং হারেমে চলিয়া গেলেন।

শ্লোক

তুমি যখন বল কোন্‌টা সত্য এবং ন্যায়
আল্লাহই তোমাকে তাহা শিক্ষা দান করে।

পরদিন সুলতান কাযি মুঘিসুদ্দীনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, তাহার প্রতি অত্যন্ত সহৃদয়তা প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে একটি অঙ্গাবরণ এবং এক সহস্র তংগা পুরস্কার দান করিলেন। তিনি বলিলেনঃ "আমি একজন মুসলমান এবং একজন মুসলমানের পুত্র। আমি যে সমস্ত কঠোরতা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার সবই সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। আমি জানি না কাল আমার কি পরিণতি হইবে, শেষ বিচারের দিনই বা কি হইবে।'

ইহার কিছুকাল পর সুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গটি অধিকার করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সংবাদ যখন মাওয়ারুন নাহরে পৌঁছিল যে সুলতান আলাউদ্দীন একটি দূরবর্তী দুর্গ অধিকার করিতে ব্যস্ত আছেন এবং দীর্ঘকাল ঐ স্থানে অবস্থান করিবেন, তখন মুঘল তুর্ঘী, পূর্বেই যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, এক বিরাট বাহিনীসহ হিন্দুস্তান লুণ্ঠন করিতে আগমন করিলেন এবং দিল্লীর নিকটস্থ যমুনা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। কিন্তু সুলতান চিতোর জয় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার এক মাস পূর্বেই দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু সুলতানের সেনাবাহিনীর উৎকৃষ্টতম অংশ অরঙ্গল বিজয়ের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিল। আর মহা-আমীরগণের অধিকাংশই তাহাদের রণথম্বোর বিজয়ের পর তাহাদের নিজ নিজ জায়গীরে চলিয়া গিয়াছিলেন আর সুলতানের সঙ্গে যে সেনাবাহিনী ছিল, তাহা বর্ষাকালের জন্য এবং সুদীর্ঘকাল শিবিরে অবস্থানের ফলে উপযুক্তরূপ সাজসজ্জায় প্রস্তুত ছিল না। সুলতান হতবুদ্ধি অবস্থায় তাহার সঙ্গে যে সৈন্য ছিল তাহাদের লইয়াই দিল্লী হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং সিরির প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। তিনি পরিখা খনন করিয়া এবং একত্র বাঁধিয়া, কাঁটা ফেলিয়া এবং অন্যান্য রক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া তাহার অবস্থান সুরক্ষিত করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তিনি যে

আমীরগণকে তলব করিয়াছেন তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। মুঘলগণ দিল্লীর চতুর্দিকের অঞ্চলটি দখল করিয়া রাখিবার ফলে তাহার আমীরগণ তাহার সঙ্গে যোগদান করিতে সক্ষম হইলেন না, মুঘলগণ তাহাদের অবস্থানও সুরক্ষিত করিয়া রাখিল। তাহাদের কিছু সংখ্যক কোলে, এবং কিছু সংখ্যক বরণে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই মাস যখন গত হইল তখন কোন আপাত কারণ ছাড়াই তর্ঘী চলিয়া গেলেন। দিল্লীর নাগরিকগণ ইহা শেখ ঘিয়াসুদ্দীনের, তাহার কবর যেন পবিত্র হয়, অনুগ্রহ বলিয়া গণ্য করিলেন এবং ইহা তাহার কেরামতিসমূহের একটি ধরিয়া লইলেন। তাহারা বলে যে তর্ঘী ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠে এবং তিনি হতবুদ্ধি অবস্থায় যাত্রা করেন এবং তাহার স্বদেশে) প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার পর সুলতান সিরি তাহার রাজধানী করিলেন এবং বড় বড় অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিলেন এব দিল্লীর দুর্গ প্রাকার পুনঃ নির্মাণ করিলেন, এবং পুনরায় মুঘলদের আগমন পথে অবস্থিত দুর্গগুলি শক্তিশালী করিলেন। তিনি এমন এক শক্তি-শালী সেনাবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যাহা মুঘলদের প্রতিহত করিতে এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে এমন এক বাহিনী ব্যয়ভার বহনের জন্য তাহার রাজস্ব যথেষ্ট নয়। ফলে এই ব্যাপারে তিনি তাহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রীগণ এবং অভিজ্ঞ আমীরগণের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তাহারা বলিলেন যে অশ্ব এবং অস্ত্রশস্ত্র এবং একজন সৈন্যের সমস্ত সাজসজ্জা, যাহার উপর কোন সেনাবাহিনীর শক্তি নির্ভর করে, এবং শস্য আর সাধারণ লোকের অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় জিনিস যদি সস্তা হয়, তবে সুলতানের ইচ্ছা সফল হইতে পারে। কারণ তাহা হইলে ফসলের দাম সস্তা হইবার ফলে সৈন্যগণ তখন যে কম বেতন পাইবে তাহাতেও তাহারা রসদ সংগ্রহ করিতে পারিবে। অতঃপর সুলতান তাহার উযিরগণের, যাহারা এই যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ে কতিপয় নূতন বিধি প্রণয়ন করেন! এই বিধিসমূহের ফলে জীবনধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হ্রাস পায়। প্রথম নিয়মটি ছিল এই যে, সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের শস্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। বাজারের লোকদের শস্যের মূল্য নির্ধারণের কোন ক্ষমতা রহিল না। যাহা স্থির করা হইল তাহা এই:

গম	প্রতি মণ	সাড়ে সাত জিতল	বার্লি	প্রতি মণ	চার জিতল
ছোলা	,, ,,	পাঁচ জিতল	ধান	,, ,,	পাঁচ জিতল
মাস	,, ,,	পাঁচ জিতল	মসুর	,, ,,	তিন জিতল

এই নির্ধারিত মূল্যহার সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে ; আর কোনরূপ দুর্ভিক্ষ অথবা দুষ্প্রাপ্যতার ফলেও এই নির্ধারিত মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই। দ্বিতীয় নিয়মটি ছিল এই যে, মালিক কাবুল উলুঘ খান, যিনি চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বলিত একজন সুবিজ্ঞ লোক ছিলেন, শস্যের বাজারের (যাহা হিন্দুস্তা-নের ভাষায় মন্দুই নামে পরিচিত) পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) নিযুক্ত হন, যাহাতে তিনি নজর রাখিতে পারেন যে সকল বেচাকেনা সুলতানের নির্ধারিত মূল্যে করা হয়। তৃতীয় নিয়মটি হইল এই যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ভূমি ; যে অংশ সুলতানের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহা সংগ্রহ করিয়া শহরগুলিতে গুদামজাত করিয়া রাখিতে হইবে ; যাহাতে বাজারে আনীত শস্য যদি অপর্যাপ্ত হয় তবে যেন ইহা নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা যায়। চতুর্থ নিয়ম (বা নির্দেশ) এই ছিল যে, মালিক কাবুল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরের শস্য ব্যবসায়ীগণকে তলব করিবেন এবং তাহাদিগকে যমুনার তীরে বসতি স্থাপন করাইবেন, যাহাতে তাহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে শস্য আনিতে পারে এবং তাহা সুলতানের নির্ধারিত মূল্যে দিল্লীর বাজারে বিক্রয় করে ; আর তিনি এই উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট হইতে কারবারনামা গ্রহণ করিবেন। পঞ্চম নিয়মটি দ্বারা শস্য গুড়া করা নিষিদ্ধ করা হয়। কোন সৈন্য বা কৃষক যদি শস্য গুড়া করার অপরাধ করে তবে তাহার নিকট হইতে শস্য নিয়া নেওয়া হয়, এবং তাহা সুলতানের শস্যের সঙ্গে যোগ করা হয় এবং লোকটাকে জরিমানা করা হয়। ষষ্ঠ নিয়মটি হইল এই যে, সকল চাষীকে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা তাহাদের ফসল যেখানে উৎপন্ন হয় সেই স্থানেই বিক্রয় করে আর রাজস্ব আদায়কারীগণকে এমনভাবে রাজস্ব আদায় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল যেন কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন ফসল মাঠেই ব্যবহার করিতে পারে এবং তাহাদের নিজেদের অংশ ছাড়া আর কোন কিছুই যেন তাহাদের নিজেদের গৃহে না নিতে পারে এবং যাহাতে ফসল গুড়া করিবার অপরাধ না করিতে পারে। সপ্তম নিয়মটি হইল এই যে, বিভিন্ন প্রকারের শস্যের মূল্য সম্বন্ধে এবং শস্যের বাজারের সকল বিষয় সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রতিদিন সুলতানের নিকট দাখিল করিতে হইত। এই নিয়মগুলির সামান্যতম ব্যতিক্রম হইলেও বাজারের ম্যানেজারগণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণকে শাস্তি দেওয়া হইত। আর একটি নির্দেশ জারি করা হইল যে, অনাবৃষ্টির সময়ে প্রত্যেক লোক তাহার পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত পরিমাণ শস্য বাজার হইতে খরিদ করিবে ; আর কাহাকেও তাহার পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু কিনিতে দেওয়া হইত না। ইহা দেখা-শোনা করিবার জন্য অফিসার নিযুক্ত করা হইল ; আর এই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তদন্ত এবং কঠোরতা অবলম্বন করা হইত। এই ব্যাপারে তাহার নিকটে গোপন তথ্য

প্রেরণের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। কাহাকেও সুলতানের নির্ধারিত মূল্যের আধ জিতলও হেরফের করিতে দেওয়া হইত না।

সস্তায় কাপড় বিক্রির ব্যবস্থা করিবার জন্য নিয়ম প্রস্তুত এবং ব্যবস্থাবলম্বন করা হয়। প্রথমটি হইল এই যে, বদাওন দরওয়াজার নিকটে একটি বিস্তৃত অট্টালিকা নির্মাণ করা হইল; আর ইহার নাম দেওয়া হইল ন্যায়বিচারের গৃহ, আর সুলতান নির্দেশ দিলেন যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে যে থান-কাপড়সমূহ আসিবে, সে সব এই স্থানে জমা দিতে হইবে এবং তথায় তাহা বিক্রি করিতে হইবে এবং কেহই বাজারে বা তাঁহার নিজ গৃহে থান কাপড় বিক্রি করিতে পারিবে না। ন্যায়বিচারের গৃহে বেচাকেনা অতি ভোর হইতে শুরু করিয়া প্রথম নামাজের সময় পর্যন্ত চলিবে। যদি জানা যায় যে [illegible] কোন লোক প্রথম নামাজের পূর্বেই তাহার দোকান বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে অথবা তাহা অতি প্রত্যুষের পরে খুলিয়াছে তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত। দ্বিতীয়টি হইল এই যে সকল থান কাপড় পূর্ব হইতে সুলতানের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইত। [এইগুলি হইল] দিল্লীর কাঁচা রেশম[১] ষোল তংগা; কমলা রং-এর কাঁচা রেশম, ছয় তংগা; চুল মিশ্রিত রেশম তিন তংগা; লাল ডোরা কাটা কাপড় আট জিতল; সাধারণ কাপড়, ছত্রিশ জিতল, পাগোরের লাল অস্তরের কাপড় চব্বিশ জিতল; সূক্ষ্ম শিরিন বাফ্‌ত পাঁচ তংগা; মধ্যম প্রকারের শিরিন বাফ্‌ত তিন তংগা; সর্বোৎকৃষ্ট সিলহতি, চার তংগা; মধ্যম সিলহতি, তিন তংগা; মোটা সিলহতি, দুই তংগা; সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্র; চব্বিশ গজ এক তংগা, ধূসর মোটা সূতী বস্ত্র, চল্লিশ গজ, এক চাদর, প্রতিটি দশ জিতল। তৃতীয় নিয়মটি হইল এই যে শহরের এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের

১. *বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে জিনিসগুলির নামের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথম প্রকারের জিনিসটির নাম একটিতে দেওয়া আছে হো; অপর দুইটিতে ইহা দেওয়া আছে খসনে, যাহার অর্থ মোটা কাপড়; অপর একটিতে ইহা দেওয়া আছে খাম বা খানম; সম্ভবতঃ ইহা খাম-ই-হইবে কারণ মোটা কাপড় তালিকায় প্রথমেই স্থান পাওয়া এবং ইহার মূল্য ষোল তংগা হইতে পারে না। মেজর ফুলার তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে প্রথম শ্রেণীর কাপড়টির নাম দেওয়া হইয়াছে দিল্লী খাজ রেশম। চতুর্থ প্রকারেরটির নাম একটিতে লেখা আছে برد قلمي د و لعل অপর একটিতে ইহাকে বলা হইয়াছে برد قلمي د و لعل এবং আর একটিতে আছে قرد قلمي لعل এইগুলির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। মেজর ফুলারের তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর অনুবাদে ইহাকে বলা হইয়াছে লাল ডোরাওয়ালা কাপড়। এবং এই নামটিই এই স্থানে গ্রহণ করা হইয়াছে। মেজর ফুলারের অনুবাদে ইহার মূল্য দেওয়া আছে ছয় জিতল। কিন্তু তবকাত-ই-আকবরীর পাণ্ডুলিপিতে ইহা আট জিতল দেওয়া আছে। সর্বোত্তমটির মূল্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেওয়া আছে ছত্রিশ জিতল; সম্ভবতঃ ইহা ভুল। মেজর ফুলারের তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর অনুবাদে দেওয়া আছে সাড়ে তিন জিতল। তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে সূক্ষ্ম এবং মাঝারি সিলাহতির মূল্য দেওয়া আছে যথাক্রমে ছয় তংগা এবং চার তংগা।*

ব্যবসায়ীদের নাম একটি রেজিস্টারে লেখা থাকিত; আর তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইত যেন তাহারা পূর্বের প্রথামত সকল প্রকার থান কাপড় শহরে নিয়া আসিবে আর সেইগুলি স্থায়বিচারের গৃহে সুলতানের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিবে। যে কোন লোক এইরূপ করিতে অবহেলা করিলে, তাহাকে অপরাধরূপে গণ্য করা হইত।' চতুর্থ ব্যবস্থাটি ছিল এই যে, শহরের ব্যবসায়ীগণকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে অর্থ অগ্রিম দেওয়া হইত যাহাতে তাহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে থান কাপড় আনয়ন করিতে সক্ষম হয় এবং তাহা নির্ধারিত মূল্যে স্থায়বিচারের গৃহে বিক্রয় করিতে পারে। পঞ্চম নিয়মটি ছিল এই যে কোন উল্লেখযোগ্য আমীরের কখনও কোন বিশেষ সূক্ষ্ম বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইলে তাহাকে বাজারের প্রধানের নিকট হইতে একটি অনুমতি পত্র (লাইসেন্স) নিতে হইত। এই নিয়মটি এই উদ্দেশ্যে করা হয় যাহাতে দেশের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী ব্যবসায়ীগণ যাহাতে এইরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র স্থায়বিচারের গৃহে নির্ধারিত মূল্যে খরিদ করিতে না পারে এবং তাহা উচ্চ মূল্যে অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করিতে না পারে।

স্বল্প মূল্যে অশ্ব কেনা-বেচার ব্যবস্থা করিবার জন্যও চারিটি নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। প্রথমটি ছিল শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে; যেমন প্রথম শ্রেণীর অশ্বের জন্য একশত তংগা; দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বের জন্য আশি হইতে নব্বই তংগা; আর তৃতীয় শ্রেণীগুলির জন্য পয়ষট্টি হইতে সত্তর তংগা। দ্বিতীয় নিয়মটি ছিল এই যে অশ্ব ব্যবসায়ীগণ এবং শহরের ধনী লোকদের বাজারে অশ্ব কিনিতে দেওয়া হইত না। শহরের ধনী লোকেরা যাহারা অল্প মূল্যে কিনিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহাদিগকে শহর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং নির্বাসন দেওয়া হয় এবং ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।' তৃতীয় নিয়মটি করা হইয়াছিল অশ্ব কেনাবেচার দালালদের তিরস্কার করার এবং শাস্তি দিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য; এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় যে সুলতানের নির্ধারিত মূল্য ভঙ্গ করিয়া বাজারে যদি একটি অশ্ব বিক্রয় করা হয়, তবে বাজারের সকল দালালকে কারারুদ্ধ করা হইবে এবং সাজা দেওয়া হইবে। পঞ্চম নিয়মটি ছিল এই যে প্রতি মাসের শেষে অশ্বদের শ্রেণীবিভাগ এবং সেইগুলির মূল্য সম্বন্ধে এবং দালালদের অবস্থা এবং ব্যবহার সম্বন্ধে এক তদন্ত পরিচালনা করা হইত, আর সুলতানের প্রবর্তিত নিয়মসমূহের সামান্যতম ব্যতিক্রম দেখা গেলেও দালালগণকে শাস্তি দেওয়া হইত।

অশ্ব সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত চারিটি নিয়ম, যুদ্ধবন্দী (ক্রীতদাস) এবং গবাদি পশুর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হইত।

বাজারে যা কিছু ঘটিত তাহার সবই তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং দৈনিক রিপোর্ট সুলতানের নিকট পেশ করা হইত। বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে

অনুসন্ধানের জন্য গুপ্তচরও নিয়োগ করা হইত, আর যদি দেখা যাইত যে বাজারের তত্ত্বাবধায়ক বা ম্যানেজারগণ যদি কোনরূপ মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে, তবে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত। যাহা কিছু বাজারে কেনাবেচা করা হইত তাহার সব কিছুই সুলতানের সম্মুখে আনয়ন করা হইত এবং তিনি সেইগুলি পরীক্ষা করিতেন এবং মূল্য নির্ধারিত করিতেন। তিনি সূচ এবং চিরুণী এবং জুতা এবং মাটির কলসী এবং পেয়ালা ইত্যাদি জিনিসকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন না। মূল্যবান জিনিসপত্র এবং সাধারণ জিনিসপত্র সব কিছুরই মূল্য সুলতান স্বয় নির্ধারণ করিয়া দিতেন, আর এইসব জিনিসের নির্ধারণ মূল্যের এক তালিকা বাজার সমূহে সরবরাহ করা হইত। বাজারের লোকদের উপর সুলতান যে যত্ন নিতেন এবং তত্ত্বাবধান করিতেন এবং নির্ধারিত মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে সুলতান এত কড়া নজর রাখিতেন এবং তাহা এমন পর্যায়ে গিয়া যান যে কিছুকাল পর, ছোট ছোট বাচ্চাদের, যাহাদের জিনিসপত্র বেচাকেনা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, তাহাদের হাতে কিছু টাকা দিয়া বাজারে প্রেরণ করা হইত, যাহাতে তাহারা যে সব জিনিস পছন্দ তবে সে সব কিনতে পারে। জিনিস-পত্রগুলি সুলতানের নিকট নেওয়া হইত। আর যদি দেখা যাইত যে জিনিসের মূল্য হারে অথবা ওজনে সামান্যতম হের ফের আছে, তবে যে লোক জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়াছে, তাহাকে সাজা দেওয়া হইত। এইরূপ অবস্থায় সর্বাপেক্ষা কম সাজা ছিল কান বা নাক কাটিয়া দেওয়া।

খাদ্যদ্রব্য এবং সৈন্যদের সাজসরঞ্জাম যখন সস্তা হইয়া গেল এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল, তখন মুঘলদের আগমনের দ্বার এবং তাহাদের উৎপীড়ন অনেকটা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যদি কোন সময়ে মুঘলদের কোন দল দিল্লী অভিমুখে আগমন করিত, তখন তাহাদের সকলকেই বন্দী করা হইত এবং হত্যা করা হইত। যেমন একবার চেঙ্গিস খানের পৌত্র[১] আলী বেগ এবং তরতাক, চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহীসহ সিবালিক পর্বতের ধার দিয়া আমরোহা অঞ্চলে আগমন করে। সুলতান আলাউদ্দীন এক বিরাট বাহিনী সৈন্যসহ তাহাদের বিরুদ্ধে গমনের জন্য মালিক নায়ক আখুর

১. এই স্থানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ বংশধর অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে; ঠিক পৌত্র অর্থে নহে। দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষটির নামটি সঠিক কি হইবে বলা দুষ্কর। ইলিয়টে এবং মেজর ফুলারের অনুবাদে ইহা তরতাক দেওয়া আছে; কিন্তু প্রথমোক্তটিতে এক টীকায় বলা হইয়াছে যে, (তারিখ-ই-ফিরোয শাহীর) পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি তরিয়াক এবং রিয়াক দেওয়া আছে। ফিরিশতাতে ইহা দেওয়া আছে তরিয়াল, কিন্তু অনুবাদে দেওয়া আছে খাজা তরঘ, তুবকাত-ই-আকবরীতে আছে রগমক। কিন্তু তবকাত-ই-আকবরীর পাণ্ডুলিপিতে কোথায়ও রগমক দেখা যায় না বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্ন রূপ আছে যেমন বরমাক, তযমাক, তরিয়াক, ইয়ারখাক।

বেগকে[১] মনোনীত করেন। তাহারা আমরোহী অঞ্চলেই মুঘলদের সম্মুখীন হন এবং যুদ্ধ করেন। মুঘলদের অধিকাংশই নিহত এবং আলী বেগ ও তরতাককে বন্দী করা হয় এবং তাহাদিগকে এবং ঐ বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যকে বন্দী করা হয় তাহাদের সুলতানের নিকট আনয়ন করা হয়। ঐ দিন সুলতান শহর হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং সুভানী চবুতরে প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন আর ঐ স্থান হইতে ইন্দরপত[২] পর্যন্ত দুই সারিতে সৈন্য সাজানো হয়। এই সময়ে আলী বেগ এবং তরতাক বেগকে অন্যান্য বন্দীদের সহ সুলতানের সম্মুখে আনয়ন করা হয় এবং তাহাদের অধিকাংশকেই হস্তীপদ পদতলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হয়।

শ্লোক

এই পৃথিবীতে যেই মন্দ কাজ করে
শেষ পর্যন্ত সে নিজেই তাহার শিকার হয়।

আর একবার কবেক[৩] নামীয় একজন মুঘল এক বিশাল বাহিনীসহ খকর শহরে আগমন করেন এবং দিল্লীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয় বদাওন দরওয়াজার সম্মুখে তাহাদের শির দ্বারা এক স্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়। কিছুকাল পর প্রায় ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের এক মুঘল বাহিনী সিবালিক অঞ্চলে আগমন করে এবং দেশটি লুটতরাজ আরম্ভ করে। এই সংবাদ যখন সুলতানের গোচরে আসে, তখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী ইরাবতী নদীর নিকটে, যে পথে মুঘলগণ প্রত্যাবর্তন করিবে এমন এক স্থানে অবস্থান করিতে থাকে। মুঘল সেনাবাহিনী প্রচুর লুণ্ঠিত

---

১. এই নামটি সুস্পষ্ট নয়। পাণ্ডুলিপিতে ইহা মালিক নায়ক আখুব বেগ বলিয়া মনে হয়; ইলিয়টেও নামটি মালিক নায়ক আখুর বেগই আছে। কিন্তু মেজর ফুলারের তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর অনুবাদে ইহা দেওয়া হইয়াছে 'মালিক আতাবক; অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক। মেজর ফুলারের অনুবাদে মিঃ ভোলবর্ট এর যে টিকা দেওয়া হইয়াছে সুলতানের প্রেরিত সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, বদাওনীর মতে মালিক মানিক (= নায়েব কাফুর হাজার দিনারী। আর ফিরিশতার মতে তুঘলক খান।

২. ইলিয়টে এবং মেজর ফুলারের অনুবাদে এই স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দরপত্ত। তবকাত-ই-আকবরীর একটি পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি ইন্দরপত হইতে পারে, তবে, অন্যান্যগুলির একটিতে আছে মদিনা এবং অপর একটিতে আছে নদিনাহ।

৩. এই মুঘল নেতার নাম ইলিয়টে দেওয়া আছে কক এবং মেজর ফুলারের অনুবাদে আছে গজ। তবকাত-ই-আকবরীর একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি কবক বা কবিক হইত। মুঘলগণ যে শহরটিকে আক্রমণ করিয়াছিল, জিয়া-ই-বার্নী তাহার নাম লিখিয়াছেন খেকর এবং তবকাত-ই-আকবরীতে দেওয়া আছে খকর বা খখরা; সম্ভবতঃ পাতিয়ালার নিকটস্থ ঘগর নদী বুঝাইতেছে।

[illegible] যখন ঐ নদীর তীরে উপস্থিত হয় তখন দিল্লীর সেনাবাহিনী অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং বিজয় এবং সাফল্য লাভ করে। তাহারা বহু সংখ্যক মুঘল নেতাকে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ তরাইনার[১] দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন ; আর তাহাদের পরিবার এবং অনুচরদের দিল্লীতে আনয়ন করেন এবং তথায় তাহাদিগকে বাজারে ক্রীতদাস-রূপে বিক্রয় করা হয়। ইহার পর মালিক খাস হাজিবকে তরাইনায় গমন করিয়া কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে হতাশ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার কিছুকাল গত হইলে পর, ইকবাল নন্দা নামক একজন মুঘল এক বিশাল বাহিনী সৈন্যসহ হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন। দিহন্দা আমীর আলী ওয়াহান[২] নামক স্থানে তাহার মধ্যে এবং দিল্লীর সেনাবাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় ; আর যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং অন্যান্য মুঘলদের বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। আর তাহাদিগকে হস্তীপদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করা হয়। ইহার পর মুঘলদের হৃদয়ে এমন ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয় যে তাহাদের মন হইত হিন্দুস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায়। কুতবুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত দেশটি তাহাদের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকে। সুলতান তুঘলক শাহ, যাহাকে ঐ সময়ে ঘাযি মালিক বলা হইত, দিবালপুর এবং লাহোর জায়গীররূপে ভোগ করিতেন। মুঘলগণ আসিয়া তাহাকে বাধা দিতে এবং তাহাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না।

মুঘলদের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবার পর, আর হিন্দুস্তানের যে সব শহর দুর্দান্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল লোকদের আশ্রয়স্থল ছিল ; সেইগুলির অধিকাংশ সম্পূর্ণরূপে দখলে আনয়নের পর, আর ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সকল প্রকার পরিব্রাজকগণের জন্য পথঘাট সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করিবার পর এবং সাম্রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী সেনা-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবার পর, সুলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে এইক্ষণে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এবং তাহার মনকে সর্বপ্রকার উদ্বেগ হইতে মুক্ত করিয়া দূরবর্তী অঞ্চলের শহর এবং প্রদেশগুলিকে জয় করিবার সংকল্প করেন, আর যে দেশই

১. এই দুর্গটির নাম ইলিয়টে দেওয়া আছে নারানিয়া, আর মেজর ফুলারের অনুবাদে দেওয়া আছে নারাইনা।

২. এই স্থানের নামটি সুস্পষ্ট নয়। মেজর ফুলারের অনুবাদের এক টিকা হইতে জানা যায় যে এই টিকার লেখক তবকাত-ই-আকবরীর পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেখিয়াছেন, সেই অনুযায়ী এই নামটি এই স্থানে দেওয়া হইয়াছে। ঐ টিকার লেখক লিখিয়াছেন যে দিহন্দা, অযোধ্যার পতন-ই-পাঞ্জাবের নিকটস্থ একটি নদী ; ইহা দিপালপুর বা দিবালপুরের পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। যে স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার নাম ইলিয়টে দেওয়া নাই।

তিনি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই তিনি কোন রূপ বাধাবিপত্তি বা অসুবিধা ছাড়াই অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

শ্লোক

সৌভাগ্যশালীর নিকটে যখন আল্লাহর সাহায্য পৌঁছে
চাওয়ার পূর্বেই তখন তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়া যায় ;
যখন তাহার ইচ্ছা তাহার হৃদয়ে আছে
তখন তাহার হাতেই ধন সম্পদ আসিয়া পৌঁছে ;
তাহার উদ্দেশ্যের প্রবণতা যদি পূর্ব দিকের প্রতি হয় ;
তখন পশ্চিম হইতে তাহার নিকটে আসে বারিপাত এবং বায়ুপ্রবাহ।

তাহার আশা এবং উদ্দেশ্য যেভাবে সাফল্য অর্জন করে এবং তিনি তাহার কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি যে সব চমৎকার কার্যসমূহ সম্পন্ন করেন, সেগুলিকে বহু লোক কেরামতি ছাড়া আর কিছুই নয় বলিয়া গণ্য করিতেন এবং তাহারা তাহাদের সাফল্য উদঘাটন এবং অনুপ্রেরণা ফল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন ; আবার কিছু সংখ্যক এইগুলিকে দুষ্ট প্রকৃতির প্রতিনিধিদের দ্বারা সংঘটিত করানো হইয়াছে আর ঐগুলি আল্লাহ দ্বারা ক্রীত ফাঁকি বলিয়া গণ্য করিত। তা আবার কেহ কেহ মনে করিত যে লোকের শান্তি এবং সুখ শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (তাহার কবর যেন পবিত্র থাকে) অবস্থিতি দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে।

সংক্ষেপে মালিক নায়েব কাফুর হাজার দিনারীকে অন্যান্য মহান আমীরগণের এবং খ্যাতনামা খানদের দক্ষিণের শহর দেওগীরে প্রেরণ করা হয়। সুলতান তাহাকে বহু সম্মানে ভূষিত করেন এবং তাহাকে একটি লাল চাঁদোয়া দান করে রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সেনাবাহিনী সহকারী সমাবেশক খাজা হাজীকে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা হয়, যাহাতে তিনি সেনাবাহিনীর কার্য তদারক করিতে পারেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারের দায়িত্ব নিতে পারেন। মালিক কাফুর দেওগীরে পৌঁছিয়া তাহার বীরত্ব এবং কৌশলের দ্বারা ঐ জেলার রাজা (রাম দেও) এবং তাহার পুত্রগণকে বন্দী করেন ; এবং সমস্ত ধন-রত্ন এবং সতেরটি হস্তী দখল করেন। তিনি বিজয়ের এক বিবরণ সহ এইগুলি দিল্লী প্রেরণ করেন। ইহার পর পরই তিনি রাম দেও-এর প্রতি মহা-দয়াশীলতা প্রদর্শন করেন এবং হস্তী এবং ধন-রত্নসহ তাহাকে দিল্লী নিয়া যান, এবং তথায় রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। সুলতান রাম দেও-এর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন, তাহাকে রায়-ই রায়ান উপাধি দান করেন এবং তাহাকে একটি চাঁদোয়া এবং

এক লক্ষ তংগা পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাহাকে দেওগীরে শাসনকর্তারূপে পুনর্বহাল করিয়া তাহাকে তথায় ফেরৎ পাঠান। অতঃপর রামদেও সুলতানের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যে পরিণত হয় এবং সর্বদা তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, বশ্যতা স্বীকার করেন এবং যথেষ্ট খেদমত করেন।

আঃ হিঃ ৭৯০ সনে সুলতান আলাউদ্দীন মালিক কাফুরকে দ্বিতীয়বারের জন্য এক বিরাট বাহিনী সৈন্যসহ অরঙ্গল প্রেরণ করেন। তাহাকে বিদায় দিবার সময় তিনি নির্দেশ দিলেন যে অরঙ্গলের রাজা বদর দেও[১] যদি ধনরত্ন, কামান এবং হস্তীসমূহ সমর্পণ করে এবং বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হয়, তবে যেন তিনি তাহাতে সম্মত হন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি যেন দুর্গ অধিকার করিতে বা রুদর দেওকে বন্দী করিতে চেষ্টা না করেন। ঐ সব অঞ্চলের ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি যেন খাজা হাজীর সঙ্গে পরামর্শ করেন আর সামান্য অপবাধ এবং কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে ছোট খাট ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য যেন আমীরগণকে শাস্তি দান না করেন। তবে তিনি যেন কোনরূপ গাফলতি বরদাস্ত না করেন। কোন সৈন্য যদি কোন লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করে এবং তাহা নিজের রাখিবার জন্য প্রার্থনা করে তবে তিনি যেন তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন; আর যদি কোন অশ্বারোহী সৈনিকের অশ্ব যুদ্ধে নিহত হয় অথবা চুরি হইয়া যায় অথবা অকেজো হইয়া যায়, তবে তিনি যেন ঐ অশ্বের স্থলে তাহাকে আরও ভাল একটি অশ্ব প্রদান করেন। এই সব কাজ শাসনকর্তার কর্তব্য-রূপে যেন তিনি গণ্য করেন। অতঃপর মালিক কাফুর এবং খাজা হাজী সুলতানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; এবং দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া অরঙ্গল অভিমুখে গমন করেন। তাহারা চন্দেরী পৌঁছিয়া ঐ স্থানে কয়েকদিন অপেক্ষা করেন এবং সেনাদের এক সমাবেশ সম্পূর্ণ করেন। ঐ স্থান হইতে তাহারা দেওগীর অভিমুখে যাত্রা করেন। রাম দেও তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া আসেন এবং প্রচুর উপহার প্রদান করেন, আনুগত্য প্রকাশ এবং খেদমতের কর্তব্য সম্পাদন করেন; আর কয়েক পর্যায় পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে গমন করেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন এবং দেওগীরে প্রত্যাবর্তন করেন।

মালিক নায়েব যখন অরঙ্গলের সন্নিকটে গমন করিলেন, নিকটবর্তী রায়গণ ইসলামের বাহিনীর ভয়ে দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়; আর বহির্দিকের দুর্গে একটি

১ নামটি ইলিয়টে দেওয়া আছে লদ্দর। তবকাত-ই-আকবরীর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে লদ্দর দেও; কিন্তু দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে রুদর দেও; রুদর দেও, বা রুদ্র দেব একটি সুপরিচিত নাম কিন্তু লদ্দর দেও এর কোন অর্থ হয় না।

প্রাকার নির্মাণ করেন, ইহা অতি বিস্তৃত ছিল, আর ইহাতেই তাহারা ভীড় করিল এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। রুদর দেও তাহার নিজস্ব অনুচরগণসহ পাথরের তৈরী আভ্যন্তরীণ কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতানের সেনাবাহিনী দুর্গটি অবরোধ করেন এবং তাহা দখল করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকেন আর হিন্দুগণ ভিতর হইতে তাহাকে বাধা দিতে এবং দুর্গ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। কিছুকাল পরে, এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর বাহিরের দিকের অংশটি অধিকার করা হয়। অধিকাংশ রায এবং জমিদার এবং তাহাদের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের কারারুদ্ধ করা হয়; আর প্রচুর সংখ্যক নিহত হয। রায রুদর দেও মহা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন এবং আশ্রয প্রার্থনা করেন। মালিক নায়েব তাহার নিকট প্রচুর ধনরত্ন, একশত হস্তী, এবং সাতশত অশ্ব গ্রহণ করেন এবং তাহাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন, আর ইহাও নির্ধারিত হয যে প্রতি বৎসর তিনি উপযুক্ত কর প্রদান করিবেন। মালিক নাযেব অতঃপর ঘটনাসমূহ বিবৃত করিয়া সুলতানের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, আর তিনি ইহা লইযা নির্দেশ দেন যে বিজয়ের রিপোর্টটি মঞ্চ হইতে পাঠ করিতে হইবে এবং বিজয় ঢাক বাজাইতে হইবে এবং দান খযরাত করিতে হইবে। মালিক নাযেব যখন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন সুলতান শহর হইতে বাহির হইযা আসিলেন এবং বদাওন দরওয়াজার নিকটে অবস্থিত নাসিরী চবুতরে (মঞ্চ) রাষ্ট্রীয মর্যাদায় আসন গ্রহণ করিলেন। তথায় মালিক নায়েবকে আনুগত্য প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল এবং তিনি সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য সুলতানের চোখের সম্মুখ দিযা প্রদর্শন করাইযা নিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত হইলেন।

কথিত আছে যে যখনই সুলতান আলাউদ্দীন কোন স্থানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতেন, তখনই তিনি দিল্লী হইতে সেনাবাহিনীর গন্তব্যস্থল পর্যন্ত অশ্বের এক ডাক চৌকি বসাইতেন (যাহাকে প্রাচীনদের ভাষায় বলা হইত ইয়াম বা ডাকে অশ্ব); আর তিনি প্রতি ক্রোশে একজন দ্রুতগামী রানার, (যাহাকে হিন্দিতে বলা হয পাইক) স্থাপন করিতেন; আর পথিমধ্যের সমস্ত শহর ও নগরে একজন লেখক বা কেরানী স্থাপন করিতেন, আর তিনি প্রতিদিন ঐ স্থানের সমস্ত ঘটনাবলীর রিপোর্ট সুলতানের নিকট প্রেরণ করিতেন। একবার ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে যখন মালিক নায়েবকে অরঙ্গল প্রেরণ করা হয়, তখন পথিমধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবার ফলে কিছু কালের জন্য তাহার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কতিপয় থানা বা চৌকির ব্যবস্থা গণ্ডগোল হইয়া যায়। ইহাতে সুলতান অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন এবং মালিক করা বেগ এবং সামানার কাযি মুঘিসুদ্দীনকে সেইখুল ইসলাম, শেখ নিযাসুদ্দীন আউলিয়ার

নিকট প্রেরণ করেন এবং (শেখের মঙ্গলের জন্য) তাহার প্রার্থনা নিবেদন করিয়া তাহাকে জানান যে সুলতান বেশ কিছুকাল অরঙ্গলে প্রেরিত সেনাবাহিনীর কোন সংবাদ পাইতেছেন না; আর ইসলামের সেনাবাহিনীর (নিরাপত্তার) জন্য তাহার উদ্বেগ অবশ্যই সুলতানের চেয়ে অধিক হইবে; আর তিনি যদি তাহার পবিত্র অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সেনাবাহিনীর অবস্থা সম্বন্ধে কোন কিছু অবহিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি যদি তাহা প্রকাশ করেন তবে সুলতানের হৃদয় উল্লসিত এবং আনন্দিত হইবে। তিনি সংবাদ-বাহকদের আরও বলিলেন যে শেখের মুখ হইতে যাহা কিছু বাহির হয় তাহাই যেন তাহারা কোনরূপ অতিরঞ্জিত না করিয়া বা না কাটিয়া ছাটিয়া তাহার নিকট প্রকাশ করেন। তাহারা যখন শেষোক্ত জনের সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন তাহারা সুলতানের বার্তা তাহাকে প্রদান করেন। শেখ একজন ভূতপূর্ব রাজার উল্লেখ করিলেন; তাহার বিজয় অভিযানসমূহের বিবরণ দিলেন; আর এই বিবরণের মধ্যে এই কথাগুলি বলিলেন যথা: "এই বিজয় ছাড়াও অন্যান্য বিজয় লাভের আশা আছে।" মালিক করা বেগ এবং কাযি মুঘিসুদ্দীন শেখের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুলতানের নিকট কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। শেষোক্ত জন অত্যন্ত প্রীত হন এবং বুঝিতে পারেন যে অরঙ্গল বিজিত হইয়াছে এবং আশা করেন যে আরও স্থান জয় করা হইবে। ঐ দিনের শেষেই বিজয় লাভ সম্বন্ধে মালিক নায়েবের রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছে, আর ইহার ফলে শেখের পবিত্রতা সম্বন্ধে সুলতানের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়। যদিও সুলতান আলাউদ্দীন কখনও স্বয়ং শেখের নিকট তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গমন করেন নাই, তবু সর্বদাই তিনি তাহার নিকট লোক মারফতে বার্তা প্রেরণ করিয়া তাহার প্রতি তাহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার মধ্যস্থতার জন্য প্রার্থনা করিতেন।

আঃ হিঃ ৯১০ সনে পুনরায় সুলতান আলাউদ্দীন, মালিক নায়েবকে ধোর সমুন্দর দ্বার সমুদ্র) এবং মা'বার (মালাবার) অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনীর সহকারী সমাবেশকারী খাজা হাজীকেও তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা হইল। তাহারা যখন দেওগীরে পৌঁছিলেন তখন দেখিলেন যে রাম দেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার ছেলে প্রথানুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। মালিক নায়েব এবং খাজা হাজী দেওগীরে বিলম্ব করিলেন না। তথা হইতে দ্রুত গমন করিয়া ধোর সমুন্দরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। অচিরেই তাহারা ঐ স্থানটি দখল করিলেন এবং ঐ স্থানের রানা মন্নার দেওকে বন্দী করিলেন। তাহারা ছত্রিশটি হস্তী এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করিলেন এবং তাহাদের এই বিজয় লাভের স বাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের সেনাবাহিনীসহ মা'বারে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাও

অধিকার করিলেন এবং ঐ স্থানের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিয়া এবং স্বর্ণ এবং জহরতের মূর্তিগুলি বিধ্বস্ত করিয়া, স্বর্ণগুলি কোষাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহারা মা'বারের শাসনকর্তা দুইজন রায়ের প্রত্যেকের নিকট হইতেই প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করিলেন এবং তিনশত বারটি হস্তী, বিশ সহস্র অশ্ব, ছিয়ানব্বই হাজার মণ স্বর্ণ এবং বহু বাক্সপূর্ণ মণিমুক্তা এবং অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য যাহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাসহ প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সুলতানের খেদমতে হাজির হইলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয় এবং অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্য লাভের জন্য বিশেষ উৎফুল্ল হইলেন এবং এই লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক অংশ আমীরগণকে প্রদান করিলেন।

সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বের শেষ ভাগে যে সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে তাহার মধ্যে একটি হইল এই যে, কতিপয় অপদার্থ নব মুসলমান, যাহাদের কোন পদ ছিল না এবং কোন ভাতা ছিল না, একত্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং স্থির করে যে সুলতান যখন শিকার করিতে গমন করিবেন এবং তাহার অনুচরদের কেহই তাহার নিকটে থাকিবে না তখন তাহাকে হত্যা করিবেন। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ যখন সুলতানের নিকট পেঁীছে, তিনি তাহার চরিত্রের মধ্যে যে কঠোরতা এবং প্রচণ্ডতা ছিল, তাহার ফলে নির্দেশ দেন যে নব-মুসলমানদের যেখানে যত লোক পাওয়া যাইবে তাহাদের প্রত্যেককেই হত্যা করিতে হইবে; ফলে এক দিনের মধ্যেই কয়েক সহস্র নিরপরাধ লোক, এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যাহারা কিছুই জানিতেন না, তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এব তাহাদের সন্তান সন্ততিকে ধ্বংস করা হয়।

এই সময়েই একদল বহতীর আবির্ভাব হয়। সুলতান তাহাদের সকলকেই বন্দী করিবার এবং তাহাদের শিরের মধ্য দিয়া করাত টানিবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে এই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়; আর যেহেতু সুলতান নিষ্ঠুর এবং জটিল চরিত্রের লোক ছিলেন, কাহারও পক্ষে তাহার নিকট সুপারিশ করিবার মত সাহস কাহারও ছিল না। তিনি যদি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন তবে সারা জীবনেও তাহার এই ক্রোধ শান্ত হইত না; আরও তিনি কখনও শান্তি স্থাপনের কোন পথ খোলা রাখিতেন না। যদিও রাজত্বের প্রথম দিকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিষয়ে তিনি লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাদিগকে এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন, তবু রাজত্বের শেষ দিকে যখন তাহার মন সকল চিন্তাভাবনা হইতে মুক্ত হয় এবং তাহার সকল রাজনৈতিক পরিকল্পনা তাহার ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হয়, তখন তাহার যাহা মনে হইত, এবং যাহা তিনি ভাল বিবেচনা করিতেন তাহাই করিতেন, এবং এই সব ব্যাপারে কাহারও কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না।

বলা হইয়া থাকে যে হিন্দুস্তানের আর কোন সম্রাট সুলতান আলাউদ্দীনের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক যুদ্ধ জয় করেন নাই। তারিখ-ই-ফিরোযশাহীর লেখক বলেন যে তাহার সময়ে এত অধিক অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল যেমন মসজিদ এবং মিনার এবং জলাশয় এব' দুর্গ এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রাসাদ যাহা আর কোন সময় নির্মিত হয় নাই। শিল্পী এবং সুদক্ষ কারিগরের সংখ্যাও তাহার রাজত্বকালে যেরূপ দেখা গিয়াছে, অন্য কোন সময়ে আর সেরূপ দেখিয়াছে স্মরণ করিতে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা হিন্দুগণের আনুগত্য প্রদর্শন এবং সর্ব প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন তাহার সময়ে যেরূপ দেখা গিয়াছে আর কাহারও সময়ে সেরূপ দেখা যায় নাই। তাহার সময়ে যত বেশী সংখ্যক মহান ধর্মীয় শিক্ষক এবং ধর্মপথে বিচরণকারী লোক দিল্লীতে যাহাদের মহান উপস্থিতির ফলে তাহা পৃথিবীর অন্যান্য শহরের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়, একত্র সমবেত হয় আর কোন সময়ে এমন হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শেখ নিযামুউদ্দীন আউলিয়া আল আজিজ, তাহার কবর যেন পবিত্র হয়, যাহার কোন প্রশংসার প্রয়োজন নাই এবং যিনি শিক্ষাদান এবং পথ প্রদর্শনের উচ্চ স্থানে সমাসীন থাকিয়া লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন। মহরম মাসের ৫ তারিখ হইতে ১০ তারিখ পর্যন্ত অযোধানের শেইখুল ইসলাম ফরিদুদ্দীনের উৎসবের দিনগুলিতে শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার খানকাতে প্রচুর লোক সমাগম হইত: আর ঐ দিনগুলিতে হিন্দুস্তানে সর্বত্র হইতে লোক দিল্লীতে আগমন করিতেন; আর উপস্থিত লোকদের আল্লাহর ভাবে উল্লাসের নিমজ্জিত অবস্থা দেখিয়া দরজা এবং দেওয়ালসমূহ পর্যন্ত বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। অপর একজন ছিলেন শেখ ফরিদুদ্দীনের পৌত্র শেখ আলাউদ্দীন, যিনি অযোধানে উপদেশ দানের আসনে সমাসীন ছিলেন, আর তিনি বাহ্যিক এবং গূঢ় আরাধনায় এত গভীরভাবে নিয়োজিত থাকিতেন যে লোকেরা তাহাকে পবিত্র ফেরেশতা আখ্যা দিতেন। আর একজন ছিলেন মহাপবিত্র, দরবেশদের ধ্রুবতারকা, শেখ রুকনুদ্দীন পিতা শেখ সদরুদ্দীন, পিতা শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, আল্লাহ যেন তাহাদের আত্মাকে পবিত্র রাখেন, যিনি আল্লাহর অনুসন্ধানের মরুভূমির পথে বিচরণকারীদের বিশ্বাসের রাজপথে পরিচালিত করিয়া সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়া যাইতেন। মুলতান এবং উচের এবং সমস্ত সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসীগণ তাহার দ্বারে আগমন করিতেন এবং নিজেদের তাহাদের ছত্র ছায়ায় সমর্পণ করিয়া বিপদ আপদ এবং দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইতেন। তাহার মহান পিতা শেখ সদরুদ্দীন; তাহার প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, যাহা তিনি তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার এত প্রচুর পরিমাণ নজর ও উপহার আসিত যাহার পরিমাণ কল্পনার অতীত, তিনি সর্বদা

ঋণে আবদ্ধ থাকিতেন। অপর একজন ছিলেন সৈয়দ কুতবুদ্দীনের পুত্র সৈয়দ তাজুদ্দীন যিনি দানশীলতা, পাণ্ডিত্য, ধৈর্য এবং অন্যান্য মানবিক উৎকর্ষতায় ঐ যুগে অতুলনীয় ছিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি অযোধ্যার কাযি ছিলেন এবং তৎপর তিনি বদাওনের কাযি নিযুক্ত হন। অপর একজন ছিলেন সৈয়দ রুকনুদ্দীন। তিনি ছিলেন উপরোক্ত সৈয়দ তাজুদ্দীনের ভ্রাতা; আর তিনি ছিলেন কারার কাযি এবং প্রশংসনীয় গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। অপর একজন ছিলেন কৈথালের সৈয়দগণের অন্যতম সৈয়দ মুঘিসুদ্দীন এবং তাহার ভ্রাতা সৈয়দ মসলাহতদ্দীন; আর এই উভয় ভ্রাতাই পাণ্ডিত্য এবং দয়াশীলতা এবং পবিত্রতা এবং সকল উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাহাদিগকে বলা হইত নোহতার সৈয়দগণ। তাছাড়া অন্যান্য সৈয়দগণ এব মহান ব্যক্তিগণও ছিলেন; কিন্তু সকলের বিশদ বিবরণ দিতে গেলে বিবরণ অতি দীঘ হইয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে ছিলেন কাযি সদরুদ্দীন আরিফ; তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান কাযি এবং তাহার উপাধি ছিল সদর-ই-জাহান। তাহার পর কাযি জালালুদ্দীন দিলওয়াড়ী[১] সাম্রাজ্যের কাযি হন আর মৌলানা যিয়াউদ্দী বিয়ানা সদর-ই জাহান প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত হন। সুলতান আলাউদ্দীনের শেষ দিকের দিনগুলিতে মালিক ইলতিজার হামিদুদ্দীন মুলতানী সাম্রাজ্যের কাযি নিযুক্ত হন।

বাহ্য জগতের আলেমদের মধ্যে যাহারা বিভিন্ন বিজ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষকতা কার্যে এবং জ্ঞানদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহাদের সংখ্যা ছিল ছেচল্লিশ, যথা ঃ কাযি ফখরুদ্দীন নফসাহ, কাযি শরফুদ্দীন সারমানি, মৌলানা নাসিরুদ্দীন ঘনি, মৌলানা তাজুদ্দীন মুকাদ্দম, কাযি যিয়াউদ্দীন বিয়ানা, মৌলানা যহীর লঙ্গ, মৌলানা রুকনুদ্দীন সুনামী, মৌলানা তাজুদ্দীন কলাহী, মৌলানা যহীরুদ্দীন ভকারী, কাযি মহিউদ্দীন কাশানী, মৌলানা কামালুদ্দীন কুলুই, মৌলানা ওয়াজিহউদ্দীন পায়েলী, মৌলানা মিনহাজুদ্দীন কবাই, মৌলানা নিযামুদ্দীন কলাহী, মৌলানা নাসিরুদ্দীন কারা, মৌলানা নাসিরুদ্দীন সাবুনী, মৌলানা আলাউদ্দীন তাজির, মৌলানা করিমুদ্দীন জৌহরী, মৌলানা হুজুত মুলতানী, মৌলানা হামিদুদ্দীন মুখলিস, মৌলানা বুরহানুদ্দীন ভকরী, মৌলানা ইফতিখারুদ্দীন বার্নী, মৌলানা হিসামুদ্দীন সুর্খ, মৌলনা ওয়াজিউদ্দীন মলহ, মৌলানা আলাউদ্দীন কুর্ক, মৌলানা হিসামুদ্দীন সাদী, মৌলানা হামিদুদ্দীন মুলতানী, মৌলানা শিহাবুদ্দীন মুলতানী, মৌলানা ফখরুদ্দীন হানসুই, মৌলানা ফখরুদ্দীন সফাফিল, কাযি যয়নুদ্দীন নাফিলাহ, মৌলানা সরখী, মৌলানা

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন দাওয়াতী, দাওয়াহী, দিলওয়াতী, দেওয়ালহী।

ওয়াজিউদ্দীন রাযি, মৌলানা আলাউদ্দীন সদর শরিয়াত, মৌলানা মিরান বারিখলাহ, মৌলানা নজিবুদ্দীন শাদী, মৌলানা শামসুদ্দীন, মৌলানা নাসিরুদ্দীন, মৌলানা আলাউদ্দীন লাহুরী, কাযি শামসুদ্দীন কায়যুনী, মৌলানা শামসুদ্দীন ইয়াহিয়া, মৌলানা নাসিরুদ্দীন ইতাভী, মৌলানা ময়নুদ্দীন লালী, মৌলানা ইফতিখারুদ্দীন রাযি, মৌলানা মুইযযুদ্দীন আন্দ্রেহী, এবং মৌলানা নজমুদ্দীন ইনতেশারী। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বের শেষ দিকে শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পৌত্র মৌলানা ইল-মুদ্দীন, যিনি তাহার সময়ের একজন সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, দিল্লীতে আগমন করেন এবং বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান শিক্ষা দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কোরান পাঠের বিজ্ঞানের শিক্ষকগণের মধ্যে মৌলানা শাতি, মৌলানা আলাউদ্দীন মুকরা এবং খাজা যাকি, হাসান বসরীর ভাগিনেয় বিখ্যাত ছিলেন। প্রচারকগণের মধ্যে মৌলানা ইমাদ হাসান দরবেশ এবং তাহার ভ্রাতা মৌলানা জালাল, মৌলানা যিয়াউদ্দীন সুনামী, মৌলানা শিহাবুদ্দীন খলিলী এবং মৌলানা করিম ছিলেন ঐ যুগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সিপাহসালার তাজুদ্দীন ইরানী, খুদাওয়ান্দযাদাহ চাসনীগীর, বলবন-ই বুযুর্গের পৌত্র, মালিক রুকনুদ্দীন হাবিব, মালিক ইযযুদ্দীন তুখান খান এবং মালিক নাসিরুদ্দীন নূর খান ছিলেন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান সভাসদ। সুলতান আলাউ-দ্দীনের রাজত্বকালের কবিগণের মধ্যে, যাহাদের অতুলনীয় অস্তিত্বের ফলে রাজধানী দিল্লী, প্রকৃতপক্ষে সারা হিন্দুস্তান দেশটি সুসজ্জিত এবং সুশোভিত হইয়াছিল, এবং যাহাদের বাগ্মীতার খ্যাতি সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আমীর খসরু, যিনি শব্দ প্রয়োগে এবং তাহার অর্থ আবিষ্কারে পরম উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; আর যাহার মহত্ব এবং উৎকর্ষতার লক্ষণগুলি তাহার গদ্য এবং পদ্য লেখা হইতে সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। অনুরূপভাবে তিনি একজন মরমীও ছিলেন, গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার অধিকাংশ সময় কাটিত রোজা রাখিয়া এবং নামাজ পড়িয়া ; আর আল্লাহর প্রেমে এবং তাহার সাধনায় তিনি প্রায় মোহাবিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। এই যুগের এই উৎকর্ষ প্রতিভাকে সুলতান আলাউদ্দীন এক সহস্র তংগার এক ভাতা দিতেন। অপর একজন ছিলেন আমীর হাসান সনজরী, যিনি তাহার রচনায় সহজভাবের জন্য এবং তাহার রচনাশৈলীর শালীনতার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা কমনীয় গীতি কবিতা রচনা করিতেন, এবং একজন মহাকবি ছিলেন এবং তাহাকে হিন্দুস্তানের সাদী বলা হইত। ঐ যুগে তিনি তাহার নৈতিকতার পবিত্রতা এবং সন্তোষে এবং পার্থিব ভোগ বিলাস ত্যাগ এবং তাহার নির্জনতা প্রিয় হইবার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মহা-পবিত্র নিযামুদ্দীন আউলিয়ার, তাহার কবর যেন পবিত্র হয়, শিষ্য এবং

তিনি তাহার শিষ্য থাকিবার সময়ে শেখের নিকট হইতে যে সব বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন সে সব বাণী সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তক সংকলন করেন, এবং এই সংকলনের নামকরণ করেন "ফাওয়ায়েদ উল ফওয়াদ।" তিনি গদ্যে এবং পদ্যে আরও বহু পুস্তক রচনা করেন। সদরুদ্দীন আলী, ফখরুদ্দীন কাওয়াম, হামিদুদ্দীন রাজা, মৌলানা আরিফ, উবেদ হাকিম এবং শিহাব সদর-নশিনও সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের কবি ছিলেন এবং তাহারা এইজন্য ভাতা পাইতেন। ইহাদের প্রত্যেকের একটি বিশেষ ধরনের রচনা পদ্ধতি ছিল। তাহাদের গীতি কবিতাগুলির স কলন তাহাদের উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য এব' শিল্পকলার সাক্ষাৎ দান করে। কতিপয় অতুলনীয় ঐতিহাসিকও ছিলেন। দেবদূতের ন্যায় চিকিৎসকগণের মধ্যে সুদক্ষ চিকিৎসক মৌলানা বদরুদ্দীন দামাশকীর এমন দক্ষতা ছিল যে যদি কেহ তাহার নিকট কোন পাত্রে কতিপয় জন্তুর প্রস্রাব একত্র করিয়া আনিত, তবে তিনি শুধু তাহা দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারিতেন কোন্ কোন্ প্রাণীর প্রস্রাব ইহাতে মিশান হইয়াছে। তিনি অতীন্দ্রিয়বাদের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে এবং তাহাদের পরীক্ষা এবং উদ্ঘাটন সম্বন্ধেও সুদক্ষ ছিলেন। কতিপয় জ্যোতিষী এবং গণৎকার ছিলেন, যাহাদিগকে মনের গোপন তথ্য ফাঁস করিয়া দেওয়ার বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা ব্যক্ত করিবার ব্যাপারে যাদুবিদ্যার ন্যায় সুদক্ষ বলা যাইত। কোরান এবং কবিতা পাঠকের সংখ্যা এবং আনন্দ দানকারী শিল্পের সুদক্ষ চর্চাকারীর এবং অন্যান্য কলাবিদ্যার লোক এত প্রচুর সংখ্যক ছিলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা যায় না।

সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং তাহার সাফল্য এবং আড়ম্বর উচ্চস্তরে উন্নীত হইবার পর, সকল জিনিসই চরম উৎকর্ষে পৌঁছিয়া পতন আরম্ভ হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী এবং প্রত্যেক আরম্ভেরই যেমন একটি শেষ অবশ্যই থাকে তেমনি, তিনি এমন সব কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন যাহার ফলে তাহার সাম্রাজ্যের পতন এবং তাহার মহত্বের ধ্বংস সাধন শুরু হয়। ইহাদের মধ্যে ছিল এই যে তিনি মালিক কাফুর হাজার দিনারীর সৌন্দর্যে তিনি এমন মোহগ্রস্ত এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; ইহার ফলে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কখনও তাহার ইচ্ছা অবহেলা করিতেন না, অথবা কখনও তিনি তাহার উপদেশ তাহা, যতই অবিবেচনা প্রসূত হউক না কেন, তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেন না। অপর একটি ব্যাপার এইরূপ ছিল যে তিনি তাহার তরুণ পুত্রগণকে তাহারা অভিভাবকত্বের তত্ত্বাবধান এবং গভর্ণরগণের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাইবার পূর্বেই হারেম (প্রাসাদের মহিলাগণের অঙ্গন) হইতে বাহির করিয়া দেন; এবং একই সময়ে তাহাদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

খিযির খানের চরিত্রে কোনরূপ সংযমের পরিচয় পাইবার পূর্বেই তিনি তাহাকে একটি চাঁদোয়া প্রদান করেন এবং তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং তিনি তাহার দেখাশোনা করিবার জন্য কোন জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ আমীরকে নিযুক্ত করেন নাই, যিনি প্রথম দিকে তাহাকে ভোগ বিলাস ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতার অতিরিক্ত আসক্তি হইতে বিরত রাখিতে পারিতেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে সুলতান যখন অসুস্থ হইয়া পড়েন তখন তিনি খিযির খানকে এক শিকার ও আমোদ-প্রমোদের ভ্রমণে আমরোহা গমনের অনুমতি প্রদান করেন; আর তাহাকে বলেন যে যখনই তিনি আরোগ্য লাভ করেন তখনই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। খিযির খান শপথ করিয়া এক অঙ্গীকার করেন যে যখনই সুলতান আরোগ্য লাভ করিবেন, তখনই তিনি খালি পায়ে দিল্লীর দরবেশগণের দরগাহে জিয়ারত করিতে আগমন করিবেন। তিনি যখন সুলতানের আরোগ্য লাভের সংবাদ পাইলেন, তখন তাহার প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ জারি হওয়ার পূর্বেই তিনি খালি পায়ে দরগাহ জিয়ারতে দিল্লী আগমন করিলেন। মালিক নায়েব, যাহার মাথায় সাম্রাজ্যলিপ্সা বাসা বাঁধিয়াছিল এবং সুলতানের বংশধরদের ধ্বংস সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, শেষোক্ত জনের নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন যে খিযির খান এক দুষ্ট পরিকল্পনা করিয়াছে; এবং অনুমতি লাভের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিয়াছে এইরূপে তিনি খিযির খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করিতে সুলতানকে প্ররোচিত করেন। কিছুকাল পর সুলতান শোথরোগে আক্রান্ত হন এবং রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে তিনি মালিক নায়েবকে দেওগীর হইতে তলব করিয়া আনেন; আর আলাপ খানকে গুজরাট হইতে তলব করেন। তাহারা রাজধানীতে আগমনের পর প্রথমোক্ত জন শেষোক্ত জনের প্রতি তাহার যে শত্রুতা ছিল, সুলতানকে অসম্ভব কিন্তু সত্য বলিয়া প্রতীয়মান নিবেদন পেশ করিয়া সুলতানকে প্রতারণা করেন এবং তাহার ফাঁসীর নির্দেশ দিবার জন্য সুলতানকে প্ররোচিত করেন। ইহার অল্প পরেই সুলতান ইন্তেকাল করেন।

শ্লোক

কতিপয় শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি গণনা করিয়াছিলেন; আর তিনি ধূলি হইয়া যান
সময় তাহার প্রতি উপহাস করে এবং বলে, তিনিও চলিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন মালিক নায়েব তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তিনি বিশ বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুলতান শিহাবুদ্দীন, সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর কনিষ্ঠতর পুত্র

মালিক নায়েব আমীরগণকে এবং রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীগণকে সুলতান আলা-উদ্দীনের ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় দিনে একত্র ডাকিয়া আনেন; এবং শেষোক্ত জনের এক লেখা প্রদর্শন করেন, যাহাতে লেখা ছিল যে, তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীনকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতেছেন: আর তিনি খিযির খানকে অপসারণ করিয়াছেন। তদনুযায়ী প্রথমোক্ত জনকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় এবং মালিক নায়েব নিজেকে অভিভাবকের কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। প্রথম দিনেই তিনি মালিক সম্বলকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন এবং তাহাকে নির্দেশ দেন যেন খিযির খান এবং তাহার ভ্রাতা শাদী খানের চোখের উপর দিয়া পেন্সিল টানিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার এই কাজের প্রতিদানে বারবক (অনুষ্ঠানাদির কর্মসচিব) পদে নিযুক্ত করিবার অঙ্গীকার করেন। অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাটি এই কাজ গ্রহণ করে এবং আলাউদ্দীনের চোখের এই দুই মণির (অর্থাৎ দুই পুত্রের) চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। খিযির খানের মাতাকে যাহাকে বলা হইত মালকা-ই-জাহান, কারারুদ্ধ করা হয় এব তাহার সমস্ত অর্থ এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী এমনকি তাহার স্বর্ণসহ, সব কিছুই তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়া হয়। শাহজাদা মুবারক খানকে, যিনি পরে সুলতান কুতবুদ্দীন হইয়াছিলেন, তাহার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। মালিক নায়েব তাহাকেও অন্ধ করিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু নিয়তির বিধান অন্যরূপ, তাহাকে তাহার এই শয়তানী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রতিদিন তিনি অতি অল্পক্ষণের জন্য শিশু সুলতান শিহাবুদ্দীনকে হাজার সাতুন (সহস্র স্তম্ভের) প্রাসাদের সমতল ছাদে আনয়ন করিতেন এবং তথায় সিংহাসনে বসাইতেন এবং আমীরগণ, পদস্থ কর্মচারীগণ, গৃহাধ্যক্ষগণ এবং আবাহকগণকে সারিবদ্ধভাবে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে নির্দেশ দিতেন। দরবার সম্পন্ন হইলে, শিশু সুলতানকে হারেমে তাহার মাতার নিকট প্রেরণ করা হইত। অতঃপর মালিক কাফুর প্রাসাদের সমতল স্থানে তিনি যে মঞ্চ তৈরী করিয়াছিলেন তথায় গমন করিতেন এবং তথায় তাহার বিশ্বস্ত কতিপয় খোজার সঙ্গে তুরি[১] (যাহা অনেকটা ছক্কা খেলার মত) নামক খেলা খেলিতেন, এবং তিনি সর্বদাই তাহার বিশেষ বন্ধুদের সঙ্গে কি করিয়া সুলতান আলাউদ্দীনের বংশধর ধ্বংস করা যায় তাহার ষড়যন্ত্র

১: খেলাটির নাম বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন বেজমুরাই, সেরহিল, পারওয়ানী তুরি।

করিতেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে হাজার সাতুনের পাহারাদার এক দল পুরাতন পাইকগণ, সুলতান আলাউদ্দীনের ইন্তেকালের ঠিক পঁয়ত্রিশ দিন পর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং এক রাত্রিতে লোকেরা রাজকীয় প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে দরজা তালা বন্ধ হইবার পর মঞ্চে প্রবেশ করে এবং মালিক নায়েব এবং তাহার সঙ্গীগণকে হত্যা করে।

শ্লোক

তুমি যদি অন্যায় করিয়া থাক, তবে ন্যায়ের আশা করিও না;
কারণ কখনও তেতুল গাছে আঙ্গুর ফল ফলে না।
তুমি যদি শরৎকালে বালি বুনিয়া থাক
ফসল কাটিবার সময় ভাল গম পাইবার আশা করিও না।

তাহারা শাহযাদা মুবারক খানকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনে এবং তাহাকে মালিক নায়েবের স্থলে সুলতান শিহাবুদ্দীনের অভিভাবক নিযুক্ত করে। মুবারক খান কিছুকাল অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনে মনোযোগ দিয়া আমীর এবং মালিকগণকে নিজের পক্ষে আনয়ন করেন। যখন দুই মাস গত হয়, তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুলতান কুতবুদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সুলতান শিহাবুদ্দীনকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন। যে পাইকগণ মালিক নায়েবকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের হৃদয় অহমিকা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকেও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন এবং সন্নিকটস্থ বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেন; আর তিনি তাহাদের প্রধানগণকে, যাহারা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ফাঁসী দেন।

শ্লোক

যে আগাছা হইতে কাহারও গায়ে কাঁটা বিধে,
সেই আগাছাতে অগ্নি সংযোগ করা উচিত।

যে সময়ে সুলতান আলাউদ্দীনের বংশধরগণকে ধ্বংস করা হইতেছিল এবং তাহার সন্তানদের হত্যা করা হইতেছিল, তখন তাহারা শেখ বসির দেওয়ানকে, যিনি ছিলেন নিময়দের একজন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে প্রভু, ইহা কি ঘটিতেছে"? তিনি বলিলেন: "যেহেতু আলাউদ্দীন তাহার চাচা এবং উপকারীর সন্তানদের ধ্বংস করিয়াছিলেন, তেমনি তাহার ব্যাপারেও ঐ রূপই ঘটিতেছে।"

শ্লোক

ভাল প্রতিদানে ভাল, মন্দের প্রতিদানে মন্দ, হিসাব এইরূপই হয়
প্রতিটি কাজ যাহা সম্পন্ন করা হয়, বিশ্ব জগৎ তাহার প্রতিদান দেয়।

তাহার শাসনকাল তিন মাস কয়েক দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

সুলতান কুতবুদ্দীন মুবারক শাহ, সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর পুত্র

আঃ হিঃ ৭৭১ সনে[1] যখন সুলতান কুতবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি হস্তীপালক মালিক দিনারকে যাফর খান উপাধি দান করেন; আর তাহার নিজের চাচা মুহম্মদ মৌলাইকে দেন শের খান উপাধি, এবং হস্তলিখনবিদ, মৌলানা বাহাউদ্দীনের পুত্র মৌলানা যিয়াউদ্দীনকে দেন সদর জাহান উপাধি। তিনি মালিক করা বেগকে তাহার নিকটে থাকিবার অনুমতি দান করিয়া তাহাকে সম্মানিত করেন; আর তিনি আমীরগণের প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী উচ্চপদগুলি তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। সুলতান আলাউদ্দীনের নায়েব খান হাজিব মালিক শাদী কর্তৃক আনীত একজন তরুণ পরওয়ারীকে[2] তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং তাহাকে খুসরু খান উপাধি দান করেন। শ্রমজীবি শ্রেণীর এক সম্প্রদায়ের নাম পরওয়ারী। গুজরাটে ইহাদিগকে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। সুলতান এই লোকটির প্রতি যে মহা আকর্ষণ অনুভব করিতেন, তাহার ফলে তিনি মালিক শাদীর সম্পূর্ণ অনুচরদের তিনি তাহাকে প্রদান করেন, আর যেহেতু তিনি তাহার প্রতি পাগল প্রায় মোহাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি তাহাকে উযির পদে নিযুক্ত করেন, যদিও এই পদের যোগ্যতা তাহার মধ্যে ছিল না।

---

১. এই তারিখটি ভুল। যিয়া-ই-বার্ণী আঃ হিঃ ৭১৭ সনে সুলতান কুতবুদ্দীন মুবারক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া বলেন এবং নিযামুদ্দীন এবং বদাওনী এবং ফিরিশতা তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। সঠিক তারিখটি হইবে আঃ হিঃ ৭১৬। ইহা আমীর খসরুর মসনভীতে দেওয়া আছে। তারিখ-ই-মুবারকশাহীতে সুনির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হইয়াছে আঃ হিঃ ৭১৬ সনের ২০ই মহরম।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন পরওয়ায, বরাও বা পরাও। ইলিয়টে এবং টমাসে নামটি পরওয়ারী দেওয়া আছে। পরওয়ারীগণ নিম্ন শ্রেণীর লোক, সাধারণতঃ ইহাদিগকে পাহারাদার, রাজরক্ষক, ভারবাহক ইত্যাদি কাজে নিয়োগ করা হইত।

শ্লোক

তুমি যদি কোন সুসজ্জিত সাম্রাজ্যের ভাল চাও
তবে সদ্য উত্থিত কাহারও প্রতি গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিও না।
তুমি যদি তোমার মহত্ব নষ্ট করিতে না চাও
যে কখনও কাজ করে নাই তাহাকে শক্ত কাজ প্রদান করিও না।

তিনি এমনভাবে তাহার প্রতি মোহাচ্ছন্ন হন যে তিনি এক মুহূর্তও তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারিতেন না।

সংক্ষেপে, সুলতান আলাউদ্দীনের ইন্তেকালের পর যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল, সুলতান কুতবুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের পর তাহা দমন করা হয়; আর লোকের মধ্যে শান্তি ও সন্তোষ দেখা দেয়। নূতন সুলতান যেহেতু তরুণ এবং উত্তম স্বভাবের এবং দয়ালু ছিলেন এবং কারাগারে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তিনি তাহার রাজত্বের প্রথম দিনেই কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্তিদান করিয়া এবং নির্বাসিত ব্যক্তিদের নির্বাসন দণ্ড বাতিল করিয়া নির্দেশ জারি করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সকলকে ছয় মাসের বেতনের সমান অর্থ পুরস্কার দান করেন এবং আমীর এবং মালিকগণের ভাতা বৃদ্ধি করেন। তিনি এক নির্দেশ জারি করেন যে, সকল আবেদনকারীর দরখাস্ত তাহার নিকট পেশ করিতে হইবে, এই প্রথা বহু দিন হইতেই রহিত হইয়া গিয়াছিল, আর তিনি ঐ সব দরখাস্তের প্রার্থনা এবং অনুরোধ অনুযায়ী নির্দেশ জারি করিতেন। তিনি ওলেমা, ধার্মিক এবং অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের ভাতা ও বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেন। সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে যে সব মৌজা রাজকীয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, সেগুলি তিনি তাহাদের মালিকগণকে ফেরৎ দেন, আর তাহাদের পকেটে পুনরায় দিরাম এবং দিনার জমা হইতে থাকে। তেমনিভাবে সুলতান আলাউদ্দীন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া যে সব নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেগুলির সবই বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। যদিও প্রকাশ্যে মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল, তবু ব্যভিচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অপরাধ, এবং অসংযত জীবনযাত্রা এবং লাম্পট্য, যেগুলি সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি লোকের মধ্যে পুনরায় দেখা দেয়। যে চারি বৎসর চারি মাস কাল সুলতান কুতবুদ্দীনের রাজত্বকাল বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি তাহার সম্পূর্ণ সময় অসংযত জীবনযাত্রা এবং তাহার কামনা চরিতার্থ করা এবং অপরিমিত উপহার দান ছাড়া আর কোন কাজ করেন নাই। এই সময়ের মধ্যে সুলতানের কষ্ট বা অসুবিধা হইবার মত কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নাই, অথবা লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করিবার মত কোন দুর্ঘটনাও ঘটে নাই।

যেহেতু ইহার পূর্বেই সুলতান আলাউদ্দীন আলপ খানকে গুজরাট হইতে তলব করিয়া আনিয়াছিলেন এবং ইহার পর তথায় বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ দেখা দেয়, এই-গুলি দখল করিবার জন্য মালিক কামালুদ্দীনকে তথায় প্রেরণ করা হয়; কিন্তু তিনি তথায় পৌঁছিয়াই শহীদ হন।[১] ইহার ফলে বিদ্রোহীগণ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে। সুলতান কুতবুদ্দীন গুজরাটের বিদ্রোহ দমনকে তাহার সর্বাপেক্ষা জরুরী কর্তব্যরূপে গণ্য করেন এবং এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ আইনুল হক মুলতানীকে ঐ প্রদেশে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছেন; যে সব লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাদের বিধ্বস্ত করেন; এবং নহরওয়ালা এবং ঐ প্রদেশের সবগুলি শহর পুনরায় আয়ত্ত্বাধীনে আনয়ন করেন; আর জমিদারগণকে দমন করেন এবং অনুগত হইতে বাধ্য করেন। ইহার পর সুলতান কুতবুদ্দীন মালিক দিনারের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাহাকে যাফর খান উপাধি দান করিয়া গুজরাটে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া তিন বা চারি মাসের মধ্যেই ঐ প্রদেশটিকে সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলাকারীদের কাঁটা মুক্ত করেন। তিনি প্রদেশের রাজা এবং জমিদারদের নিকট হইতে প্রচুর স্বর্ণ আদায় করেন এবং তাহা কোষাগারে প্রেরণ করেন।

সুলতান আলাউদ্দীনের ইন্তেকালের পর রাম দেও-এর জামাতা হরপাল দেও[২] দেওগীর দেশটি দখল করেন। সুলতান কুতবুদ্দীন তাহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তাহার সেনাবাহিনীসহ ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন; এবং তাহার অবর্তমানে তিনি এক ক্রীতদাসের পুত্র শাহীনকে, যাহাকে বাউলদা বলা হইত, ওয়াফা-ই মুলক উপাধি দান করিয়া তাহাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। এইরূপ করিবার পর তিনি দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন দেওগীরের সন্নিকটে উপস্থিত হন, তখন হরপাল দেও এবং অন্যান্য যে সব জমিদার একত্র হইয়াছিলেন তাহারা তাহাকে বাধা দিতে অপারগ হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যান। সুলতান স্বল্প-কালের জন্য দেওগীরে অবস্থান করেন এবং কতিপয় খ্যাতনামা আমীর এবং মহা-খানদের হরপালের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা তাহাদের প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং হরপাল দেওকে বন্দী করিয়া আনেন। সুলতান কুতবুদ্দীনের নির্দেশে তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় তাহার চামড়া ছাড়াইয়া নেওয়া হয় এবং দেওগীরের

১. যিয়া-ই-বার্ণীর মতে গুজরাটে আলপ খানের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কামালুদ্দীন গর্গকে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু বিদ্রোহীগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন।

২. ইলিয়ট উল্লেখ করা হইয়াছে যে হরপাল দেও এবং রাম দেও দেওগীর অধিকার করেন, কিন্তু তবকাত-ই-আকবরীর মতে রাম দেও-এর জামাতা হরপাল দেও তাহা দখল করেন।

প্রবেশ দ্বারে তাহার শির ঝুলাইয়া রাখা হয়। সুলতান কিছুকাল তথায় বিলম্ব[১] করেন; আর ঐ সময়ের মধ্যে মারাঠা দেশটিও আয়ত্তাধীনে আনয়ন করা হয়। দেওগীর দেশটি আলাই ক্রীতদাসগণের একজন মালিক ইয়াখলাখীকে প্রদান করা হয় আর মারহাটা আমীরগণের মধ্যে জায়গীররূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়; অতঃপর খুসরু খানকে একটি চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ উপহার দেওয়া হয় এবং মা'বারে যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়, তাহাকে তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়; আর সুলতান স্বয়ং দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি মদ্যপান এবং অসংযত জীবনযাত্রায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে সুলতান কুতবুদ্দীনের মহা অমনোযোগীতা এবং অবহেলার ফলে এবং তাহার সর্বদা মদ্যপানে আসক্ত থাকিবার ফলে, সুলতান আলাউদ্দীনের চাচাত ভাই মালিক আসাদুদ্দীনের মাথায় রাজ্য শাসনের কল্পনা প্রবেশ করে এবং তিনি সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনাপতির সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং স্থির করেন যে সুলতান ঘাটি সাগুন অতিক্রম করিবার পর যখন হারেমে গমন করিবেন, যে সময়ে তাহার নিকট কোন পাইক অথবা অন্য কোন দেহরক্ষী থাকিবে না, তখন তাহারা হারেমে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে ঠিক ঐ রাত্রেই যখন সুলতান ঘাটি সাগুন অতিক্রম করিবেন, ষড়যন্ত্রকারীদের একজন সুলতানের নিকট সব কথা ফাঁস করিয়া দেন। সুলতান যে স্থানে ছিলেন তথায়ই থাকিয়া যান এবং মালিক আসাদুদ্দীনকে বন্দী করিয়া ফাঁসী দিবার নির্দেশ দেন; আর ইয়াঘর্শ খানের (মালিক আসাদুদ্দীনের পিতা) দিল্লীতে অবস্থিত উনত্রিশজন পুত্রকে, যাহারা এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, এবং যাহাদের কিছু সংখ্যক ছিলেন একেবারেই কম বয়স্ক, তাহাদের সকলকে সুলতানের নির্দেশে হত্যা করা হয়। সুলতান যখন ঝাইন-এ উপস্থিত হন তখন তিনি রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি শাদী খানকে গোয়ালিয়রে প্রেরণ করেন, যাহাতে তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্রগণ খিযির খান, শাদী খান এবং মালিক শিহাবুদ্দীনকে, যাহাদের ইতিপূর্বেই অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, হত্যা করিতে পারেন; এবং তাহাদের পরিবার এবং সন্তানদের দিল্লী নিয়া যাইতে পারেন। সুলতান কুতবুদ্দীন সর্বদা শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়া আল আজীজের (তাহার কবর যেন পবিত্র হয়) প্রতি দুর্ব্যবহার

১. এই পুস্তকে এই বিলম্বের কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। শুধু এইটুকুই বলা হইয়াছে যে, এই বিলম্ব করা হয় باز ماندگی জন্য, যাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে প্রস্তুতির অভাবে; কিন্তু তারিখ-ই-ফিরোয শাহীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বর্ষাকাল শুরু হইয়া যাওয়ার ফলে বিলম্ব করা হয়।

করিতেন, কারণ খিযির খান তাহার শিষ্য ছিলেন এবং সর্বদাই তাহার একজন শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে পরিচিত ছিলেন; আর তিনি সর্বদাই তাহার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করিতেন; আর তাহার প্রতি বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করিতেন।

শ্লোক

আল্লাহ্ যখন কাহারও উপর লজ্জা ও অপমান আনিতে ইচ্ছা করেন
তখন তিনি তাহার দ্বারা সৎ লোকের মন্দ বলান
আর তিনি যখন কাহারও মন্দ ঢাকিতে চান
ঐ লোকের দ্বারা তিনি অন্যের পাপ ঢাকিয়া দেন।

সুলতান কুতবুদ্দীন যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং গুজরাট এবং দিল্লী এবং সমস্ত দেশটি আয়ত্বাধীনে দেখিতে পান এবং দেখেন যে সমস্ত আমীর এবং মালিকই তাহার প্রতি বিনীত, অনুগত এবং বাধ্য আছেন এবং সি হাসনের আর কোন দাবীদার অবশিষ্ট নাই, তখন সুরা, যৌবন এবং ক্ষমতার মাদকতা তাহার হৃদয়ে অহমিকার সৃষ্টি করে এবং তিনি নির্দেশ জারি করিতে অথবা রাষ্ট্রীয় কর্ম সম্পাদন করিতে কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিতে অস্বীকার করেন; অথবা তিনি কোন আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা শুনিতেন না। যদি কেহ তাহার খেদমত করিবার ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া তাহার নিকট কোন কিছু নিবেদন করিতেন, আর তাহা যদি তাহার নিজের মতানুযায়ী না হয় তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বাতিল করিয়া দিতেন এবং পরামর্শদাতার প্রতি উপহাস এবং তিরস্কারের ভাষার বন্যা বহাইয়া দিতেন; ফলে কেহই আকার ইঙ্গিতেও তাহার মঙ্গল হইবে এমন কোন কথা তাহাকে বলিতে সাহস পাইতেন না। তাহার সকল সৎগুণগুলি মন্দ স্বভাবে পরিণত হয়; আর তিনি বল প্রয়োগ এবং নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পিতার ন্যায় তিনি অন্যায়ভাবে তাহার হস্ত রক্তরঞ্জিত করিতে থাকেন। অন্যান্যদের মধ্যে তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা যাফর খানের হত্যার নির্দেশ দেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার একজন খুঁটি স্বরূপ, যদিও তিনি কোন প্রকারেই কোন অপরাধ করেন নাই। ইহার পর তিনি শাহীনকে, যাহাকে তিনি ওয়াফা-ই মুলক উপাধি দান করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ বিনাদোষে শুধুমাত্র ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্ররোচনায়, হত্যার নির্দেশ দান করেন; তিনি অন্যান্য এমন সব কাজ করিতে আরম্ভ করেন, যেগুলি শুধুমাত্র তাহার ক্ষমতা খর্ব করিতে এবং তাহার সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে থাকে। তিনি প্রায়ই নিজেকে মহিলাদের সাজ পোশাক এবং অলংকারে সজ্জিত করিতেন; আর ঐ বেশে তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। তিনি সহস্র

প্রাসাদের সমতল ছাদে অশ্লীল এবং দুষ্টা রমণীদের ডাকিয়া আনিয়া তাহা-দিগকে মহা-ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ক্ষমতাশালী আমীরগণকে যেমন আইনুল মুলক মুলতানী এবং মালিক করা বেগ, যিনি চৌদ্দটি পদ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ন্যায় অন্যান্যদের, ব্যবহার করিতে এবং তাহাদিকে অশ্লীল হাসি ঠাট্টা দ্বারা অপমান করিতে হুকুম দিতেন। তিনি তাহাদিগকে অন্যান্য অশ্লীল কাজ করিতেও বলিতেন, ফলে তাহারা লোকের সম্মুখে প্রায় উলংগ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইত এব তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কলুষিত করিয়া দিত। সুলতান কুতবুদ্দীনের শ্রদ্ধেয় শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি যে শত্রুতা ছিল, তাহার ফলে তিনি লোককে তাহার নিকটে গমনে বাধা দিতেন এবং তাহার প্রতি অসম্মানজনক এবং অপমানকর ভাষা প্রয়োগ করিতেন। শেখের শত্রুদের একজন শেখযাদা জামকেও তিনি তাহার নিকটে গমনের বিশেষ সুবিধা দান করিয়া সম্মানিত করেন এবং শেখের প্রতি তাহার ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য তিনি মুলতান হইতে শেখ রুকনুদ্দীন মুলতানীকে আনয়ন করেন।

যাফর খানকে হত্যার নির্দেশ দিবার পর তিনি খুসরু খানের মাতার দিক হইতে তাহার ভ্রাতা হিসামুদ্দীনকে, বেশ কিছু সংখ্যক আমীর এবং মালিকসহ প্রেরণ করেন এবং যাফর খানের সমস্ত অনুচরদের তাহাকে প্রদান করেন। তিনি যখন গুজরাটে উপস্থিত হন, তখন তিনি সকল বরাওসদের (বা পরওয়ারীদের) সংগ্রহ করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার মনস্থ করেন; কিন্তু তাহার সঙ্গে যে আমীরগণ ছিলেন তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং তাহাকে সুলতান কুতবুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন কিন্তু তাহার ভ্রাতা খুসরু খানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দেন, আর তাহাকে রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সম্মানিত করেন। আমীরগণের এবং রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মচারীদের তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার এবং ভীত হইবার ইহাও একটি কারণ। মালিক ওয়াহিদুদ্দীন কুরেশী, তাহার সাহসিকতা এবং দক্ষতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে হিসামুদ্দী-নের স্থলে গুজরাটে প্রেরণ করা হয়; আর তিনি ঐ প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন; হিসামুদ্দীন এই প্রদেশটিকে বিশৃঙ্খল এবং ধ্বংস-প্রায় অবস্থায় রাখিয়া গিয়া-ছিলেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে দেওগীরের গভর্ণর মালিক ইয়াখলাখী শত্রুতার পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন; আর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন; সুলতান ইয়াখলাখীর ধ্বংস সাধনের জন্য এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ বহু সংখ্যক মহা-আমীরকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তথায় গমন করিলেন এবং সুকৌশলে মালিক ইয়াখলাখীকে এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের, যাহারা এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বন্দী করিলেন এবং তাহাদিগকে দিল্লী আনয়ন করিলেন। সুলতান মালিক ইয়াখলাখীর নাক

ও কান কাটিয়া দিবার নির্দেশ দান করিলেন এবং তাহার সঙ্গীগণকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দান করিলেন। অতঃপর মালিক আইনুল হক মুলতানীকে দেওগীর প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল আর মুন্সী খাজা আলাউদ্দীনের পুত্র মালিক তাজুদ্দীনকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করা হইল, এবং তাহাদিগকে ঐ প্রদেশে প্রেরণ করা হইল। ইহার পর মালিক ওয়াহিদুদ্দীনকে গুজরাট হইতে তলব করিয়া আনা হইল এবং তাহাকে উযির পদে নিযুক্ত করা হইল এবং তাজুল-মুলক উপাধি দান করা হইল।

খুসরু খানকে মা'বার গমনের জন্য মনোনীত করা হইলে তিনি যখন তথায় গমন করিলেন তখন তিনি দেখিতে পান যে ঐ প্রদেশের রায়গণ তাহাদের ধনসম্পদ ও মূল্যবান সামগ্রীসহ পলায়ন করিয়াছেন। তাহারা যে একশতের বেশী হস্তী ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেগুলিকে হস্তগত করেন। খাজা তাকি নামে একজন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, যেহেতু যে সেনাবাহিনী আগমন করিতেছে তাহা মুসলমান বাহিনী, সুতরাং ইহা কোন প্রকারেই তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। এই বিশ্বাসের ফলে তিনি পলায়ন করেন নাই। তাহাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার নিকট হইতে সমস্ত সম্পত্তি ছিনাইয়া নেওয়া হয় এবং তৎপর তাহাকে হত্যা করা হয়, খুসরু খান বর্ষাকাল তথায় অতিবাহিত করেন এবং নীচতা এবং অপরিণামদর্শীতার ফলে, যাহা তাহার চরিত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল, তাহার মাথায় বিদ্রোহ করিবার পরিকল্পনা উদিত হয়, ফলে তিনি তাহার সঙ্গে যে আমীরগণ ছিলেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়া মা'বারে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের দৃঢ় সংকল্প করেন। চন্দেরীর গভর্ণর মালিক তমর, মালিক মাল আফঘান এবং মালিক তালবাগাহ ইয়াঘদাহ, যাহারা প্রধান আমীর ছিলেন, এবং যাহাদিগকে মা'বারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, খুসরু খানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন; এবং তাহাকে কোনরূপ সংবাদ না দিয়াই দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কিন্তু আমীরদের ভয় দেখানোর ভাষা প্রয়োগে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং অবিরাম পথ চলিতে লাগিলেন। পূর্বোল্লেখিত আমীরগণ তাহাকে একটি পাল্কীতে চড়াইলেন এবং তাহাকে সাত দিনের মধ্যে দেওগীর হইতে দিল্লী প্রেরণ করিলেন।[১] তাহারা বোকার মত মনে করিলেন যে

১. আমীরদের যে ব্যবহারের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বলা হইয়াছে যে তাহারা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল (সম্ভবতঃ খুসরু খানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুলতানকে অবহিত করিবার জন্য) তবু তাহারা তাহাকে আগে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার কথা সুলতানকে আগে নিবেদন করিবার জন্য। ইহা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। যিয়া-ই-বার্ণী এ সম্বন্ধে ভিন্নরূপ এবং অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বিবরণ দিয়াছেন। তাহার মতে অন্যান্য আমীরগণ খুসরু খানকে দিল্লী যাইতে বাধ্য করে, যাহাতে তিনি তাহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে না পারেন। সুলতান কিন্তু তাহার প্রতি এত আসক্ত ছিলেন এবং তাহাকে দেখিবার জন্য এত অধীর হইয়াছিলেন যে তিনি তাহাকে নিবার জন্য একটি পাল্কী প্রেরণ করেন এবং সেই পাল্কীতে তিনি সাত বা আট দিনের মধ্যে দেবগীর হইতে দিল্লী পৌঁছেন।

যেহেতু তাহারা তাহার মঙ্গলের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, ফলে তাহারা তাহার নিকট হইতে বহু অনুগ্রহ লাভ করিলেন ; কিন্তু খুসরু খান যখন রাজকীয় দরবারে পৌঁছিলেন এবং এক গোপন সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন তখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ পেশ করিলেন ; আর বলিলেন, "তাহারা আমার বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং বিদ্রোহ করিবার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে এবং আমার মৃত্যুদণ্ড দানের নির্দেশ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে ; কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ভিন্নরূপ. আমি নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করিয়া তাহাদের কবল হইতে পলায়ন করিয়াছি।" সুলতান তাহাকে ভালবাসিতেন, এবং তাহার প্রতি পাগলের ন্যায় আসক্ত ছিলেন, ফলে তাহার মিথ্যা কথাগুলিকে সত্য বলিয়া গণ্য করিলেন এবং আমীরগণের প্রতি বিরক্ত হইলেন : আর তাহারা যখন দিল্লীতে আগমন করিলেন, যদিও তাহারা খুসরু খানের শয়তানী পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করিলেন, তবু তাহাতে কোন ফল হইল না। সুলতান একজন অত্যাচারীর ন্যায় কাজ করিলেন তাহাদের সর্বপ্রকার নিবেদন বাতিল করিয়া দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে মালিক তমরকে আনুগত্য প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না ; আর চন্দেরীর শাসনভার তাহার নিকট হইতে নিয়া তাহার পুত্রকে দেওয়া হইল।[১] তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে মালিক তলবাগাহ ইয়াগদাহকে তাহার মুখে আঘাত করিতে হইবে ; তাহার জায়গীর তাহার নিকট হইতে নিয়া নেওয়া হয় এবং তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। সাক্ষীদিগকেও শাস্তি দেওয়া হয়। অন্যান্য আমীরগণ যখন সুলতানের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহারাও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন আর যদিও তাহারা খুসরু খানের প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবগত ছিলেন, তবু তাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিলেন এবং একটি কথাও মুখ হইতে বাহির করিলেন না আর অপর দিকে নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায়তার ফলে, তাহারা নিজদিগকে তাহার ছত্রছায়ায় নিক্ষেপ করিলেন।

শ্লোক

নিয়তি যখন শয়তান ও দুরাত্মাকে সমস্ত ক্ষমতা দান করে
হায় ! তখন ইহা পৃথিবীর সম্পদকে ধ্বংস করিয়া দেয় ;

[১] ফিরূ-ই-বার্ণীর মতে চন্দেরী মালিক তমরের পুত্রকে দেওয়া হয় নাই, ঐ পরওয়ারী বালকটিকেই দেওয়া হয়, অর্থাৎ খুসরু খানকেই তাহা দেওয়া হয়। মালিক তলবাগাহ ইয়াগদাহকে ঐ লেখকের মত অনুযায়ী অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার মুখে আঘাত করা হয় ইত্যাদি।

ক্ষমতাবানের সিংহাসন নীচজনের হস্তগত হয়
অবলোকন কর ! ইহার সর্বশেষ পরিণতি কি হয় ।

খুসরু খান যখন তাহার শত্রুগণকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হইতে দেখিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের কেহই তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা সুলতানকে বলিতে সাহস পাইবে না, তখন তিনি তাহার প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার পথে অগ্রসর হইবার জন্য পূর্বের চেয়ে অধিকতর শক্ত করিয়া আট ঘাট বাঁধিয়া লইলেন ; এবং রাজমুকুট লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। একদিন তিনি গোপনে সুলতানের নিকট এইরূপ কথা বলিলেন : "মহান সম্রাট যখন আমার প্রতি আপনার বিশেষ করুণার ফলে আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়া দূরবর্তী প্রদেশসমূহে ঐগুলি জয় করিতে প্রেরণ করেন, তখন আমার সঙ্গে যে আমীরগণকে দেওয়া হয়, তাহাদের সঙ্গে তাহাদের নিজের গোত্র এবং উপজাতির অনুচরের সংখ্যা অধিক থাকে (আমার চেয়ে) ; ফলে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকট অবনত থাকিতে হয়। গুজরাটে আমার উপজাতি এবং গোত্রের বহু বরাও আছে। সম্রাট যদি অনুমতি দান করেন, তবে আমি তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে পারি এবং এইরূপে একজন প্রতিষ্ঠাবান লোকে পরিণত হইতে পারি।" সুলতান তাহার অনুরোধে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে তাহার উপজাতির লোকদের আনয়ন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর খুসরু খান অল্প কালের মধ্যেই বিরাট একদল বরাও সংগ্রহ করিয়া লইলেন ; আর তাহার ক্ষমতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি তাহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পূর্বের চেয়ে অধিকতর অধ্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন। সুলতানের মুন্সি বাহাউদ্দীনকে[১] সুলতান বরখাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে তাহার বন্ধুতে পরিণত করেন এবং একজন দোসর করিয়া নেন ; আর তিনি অন্যান্য দুর্দান্ত লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন যেমন কুরাহ্-ই-কিমারের পুত্র এবং ইউসুফ সুফি এবং অনুরূপ অন্যান্য লোক ; এবং সুযোগের অপেক্ষা থাকেন। এই সময়ে সুলতান এক শিকার অভিযানে সরসাওয়াহ অভিমুখে গমন করেন। খুসরু খান এবং বরাওগণ তাহাকে ঐ স্থানে হত্যা করিবার সংকল্প করে। কুরাহ্-ই-কিমারের পুত্র এবং ইউসুফ সুফি ইহা নিষেধ করে এবং বলে, 'মনে করুন সুলতান যখন শিকার করিতে যান তখন আমরা তাহাকে হত্যা করিতে সক্ষম হই ; ইহা খুবই সম্ভব যে তাহার সঙ্গে যে সেনাদল থাকিবে তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে এবং হত্যা করিবে। সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে, সুলতান যখন হাজার সাতুনের সমতল ছাদে থাকিবেন, আর

১. তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী অনুযায়ী সুলতান একটি বস্ত্রের ব্যাপারে তাহার সঙ্গে কলহ করেন।

তথায় তাহাকে একাকী পাওয়া সর্বদাই সম্ভব হইত। ঐ সময়ে আমরা সহসা তাহাকে আক্রমণ করিব এবং হত্যা করিব ; আর আমীরগণকে তাহাদের গৃহ হইতে তলব করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে প্রতিভু রাখিব। তাহারা যদি আমাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে তবে ভাল, নতুবা তাহাদিগকেও আমরা হত্যা করিতে পারিব।"

সুলতান যখন শিকার অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি তাহার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পুনরায় নিজেকে মদ্যপান এবং অসংযত জীবনযাত্রা নির্বাহে নিয়োজিত করিলেন।

শ্লোক

আনন্দিত চিত্তে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন,
বন জঙ্গল হইতে ভোজ উৎসবে ফিরিয়া আসিলেন,
বিদ্বেষপরায়ণ ভাগ্যের প্রতি দৃকপাত করিলেন না,
ইহাতে তাহার জন্য কি জমা আছে জানিলেন না।

খুসরু খান তাহার উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং এক রাত্রে তাহারা যখন উভয়ে একাকী ছিলেন, তখন তিনি সুলতানকে বলিলেন : "আমি সর্বদাই সুলতানের পরিচর্যা করি এবং বহু রাত্রি আমি তিশখানায় যাপন করি। আমার কতিপয় আত্মীয় গুজরাট হইতে মহান সম্রাটের দয়ার অংশ গ্রহণের আশা করিয়া আসিয়াছে। তাহারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু প্রাসাদের দ্বাররক্ষীগণ তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। সম্রাট যদি অনুমতি করেন, তবে তাহারা প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে।" অতঃপর সম্রাট নির্দেশ দিলেন যে প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারের চাবি যেন খুসরু খানকে প্রদান করা হয়। সুলতান তাহাকে বলিলেন : "আমি তোমাকে এবং তোমার ভ্রাতাগণকে যেরূপ বিশ্বাস করি, আর কে আছে যে আমি তাহাকে সেরূপ বিশ্বাস করি? প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাসাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তোমার উপরই ন্যস্ত।" খুসরু খান তাহার নিকট চাবি প্রদানকে শুভলক্ষণের প্রতীকরূপে গণ্য করিলেন এবং ইহাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর ব্যবহাররূপে মনে করিলেন ; আর তাহার সকল পরিকল্পনার সাফল্য প্রত্যক্ষ করিলেন।

শ্লোক

যিস্মোষ যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন
ঐ লক্ষণকে বিজয়ের প্রতীক গণ্য করিলেন ;

ঐ শুভলক্ষণের চিহ্ন দেখিয়া তাহার হৃদয়
যদিও শক্ত ছিল, নব শক্তি সংগ্রহ করিল।

সংক্ষেপে, যখন প্রবেশ দ্বার এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রাসাদ বরাওদের আয়ত্তে আসিল, ঐ অপরিণামদর্শী এবং রক্তপিপাসু দলটি অস্ত্রশস্ত্রসহ অধিক সংখ্যায় আগমন করিল এবং দিন রাত্রি খুসরু খানের দখলের নিম্নের অংশটিতে আসিয়া জমায়েত হইল এবং সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে খুসরু খানের পরিকল্পনা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; কিন্তু প্রত্যেকেই জানিত যে এই অবস্থার সর্বময় কর্তা তিনি স্বয়ং; আর তাহারা সম্পূর্ণ অসহায়। কেহই একটি কথা বলিতে সাহস পাইল না। একদিন কাযি যয়নুদ্দীন, যাহার উপাধি ছিল কাযি খান, এবং একজন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন এবং একজন কর্মদক্ষ লোক ছিলেন, আর যিনি হস্তলিখন সম্বন্ধে সুলতানের শিক্ষক ছিলেন, স্থির করিলেন যে প্রয়োজন হইলে তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিবেন; আর দেশের এবং জনসাধারণের মঙ্গল নিজের মঙ্গলের উর্ধে স্থান দিয়া এইরূপে সুলতানকে সম্বোধন করিলেনঃ—

শ্লোক

"হে শক্তিমান সুলতান! জ্ঞান যেন সর্বদা তোমার পথ প্রদর্শন করে,
জয় যেন তোমার বন্ধু হয়! আর তোমার শত্রু যেন সব ধ্বংস হয়!
পৃথিবীর প্রভু আর সমস্ত সৃষ্ট জীবের আশ্রয় স্থল;
তোমাকে রক্ষা করে! হে বিশ্ব বিজয়ী সুলতান।

আমরা যাহারা মহান সম্রাট এবং আপনার পিতার দ্বারা লালিত হইয়াছি, আর মহান সম্রাটের মঙ্গল সাধনেই আমরা জনসাধারণের নিরাপত্তা দেখিতেছি, আমরা যদি আপনাকে সত্য কথা বলিতে অবহেলা করি বা বাদ দেই, তবে আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিব। আল্লার সৃষ্ট জীবের প্রতি অন্যায় করিব এবং আপনার প্রতি অন্যায় করিব।" অতঃপর তিনি খুসরু খানের অসঙ্গত উচ্চাভিলাষ এবং দুষ্ট পরিকল্পনা অসংখ্য বরাওদের কার্যকলাপ এবং প্রতি রাত্রিতে তাহাদের খুসরু খানের কামরাসমূহে সমাবেশ ইত্যাদির বিবরণ দিলেন, এবং বলিলেনঃ "সম্রাটের উচিত এই ব্যাপারের তদন্ত করা; কারণ ইহা সত্য যে সুলতানের নিজেকে রক্ষা করা সুলতানের অবশ্য কর্তব্য; আর যদি ইহা মিথ্যা হয় তবে সুলতান খুসরু খান এবং তাহার ভ্রাতাগণের প্রতি আর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন।" কাযির এইসব কথাতেও কোন কাজ হইল না, এবং কোন সুফল দেখা গেল না। অপর দিকে

সুলতান কঠোর জবাব দিলেন এবং তাহার প্রতি রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিলেন। আর শেষপর্যন্ত তাঁহার যাহা দেখিবার তিনি তাহাই দেখিলেন।

শ্লোক

জ্ঞানী লোকের পরামর্শ কাহারও অবহেলা করা উচিত নয়
এই পরামর্শের পাতা যেন কেহ বন্ধ করিয়া না রাখে
কারণ সময় যখন সকল বিষয়কে পরীক্ষার সম্মুখীন করে
তখন ঐ পরামর্শ তোমার মনে উদয় হইবে।

কিছুকাল পর যখন খুসরু খান সুলতানের পরিচর্যা করিতে প্রত্যাগমন করিলেন, শেষোক্ত জন যাহা কিছু কাযির নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাহার সবই তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। সেই মহা-কপট তৎক্ষণাৎ আনুগত্যের ভাব প্রকাশ করিতে অশ্রু বিসজন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেনঃ "মহান সুলতান যেহেতু আমাকে প্রচুর অনুগ্রহ এবং এবং দয়া প্রদর্শন করেন, দরবারের উচ্চ পদস্থ অফিসার-গণের সকলেই ঈর্ষায় জ্বলিয়া যায় এবং আমাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে। অচিরেই তাহারা আমার বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিবে, এবং মহান সুলতানের নিকট আপনার সন্তোষজনকভাবে তাহা প্রমাণ করিবে এব আমাকে ফাঁসী দিবার ব্যবস্থা করিবে। 'ইহার পর তিনি করুণভাবে কাঁদিতে লাগিলেন এবং হতাশভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেনঃ "হায়, আমি ইতিমধ্যেই নিজেকে নিহতগণের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি।" ঐ কপট লোকটির অশ্রু বর্ষণ সুলতানের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিল; তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইতে সক্ষম হইলেন না; তাহাকে নিজের বাহুতে জড়াইয়া ধরিলেন; তাহার সমবেদনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাহার ওষ্ঠে ও গণ্ডে কয়েকটি চুম্বন দিলেন; আর বলিলেনঃ "সমস্ত পৃথিবী যদি একত্র হয় এবং তোমার বিরুদ্ধে বলে, তবু তাহারা কি বলে আমি তাহাতে কর্ণপাত করিব না; কারণ তোমার প্রতি ভালবাসা আমাকে পৃথিবী হইতে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে; আর তোমাকে ছাড়া আমার চোখে পৃথিবীর কোন অর্থই নাই।"

শ্লোক

হে বন্ধু, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কখনও এই মাথা ছাড়িয়া যাইবে না
এই মাথা চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার প্রেম এই মাথা হইতে যাইবে না।

রাত্রির কিছু অংশ যখন অতিবাহিত হইয়া গেল এবং যে আমীরগণের কর্তব্যে থাকিবার কথা নয়, তাহারা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলেন; আর কাযি যয়নুদ্দীন, যাহার কর্তব্য ছিল সর্বদা ইহা রক্ষা করা, যখন হাজার সাতুনের সমতল ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার এবং শাস্ত্রীগণকে পরীক্ষা করিতেছিলেন; আর খসরু খান ছাড়া সুলতানের নিকট যখন আর কেহই ছিলেন না, তখন একদল বরাও তাহাদের বাহুর নীচে ছোরা লুকাইয়া লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। খুসরু খানের চাচা রন্ধোল কাযি যয়নুদ্দীনের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সঙ্গে কথা বার্তা বলিয়া তাহাকে ব্যস্ত রাখিলেন এবং তাহাকে এক বিরা পান দিলেন। মৃত্যুর-হাত কাযিকে অসতর্ক করিয়া দিল, আর তখন জহরিয়া নামক একজন বরাও, যে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল, তাহার নিকটে আসিল এবং তাহার ছোরা দ্বারা তাহাকে আহত করিল। কাযি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং শুধু এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইলেন, "তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।" লোকেরা তখন হাঁক ডাক শুরু করিল। সুলতান যখন সোরগোল শুনিলেন তখন তিনি খুসরু খানকে বলিলেন, "ইহা কিসের গোলমাল।" খুসরু খান বাহির হইয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আস্তাবলে অশ্বগুলি ছুটিয়া গিয়াছে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেছে।" এই সময়ে খুসরু খানের চাচা জহরিয়া ইব্রাহিম এবং ইসহাককে, যাহাদিগকে হাজার সাতুন প্রাসাদটি পাহারা দিবার জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল, হত্যা করিয়া হাজার সাতুন প্রাসাদে প্রবেশ করেন। অবশেষে সুলতান পরিস্থিতি সম্যক বুঝিতে পারিলেন এবং লাফাইয়া উঠিয়া হারেম অভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। খুসরু খান তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিলেন এবং সুলতান তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার বুকের উপর বসিয়া পড়িলেন। এই সময়ে জহরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার রক্তপিপাসু ছোরা দ্বারা সুলতানের পাশে এক ক্ষতের সৃষ্টি করিলেন; তাহাকে মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন; অসহায় লোকটির মাথা কাটিয়া ফেলিলেন; আর সমতল ছাদ হইতে তাহা নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

শ্লোক

বিশ্বাসঘাতক কুম্ভীর, উন্মত্ত পশুর ন্যায়
সেই উন্মত্ত আকৃতির বীরকে আক্রমণ করিল

ইহা তাহার পার্শ্বদেশে এমন এক আঘাত করিল
যে পৃথিবী তিউলিপ ফুলের কেয়ারির ন্যায় ক্ষতবিক্ষত হয়।[১]

লোকেরা যখন সুলতানের শির দেখিলেন তখন সকলেই ঐ স্থান হইতে সরিয়া গেলেন এবং সোরগোল বন্ধ হইয়া যায়। ঐ রাত্রিতে প্রাসাদে উপস্থিত বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়। বরাওগণ সুলতানকে শেষ করিবার পর, রন্ধোল এবং জহরিয়া অন্যান্য কতিপয় লোকসহ হারেমে প্রবেশ করে এবং সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্রদ্বয় শাহযাদা ফরিদ খান এবং শাহজাদা মঙ্গু খানকে নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের মাতাগণের নিকট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে এবং তাহাদিগকে হত্যা করে। হারেমে প্রচণ্ড সোরগোল উত্থিত হয় আর বরাওগণ লুন্ঠনের জন্য তাহাদের হস্ত প্রসারিত করে এবং যাহা কিছু তাহারা পাইল তাহাই লুটপাট করিল।

শ্লোক

এইরূপে ঐ সাম্রাজ্যের সিংহাসন আর ঐ মহাশক্তি হস্তচ্যুত হইল
সময় সবই ধ্বংস করে এবং ধূলায় মিশাইয়া দেয়।

কিছু সময় পরে তাহারা যখন শাহযাদাগণের হত্যাকাণ্ড শেষ করিল, তখন তাহারা মালিক আইনুল মুলক মুলতানী, মালিক ওয়াহিদুদ্দীন কুরাইশী, মালিক ফখরুদ্দীন জুনা, যিনি পরবর্তীকালে সুলতান মুহম্মদ তুঘলক শাহ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং কিরান বেগের পুত্রগণকে এবং অন্যান্য মহা আমীরগণকে, যাহাদিগকে তাহারা ঐ রাত্রিতে তলব করিয়া আনিয়াছিল, হাজার সাতুনের ছাদে পাহারাধীন রাখিয়া দিল, আর সকালের দিকে বহুসংখ্যক বরাও এবং খুসরু খানের অন্যান্য সঙ্গী তাহাদের চতুর্দিকে সমবেত হইল। যখন ভোর হইল তখন (খুসরু খান) উচ্চ পদস্থ অফিসার এবং শহরের ওলেমাগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার নিজ

১. এই স্থানে একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত অংশটি আছে, অন্যগুলিতে নাই: "তারিখ-ই-আলফীতে উল্লেখিত আছে যে সুলতান কুতবুদ্দীন যখন খুসরু খানের এবং বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন, এ পর্যন্ত যাহার কোন কিছুই তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার হারেম সরাই অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন, আর ঐ বিশ্বাসঘাতক খুসরু খান দৌড়াইয়া তাহার নিকটে গমন করেন এবং তাহাকে তাহার মাথায় চুল ধরিয়া টানিয়া রাখেন। আর সুলতান ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে সদা সর্বদা যেরূপ করেন তেমনি তাহাকে নিজের নীচে ফেলিয়া দেন। এই সময়ে জহরিয়া তথায় উপস্থিত হয় আর খুসরু খান ডাকিয়া উঠিলেন, এদিকে আসিয়া আমাকে সাহায্য কর, আর জহরিয়া তাহার তরবারি দ্বারা সুলতানের পার্শ্বদেশে আঘাত করিল এবং তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার শির নীচে নিক্ষেপ করে।"

নামে খোৎবা পাঠ করাইলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং সুলতান নাসিরুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি নানারূপ ছলচাতুরী এবং কৌশল প্রয়োগ করিয়া কতিপয় খ্যাতনামা আমীরকে তাহার আয়ত্বে আনয়ন করেন, ইহাদের শত্রুতার তিনি ভয় করিতেছিলেন, এবং তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করেন। তিনি নিহত কাযির সম্পত্তি এবং পরিবার রন্ধোলকে দান করেন। কিন্তু কাযির স্ত্রী পলায়ন করিয়া নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হন। তিনি তাহার নিজের ভ্রাতা হিসামুদ্দীনকে খান-ই-খানন উপাধি দান করেন আর রন্ধোলকে দেন রায় রায়ান এবং কুরাহ-ই-কিমারের পুত্রকে[১] দেন আযম-উল-মুলক উপাধি। সুলতান কুতবুদ্দীনের আমীরগণের মধ্যে তিনি আইনুল মুলক মুলতানীকে আলম খান উপাধি দান করেন, আর তিনি মালিক তাজুল মূলক ওয়াহিদুদ্দীন কুরাইশীকে উযির পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি তাহার পুত্রগণকে তাহাদের উচ্চ পদে পুনর্বহাল করেন। সুলতান কুতবুদ্দীনের হত্যাকারী জহরিয়াকে তিনি মণিমুক্তায় ভূষিত করেন এবং তাহাকে নানাবিধ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাহার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি সুলতান কুতবুদ্দীনের স্ত্রীগণকে বরাওদের মধ্যে বিলি করিয়া দেন; আর নিজে তাহার (প্রধান) স্ত্রীকে গ্রহণ করেন।[২]

শ্লোক

হে পৃথিবী! তুমি যদি আশীর্বাদ কামনা কর, সহ্য করিও না
যদি সেগুলি ভুল হয়, তবে তোমার সহ্য করিয়া কি লাভ হইবে।
কাহার গোপন ক্ষমতা অধিক শক্তিশালী, আমি এখন তাহা জানি।
আর তোমার প্রকাশ্য কাজে আমি চিরদিনই কাঁদিব।[৩]

যেহেতু অধিকাংশ বরাওই ছিল হিন্দু, ফলে মুসলমান ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করা হয় আর হিন্দুদের আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি প্রচলিত হয়। মূর্তি পূজা এবং মসজিদ ধ্বংস করা নিত্য নৈমিত্তিক কাজ হইয়া উঠে। খুসরু খান লোকের হৃদয় জয় করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং অধিকাংশ কোষাগারের অর্থই পুরস্কার ও উপহার প্রদানে ব্যয় করেন। যেহেতু ঘাযি মালিক সুলতান আলাউদ্দীনের একজন খ্যাতনামা আমীর ছিলেন এবং তাহার প্রচুর সংখ্যক অনুচর ছিল এবং এক উপজাতির

১. তারিখ-ই-ফিরোযশাহী অনুযায়ী তাহার নাম ছিল বাহাউদ্দীন। ফলে দেখা যায় যে তিনি এবং সুলতান কুতবুদ্দীনের পদচ্যুত দবির বা সম্পাদক বাহাউদ্দীন একই ব্যক্তি। এই পুস্তক অনুযায়ী আইনুল-মুলক মুলতানীর বলপূর্বক সিংহাসন দখলকারীর সঙ্গে তাহার কোন যোগাযোগ ছিল না, তবু শুধু ভাওতা দিবার জন্য তাহাকে আলম খান উপাধি দেওয়া হয়।
২. স্ত্রীগণ এবং প্রধান স্ত্রী যে শব্দগুলির অর্থ করা হইয়াছে সেইগুলি হইল حرم এবং زن প্রথমটির দ্বারা রাজকীয় পরিবারের মহিলাগণকেও বুঝাইতে পারে। প্রধান স্ত্রী ছিলেন সম্ভবত দেবল দেবী। এই হিন্দু রাজকন্যা পর পর খিযির খান এবং সুলতান কুতবুদ্দীনের স্ত্রী ছিলেন।
৩. এই শ্লোকটির অর্থ সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।

প্রধান ছিলেন আর দিবালপুর জায়গীর অধিকার করিয়াছিলেন; আর তাহার পুত্র মালিক ফখরুদ্দীন জুনা সাহসিকতা, দানশীলতা এবং উদারতা ইত্যাদি গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন এবং একজন আলাই আমীর ছিলেন, খুসরু খান ইহাদিগকে তাহার পক্ষে আনয়ন করা তাহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যরূপে গণ্য করিলেন; আর তিনি কি করিয়া ইহা করা যায় সে নিয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতে থাকেন। তদনুযায়ী তিনি মালিক ফখরুদ্দীন জুনাকে অশ্বের তত্ত্বাবধায়কের পদটি প্রদান করেন এবং সর্ব-প্রকারে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হন; আর তিনি ঘাযি মালিককেও দিল্লী আগমন করিতে বলেন। শেষোক্ত জন ছিলেন এক সাহসী এবং ধর্মভীরু চরিত্রবান লোক বিধায় তিনি ঘৃণায় অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন; আর তাহার প্রভুর পুত্রগণের হত্যার প্রতি-শোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হন; আর পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের আমীরগণের নিকট চিঠি এবং সংবাদ প্রেরণ করেন এবং অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাটিকে ধ্বংস করিবার জন্য নিজেকে যত্নবান করিয়া তোলেন। এই সময়ে মালিক ফখরুদ্দীন জুনা এক রাত্রে দিল্লী হইতে পলায়ন করেন এবং দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া দিবালপুর অভিমুখে গমন করেন। খুসরু খান তাহার অসতর্কতার নিদ্রা হইতে সজাগ হইয়া উঠেন; এবং তাহার ক্ষমতার আসন্ন পতনের আশঙ্কায় দুঃখিত হন। তিনি কুরাহ্-ই-কিমারের পুত্রকে, যিনি সাম্রাজ্যের সমাবেশের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, অন্যান্য খ্যাতনামা আমীরগণসহ মালিক ফখরুদ্দীন জুনার পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা সরস্বতী শহর পর্যন্ত তাহাকে ধাওয়া করেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার কয়েক দিন পূর্বে ঘাযী মালিক এইরূপ কোন দিনের প্রত্যাশায় সরস্বতীর দুর্গে দুইশত অশ্বারোহী রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহা সংস্কার করেন এবং শক্তিশালী করেন; মালিক ফখরুদ্দীন জুনা কতিপয় অশ্বারোহীকে তাহার সঙ্গে নেন এবং দিবালপুরে গমন করেন। তাহার আগমনে তাহার পিতা অত্যন্ত প্রীত হন এবং জয়ঢাক বাজানোর নির্দেশ দান করেন; আর [তাহার প্রভুর পরিবারের প্রতি অন্যায়ের] প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অধিকতর শক্ত করিয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া তাহার সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করিবার কাজে লাগিয়া যান; আর বরাওগণকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিবার দৃঢ় সংকল্প করেন।

খুসরু খান তাহার ভ্রাতাকে, যাহাকে তিনি খান-খানান উপাধি দান করিয়া-ছিলেন, এবং যাহাকে তখন তিনি একটি চাঁদোয়া এবং একটি দুরবাশ প্রদান করেন, এবং ইউসুফ সুফিকে, যাহাকে তিনি সুফি খান উপাধি দান করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাস-ভাজন অন্যান্য লোকজনসহ, যাহারা তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, ঘাযী মালিকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; এই সন্ধিক্ষণে উছ ও মুলতানের গভর্ণর মালিক বহরাম আবিহ, অকৃতজ্ঞ দুরাত্মাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ ঘাযী

মালিকের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। খুসরু খানের সৈন্যবাহিনী নিকটে আগমন করিলে, ঘাযী মালিকও ঐ ঘৃণ্য দলটির সম্মুখীন হন এবং সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের পর বিজয় এবং সাফল্য লাভ করেন। খুসরু খানের ভ্রাতা এবং ইউসুফ খান কোন রকমে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন; এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন; আর সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় আনুসঙ্গিক উপকরণসমূহ ঘাযী মালিকের হস্তগত হয়। শেষোক্ত জন ইহাতে সাহস সঞ্চয় করেন এবং এই জয়লাভে নব আশায় বলীয়ান হন; আর ঐ শয়তান দুরাত্মার ধ্বংস সাধনের জন্য নূতনভাবে সেনাবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করেন; এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। অকৃতজ্ঞ খুসরু খান লোক সংগ্রহের এবং অর্থ অপব্যয়ের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাইয়া শহর হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং আলাই জলাশয়ের নিকটস্থ প্রান্তরে তাহার সেনা সন্নিবেশ করেন। আর তাহার লোকদের আড়াই বৎসরের বেতন অগ্রিম প্রদান করেন। এই সময়ে তাহার একজন মহা আমীর আইনুল মুলক মুলতানী উজ্জয়িন এবং ধর অভিমুখে পলায়ন করেন। ইহাতে খুসরু খানের হতাশা বৃদ্ধি পায় এবং তাহার বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া যায়। অতঃপর ইন্দরপথের সন্নিকটে ন্যায়পরায়ণতার দল আর দুষ্টদের দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। ন্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিল এবং খুসরু খান পরাজিত হইলেন। মালিক তলবাগাহ নাগোরী এবং কুরাহ-ই-কিমারের পুত্র, যিনি শায়েস্তা খান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন আর যাহারা দুরাত্মা খুসরুর ক্ষমতার প্রধান অবলম্বন ছিলেন, নিহত হইলেন, আর খুসরু খান মহা বীরত্ব এবং সাহসিকতার[১] সহিত দিনের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তিলপত পলায়ন করিলেন। তাহার চাঁদোয়া, পতাকা এবং সেনাবাহিনী ঘাযী মালিকের হস্তগত হইল। খুসরু খান অত্যন্ত ভীত, হতবুদ্ধি এবং একাকীত্বের ফলে তিলপত হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং তাহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক মালিক শাদীর বাগানে প্রবেশ করিয়া নিজেকে তথায় লুকাইয়া রাখিলেন। পরদিন তাহাকে ঘাযী মালিকের সম্মুখে আনয়ন করা হয় এবং হত্যা করা হয়।

শ্লোক

যে বৃক্ষ তুমি রোপণ করিয়াছ তাহাতে ফল ধরিয়াছে
সেই ফল এখন তুমি তোমার চোখের সম্মুখে দেখিতেছ।

১. তারিখ-ই-ফিরোয শাহীতে খুসরু খানের ব্যবহারের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ বিবরণ দেওয়া আছে। ইহাতে আছে, "কাপুরুষ দুরাত্মাটি লোকের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাহার সেনাবাহিনী ফেলিয়া পলায়ন করিলেন এবং তিলপত অভিমুখে গমন করিলেন।" নিযামুদ্দীন আহমদ যে কোন লোককে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারেন তাহাতে বুঝা যায় তাঁহার বিচার শক্তি কত ন্যায্য ছিল।

ইহা যদি কাঁটা হইয়া থাকে, তবে ইহাই তুমি রোপণ করিয়াছিলে
ইহা যদি সুকোমল রেশম হইয়া থাকে, তবে তাহাই তুমি উৎপাদন করিয়াছ।

শহরের ছোট বড় সকলেই ঘাযী মালিককে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন; আর তাহার বিজয়লাভে তাহার প্রশংসা করিলেন, পরদিন তিনি অশ্বারোহণে ইন্দ্রপথ হইতে সিরির মণ্ডপে গমন করিলেন এবং হাজার সতুনে আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ অফিসারগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিলেন এবং সুলতান কুতবুদ্দীন এবং তাহার পুত্রগণের জন্য শোক অনুষ্ঠান পালন করিলেন, এবং কান্নাকাটি করিলেন এবং হা হুতাশ করিলেন। ইহার পর তিনি উচ্চ স্বরে বলিলেন, "আমি সুলতান আলাউদ্দীন এবং সুলতান কুতবুদ্দীনের দয়ায় লালিত হইয়াছি; আর তাহাদের উপকারের কৃতজ্ঞতার জন্য এবং কোনরূপ পদ-মর্যাদা বা সম্পদের লোভে নয়, আমি তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার তরবারি উত্তোলন করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। এখন আপনারা যাহারা এই মজলিসে উপস্থিত আছেন, তাহাদের কেহ জানেন কি তাহাদের কোন সন্তানাদি জীবিত আছে কি না। যদি থাকে তাহাকে সম্মুখে আনয়ন করুন, যাহাতে আমরা তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, আর আমরা সতর্কতার সহিত তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব এবং তাহার খেদমত করিব। যদি তাহাদের কোন বংশধর জীবিত না থাকে, তবে আপনাদের মধ্যে যাহাকে আপনারা উপযুক্ত মনে করেন তাহাকেই সিংহাসনে বসিবার জন্য এবং রাজ্য শাসন করিবার জন্য পছন্দ করুন; এবং আমি তাহার খেদমত করিতে প্রস্তুত আছি।" মজলিসে উপস্থিত ক্ষমতা-শালী ব্যক্তিগণের সকলে বলিলেন, "উভয় রাজারই কোন পুত্র সন্তান এখন আর জীবিত নাই। আপনি দীর্ঘকাল ধরিয়া মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আসিয়াছেন এবং নিজেকে হিন্দুস্তানের সকল লোকের ঢালে পরিণত করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি আপনার এক মহা দাবী প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন যেন আপনি পুনরায় এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং আপনার উপকারীদের শত্রুগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা আমীরদের এবং দেশের সাধারণ লোকের কৃতজ্ঞতার প্রতি আপনার আরও একটি দাবী। সার্বভৌমত্বের জন্য এবং সর্বাধিনায়কের পদের জন্য আপনার চেয়ে উপযুক্ত আর কেহই নাই।" তাহারা ইহা বলিলেন এবং ঘাযী মালিককে হাতে ধরিয়া নিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন এবং তাহাকে সুলতান ঘিয়া-সুদ্দীন তুঘলক শাহ উপাধি দান করিলেন; আর আমীরগণ এবং সর্বসাধারণ তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন।

শ্লোক

সৌভাগ্যশালী সুলতান, তাহার শত্রুদের ধ্বংসকারী
শুভলক্ষণের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন
বিজয় এবং সাফল্যে ভূষিত হইয়া
তিনি পৃথিবীতে এক নূতন আনন্দের সৃষ্টি করিলেন।

সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহ

আঃ হিঃ ৭২০ সনে সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন সবুজ মণ্ডপে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ন্যায়বিচার এবং পরোপকারিতার ঘোষণা প্রকাশ করেন। যে সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছিল সেগুলি পুনরায় নিদ্রিত হইল, আর দেশের শাসন ব্যবস্থায় এক নূতন গৌরবের সূচনা হইল। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রের সকল ব্যাপারের এমন সুবন্দোবস্ত করিলেন যাহা অন্যান্যদের পক্ষে কয়েক বৎসরেও সম্ভব হইত না।

ঐ শুভলক্ষণযুক্ত বৃক্ষ যেন সর্বোত্তম ফল ফলায়
ইহার ছত্রছায়ায় যেন সকলেই আরাম আয়েসে থাকিতে পায়
এখন ইহার ফল দ্বারা ইহা টেবিল সজ্জিত করে
এখন ইহা ইহার ছায়া দ্বারা শ্রান্ত পথিককে শান্তি দেয়।

যেখানেই তিনি সুলতান আলাউদ্দীন এবং সুলতান কুতবুদ্দীনের পরিবারের বাকী লোকদের এবং বংশধরদের সন্ধান পাইতেন, তিনি ভাতা এবং বৃত্তি দান করিয়া তাহাদের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিতেন। যাহারা সুলতান কুতবুদ্দীনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে খুসরু খানের বিবাহ সম্পাদনে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলকেই শাস্তি দান করেন। তিনি সুলতান কুতবুদ্দীনের আমীর এবং মালিকগণকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করেন, এবং তাহাদের জায়গীর পুনঃ অনুমোদন করেন ; এবং সাম্রাজ্যের উচ্চ পদগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করেন। খাজা খতির, এবং মালিক আনওয়ার জুনেইদী এব' খাজা মুহায্‌যব বুযুর্গকে, যাহারা সর্বদাই ভূতপূর্ব বাদশাহগণের বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার করিতেন ; আর তাহাদিগকে তাহার মজলিসে বসিবার অনুমতি প্রদান করেন এবং ভূতপূর্ব সুলতানগণ তাহাদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সাধনে এবং জনসাধারণের ব্যাপারসমূহের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য যে সব আইন কানুন এবং বিধি বিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন সে সব সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন ; আর তিনি ঐ সব

আইন কানুন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতেন। যে সব কাজে লোকদের অসুবিধা এবং ক্ষতি হইতে পারে সে সব কাজ করা হইতে তিনি বিরত থাকিতেন। যে কাহারও মধ্যে তিনি আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই তিনি উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত করিতেন, আর যে কেহ কোনরূপ কৃতিত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিলে তিনি তাহাকে অচিরেই রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সম্মানীত করিতেন। শাসনকার্যের ব্যাপারে তিনি সংযমের সহিত কাজ করিতেন এবং সর্বপ্রকার চরম ব্যবস্থা পরিহার করিয়া চলিতেন।

তিনি সুলতান মুহম্মদকে, যাহার চেহারায় মহত্ত্বের লক্ষণ ছিল, উলুঘ খান উপাধি দান করেন এবং তাহাকে একটি চাঁদোয়া দেন এবং তাহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। অন্যান্য শাহযাদাগণের মধ্যে একজনকে তিনি বহরাম খান, দ্বিতীয় জনকে যাফর খান, তৃতীয় জনকে মাহমুদ খান এবং চতুর্থ জনকে নসরত খান উপাধি দান করেন। তিনি বহরাম আবিহকে, যাহাকে তিনি ভ্রাতা বলিতেন, কশলু খান উপাধি দেন এবং তাহাকে মুলতান এবং সমস্ত সিন্ধু দেশটি জায়গীর প্রদান করেন। তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক আসাদুদ্দীনকে বারবক নিযুক্ত করেন এবং তাহার ভাগীনেয় বাহাউদ্দীনকে, আরিয-ই মুমালিক উপাধি দান করেন এবং তাহাকে সামানা জায়গীররূপে প্রদান করেন। তিনি উযিরাত পদটির পরিচালনা ভার তাহার ভ্রাতা এবং জামাতা মালিক শাদীকে প্রদান করেন। তিনি একজনকে পুত্র সম্বোধন করিতেন, তাহাকে তিনি তাতার খান উপাধি দান করেন এবং যাফরাবাদ জায়গীর দান করেন। দেওগীরের উজির পদটি কুতলুঘ খানের পিতা মালিক বুরহানুদ্দীনকে প্রদান করেন, আর প্রধান বিচারপতির পদটি কাযি সদরুদ্দীনকে প্রদান করেন। দিল্লীর কাযির পদটি দেওয়া হয় কাযি আলাউদ্দীনকে। গুজরাটের সহকারী সমাবেশক পদটি দেওয়া হয় মালিক তাজুদ্দীন জাফরকে। অন্যান্য পদগুলি ও বিভিন্ন দাবীদারের যোগ্যতা অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কোন পদই কাহাকেও দেওয়া হইত না, যতক্ষণ না সুলতান তাহার সে পদের যোগ্যতা আছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া দেখিতেন। দক্ষ লোককে তিনি চাকুরীহীন রাখেন নাই।

বিভিন্ন দেশের রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি সংযমের সঙ্গে কাজ করেন; এবং যাহারা অধিক পরিমাণ দানের প্রস্তাব করিতেন তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। যদি কেহ তাহার জায়গীর হইতে বলপূর্বক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ আদায় করিতেন, তবে সুলতান তাহাতে আপত্তি করিতেন এবং ঐ আদান-প্রদান বাতিল করিয়া দিতেন। যদি কেহ তাহার দেয় রাজস্ব হইতে, তাহার অনুচরদের অর্থ প্রদান করিবার ফলে, কোন অংশ কাটিয়া রাখিত, আর ঐ পরিমাণ

অর্থ শেষোক্ত জনের নিকট না পৌঁছিত, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং তাহার নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হইত। খুসরু খান তাহার দুর্দশা এবং বিভ্রান্তির সময়ে বিভিন্ন লোককে যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, সুলতান সেগুলি পুনরুদ্ধার করেন এবং সেগুলি কোষাগারে জমা দিবার ব্যবস্থা করেন। কোন লোক এই অর্থ ফেরৎ দিতে বিলম্ব করিলে সে তাহার ক্রোধ এবং কঠোরতার ফল ভোগ করিত। বহুবার তিনি সম্ভ্রান্ত লোক এবং সাধারণ লোকদের ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং তাহাদের অবস্থা এবং ন্যায্য দাবী অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যেককে পুরস্কার দান করিতেন। যখনই তাহার রাজ্যের কোন স্থান হইতে কোন জয়লাভের সংবাদসহ কোন পত্র আসিত অথবা যখনই শাহাযাদাদের কাহারও বিবাহ সংঘটিত হইত অথবা তাহার পরিবারে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তখনই তিনি সকল বিচারক এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারদের এবং ওলামাদের এবং শেখগণকে এবং আমীরগণকে তাহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দান করিতেন। যাহারা অবসর জীবন যাপন করিতেন তিনি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত রাখিতেন এবং তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেন; আর যখনই তিনি শুনিতেন যে রাজ্যের কোন লোক দারিদ্রতা এবং দুর্দশা ভোগ করিতেছে, তখনই তিনি তাহা দূর করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন।

শ্লোক

ঐ সুলতানের সঙ্গে যখন ভাগ্য যোগদান করিল
সে হাসিয়া উঠিল এবং গোলাপের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইল।
তিনি তাহার কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন;
তাহার সৈন্যগণ স্বর্ণ ও মণিতে ধনী হইয়া উঠিল।

তিনি প্রতি মাসে একবার তাহার সন্তানদের এবং আত্মীয় স্বজনদের এবং অফিসারদের এবং মন্ত্রীদের ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন, আর তিনি যদি দেখিতেন যে তাহাদের কেহ দুর্দশায় পতিত হইয়াছে বা অভাবগ্রস্ত হইয়াছে, তবে তিনি তাহা দূর করিতেন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদের বিচারের তালিকা সম্বন্ধে এবং অশ্বে দাগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের পন্থা অবলম্বন করেন; আর শেষোক্তটির মূল্য এবং পরীক্ষা সম্বন্ধে এবং অনুচরদের ব্যয়ভার সম্বন্ধেও তাহার পথ অবলম্বন করেন। সৈন্যগণ খুসরু খানের নিকট হইতে যে অর্থ লাভ করিয়াছিল, তাহা হইতে তিনি তাহাদিগকে এক বৎসরের বেতন মঞ্জুর করেন আর বাকী অংশ রেজিস্টারে তাহাদের নামে অগ্রিমরূপে দেখান হয় এবং নির্দেশ

জারি করা হয় যে এই অর্থ তাহাদের পরবর্তী বৎসরগুলির বেতন হইতে কিছু কিছু করিয়া কাটিয়া নেওয়া হইবে। সুলতান কুতবুদ্দীন তাহার অসাবধানতা অথবা মোহাবিষ্টতার ফলে অসঙ্গতভাবে যে সব ভাতা, এবং বৃত্তি এবং ভূমি দান মঞ্জুর করিয়াছিলেন তিনি সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেন; এবং সেইগুলি প্রকৃত যোগ্য লোককে প্রদান করেন। সুলতান তুঘলক শাহের নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতা লোকের মধ্যে সমতার সৃষ্টি করে আর দুর্দমনীয়তা এবং অবাধ্যতা নামগুলিও অদৃশ্য হইয়া যায়। তিনি এমনভাবে মুঘলদের আক্রমণের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন যে তাহার রাজত্ব-কালের সম্পূর্ণ সময়ে তাহারা কখনও হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে নাই। চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তিনি তুঘলকবাদ দুর্গের ভিত্তি স্থাপন এবং অন্যান্য অট্টালিকা নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। তিনি একজন ধার্মিক লোক ছিলেন এবং তাহার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, আর তিনি ধর্মের নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞাসমূহ কঠোরভাবে পালন করিতেন; আর তাহার বহু সময় উপাসনায় ব্যয় করিতেন। তিনি রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন এবং অতিরিক্ত আরাধনাতে চেষ্টা করিতেন। মাদক দ্রব্যের প্রতি তাহার কোন আসক্তি ছিল না এবং সুরা পান নিষিদ্ধ করিতে তিনি জোর দিতেন। তিনি একজন সরল মালিক থাকিবার সময় তাহার গৃহভৃত্য, ক্রীতদাস, পুরাতন ভৃত্য এবং তাহার প্রতি নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাহার ব্যবহার যে রূপ ছিল, সুলতান থাকা অবস্থায় তাহাদের প্রতি সেই ব্যবহারের কোন রূপ পরিবর্তন হয় নাই, ঐ একই রূপ থাকে।

আঃ হিঃ ৭২১ সনে তিনি সুলতান মুহম্মদকে, যাহার উপাধি ছিল উলুঘ খান, তাহার কতিপয় পুরাতন অফিসার এবং খ্যাতনামা আমীরগণের সকলকেসহ অরঙ্গলে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ এবং মহা আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের সঙ্গে ঐ স্থান অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন দেওগীরে পৌঁছেন, তিনি ঐ স্থানে অবস্থিত আমীরগণকে তাহার সঙ্গে নেন এবং দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন যত-ক্ষণ না তিনি তিলাঙ্গ দেশে উপস্থিত হন এবং দেশটিতে লুটতরাজ করেন ও তাহা বিধ্বস্ত করেন। রায় রুদ্র দেও এবং সন্নিকটস্থ অন্যান্য রায়গণ নিজেদের অরঙ্গল দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। উলুঘ খান প্রাচীরাদি ভাঙ্গিবার ঢেকি কল নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার চতুর্দিকে বিস্ফোরক স্থাপন করেন। প্রতিদিন উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হইতে থাকে। অবশেষে উলুঘ খানের সেনাবাহিনী যখন দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণ পরিচালনা করে এবং দুর্গ বিজিত হওয়া আসন্ন হইয়া উঠে, তখন রায় রুদ্র দেও সুলতান মুহম্মদের (অর্থাৎ উলুঘ খানের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং তাহাকে ধন সম্পদ এবং হস্তী এবং বহুমূল্য মণি মুক্তা প্রদানের প্রস্তাব করে; আর ইহাও

অঙ্গীকার করে যে ভবিষ্যতেও প্রতি বৎসর তিনি সুলতান আলাউদ্দীনকে যে কর প্রদান করিবেন তাহা প্রদান করিতে থাকিবেন। উলুঘ খান এইসব শর্ত গ্রহণে অস্বীকার করেন এবং দুর্গ দখলের জন্য এমন প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন যে ইহার পতন আসন্ন হইয়া উঠে; (আর তখনই নিম্নরূপ ব্যাপারসমূহ ঘটে)। এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে সপ্তাহে দুইবার ডাক চৌকিযোগে দিল্লী হইতে সংবাদবাহক আগমন করিবে এবং সবকিছুর নিরাপত্তার সংবাদ আনয়ন করিবে। কিন্তু দেখা যায় যে একমাস কাল কোনই সংবাদ আসে নাই। পথ নিরাপদ না থাকিবার ফলে ডাক চৌকির ব্যবস্থায় গোলমাল হইয়া যায়। কবি ওবায়েদ এবং শেখযাদা ই দমশকী ছিলেন সকল অপকর্ম ও বাধা বিপত্তির উৎস, কিন্তু তাহারা উলুঘ খানের নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; ইহারা দিল্লীতে সুলতান ঘিযাসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া এক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন; আর অন্যায়ভাবে একজন সিংহাসন অধিকার করিয়াছে বলিয়াও প্রচার করে। এই গুজবের ফলে সৈন্যদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কবি ওবায়েদ এবং শেখযাদা-ই-দামশকী, মালিক তমর, মালিক তিগিন, মালিক মাল আফগান এবং সিলরক্ষক মালিক কাফুরের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন, আর তাহাদিগকে বলেন যে যেহেতু উলুঘ খান তাহাদিগকে সুলতান আলাউদ্দীনের মহা-মালিকগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন আর সেইজন্য সাম্রাজ্যের অংশ লাভের দাবীদার রূপে গণ্য করেন, তাই তিনি স্থির করিয়াছেন যে তিনি তাহাদের সকলকে বন্দী করিয়া হত্যা করিবেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা ভীত হইয়া পড়েন; আর সৈন্যগণের মধ্যে চরম ভীতির সঞ্চার হয়। প্রত্যেকেই যাহা তাহার মাথায় আসে তাহাই করিতে থাকে এবং পলায়ন করে। চরম বিভ্রান্তির মধ্যে উলুঘ খান তাহার কতিপয় বিশেষ অনুচরসহ দেওগীর অভিমুখে রওয়ানা হন। দুর্গাভ্যন্তরের লোকেরা বাহির হইয়া আসে, সেনাবাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ লুণ্ঠন করে এবং বহু সংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করে।

ইতিমধ্যে ডাক চৌকি ব্যবস্থা, যাহাকে সাধারণ লোকের ভাষায় বলা হইত আলাম, সুশৃঙ্খল করা হয়, এবং দিল্লী হইতে সংবাদবাহক আসিতে থাকে যে সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন আছেন আর সুস্থ এবং নিরাপদ আছেন। উলুঘ খান দেওগীরে পৌঁছিয়া তাহার ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনী পুনরায় সংগ্রহ করেন। যে চারিজন আমীর একযোগে নিজেদের সেনাবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছিল; তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা হইয়া যান এবং তাহাদের অনুচর এবং ভৃত্যগণ নিহত হন; তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম জমিদারদের হস্তে পতিত হয়। মালিক তমর অল্পকিছু লোকসহ জমিদারদের বিরুদ্ধে গমন করেন এবং

নিহত হন। হিন্দুগণ অযোধ্যার গভর্ণর মালিক তিগিনকে হত্যা করে এবং তাহার চামড়া উলুঘ খানের নিকট প্রেরণ করে। তাহারা মালিক মাল আফঘান, কবি ওবায়েদ এবং অন্যান্য লোক যাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বন্দী করে এবং তাহাদিগকে দেওগীরে উলুঘ খানের নিকটে প্রেরণ করে; আর শেষোক্ত জন তাহাদিগকে দিল্লীতে তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করেন। তাহাদের পরিবারের লোক জন এবং তাহাদের প্রতি নির্ভরশীল লোকদের ইতিমধ্যেই দিল্লীতে বন্দী করা হইয়াছিল। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন সিরির প্রান্তরে প্রকাশ্যে দরবারে বসেন এবং নির্দেশ দান করেন যে কবি ওবায়েদ এবং অন্যান্য দুর্দান্ত লোকদের জীবন চামড়া ছুলিয়া ফেলা হইবে আর তাহাদের পরিবারের লোকদের এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকদের হাতীর পায়ের নীচে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহার পর উলুঘ খান দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলেন; এবং তাহার পিতা কর্তৃক বহু অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রীত হইলেন।

চারি মাস পর, সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন পুনরায় উলুঘ খানকে প্রচুর অনুচর এবং অসংখ্য সৈন্যের এক বাহিনীসহ অরঙ্গল প্রেরণ করেন। এইবার উলুঘ খান তিলাঙ্গ দেশে অগ্রসর হন এবং বিদর দুর্গটি অধিকার করেন। এবং দুর্গরক্ষী সৈন্যদের সেনাপতিকে বন্দী করেন অতঃপর তিনি অরঙ্গল গমন করেন এবং তাহা অবরোধ করেন আর স্বল্পকালের মধ্যেই বহিপ্রাকার এবং অন্তর্বর্তী দুর্গ উভয়ই অধিকার করেন। তিনি ঐ দেশের রায়গণকে তাহাদের পরিবার পরিজনসহ বন্দী করেন এবং তাহাদের হস্তী, জিনিসপত্র এবং ধনসম্পদ হস্তগত করেন। বিজয়ের সংবাদ দিয়া তিনি এক পত্র প্রেরণ করেন। আর ঐ পত্রটি দিল্লীতে সিরি এবং তুঘলকাবাদে মঞ্চ হইতে প্রকাশ্যে পাঠ করা হয়। লোকেরা গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং আনন্দ উৎসব সম্পন্ন করেন। রায় রুদ্র দেওকে তাহার হস্তীসমূহ এবং ধনসম্পদসহ, মালিক বিদর, যাহার উপাধি ছিল কদর খান এবং সাম্রাজ্যের সমাবেশ কর্তৃপক্ষ খাজা হাজীর পাহারাধীনে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। অরঙ্গলের নাম পরিবর্তন করিয়া সুলতানপুর রাখা হয়। আর সম্পূর্ণ তিলঙ্গ দেশটি আয়ত্বে আনয়ন করা হয় এবং গভর্ণর অন্যান্য অফিসার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর উলুঘ খান এক বৎসরের কর আদায় করেন; এবং জাজনগর অঞ্চলে গমন করেন। তথায় তিনি চল্লিশটি হস্তী সংগ্রহ করেন এবং ঐগুলিকে সুলতানের কার্যের জন্য প্রেরণ করেন।

অরঙ্গল এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বের দেশটি আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিবার পর এবং সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন সর্বদিকেই সাফল্য লাভ করিলে, তাহারা কতিপয় শুভাকাঙ্খী[১]

১. তারিখ-ই-ফিরোয শাহী অনুযায়ী এই লোকগুলি ছিলেন লক্ষণাবতী হইতে আগত কতিপয় আমীর।

বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্তাগণের অত্যাচার, এবং উৎপীড়ন এবং দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার নিকট নিবেদন করেন এবং সুলতানকে লক্ষণাবতী আক্রমণের জন্য উত্তেজিত এবং প্ররোচিত করেন। সুলতান এই অভিযান করিবার সংকল্প করিয়া অরঙ্গল হইতে উলুঘ খানকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি রাখিয়া এক বিশাল বাহিনীসহ এবং মহা আড়ম্বর এবং জাঁকজমক সহকারে লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন করেন। যেহেতু সুলতান তুঘলক শাহের সাহস এবং বীরত্বের ব্যাপক খ্যাতি সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, যেইমাত্র তিরহুতে তাহার মহা-ছায়া পতিত হয়, তখনই লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা সুলতান নাসিরুদ্দীন এবং অন্যান্য রায় ও জমিদারগণ, যাহারা ঐদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগাইয়া আসেন এবং তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতান তাতার খানকে 'পুত্র' সম্বোধন করিয়া সম্মানীত করিয়াছিলেন এবং যাফরাবাদের শাসনভার তাহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাকে এক বিশাল বাহিনীসহ অগ্রে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন সমস্ত দেশটিকে আয়ত্বাধীনে আনয়ন করেন। সোনার গাঁও এবং শাসনকর্তা সুলতান বাহাদুর শাহ কিছু বাধা দিয়াছিলেন; তিনি তাহার গলায় শিকল বাঁধিয়া সুলতানের নিকট আনয়ন করেন; আর তিনি এই অভিযানের সময় সংগৃহীত সবগুলি হস্তী সুলতানের হস্তীশালায় নিয়া যান। অন্যান্য জিনিসপত্রের অসংখ্য লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগৃহীত হয়। সুলতান লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা সুলতান নাসিরুদ্দীনকে, যিনি তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, একটি চাঁদোয়া এবং একটি দুবরাশ প্রদান করেন এবং তাহাকে পুনরায় লক্ষণাবতীতে প্রেরণ করেন। সোনারগাঁও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। লক্ষণাবতী বিজয়ের ঘোষণা করিয়া যে পত্র প্রেরণ করা হয় তাহা দিল্লীতে পাঠ করা হয় এবং গম্বুজ নির্মাণ করা হয় এবং আনন্দ উৎসব সম্পন্ন করা হয়। সুলতান বিজয় এবং খ্যাতি লাভ করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেনাবাহিনীকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন এবং দুই দিনের পথ এক দিনে অতিক্রম করেন।

উলুঘ খান যখন শুনিতে পান যে তাহার পিতা দ্রুতগতিতে পথ চলিয়া আসিতেছেন, তখন তিনি তিন দিনের মধ্যে তুঘলকাবাদের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত আফঘানপুরে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দান করেন। যাহাতে সুলতান যখন তথায় আসিয়া পৌঁছিবেন, তিনি যেন তথায় রাত্রি যাপন করিতে পারেন এবং নাগরিকগণ যাহাতে তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে তথায় আসিতে পারেন এবং তাহার খেদমত করিতে পারেন। অতঃপর যখন ভোর হইবে তখন কোন এক শুভমুহূর্তে তিনি রাজকীয় জাঁকজমক ও আড়ম্বরে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিবেন। সুলতান যখন

মঞ্চে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন তুঘলকাবাদে আনন্দ উৎসব করা হইল এবং বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করা হইল। উলুঘ খান, মালিকগণ এবং আমীরগণ এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণসহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন; আর তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশের অনুমতি লাভ করিয়া সম্মানীত হইলেন। যেসব লোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে লইয়া সুলতান মঞ্চে প্রবেশ করিলেন এবং একটি টেবিল পাতা হইল। আহার্য দ্রব্য যখন আনয়ন করা হইল আর লোকেরা মনে করিলেন যে সুলতান তখনই আরোহণ করিবেন, তাহারা হাত না ধুইয়াই বাহির হইয়া আসিলেন। সুলতান তাহার হাত ধূইতে তথায় রহিয়া গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের ছাদ ধ্বসিয়া পড়ে আর সুলতান ইহার নীচে পড়িয়া যান এবং আল্লাহর করুণার সঙ্গে সম্মিলিত হন। তাহার রাজত্বকাল চারি বৎসর এবং কয়েক মাস স্থায়ী হইয়াছিল।

কতিপয় ইতিহাস পুস্তকে এইরূপ বলা হইয়াছে যে যেহেতু মঞ্চটি সগু নির্মিত হইয়াছিল, এবং ঠিকমত বসে নাই, আর সুলতান তুঘলক বাঙ্গালা দেশ হইতে যে সব হস্তী আনয়ন করিয়াছিলেন সেইগুলিকে ইহার চতুষ্পার্শ দিয়া চালাইয়া নেওয়া হইয়াছিল, ফলে ভূমি ভ ঙ্গিয়া যায় এবং ছাদটি ধ্বসিয়া পড়ে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকদের মনে ইহা গোপন থাকিতে পারে না যে মঞ্চটির নির্মাণের কোনই প্রয়োজন ছিল না, আর ইহা সন্দেহের উদ্রেক করে যে উলুঘ খান তাহার পিতাকে হত্যার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে তারিখ-ই-ফিরোযশাহীর লেখক সুলতান ফিরোযের সময়ে তাহার পুস্তকটি রচনা করিয়াছিলেন আর যেহেতু সুলতান ফিরোযের সুলতান মুহম্মদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, যাহার ফলে তৎকালীন সুলতানের প্রতি সমীহ করিয়া এই ব্যাপারে প্রকৃত কথা চাপা দিয়াছেন। এই অধম লেখক বিশ্বাসভাজন লোকদের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে এবং ইহা সর্বজনবিদিত যে সুলতান তুঘলক, শ্রদ্ধেয় শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি শেষোক্ত জনের নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া জানান যে তাহার দিল্লী পৌঁছিবার পূর্বেই যেন তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া যান; আর শেখ বলেন, "দিল্লী এখনও অনেক দূর" এই কথাগুলি হিন্দুস্তানের লোকের নিকট প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাও সর্বজনবিদিত যে সুলতান মাহমুদের শেখের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং অপরিসীম ভক্তি ছিল। কিন্তু একমাত্র আল্লাহই সর্বজ্ঞ এই বৎসরেই শেখ নিযামুদ্দীন,—তাহার কবর যেন পবিত্র হয়—এবং আমীর খসরু এই দুঃখ দুর্দশায় পূর্ণ দৈহিক অস্তিত্ব হইতে আত্মার জগতে গমন করেন।

সুলতান মুহম্মদ তুঘলক শাহ

তিনি ছিলেন সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলকের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি তুঘলকাবাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ঐ স্থানে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন এব সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার সকল বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এক শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা করেন। অতঃপর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিনি পুরাতন প্রাসাদে প্রাচীন সুলতানদের সিংহাসনে আরোহণ করেন; এবং মুহম্মদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তাহারা শহরে আনন্দের ঢাক বাজান এবং গম্বুজ নির্মাণ করেন; আর বাজার ও অলিগলি সুসজ্জিত করেন। তিনি যে সময়ে রাজধানীতে প্রবেশ করেন তখন তাহার চাঁদোয়ার উপর দিয়া এত অধিক সংখ্যক স্বর্ণ এবং রৌপ্য তংগা ছিটাইয়া দেওয়া হয় যে আর কোন যুগে আর তেমন করা হয় নাই। সুলতান মুহম্মদ ছিলেন এক অদ্ভুত সৃষ্টি; বিপরীত বৈশিষ্ট্যসমূহের আধার। এক সময়ে তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় সপ্ত আবহাওয়া অঞ্চল জয় করিতে চাহিয়াছিলেন, আর এক সময়ে তিনি মানুষের ন্যায় জিনদেরও তাহার শাসনের আওতায় আনিতে তাহার সর্ব শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। আর একবার তিনি পার্থিব শাসনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক শাসন যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন; যাহাতে তিনি স্বয়ং বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক বিধান দান করিতে পারেন। রোজা রাখা এবং নামাজ পড়িবার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন: আর অতিরিক্ত আরাধনা করিবার ব্যাপারে এবং ধর্মপরায়-নতায় আর বৃত্তি এবং খয়রাত করিবার ব্যাপারেও তিনি নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন। তিনি সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিস এবং মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া চলিতেন; আর অন্যান্য সব কিছুই যাহাকে পাপ নামে অভিহিত করা যায় তাহা তিনি বর্জন করিতেন। অপর দিকে তিনি শাস্তি দানের ব্যাপারে এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটানোতে এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের দুঃখ দুর্দশা এবং নিপিড়নের ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে মনে হইত যেন তিনি এই পৃথিবীকে জনশূন্য করিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর। একই সময়ে তাহার অন্তর্নিহিত সদাশয়তা এত অধিক ছিল যে যখন তিনি দান খয়রাত করিতেন এবং দরিদ্রকে অকাতরে দান করিতেন, তখন তিনি চক্ষের নিমেষে কোষাগার শূন্য করিয়া দিতেন। ধনী, দরিদ্র, বন্ধু এবং অপরিচিত নির্বিশেষে তাহার সদাশয়তার চোখে সমান ছিল। তিনি যখন সোনার গাঁও-এর সুলতান বাহাদুরকে তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে ফেরৎ পাঠান, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুরস্কাররূপে তাহার কোষাগারে যাহা ছিল তাহার সবই দিয়া দেন। প্রতি বৎসর তিনি মালিক ঘযনীনকে এক শত লক্ষ তংগা প্রদান করিতেন এবং তিনি ঘযনীনের কাযিকেও এত প্রচুর অর্থ

প্রদান করিতেন যাহা কাহারও কল্পনায় আসিবে না। তিনি মালিক সনজর বদখসানীকে আশি লক্ষ তংগা, মালিক ইমাদুদ্দীনকে সত্তর লক্ষ, সৈয়দ আযাদকে চল্লিশ লক্ষ তংগা প্রদান করেন আর এই একইভাবে তাহার উপহার কখনও কয়েক লক্ষের কম হইত না। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই স্থানে উল্লিখিত তংগা ছিল রৌপ্য তংগা, ইহার সাথে সামান্য তামা মিশ্রিত থাকিত আর ইহাদের প্রত্যেকটি আটটি কাল তংগার সমান ছিল। যখনই কোন আলেম বা শিল্পী তাহার দরবারে আগমন করিতেন, তখনই তিনি বহু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন এবং নানারূপ পুরস্কার দান করিতেন। যে কেহ প্রার্থীরূপে খুরাসান বা ইরাক বা মাওয়ারুন নাহর বা পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে এই দরবারে আগমন করিত, সেই এত বড় রকমের পুরস্কার লাভ করিত এবং এত অধিক সংখ্যক অনুগ্রহ লাভ করিত যে, ঐ সময় হইতে সে সব সময়ের জন্য তাহার সকল অভাব অনটন দূর হইয়া যাইত। শাসনকার্যের বিধান প্রণয়নে এবং জ্ঞানের পরিধিতে তাহার কোন সমকক্ষ ছিল না। তাহার এমন সঠিক বিচার বুদ্ধি এবং এরূপ সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে তিনি শুধুমাত্র একবার চোখ বুলাইয়া যে কোন লোকের দোষ গুণ বুঝিতে পারিতেন। যে কোন লোকের মনে কি আছে, লোকটি কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হতেন। কথার বাগ্মীতায় এবং রচনাশৈলীর সৌন্দর্যের এবং বিষয় পর্যালোচনার নিপুণতার জন্য তিনি প্রবাদে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি উন্নত পর্যায়ের গদ্য এবং পদ্য লিখিতে পারিতেন। ইতিহাসের জ্ঞানেও তিনি অতুলনীয় ছিলেন ; আর দর্শন শাস্ত্র এবং তর্ক শাস্ত্রেও তিনি সুকৌশলী ছিলেন। জ্যোতির্বিদ সাদ, কবি ওবায়েদ এবং মৌলানা ইলমুদ্দীন যাহারা দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু মহানবীর আইন সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতেন না, তাহারা সর্বদাই তাহার পরিচর্যা করিতেন ; আর তাহাদের সাহচর্য হইতে আর যুক্তিবাদী বিদ্যায় প্রতিনিয়ত পাঠ দ্বারা তাহার এই ধারণা হয় যে, সত্য একমাত্র শেষোক্তটিতেই নিহিত আছে। ঐতিহ্যগত বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি শুধু তাহাই গ্রহণ করিতেন যাহা যুক্তিবাদী বিদ্যার সঙ্গে একমত। শুধু হাদিসের উপর ভিত্তি করিয়া কোন কিছু বিশ্বাস করিতে তিনি অস্বীকার করিতেন। তবু আব্বাসীয় খলিফাদের প্রতি তাহার এত গভীর বিশ্বাস ছিল এবং তিনি তাহাদের এত অনুগত ছিলেন যে তাহার নিকট হইতে অনুমতি না পাইয়া কোন শাসনকার্য আরম্ভ করা সম্পূর্ণরূপে বে-আইনী বলিয়া গণ্য করিতেন। তাহার দূতের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পদব্রজে গমন করিতেন।

নূতন প্রদেশ বিজয়ে এবং তাহার রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহে তিনি এত অধিক পরিশ্রম করিতেন যে অল্পকালের মধ্যেই গুজরাট এব মালব এব' দেওগীর এবং তিলাঙ্গ

এবং কম্পিল। এবং ধোর সমুদ্র এবং মাবার এবং তিরহুত এবং লক্ষ্ণাবতী এবং সাতগাম এবং সোনারগাম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীনে আনয়ন করা হয়; আর রাজস্ব এবং এই সমস্ত প্রদেশের আয় এবং ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব দোয়াবের শহরগুলির হিসাবের ন্যায়ই দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিত। আর গভর্ণর এবং অন্যান্য অফিসারগণের কর্তৃত্ব এত দৃঢ়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ঐ সব স্থানের কোন একজন গ্রাম-প্রধান বা অন্যান্য দুর্দান্ত লোক লুকাইয়া অথবা একগুঁয়েমি করিয়া সরকারের রাজস্ব হইতে একটি দিরামও রাখিতে সক্ষম হইত না। সাম্রাজ্যের সকল রায় এবং জমিদারগণ তাহার নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে সর্বদা সতর্ক হইয়া তাহার দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চল হইতে এত প্রচুর পরিমাণ ধনসম্পদ আসে যে সুলতানের অত্যধিক অপব্যয় এবং প্রচুর পরিমাণ উপহার প্রদান সত্ত্বেও কোষাগারে কখনও অর্থের অনটন দেখা দেয় নাই।

শ্লোক

এই সব ধনরত্ন আর স্বর্ণ হইতে পৃথিবীর শাসনকর্তা
প্রতিটি লোককেই প্রচুর ঐশ্বর্য প্রদান করেন;
যাহারা তাহার দ্বারে প্রার্থনা করে, তাহাদের তিনি দান করেন:
সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী, দীন দরিদ্রকে তিনি দান করেন।
ঐ ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে গমনের পথ কেহ লাভ করিতে পারে নাই
তিনি তাহার দয়াশীলতা হইতে ঐ পুরস্কার লাভ করেন।

যেহেতু তাহার উদ্ভাবন শক্তি অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাই তিনি পূর্ববর্তী রাজাগণ বহু চিন্তা ভাবনা করিয়া যে সব নিয়ম কানুন প্রণয়ন করিয়াছিলেন সেগুলি বাতিল করিয়া তিনি নূতন নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেন। প্রতিদিন তিনি একটি নূতন নির্দেশ দান করিতেন এবং একটি নূতন নিয়ম চালু করিতেন আর তাহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণর এবং অফিসারগণকে ফরমান জারি করিয়া বিভিন্ন নিয়ম কার্যে পরিণত করিতে নির্দেশ দিতেন। এই সব নির্দেশ যেহেতু প্রাচীন সুলতানগণের নির্দেশসমূহের এবং সুবিবেচনার পরিপন্থী ছিল, এইগুলি সার্বজনীন ঘৃণার সৃষ্টি করে; আর অফিসারগণ এইসব কার্যে পরিণত করিতে ব্যর্থ হন। আর যদি তাহারা লোকের ঘৃণা উপলব্ধি করিয়া এইগুলি কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করিতেন অথবা ইতস্ততঃ করিতেন, তবে তাহারা নিজেদিগকে নানারূপ নির্যাতন ও শাস্তির মুখে নিক্ষেপ করিতেন; আর অপর দিকে তাহারা যদি এইগুলিকে কার্যকরী করিতেন তবে

সাধারণ লোকের সর্বনাশ হইত, আর সাম্রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক কথায়, তিনি কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করেন, যেগুলি পরে বিশদভাবে উল্লেখ করা হইবে, যেগুলি তাহার প্রজাগণের সর্বনাশ সাধন করিল। যাহারা দরিদ্র তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল এবং বিলুপ্ত হইল, আর যাহাদের কিছু শক্তি ছিল তাহারা অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যেহেতু সুলতান মুহম্মদের স্বভাব মন্দ ছিল এবং কঠোর এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল আর নরহত্যা তাহার স্বভাবের অংশে পরিণত হইয়াছিল, তিনি শাস্তি দান করিতে এবং হত্যা করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। যেহেতু তাহার নির্দেশ কার্যকরী করা হইত না তিনি সমস্ত অধিবাসীদের তরবারি দ্বারা হত্যা করিতেন এবং বিস্তৃত এলাকা হইতে আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেন। অচিরেই অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠে যে তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বহু প্রদেশ তাহার আওতার বহির্ভূত হইয়া পড়ে, আর প্রকৃতপক্ষে তাহার রাজধানী দিল্লীতেও বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিভিন্ন জেলা হইতে রাজস্ব আগমন বন্ধ হইয়া যায় আর কোষাগারসমূহ শূন্য হইয়া যায়। মুখলিস-উল-মুলক যয়নুদ্দীন ইউসুফ বুঘরা, আবু রাজা এব গুজরাটের কাযির পুত্র এইসব কাজে সুলতানের সহযোগী হয়। আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে বন্দী এবং হত্যা করার কাজে তাহারা নিজেদের নিয়োজিত করে।

তাহার অসম্ভব পরিকল্পনাসমূহ এবং দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত কার্যাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে তিনি দোয়াবের ভূমির খাজনা শতকরা দশ গুণ বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করেন; আর এই উদ্দেশ্যে কতিপয় আবওয়াবের (সেস) সৃষ্টি করেন। ইহা বহু লোকের সর্বনাশের কারণ হয় আর কিছু সংখ্যক রায়তের মধ্যে অবাধ্যতার সৃষ্টি করে এবং কৃষি-কার্য স্থগিত রাখা হয়। এই সময় এক অনাবৃষ্টি হয় এবং দিল্লীতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; ফলে বহু গৃহ জনহীন হইয়া যায় এবং কোন কোন শ্রেণীর সমস্ত লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপারে মহা-বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাহার অপর একটি পরিকল্পনা এইরূপ ছিল যে তিনি দেওগীরকে তাহার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মনে করিয়া তাহাকে তাহার রাজধানী করিবার সংকল্প করেন। দেওগীরের তিনি নাম-করণ করিয়াছিলেন দৌলতাবাদ। ইহার ফলে তিনি দিল্লী নগরীকে, যাহা বোগদাদ ও দামেস্কের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল, জনশূন্য করিয়া ফেলেন এবং ইহার অধিবাসীদেরকে, যাহারা ইহার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদের পরিবার পরিজন এবং সন্তানাদিসহ নিজেদের দেওগীরে নিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন। প্রতিটি লোককে তিনি কোষাগার হইতে তাহার ভ্রমণের খরচ এবং তাহার গৃহের মূল্য প্রদান করেন। এইরূপে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। যেসব লোক যাত্রা

করিয়াছিলেন তাহাদের অধিকাংশই দেওগীরে পৌঁছিতে সক্ষম হইলেন না, আর যাহারা পৌঁছিলেন তাহারাও তথায় থাকিতে চাহিলেন না। মানুষের অবস্থার যে পরিবর্তন এবং ভাগ্যের উত্থান-পতন সংঘটিত হইল তাহা সাম্রাজ্যের ব্যাপার সম্বন্ধে মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। তাহার অপর একটি পরিকল্পনা ছিল এই যে তিনি পৃথিবীর যে চতুর্থাংশে জনবসতি আছে, তাহার সম্পূর্ণটা তিনি তাহার আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিবেন। যেহেতু এই কাজের জন্য তাহার সৈন্যসংখ্যা এবং তাহার রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না তাই তিনি তাহার এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এক প্রকারের তাম্রমুদ্রা প্রচলনের সংকল্প করেন এবং নির্দেশ দেন যে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ন্যায় টাকশালে তামার মুদ্রাও প্রস্তুত করা হইবে। তদনুযায়ী স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তংগার ন্যায় ক্ষুদ্র তামার মুদ্রাও প্রচলন করা হইল এবং এইগুলি কেনাবেচায় ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হিন্দুগণ প্রচুর পরিমাণ তামা টাকশালে আনয়ন করিল এবং এইগুলি দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া নিল আর এইভাবে তাহারা লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মুদ্রা একত্র সংগ্রহ করিল, আর এইগুলি দ্বারা তাহারা জিনিসপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র কিনিতে লাগিল। এইগুলি তাহারা দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করিত এবং স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তংগারূপে চালাইয়া দিত। প্রতিটি স্বর্ণকার তাহার গৃহে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিল এবং সেইগুলি বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। কিছুকাল পর দূরবর্তী স্থানসমূহে এই নির্দেশ অচল হইয়া যায়; আর এইসব স্থানে লোকেরা সাধারণ তামার বিনিময়ে তামার তংগা সংগ্রহ করে এবং এইগুলিকে এই নির্দেশ যেসব স্থানে তখনও প্রচলিত ছিল ঐ সব স্থানে নিয়া যায় এবং এইগুলিকে স্বর্ণ রৌপ্যের তংগার সঙ্গে বিনিময় করে। ক্রমে তামার তংগার সংখ্যা এত অধিক হইয়া যায় যে তাহাদের আর কোন মূল্যই থাকে না; এবং এইগুলি নুড়ি পাথর এবং মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরার ন্যায় মূল্যহীন হইয়া যায় আর স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তংগাসমূহ পূর্বের চেয়ে দুর্মূল্য হইয়া উঠে। ইহার ফলে কেনাবেচার ব্যাপারে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

শ্লোক

স্বর্ণ যখন তামার ন্যায় তুচ্ছ হইয়া যায়
তাহারা ইহা তামার মূল্যে সর্বদিক হইতে কিনিয়া আনে।

সুলতান মুহম্মদ যখন দেখিলেন যে তাহার নির্দেশ সম্পূর্ণ অচল হইয়া গিয়াছে আর তিনি ইহা অমান্য করিবার জন্য লোকজনকেও আর সাজা দিয়া যাইতে পারিতেছেন না, তখন নির্দেশ দিলেন যে, যে কোন লোক তাহার নিকট যে তামার

তংগা আছে তাহা কোষাগারে আনয়ন করিতে পারে; এবং এইগুলির বিনিময়ে প্রচলিত মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তংগা লইতে পারে। তিনি এই ভাবিয়া এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে সম্ভবতঃ ইহার ফলে জনসাধারণের চোখে তামার তংগার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের আদান-প্রদানে প্রচলিত হইবে। তামার তংগাসমূহ লোকের গৃহে জমা হইয়াছিল এবং অব্যবহৃত পড়িয়াছিল। এইগুলি সব কোষাগারে আনয়ন করা হইল এবং স্বর্ণ এবং তামার তংগার সঙ্গে বিনিময় করা হইল। তামা পূর্বের ন্যায়ই অপ্রচলিত থাকিয়া গেল আর কোষাগারগুলির সবই নিঃশেষ হইয়া গেল এইভাবে সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় মহা অসুবিধা দেখা দিল।

তাহার অপর একটি উদ্ভট পরিকল্পনা ছিল এই, যে তিনি খুরাসান এবং ইরাক জয় করিবেন; আর এইজন্য তিনি ঐ সব দেশের যেসব লোক তাহার নিকটে আসিতেন তিনি তাহাদিগকে মূল্যবান উপহার প্রদর্শন করিতেন আর এই উপায়ে তিনি তাহাদের হৃদয় জয় করিবার আশা করেন। তিনি এক সুবিশাল সেনাবাহিনীও সংগ্রহ করেন এবং তিনি তিন লক্ষ সত্তর হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের বেতন কোষাগার হইতে প্রদান করেন। সৈন্যগণ প্রথম বৎসরের জন্য তাহাদের বেতন লাভ করে; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর তাহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য এবং নূতন দেশ জয়ের জন্য সুলতানের কোন অবসর থাকে না। আর ফলে সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি কোন অর্থ লাভ করিবেন না; অথবা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোন লুণ্ঠিত দ্রব্যও তাহাদের হস্তগত হইল না। প্রথম বৎসরেই কোষাগারসমূহ সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং সেনাবাহিনী ছোট হইয়া যায়। সাম্রাজ্যে এবং কোষাগারে যে দুর্দশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ইহাও তাহার একটি কারণ। তাহার অবাস্তব পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সর্বশেষটি হইল এই যে তিনি হিমাচল[১] পর্বতশ্রেণী যাহা হিন্দুস্তান এবং চীন দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত, অধিকার করিবার সংকল্প করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি খ্যাতনামা আমীরগণকে এবং অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করেন; এবং তাহাদিগকে অসংখ্য সৈন্যের এক বাহিনীসহ প্রেরণ করেন যাহাতে তাহারা পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে এবং সেগুলি অধিকার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সম্পূর্ণ বাহিনী যখন পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন ঐ সব

১. ইলিয়ট এই পর্বতমালাকে লিখিয়াছেন করাজল আর এক টিকায় লিখিত হইয়াছে যে ছাপান মূল পুস্তকে ইহা করাজল আছে এবং একটি পাণ্ডুলিপিতে অনেকটা অনুরূপ পাঠ দেখা যায়, কিন্তু অপর একটিতে আছে করাজল। কিন্তু তবকাত-ই-আকবরীতে ইহা আছে হিমাজল, ইহা প্রকৃতপক্ষে হিমাচল হইবে।

অঞ্চলের অধিবাসী হিন্দুগণ সংকীর্ণ গিরিপথগুলি সুরক্ষিত করে; আর যে সব পথে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে সেগুলি বন্ধ করিয়া দেয়; আর তাহাদের অধিকাংশকেই হত্যা করে, এবং যে অল্প সংখ্যক লোক জীবন্ত ফিরিয়া আসে সুলতান মুহম্মদ তাহাদিগকে ফাঁসি দিবার নির্দেশ দান করেন।

যেহেতু সুলতান মুহম্মদ দিনের পর দিন এমন সব হুকুম জারী করিতে থাকেন যেগুলি কার্যে পরিণত করা যায় না; এবং অতুলনীয় দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করে; আর জনগণের পক্ষে এইগুলি সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে; দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এব' চরম বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সর্বত্র বিদ্রোহ মাথা তুলে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল মুলতানে বহরাম আবিহ-এর বিদ্রোহ। সুলতান মুহম্মদ যখন দেওগীরে এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অতি দ্রুতগতিতে দিল্লী আগমন করিলেন এবং তথায় তাহার সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করিয়া মুলতানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন বহরাম তাহার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিলেন; কিন্তু যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহাতে তিনি প্রাণ হারান।

শ্লোক

তোমার উপকারীর সঙ্গে যদি তুমি যুদ্ধ কর
তুমি আকাশের ন্যায় উঁচু হইলেও তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী।

তাহারা তাহার শির সুলতান মুহম্মদের নিকট আনয়ন করিলেন; এবং বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। মুলতানের লোকেরা বহরাম আবিহ-এর পক্ষ অবলম্বন করিবার ফলে সুলতান তাহাদিগকে শাস্তি দিবার সংকল্প করিলেন। সেইখুল ইসলাম শেখ রুকনুদ্দীন আল আজীজ, তাহার কবর যেন পবিত্র হয়, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য সুপারিশ করেন: আর সুলতান এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া বিজয় ও সাফল্য লাভের পর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

যেহেতু বিভিন্ন স্থান হইতে আগত লোকেরা চরম দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে দেওগীরে বসবাস করিতেছিলেন, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়; এবং দেওগীর বিধ্বস্ত এবং জনশূন্য হইয়া পড়ে, সুলতান দিল্লীতে অবস্থান করিতে থাকেন এবং দেওগীর গমন করেন না। এই সময়ে অত্যধিক অর্থ আদায়ের ফলে এবং রাজস্বের দাবী অধিক হওয়ার জন্য দোয়াবের সম্পূর্ণটা জনশূন্য হইয়া পড়ে; ফলে রায়তদের অনেকেই তাহাদের শস্যাগার পুড়াইয়া ফেলে এবং তাহাদের গবাদি পশুগুলি সঙ্গে লইয়া বিভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। সুলতান নির্দেশ দেন যে ইহাদের যাহাকেই ধরিতে পারা যাইবে, তাহাকেই হত্যা

করিতে হইবে, আর দেশটি লুণ্ঠন করিতে হইবে। ঐ দেশে অবস্থিত গভর্ণর এবং অন্যান্য অফিসারগণ লোকদের হত্যা করিলেন এবং দেশটি লুণ্ঠন করিলেন। যাহারা প্রাণ নিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইল তাহারা জঙ্গলে গমন করিল এবং তথায় লুকাইয়া রহিল।

শ্লোক

শহরে ও গ্রামে প্রতিটি লোক
তাহার উৎপীড়নে অসহায় হইয়া পড়ে।

এই সময়ে সুলতান শিকার করিতে বরণ গমন করেন এবং তিনি ঐ জেলার সম্পূর্ণটা লুণ্ঠন করিবার এবং অধিবাসীগণকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন। নিহতদের শিরগুলি বরণ দুর্গের প্রাচীন গাত্র হইতে ঝুলাইয়া বাঁধিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অপর একটি বিদ্রোহ হইল এই। ফখরা, যাহাকে মালিক ফখরুদ্দীন বলা হইল, বহরাম খানের ইন্তেকালের পর বাঙ্গালায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং কদর খানকে হত্যা করেন; আর লক্ষণাবতীতে অবস্থিত কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া লক্ষণাবতী, সোনারগাঁও এব সাতগাঁও অধিকার করেন। এই সময়ে সুলতান কান্যকুব্জের চতুর্দিকস্থ অঞ্চলটি লুণ্ঠনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জ হইতে মৌহামা[1] পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেশটি লুণ্ঠন করেন এবং তিনি অসংখ্য লোককে হত্যা করেন। তিনি তখন লুণ্ঠন এবং হত্যাকাণ্ড হইতে তাহার হাত অপসারণ করেন নাই; তাহার পূর্বেই সংবাদ আসে যে খরিতহদার (তহবিলবহনকারী) ইব্রাহীমের পিতা হাসান মা'বারে বিদ্রোহ করিয়াছে এবং ঐ স্থানের আমীরগণকে হত্যা করিয়া দেশটি দখল করিয়া লইয়াছে। সুলতান রাজধানীতে আগমন করিলেন এবং ইব্রাহীম খরিতহদার এবং সৈয়দ হাসানের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন এবং একবাহিনী সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া মা'বার অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি দেওগীরে পৌঁছিয়া তথাকার অফিসার, আমীরগণ এবং লোকদের উপর এমন অতিরিক্ত দাবী জানান যে সে দাবী মিটাইতে অসমর্থ হইবার ফলে তাহাদের অধিকাংশই প্রাণ হারান। তিনি মারাঠা দেশেও অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করেন এবং কঠোর এবং নিষ্ঠুর রাজস্বকারী নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি আহমদ আয়াযকে দিল্লী প্রেরণ করেন, আর তিনি স্বয়ং তিলঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন অরঙ্গলে পৌঁছেন তখন

১. তিনটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই দেওয়া আছে; একটিতে আছে হমুহাকা, ইলিয়টে দেওয়া আছে মলামৌ।

ঐ স্থানে প্লেগ[১] রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকই এই রোগে ভুগিতেছিলেন এবং কতিপয় সুবিখ্যাত ওমরাহ ইহাতে ইন্তেকাল করেন। সুলতান মুহম্মদও এই রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নায়েব উযির মালিক কাবুলকে ঐ দেশের দায়িত্ব দিয়া তাহা ত্যাগ করেন এবং দেওগীর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যখন শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি কয়েকদিনের জন্য নিজেকে চিকিৎসাধীন রাখেন। তিনি শিহাব-ই-সুলতানীকে নসরত খান উপাধি দান করেন, তাহাকে বিদাযের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ঐ দেশের জায়গীর, যাহার রাজস্বের পরিমাণ ছিল একশত লক্ষ তংগা, তাহাকে প্রদান করেন। তিনি কুতলুঘ খানকে দেওগীর এবং মারাঠা দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। যদিও তিনি তখনও অসুস্থ ছিলেন, তবু তিনি দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিপূর্বেই তিনি এক নির্দেশ জারি করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর যে সব লোক বর্তমানে দেওগীরে বসবাস করিতেছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে দিল্লী আগমন করিতে পারে কিন্তু তাহারা যদি দেওগীরে থাকিতে চায় তবে তথায় থাকিতে পারে। অধিকাংশ লোকই সুলতানের সঙ্গে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু কিছু সংখ্যক মারহাট দেশে থাকিয়া যায়। সুলতান আরও কিছুদিন দেওগীরে অবস্থান করেন এবং তৎপর তাহারা যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি দেখেন সমস্ত মালব দেশ এবং দিল্লীর পথিমধ্যে অবস্থিত শহরগুলি দুর্ভিক্ষের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ডাকচৌকির পথে যে পাইকগণকে রাখা হইযাছিল তাহাদের সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে এবং কৃষিকার্যের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে। সুলতান যখন দিল্লী পৌঁছিলেন, তিনি তাহাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইযাছে দেখিতে পাইলেন। দুর্ভিক্ষ এত ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে এক সের শস্য সতের দিরামেও ক্রয় করা যাইত না। বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং গবাদি পশুও খাদ্যের অভাবে মরিয়া যায়।

কবিতা

দামেস্কে এত ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ হয়
যে মহা-প্রেমিকগণও তাহাদের মধুর প্রেমালিঙ্গন ভুলিয়া যায়।
আকাশ মাটির প্রতি এত কৃপণ হইয়া উঠে
যে মাঠ আর ফলবাগান তাহাদের ঠোঁট ভিজাইতে পারে না।

১. মূল গ্রন্থে আছে ওয়াবা। ইলিয়ট ইহার অনুবাদ করিয়াছেন কলেরা।

সুলতান এই ধ্বংস এবং জনশূন্য অবস্থা দেখিয়া দেশের উন্নতি সাধনের প্রতি এবং কৃষিকার্যের উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি রাজকীয় কোষাগার হইতে লোকদের উপহার দান করেন এবং তাহাদিগকে কৃষিকার্যে নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু যেহেতু তাহারা চরম দুর্দশায় নিপতিত হইয়াছিল, তাই তাহারা অগ্রিমরূপে যাহা কিছু পাইল, তাহার কিছু অংশ খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিয়া ফেলিল; আর বাকী অংশ কৃষিকার্যে ব্যয় করিল; কিন্তু বৃষ্টির অনটন হেতু যাহা এই সময়ে সংঘটিত হয়, তাহারা কোনরূপ সুবিধা করিতে সক্ষম হয় নাই; এবং অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর শাস্তি লাভ করে (সম্ভবতঃ তাহারা তাহাদের অগ্রিম নেয়া অর্থ ফেরৎ দান করিতে ব্যর্থ হইবার ফলে)।

এই সময়ে শাহ আফঘান বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং মুলতানের নায়েব বেহযাদকে হত্যা করেন। মালিক ভুরা মুলতান হইতে পলায়ন করেন এবং দিল্লী আগমন করেন। সুলতান মুহম্মদ অতঃপর এক বিরাট বাহিনীসহ মুলতান অভিযানে যাত্রা করেন। তিনি মাত্র এক পর্যায় পথ গমন করিয়াছেন, এই সময়ে তাহার মাতা মালকা-ই-জাহান, যাহার উপরে সুলতান তুঘলক শাহের সম্পূর্ণ গৃহস্থালীর ব্যয় নির্বাহ এবং ব্যবস্থাপনা নির্ভর করিত, আল্লার করুণার সহিত একত্রিত হইয়া যান। সুলতান শোক এবং দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়েন এবং নির্দেশ দান করেন যে তাহার আত্মার শান্তির জন্য শহরে খাদ্য এবং খয়রাত বিতরণ করিতে হইবে; কিন্তু তিনি মুলতান অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন ঐ শহরের উপকণ্ঠে উপনীত হন, তখন শাহ তাহার নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করেন এবং তাহার লজ্জা এবং অনুতাপ প্রকাশ করেন; আর মুলতান ত্যাগ করিয়া আফঘানিস্তানে গমন করেন। সুলতান পথ হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় দুর্ভিক্ষ এত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ মানুষকে গিলিয়া খাইতেছিল। সুলতান পুনরায় কৃষিকার্যের প্রসারের জন্য যারপরনাই প্রচেষ্টা চালান এবং কোষাগার হইতে অর্থ প্রদান করেন। তিনি কৃষকগণকে কূপ খনন করিবার জন্য এবং তাহাদের ভূমিতে কৃষিকার্য করিবার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ দান করেন; কিন্তু তাহাদের দুর্দশার জন্য এবং আয়োজনের অভাবে এবং বৃষ্টি না হইবার ফলে, তাহাদের প্রতি অবহেলা এবং গাফলতির অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়। এই সময়ে দলে দলে মুন্দাহিরগণ এবং চৌহানগণ এবং বহতীয়াগণ এবং মিনাহগণ, যাহারা সুনাম এবং সামানা অঞ্চলে বসবাস করিত, দুর্দান্তভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করে এবং বিশাল জঙ্গলে নিজেদের জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় পানি এবং শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং এইগুলিকে নিজেদের নিরাপদ রক্ষাস্থান মনে করিয়া ঐ সব স্থানে জমায়েত

হয় ; আর দুর্দান্তভাবে এবং অবাধ্য ব্যবহার করিয়া রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখে এবং পথঘাটে ডাকাতি করিতে আরম্ভ করে। সুলতান তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাদের সুরক্ষিত স্থানগুলি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া, যেগুলি তাহাদের ভাষায় মণ্ডল নামে পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। তিনি তাহাদের দলপতিগণকে তাহার সঙ্গে নিয়া আসেন এবং তাহাদিগকে রাজধানীতে বসবাস করিবার স্থান দেন এবং তাহাদিগকে আমীর পদমর্যাদা দান করেন। এইভাবে তাহারা ঐ দেশে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা দমন করেন।

এই সময়ে কন্যা পাইক্, যিনি অরঙ্গলের উপকণ্ঠে ছিলেন, ঐ দেশের জমিদারগণের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নায়েব মালিক মকবুল পলায়ন করেন এবং দিল্লী আগমন করেন। অরঙ্গল হিন্দুদের দখলে চলিয়া যায় এবং রাজকীয় সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইয়া যায়। এই একই সময়ে কম্পিলার রাজার এক আত্মীয়-যাহাকে সুলতান মুহম্মদ ঐ স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যান এবং বিদ্রোহ করেন ; আর কাম্পিলাও সুলতানের রাজ্য হইতে চলিয়া যায়। এই-ভাবে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের মধ্যে গুজরাট ও দেওগীর ছাড়া আর কোন অংশ সুলতানের দখলে রহিল না। প্রত্যেক দিকেই বিপদ এবং বিদ্রোহ দেখা দিল। ইহাতে সুলতান আরও বেশী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং লোকদের শাস্তি দিবার নির্দেশ দান করিলেন। শেষোক্তগণ সুলতানের কঠোরতার কথা শুনিয়া তাহার প্রতি অধিকতর ঘৃণা অনুভব করিল, আর ইহার ফলে অধিকতর বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের সৃষ্টি হইল।

সুলতান কিন্তু কৃষিকার্যের প্রসার এবং দেশের উন্নতি সাধনে তাহার মনোযোগ নিবিষ্ট করেন ; কিন্তু বৃষ্টির অল্পতা হেতু তাহার প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হইল না। শেষ পর্যন্ত তিনি এই নির্দেশ দান প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন যে শহরের দরওয়াজাগুলি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে সব লোককে তথায় বল প্রয়োগ করিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের যেখানে ইচ্ছা যাইতে দেওয়া হইবে। এইসব লোকদের বহু সংখ্যক তাহাদের পরিবার পরিজনসহ স্থান ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা দেশ এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে গমন করিল। সুলতান নিজেও রাজধানী ত্যাগ করেন এবং পাতিয়ালি এবং কম্পিলা অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-তীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নির্দেশ দান করেন যে লোকেরা যেন কুটির নির্মাণ করেন এবং তাহাতে বাস করেন। এই স্থানটিকে বলা হইত সরগদওয়ারী। কারা এবং অযোধ্যা হইতে তথায় পণ্য আনয়ন করা হইত এবং ঐ স্থানে তাহা রাজধানীর চেয়ে কম দাম ছিল। আইনুল মুলকের জায়গীর ছিল অযোধ্যা এবং যাফরাবাদ এবং তিনি তাহার ভ্রাতাগণসহ তথায় বাস করিতেন এবং নিয়মিতভাবে

সরগদওয়ারীতে শস্য এবং বস্ত্রাদি পণ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র প্রেরণ করিতেন। যে সময়ে সুলতান সরগদওয়ারীতে ছিলেন, সেই সময়ে তিনি শেষোক্তজনের ব্যবহারের জন্য নগদ এবং পণ্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্রে মিলিয়া আশি লক্ষ তংগার জিনিসপত্র প্রেরণ করেন। সুলতান তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার দক্ষতা এবং সুশাসনের প্রতি তাহার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল।

সুলতান সরগদওয়ারীতে অবস্থানকালে চারিটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, কিন্তু সবগুলিই দ্রুত দমন করিয়া ফেলা হয়। প্রথমটি হইল কারায় নিযাম মাবিনের বিদ্রোহ। এই নিযাম মাবিন ছিলেন একজন অতি ঘৃণ্য লোক। এই লোকটি বোকার ন্যায় কথা বলিতেন এবং কাজ করিতেন এবং কোন মান মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন না; তিনি যেহেতু যেসব শর্তে তাহার জায়গীর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরিপূর্ণ করিতে অক্ষম হন, তাই বিদ্রোহ করেন এবং রাজকীয় চাঁদোয়া ধারণ করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন।

সুলতান মুহম্মদ তাহাকে ধ্বংস করিতে গমন করিবার পূর্বেই আইনুল মুলক তাহার ভ্রাতাগণসহ তাহাকে আক্রমণ করে এবং বন্দী করে এবং তাহার চামড়া ছুলিয়া ফেলিয়া তাহার শির সুলতানের নিকটে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীর জায়গীর শেখ-যাদা বস্তামীকে দেওয়া হয়। সুলতানের ভগ্নী তাহার গৃহে ছিলেন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে যাহারা তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের সাজা দেওয়ার ভার শেখ-যাদাকে দেওয়া হয়; এবং তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলেন। পরবর্তী বিদ্রোহ করেন শিহাব-ই-সুলতানী, যাহার উপাধি ছিল নসরত খান। তিনি একশত লক্ষ তংগা দিবার শর্তে সম্পূর্ণ বিদর দেশটি জায়গীররূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ পরিমাণ অর্থ দিতে ব্যর্থ হইয়া বিদ্রোহ করেন এবং বিদর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওগীর হইতে কুতলুক খানকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয় এবং তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য অন্যান্য আমীরগণকে দিল্লী হইতে প্রেরণ করা হয়। কুতলুক খান বিদর দুর্গটি অবরোধ করেন এবং কতিপয় শর্তে শিহাব-ই-সুলতানীকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। এইরূপে এই বিদ্রোহটিও দমন করা হয়। ইহার এক মাস গত হইবার পূর্বেই, যখন যাফর খানের ভাগীনেয় আলী শাহকে, যিনি একজন আমীর যাদাহ ছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য দেওগীর হইতে গুলবার্গে প্রেরণ করা হইয়াছিল, ঐ স্থানটিতে অফিসার শূন্য দেখিয়া গুলবার্গের শাসনকর্তা বহরণকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করে; আর তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তিনি বিদরে গমন করেন এবং ঐ স্থানের নায়েবকেও হত্যা করিয়া ঐ স্থানটি অধিকার করেন। সুলতান মুহম্মদ তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য কুতলুক খানকে প্রেরণ

করেন ; এবং দিল্লীর কতিপয় আমীরকে এবং ধার-এর সেনাবাহিনীকে তাহার সঙ্গে গমনের নির্দেশ দান করেন। আলী খান কুতলুক খানের মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। অতঃপর তিনি বিদর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন আর কুতলুক খান তাহাকে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন এবং তিনি এবং তাহার ভ্রাতাগণকে সুলতানের নিকট সরগদওয়ারীতে প্রেরণ করেন। সুলতান আলী শাহ এবং তাহার ভ্রাতাগণকে ঘযনীনে প্রেরণ করেন এবং তাহারা যখন ঘযনীন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি উভয় ভ্রাতাকে হত্যা করেন।

ইহার পর সুলতান মাহমুদ দেওগীরের শাসনভার আইনুল মুলক-এর উপর ন্যস্ত করেন, আর তিনি কুতলুক খানকে ঐ স্থান হইতে ডাকিয়া পাঠান। ইহার পূর্বে দিল্লীতে কতিপয় লোকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহারা ঐ স্থানে শস্যের অগ্নিমূল্যের অজুহাতে দিল্লী ত্যাগ করেন এবং অযোধ্যা এবং যাফরাবাদ গমন করেন; আর নিজেদের আইনুল মুলক এবং তাহার ভ্রাতাগণের আশ্রয়ে ন্যস্ত করেন। ইহাতে সুলতানের ক্রোধের উদ্রেক হয়, কিন্তু তিনি তাহা প্রদর্শন না করাই সুবিবেচনার কাজ বলিয়া গণ্য করেন। আইনুল মুলক কিন্তু তাহার প্রতি সুলতানের ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন; এবং ভীত হইয়া উঠেন। যে সময়ে দেওগীরের শাসনভার তাহার হস্তে সমর্পণ করা হয় এবং তাহাকে তাহার অনুচরগণ এবং পরিজনসহ ঐ স্থানে গমনের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি ইহাকে সুলতানের ধূর্তামী এবং বিশ্বাসঘাতকতা রূপে গণ্য করেন; আর ইহার ফলে তিনি তাহার নিজের স্বার্থ নিরাপদ করিতে সচেষ্ট হন। সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি অযোধ্যা এবং যাফরাবাদ হইতে তাহার ভ্রাতাগণ এবং তাহার সৈন্যগণকে তলব করেন, আর তাহারা যখন আগমন করিতেছিল, সেই সময় সহসা এক রাত্রিতে তিনি সরগদওয়ারী ত্যাগ করেন এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তাহার ভ্রাতাগণ চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ সরগদওয়ারীর সন্নিকটে আগমন করিয়া, ঐ স্থানের উপকণ্ঠে সুলতানের যে সব অশ্ব এবং হস্তীসমূহ মাঠে বিচরণ করিতেছিল, সেগুলিকে তাড়াইয়া তাহাদের নিজেদের শিবিরে নিয়া যায়। সুলতান অত্যন্ত বিচলিত হইয়া সামানা এবং আমরোহা এবং বরণ এবং কোল-এর এই সেনাবাহিনীকে তলব করেন। আহমদ আয়াযও দিল্লীর সেনাবাহিনীসহ আগমন করেন। অতঃপর সুলতান তাহার সমস্ত সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া কান্যকুব্জ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ঐ শহরের উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করেন। আইনুল মুলক এবং তাহার সৈন্যবাহিনীও তাহার সম্মুখে শিবির স্থাপন করে।

কবিতা

মস্ত হস্তীর গর্জন, এত ভয়াবহ
সাহসী সিংহের গলার গাঁট ভাঙ্গিয়া দেয়।[১]
পিতা এবং পুত্রে ভয়াবহ মারাত্মক কলহে লিপ্ত
ইহা সবই আনুষ্ঠানিক; পৃথিবী হইতে সকল ভালবাসা পলায়ন করিয়াছে।

অতঃপর তাহারা বাঙ্গর মৌ এর ফেরীতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয়। আইনুল মুলককে বন্দী করা হয় আর তাহার দুই ভ্রাতাকে হত্যা করা হয়। যুদ্ধে তাহার বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হয় আর যাহারা তরবারির মুখ হইতে অব্যাহতি পায়, তাহারা গঙ্গায় ডুবিয়া মরে। যে অল্প সংখ্যক নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হন, তাহারা হিন্দুদের দখলীকৃত অঞ্চলসমূহে তাহাদের হস্তে বন্দী হয় এবং নিহত হয়। তাহারা যখন আইনুল মুলককে সুলতানের নিকট আনয়ন করে, তখন শেষোক্ত জন ঘোষণা করেন যে তাহার কোনই দোষ নাই। তাহার লোকেরাই তাহাকে বিপথে চালিত করিয়াছে। তিনি আইনুল মুলককে তাহার সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ দান করেন, তাহাকে উৎসাহ দান করেন এবং তাহাকে একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রদান করেন। তিনি তাহাকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত করেন এবং তাহার পুত্রগণকে এবং তাহার সকল অনুচর এবং অধীনস্থ লোকদের ক্ষমা করিয়া দেন।

সুলতান বাঙ্গর মৌ হইতে বাহরাইচ গমন করেন এবং সিপাহসালার মাসুদ শহীদের কবর জিয়ারত করিতে গমন করেন। তিনি ছিলেন ঘযনীনের সুলতান মাহমুদের একজন আত্মীয় : আর ঐ মহাত্মার কবরের তত্ত্বাবধানকারীগণকে ঐ স্থানে অবস্থিত ফকিরগণকে প্রচুর অর্থ দান খয়রাত করেন। তিনি আহমদ আয়াযকে বাহরাইচ প্রেরণ করেন। যাহাতে তিনি লক্ষণাবতীর গমনের পথে অবস্থান করিতে পারেন এবং যাহাতে আইনুল মুলকের সেনাবাহিনী হইতে পলাতকগণ ঐ স্থানের অভিমুখে গমনে বাধাদান করিতে সক্ষম হন; আর যাহাতে তিনি অন্যান্য যাহারা দুর্ভিক্ষের জন্য অথবা সুলতানের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং অযোধ্যা এবং যাফরাবাদে বসবাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব জেলায় প্রেরণ করিতে পারেন। অতঃপর তিনি বাহরাইচ হইতে দিল্লী আগমন করেন। আহমদ আয়াযও তাহাকে প্রদত্ত কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিয়া তথায় তাহাঁর সঙ্গে যোগদান করেন।

---

১. এই পংক্তিগুলির অর্থ সুস্পষ্ট নয়।

যেহেতু সুলতানের মনে এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে আব্বাসীয় খলিফার অনুমোদন ছাড়া সাম্রাজ্য শাসন করা অসঙ্গত, আর প্রকৃত এরূপ অবস্থা মহানবীর প্রবর্তিত আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং তিনি ঐ বংশের কোন খলিফার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। অবশেষে তাহাকে জানান হয় যে ঐ বংশের একজন খলিফা মিশরে খলিফার আসনে সমাসীন আছেন, কামালুল-মুলকের উপদেশ অনুযায়ী ঐ খলিফার অবর্তমানেই তিনি তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, আর দুই তিন মাস কাল ধরিয়া তিনি তাহার নিকট সংবাদ এবং আবেদন প্রেরণ করেন এবং তাহার আনুগত্য এবং বশ্যতার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, শহরে জুম্মার নামাজ এবং ঈদের নামাজ বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত, আর তেমনি নির্দেশ দান করেন যে মুদ্রায় তাহার নামের স্থলে খলিফার নাম মুদ্রণ করিতে হইবে। অবশেষে আঃ হিঃ ৭৪৪ সনে মিশর হইতে হাজী সইদ সরসরী দিল্লীতে আগমন করেন এবং সুলতানের নিকট তাহার শাসন অনুমোদন করিয়া একটি ফরমান আনয়ন করেন এবং তাহার সমর্থনের আশ্বাস দান করেন এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ আনয়ন করেন। সুলতান তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে এবং তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে সমস্ত আমীর এবং ওলেমা এবং শেখগণসহ অগ্রসর হইয়া যান। উভয় দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়, তখন সুলতান অশ্ব হইতে অবতরণ করেন, খলিফার ফরমান তাহার মাথার উপরে স্থাপন করেন এবং সইদ সরসরীর পায়ে চুম্বন আঁকিয়া দেন, তাহাকে মহা-সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পদব্রজে মিছিলের অনুগমন করেন। তিনি শহরে গম্বুজ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং খলিফার ফরমানের উপর স্বর্ণ চাপাইয়া দেন। যে জুম্মার নামাজ এবং ঈদের নামাজ পড়া রহিত করা হইয়াছিল তাহা পুনরায় চালু করিবার জন্য তিনি নির্দেশ দান করেন। খলিফার নামে খোৎবা পাঠের হুকুম দেওয়া হয় এবং তিনি নির্দেশ দেন যে যেসব সুলতানের আব্বাসীয় খলিফা হইতে কোন অনুমতি ছিল না, খোৎবা হইতে তাহাদের নাম অপসারণ করিতে হইবে। তিনি সোনালী কারুকার্য-খচিত পোশাকে এবং অট্টালিকার কারুকার্যে খলিফার নাম প্রবর্তন করিতে হইবে। হাজী সইদ সরসরীর আগমনের পর সুলতান নির্দেশ দেন যে একটি স্মারকলিপি লিখিতে হইবে, আর তিনি তাহা হাজী রজব বরকা-ই এর সঙ্গে এমন একটি বহু মূল্য মনি সহ, যাহার ন্যায় আর একটিও কোষাগারে ছিল না, অন্যান্য ভেট এবং উপহারসহ খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহার রক্ষীবাহিনীর প্রধান মালিক কবিরকে, যিনি তাহার একজন ক্রীতদাস ছিলেন, এবং তাহার নীতির সৌন্দর্যে জ্ঞানের বলিষ্ঠতায়, এবং দয়াশীলতায়, বীরত্বে এবং আনুগত্যে ছিলেন অতুলনীয় আর যাহার চেয়ে প্রিয় তাহার আর কোন ভৃত্য ছিল না, তাহাকে তিনি এই করের অন্তর্ভুক্ত করেন; আর

তাহাকে খলিফার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি মালিক কবিরের দ্বারা একটি স্মারক-লিপি সম্পাদন করান, যাহাতে অঙ্গীকার করা হয় যে তিনি খলিফার খেদমত করিবেন এবং তাহা হাজী রজব বরকাই এর মারফতে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহাকে মালিক কবির খলিফি উপাধি দান করেন। দুই বৎসর পর হাজী রজব বরকাই মিশরের শেখ-উশ শায়উখ সহ দ্বিতীয়বার সুলতানের নিকট আগমন করেন এবং তাহার সঙ্গে একটি ফরমান আনয়ন করেন যাহাতে সুলতানকে খলিফার সহকারীরূপে ঘোষণা করা হয়, এবং একটি বিশেষ সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং আমীরুল মোমেনিনের পতাকা প্রদান করা হয়। সুলতান তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহার সমস্ত আমীর এবং অফিসারগণসহ অগ্রবর্তী হইয়া যান এবং তিনি তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করেন এবং ফরমানটি তাহার মাথায় স্থাপন করিয়া প্রবেশদ্বার হইতে মণ্ডপের অভ্যন্তরে গমন করেন। তিনি আমীরগণকে ফরমানটির প্রতি অভিবাদন করিবার নির্দেশ দান করেন; আর সর্বদা কোরান, হাদিস এবং এই ফরমানটি তাহার সম্মুখে রাখিতেন। তিনি খলিফার নামে লোকের আনুগত্য গ্রহণ করিতেন আর তাহার জারিকৃত প্রতিটি নির্দেশ এবং ফরমান—তিনি এই ফরমানের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারি করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেন; আর তিনি বলিতেন মোমিনগণের ইমাম ইহা করিতে বলিয়াছেন অথবা ঐ রূপ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিছুকাল পর তিনি মিশরের শেখ-উশ শায়উখকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন আর তাহাকে বহু পুরস্কার দান করেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেন। আর তিনি শেখ-উশ-শায়উখের মারফতে খলিফার গ্রহণের জন্য প্রচুর সম্পদ এবং বহু মূল্যবান মণিমানিক্য প্রেরণ করেন। তিনি সমুদ্রপথে গমন করেন। ইহার পর দুইবার ব্রোচ এবং কামবায়াতে সুলতানের নিকট খলিফার ফরমান আসে, আর উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ঐগুলিকে মহা-শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন করেন এবং ভেট এবং উপহার দানের প্রথাও অনুসরণ করেন। বোগদাদের মখদুম-যাদা যখন সুলতানের নিকট আগমন করেন, তখন শেষোক্ত জন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী পালাম পর্যন্ত গমন করেন এবং তিনি তাহার অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তাহাকে এক লক্ষ তংগা, একটি পরগণা এবং সিরি মণ্ডপ এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত ভূমির সমস্ত রাজস্ব এবং অন্যান্য জলাশয় এবং উদ্যানসমূহ প্রদান করেন। যখনই মখদুম যাদা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেন, তখনই শেষোক্ত জন সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিতেন এবং কয়েক পা অগ্রসর হইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং তাহাকে নিজের পাশে সিংহাসনে বসাইতেন এবং তাহার সম্মুখে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আসন গ্রহণ করিতেন।

সুলতান আব্বাসীয় খলিফাগণের ফরমান লাভের পর, আর তাহার মতে এই-রূপে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী হইবার ফলে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং জাঁকজমকের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে অগ্রসর হন। সরগদওয়ারীতে বসতি স্থাপন করিয়া তিনি পুনরায় দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে এবং কৃষিকার্যের প্রসার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। এই সম্পর্কে তিনি কতিপয় নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। কৃষিকার্যের প্রসারের জন্য যে কোন ব্যবস্থা তাহার মনে হইত, তাহাদের প্রত্যেকটিকেই তিনি একটি আসলুব (বিধি) বলিতেন। তিনি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করিলেন আর তাহার নাম দিলেন আমীর-গোই বিভাগ। কোন বিধানই কিন্তু কোন কাজে আসিল না, বা কোন রূপ উন্নতি সাধন করিল না। অন্যান্য যে সব নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছিল এই যে সমস্ত দেশটিকে ত্রিশ ক্রোশের বৃত্তে ভাগ করিতে হইবে; আর এইসব বৃত্তগুলিকে সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমি চাষের অধীনে আনয়ন করিতে হইবে, আর যেখানে সেগুলি ইতিমধ্যেই আবাদের অধীনে আনয়ন করা হইয়াছে, ঐ সব স্থানে পূর্বের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। এই নির্দেশ কার্যকরী করিবার জন্য প্রায় একশত জন সিকদার বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। বহু লোক যাহারা ক্ষুধার্ত এব মহা-দুর্দশায় নিপতিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য বহু লোক, যাহারা লোভী এবং অর্থলিপ্সু ছিল, তাহাদের কার্যের শেষ পরিণতি কি হইবে তাহা না ভাবিয়াই ভূমি গ্রহণ করে এবং অগ্রিমরূপে এবং পুরস্কাররূপে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করে। এইসব অর্থ তাহারা তাহাদের তৎকালীন অভাব দূরীকরণে ব্যয় করে এবং তৎপর তাহারা যে শাস্তি পার্থিব বলিয়া জানিত তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে দুই বৎসরের মধ্যে আশি লক্ষ তংগারও বেশী অর্থ কোষাগার হইতে বিতরণ করা হয়। সুলতান যদি থাঠার অভিযান হইতে জীবিত ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইতেন তবে তিনি এই কার্যে নিযুক্ত একজন তত্ত্বাবধায়ককেও অথবা অন্যান্য অফিসার-দের একজনকেও জীবন্ত রাখিতেন না।

সুলতান সরগদওয়ারীতে থাকাকালীন অপর যে ব্যবস্থাটি তিনি প্রথম করিয়া-ছিলেন, তাহা হইল পুরাতন অফিসারগণকে বরখাস্ত করা এবং নুতন অফিসার নিয়োগ করা। যেহেতু সুলতানের নিকট রিপোর্ট দেওয়া হয় যে কুতলুক খান কর্তৃক নিযুক্ত লোক-দের অত্যাচার এবং অর্থ আত্মসাৎ করিবার ফলে মারহাট এবং দেওগীর প্রদেশদ্বয় ধ্বংস এবং জনশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং ইহাদের রাজস্ব পূর্বে যাহা ছিল তাহার এক-দশমাংশে নামিয়া আসিয়াছে তখন সুলতান মারহাটের রাজস্ব নূতনভাবে সাত কোটি নির্ধারণ করেন, আর ইহাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া সুরুর উল-মুলক, মখলিস-উল-মুলক, ইউসুফ বঘরা এবং আজীজ খামারকে চারিজন বিভাগীয় গভর্ণররূপে নিযুক্ত করেন।

তিনি ইমাদুল মুলক, সরির সুলতানীকে দেওগীরের উযির নিযুক্ত করেন ; আর ধারাওহর[1] নায়েব উযির নিযুক্ত করেন, কৃষিকার্যের জন্য অগ্রিম দানের এবং কৃষি সম্বন্ধীয় বিধি সমূহের কার্যকরীকরণের দায়িত্ব তাহার উপর ছিল। তিনি কুতলুক খানকে তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ এবং অনুচরগণসহ দেওগীর হইতে তলব করেন। ঐ স্থানের লোকেরা কিন্তু তাহার অপসারণে বেদনার্ত এবং দুঃখিত হয়, কারণ সুলতানের কঠোরতা সমস্ত দেশটিকে ছারখার করিয়া দিলেও দেওগীরের লোকেরা কুতলুক খানের আশ্রয়ে নিরাপদ ছিল এবং তিনি তাহাদের প্রতি যে সদয ব্যবহার করিতেন তাহার ফলে তাহারা সুখী এবং সন্তুষ্ট ছিল। মৌলানা নিযামুদ্দীন ব্রোচে ছিলেন, তাহাকে অন্য কোন অফিসার আগমন সাপেক্ষে দেওগীরে গমনের এবং শাসনভার গ্রহণ করিবার এবং ঐ স্থানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সুলতান নির্দেশ দেন যে কুতলুক খান যে রাজস্ব আদায় করিয়াছেন এবং তথায জমা করিয়া রাখিয়াছেন, যেহেতু পথ নিরাপদ না হওয়ায় তাহা দিল্লী প্রেরণ করিতে সক্ষম হন নাই—তাহা যেন ধারাগড়ে রাখা হয় ; ইহা দৌলতাবাদ দুর্গেরই অপর নাম এবং ইহা একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। কুতলুক খান দিল্লী আগমন করিবার পর সুলতান নিম্নশ্রেণীর লোক আজীজ খামারকে মালব শাসন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাহাকে বিদায় দিবার সময় সুলতান তাহাকে কতিপয় নির্দেশ দান করেন। ইহাদের মধ্যে, তিনি বলেন, 'আমি শুনিতে পাই যে, যে কোন প্রদেশে যে কোন বিদ্রোহ হয় তাহা ঐ স্থানের আমীর সদহগণ দ্বারা সৃষ্ট হয়, ইহারা সকল দুর্দান্ত লোককে সমর্থন করেন ; আর এইরূপে সকল বিদ্রোহের উৎসে পরিণত হয়। আপনি যদি তাহাদের কাহাকেও মন্দ স্বভাবের লক্ষ্য করেন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে আপনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের বধ করিবেন।'' আজীজ খামার যখন ধার দেশে পেঁৗছিলেন এবং ঐ স্থানের শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিলেন তখন তিনি প্রদেশের আমীর সদহগণের আশি জনেরও অধিক নেতাকে কোনরূপ উপযুক্ত তদন্ত এবং বিবেচনা ছাড়াই গ্রেপ্তার করেন এবং তাহাদের শিরচ্ছেদ করেন। তিনি ইহা বিবেচনা করিলেন না যে গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং অন্যান্য প্রদেশের আমীর সদহগণ ইহাতে ভীত হইয়া উঠিবে এবং নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে। ঐ সময়ে ইউযবাশিগণকে বলা হইত আমীর সদহ। আজীজ খামার যখন তাহার কার্যাবলীর এক বিবরণ লিখিলেন এবং তাহা সুলতানের নিকট পেশ করিলেন তখন শেষোক্ত জন অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহার সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া একটি ফরমান প্রেরণ করিলেন, আর একটি বিশেষ অঙ্গাবরণ

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে আনবাওহর ; কিন্তু অন্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে ধারাওহর।

পাঠাইলেন। তিনি আমীরগণকেও নির্দেশ দিলেন যেন তাহারাও তাহার নিকট প্রশংসাসূচক পত্র লিখেন এবং তাহাকে অশ্ব এবং সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রেরণ করেন। এই-রূপে সুলতান এই আজীজ খামারকে এবং অতি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কতিপয় লোককে সম্মানীত করেন এবং তাহাদিগকে অধিকাংশ আমীরের চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞের পুত্র বহনাকে[১] গুজরাট, সুলতান এবং বদাওন প্রদেশগুলি প্রদান করেন। উযির পদটি দেওয়া হয় এক মালীর পুত্রকে, যিনি ছিলেন একজন সর্বাপেক্ষা নীচ ব্যক্তি। নাপিত ফিরোয, এবং তামাক বিক্রেতা মাক্কা, এক মালীর পুত্রগণ এবং শেখ বাবু এব একজন জুলাহার পুত্র মানিককে সুলতানের নিকট সঙ্গী করিয়া সম্মানীত করা হয। তিনি তাহাদিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করেন এবং বড় বড় জায়গীর প্রদান করেন। তিনি আহমদ আয়াযের মকবিল নামক একজন ক্রীতদাসকে গুজরাটের উযির পদে নিযুক্ত করেন; এই লোকটি ব্যক্তিগতভাবে এবং মানসিক দিক দিয়া একজন অতি ঘৃণ্য লোক ছিলেন। সুলতান অসারভাবে কল্পনা করিতেন যে তিনি যদি নীচ এবং শযতান লোককে উন্নীত করেন, তবে তাহারা ধুলি হইতে উন্নীত হইযাছেন বুঝিতে পারিয়া এবং তিনি তাহাদের পালন করিতেছেন জানিযা বিশ্বস্ততার পথ হইতে বিচ্যুত হইবে না। কিন্তু তিনি ইহা বিবেচনা করেন নাই যে নীচ লোকেরা কখনও তাহাদের স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারে না, আর সাম্রাজ্যের কার্যাবলীর যথোপযুক্ত সম্পাদন তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যায় না। তিনি এই সত্য কথাটি বিস্মৃত হইযাছিলেন ঃ

শ্লোক

শয়তান এবং নীচ লোকের মাথা উত্তোলন করা
ইহাদের ন্যায় লোকের নিকট হইতে ভাল আশা করা
সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হারানোর সমান ;
ইহা সাপকে বুকে রাখিয়া লালন করার ন্যায়।

আজীজ খামারের ঘৃণ্য কাজের সংবাদ যখন বিভিন্ন প্রদেশের আমীর সদহগণের কর্ণগোচর হইল, তখন তাহারা তাহাদের সৈন্য সংগ্রহ করিল এবং উপযুক্ত সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। অন্যান্য তিনটি পাণ্ডুলিপিতে ইহা বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন বকশাই, মুক্তাদী এবং একলাই।

এই সময়ে গুজরাটের নায়েব মালিক মকবিল তিনি যে রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, তাহা এবং রাজকীয় অশ্বপালনের অশ্ব এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রসহ দেওলী এবং বরোদা হইয়া দিল্লী আগমন করিতেছিলেন। গুজরাটের আমীর সদহগণ তাহার সবকিছু লুণ্ঠন করিয়া নেয় এবং তাহার রক্ষার ব্যবস্থার অধীনে যে সব ব্যবসায়ী ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাদের সকল পণ্যদ্রব্য এবং জিনিসপত্রও লুণ্ঠিত হয়। মালিক মকবিল সব কিছু হারান এবং একাকী নহরওয়ালা গমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং স্বয়ং গুজরাট গমনের সংকল্প করেন। যদিও কুতলুক খান তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে দেওলী এবং বরোদার আমীর সদহগণের বিদ্রোহ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তাহা দমন করিতে সুলতানকে স্বয়ং তথায় গমন করিতে হইবে, তাহার নিবেদনে কোনই ফল হয় না। তারিখ-ই-ফিরোয শাহীর লেখক যিয়া-ই-বার্ণী বলেন, যে কুতলুক খান তাহার মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং নিবেদন করেন যে সুলতানের অনুগ্রহে তাহার এত অধিক সংখ্যক অনুচর এবং সৈন্য আছে যে তিনি এই বিদ্রোহ দমন করিবার দায়িত্ব নিতে পারেন; আর সুলতানের স্বয়ং ঐ স্থানে গমনের ফলে দেশের অন্যান্য অংশে অন্যান্য বিশৃঙ্খলা এবং দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

শ্লোক

সুলতানের পদক্ষেপ, যদি সূর্যের মত হয়, ইহা ঘুরিয়া বেড়ায়;
ইহা যেখানেই যায়, ইহা ধ্বংস ডাকিয়া আনে।

সুলতান তাহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না এবং এক সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করিবার নির্দেশ দান করিলেন। তিনি তাহার চাচাত ভাই মালিক ফিরোযকে দিল্লীতে তাহার অবর্তমানে মালিক কবির আহমদ আয়াযের সহযোগে, তাহার প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন এবং রাজধানী হইতে পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত সুলতানপুরে শিবির স্থাপন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। তথায় আজীজ খামারের নিকট হইতে এক আবেদন তাহার নিকট পৌঁছে। তিনি নিবেদন করেন যে যেহেতু দেওলী এবং বরোদার আমীর সদহগণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে এবং তিনি তাহাদের নিকটে অবস্থান করিতেছেন, "তাই তিনি ধারের সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। সুলতান তাহার সম্বন্ধে কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করিলেন এবং বলিলেন, "আজীজ খামার যুদ্ধের পন্থা সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইহা খুবই সম্ভব যে সে তাহার জীবন হারাইবে।"

ইহার অল্প পরেই সংবাদ আসে যে যখন আজীজ খামার বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করেন তখন তিনি তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন এবং তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া যান এবং বিদ্রোহীগণ অপমানজনকভাবে তাহাকে হত্যা করে। অতঃপর সুলতান সুলতানপুর হইতে যাত্রা করেন। যিয়া-ই-বার্ণী বিবরণ দিয়াছেন যে গুজরাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার সময় সুলতান তাহাকে বলেন, যে যদিও লোকেরা বলে যে তাহার কঠোরতার ফলেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাহারা যাহাই বলুক না কেন, আর বিদ্রোহ যত বেশীই হোক না কেন, তিনি তাহার পদ্ধতি পরিবর্তন না করিবার স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন। যিয়া-ই-বার্ণী আরও বলেন যে, অতঃপর তিনি বলেন, "আপনি ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, আপনি আমাকে বলিতে পারেন যে কোন কোন অবস্থায় সুলতানগণ কঠোর শাস্তি দান করিতে পারেন।" প্রত্যুত্তরে আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম যে তারিখ-ই কিস্রাতে উল্লেখ আছে যে সাত শ্রেণীর অপরাধ আছে যাহার জন্য কঠোর সাজা দিবার প্রয়োজন হয়, যথাঃ (১) সত্য ধর্ম হইতে বিচ্যুতি, (২) ইচ্ছাকৃত নরহত্যা, (৩) যাহার স্ত্রী জীবিত আছে সে রূপ কোন লোক যে স্ত্রী লোকের স্বামী জীবিত আছে তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করা, (৪) সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, (৫) কোন বিশৃঙ্খলার নেতৃত্ব করা বা কোন বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করা, (৬) সুলতানের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেওয়া এবং তাহাদিগকে সংবাদ এবং অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সাহায্য করা এবং (৭) সুলতানের নির্দেশ অমান্য করা এবং সেগুলি সম্বন্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা। ইহার পর সুলতান জানিতে চাহিলেন যে এইগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ অপরাধের শাস্তি হাদিসে অনুমোদন করা হইয়াছে? আমি সসম্মানে নিবেদন করিলাম যে সাত শ্রেণীর অপরাধের মধ্যে তিনটি হাদিসে উল্লেখ করা আছে, যথাঃ সত্য ধর্ম হইতে বিচ্যুতি, কোন মুসলমানকে হত্যা এবং ব্যাভিচার; আর অন্যান্য চারিটি রাজাগণ তাহাদের রাজ্যের সুশাসনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সুলতান বলিলেন, "আগেকার দিনে মানুষ কথায় এবং কাজে সত্যবাদী ছিলেন; কিন্তু বর্তমানে নীতিভ্রষ্টতার ফলে, লোককে সত্য পথে রাখিবার জন্য এবং তাহাদিগকে দুর্দান্ত এবং বিদ্রোহী হইতে বন্ধ করিবার জন্য আমি কঠোর শাস্তি দান অপরিহার্য বলিয়া মনে করি, যাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে নিরাপদ থাকিতে পারি। আর তাছাড়া আমার কোন সুবিজ্ঞ মন্ত্রী নাই, যিনি দেশটিকে বিজ্ঞতার সঙ্গে সুশাসন করিতে পারেন; যাহাতে রক্তপাত করিবার কোন প্রয়োজন না হয়।"

সুলতান যখন গুজরাটের সীমান্তে অবস্থিত আভু পর্বতে পৌঁছিলেন, তখন তিনি বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য একজন আমীরকে মনোনীত করিলেন। শেষোক্তগণ যুদ্ধ করিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া দেওগীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

সুলতান আভু হইতে বারোচ (ব্রোচ) আগমন করিলেন এব' সাম্রাজ্যের নায়েব উযির মালিক কাবুলকে আমীর সদহগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। মালিক কাবুল নর্বদা (নর্মদা) নদীর তীরে তাহাদের ধরিয়া ফেলেন এবং তাহাদের অধিকাংশ-কেই হত্যা করেন; আর তাহাদের শিশু এবং পরিবার পরিজনকে বন্দী করেন। যাহারা তাহাদের প্রাণ নিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইল, তাহারা সালির মুলিরের শাসনকর্তা মান্দেও-এর নিকট গমন করিল। শেষোক্তগণ তাহাদের লুণ্ঠন করেন এবং বিধ্বস্ত করেন এবং তৎপর বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। মালিক কাবুল কয়েকদিনের জন্য সুলতানের নির্দেশে নর্বদার তীরে রহিলেন এবং বারোচের অধিকাংশ আমীর সদহগণকে হত্যা করিলেন। যে অল্প সংখ্যক তাহাদের প্রাণ নিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইল তাহারা পৃথিবীর বুকের পরিব্রাজকে পরিণত হইল। সুলতান কয়েকদিন বারোচে অবস্থান করিলেন এবং বহু অনুসন্ধানের পর বারোচ এবং কামবায়াত এবং সম্পূর্ণ গুজরাট প্রদেশের যাহা সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠন করা হইয়াছিল, রাজস্বের যে অংশ লুণ্ঠনকারীদের নিকট পাওয়া গেল তাহা পুনরুদ্ধার করিলেন এবং তাহার কোষাগারে জমা দিলেন। যাহারা যে কোন প্রকারে এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল, তিনি তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার হুকুম দান করেন। তিনি যিয়া বান্দা, যাহা উপাধি ছিল মজদুদ্দীন এবং রুকন থানেশ্বরীর পুত্রকে, ইহারা ছিলেন এই যুগের সর্বাপেক্ষা দুষ্ট প্রকৃতির লোক, দেওগীরে প্রেরণ করেন। যাহাতে তাহারা ঐ স্থানের বিদ্রোহীদের বন্দী করিতে পারে এবং তাহাদের হত্যা করিতে সক্ষম হয়। দেশের সমস্ত অধিবাসীগণ, যাহারা সুলতানের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিল, তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং চরম বিচলিত হইল। ইহাদের পর সুলতান অন্যান্য আমীরগণকেও দেওগীরে প্রেরণ করিলেন; আর কুতলুঘ খানের ভ্রাতা মৌলানা নিযামকে এক স,বাদ প্রেরণ করিলেন যে তিনি যেন পনের শত অশ্বারোহী স'গ্রহ করেন এবং ইহাদের দেশের উল্লেখযোগ্য আমীর সদহগণসহ এই দুইজন আমীরের সঙ্গে যেন দরবারে প্রেরণ করেন। মৌলানা নিযাম এই নির্দেশ অনুযায়ী পনর শত অশ্বারোহী এবং ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ আমীর সদহগণসহ সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথম বিশ্রামস্থলেই আমীর সদহ এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাহারা যে ভয় ও সন্দেহ করিতেছিল তাহার ফলে একত্রিত হইল এবং আমীর দুইজনকে হত্যা করিল এবং মৌলানা নিযামকে বন্দী করিল এবং সুলতানের নির্দেশে যে অফিসারগণ দেওগীরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাদের শিরচ্ছেদ করিলেন। তাহারা রুকনুদ্দীন থানেশ্বরীর পুত্রকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; ধারাগড়ে অবস্থিত ধনসম্পদ হস্তগত করিল এবং মালিক মাল আফঘানের ভ্রাতা মালিক মাখকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। তাহারা ধনসম্পদ, অশ্বারোহী এবং

পদাতিক সৈন্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল আর মারহাট দেশটি বিদ্রোহীগণের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। মালিক মাখ আফঘানের অফিসার এবং অনুচরগণ এবং দেওগী ও বরোদার আমীর সদহগণ সকলেই দেওগীরে একত্র সমবেত হইলেন আর দেশের লোকেরা তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইল। সুলতান যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি বারোচ হইতে অনবরত পথ চলিয়া দেওগীরে আগমন করিলেন। বিদ্রোহীগণ তাহার মোকাবিলা করিলেন, পরাজিত হইলেন এবং তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইলেন। মাখ আফঘান, যিনি বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন, তাহার অনুচর এবং অফিসারগণসহ নিজেকে ধারাগড় দুর্গে সুরক্ষিত করিলেন। হাসান কাঙকু এবং মাখ আফঘানের ভ্রাতাগণ গুলবার্গ অভিমুখে পলায়ন করিলেন; আর দেবগীরের লোকেরা উচ্চ-নীচ সকলেই লুণ্ঠিত হইল। সুলতান মুহম্মদ, ইমাদ-উল-মুলক সরতেয্ সুলতানীকে অন্যান্য আমীরগণসহ গুলবার্গে প্রেরণ করেন যাহাতে তাহারা ঐ প্রদেশটিকে আয়ত্ত্বাধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হয় এবং পলাতক বিদ্রোহীগণের যাহাকেই তাহারা ধরিতে পারিবেন, তাহাকেই যাহাতে হত্যা করিতে পারেন। তিনি দেওগীরের বহু অধিবাসীকে নওরোয কারকুনির সঙ্গে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করেন। বিজয় বার্তা ঘোষণা করিয়া একটি গেজেট প্রেরণ করা হয়; এবং তাহা দিল্লীতে মঞ্চ হইতে পাঠ করিয়া শুনান হয়, এবং তথায় তাহারা জয়ঢাক বাজান। অতঃপর সুলতান দেওগীর এবং মারহাটের ব্যাপারসমূহ সুশৃঙ্খল করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু তিনি এই কাজগুলি শেষ করিবার পূর্বেই সংবাদ আসে যে তাহার বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাস তাঘী, যে তাহার সাহসিকতা এবং বীরত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার কপালে রাজদ্রোহের চিহ্ন অঙ্কন করিয়াছেন এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন; আর তিনি গুজরাটের আমীর সদহ এবং জমিদারগণকে তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন; আর নহরওয়ালায় আগমন করিয়া তিনি শেখ মুইযযুদ্দীনের নায়েব মালিক মুযাফফরকে হত্যা করিয়াছেন; আর শেখ মুইযযুদ্দীনকে এবং অন্যান্য অফিসারগণকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং তৎপর নহরওয়ালা হইতে এক বিরাট বাহিনীসহ কামবায়াতে গমন করিয়াছেন; আর ঐ শহরটি বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং তৎপর বারোচ গমন করিয়াছেন এবং এই সময়ে তথাকার দুর্গ অবরোধ করিতেছেন। সুলতান যখন এই স বাদ পাইলেন তখন তিনি বিরাট একদল সৈন্যসহ খুদাবন্দযাদা কাওয়ামুদ্দীন, মালিক জওহর, শেখ বুরহান বলারামি এবং যহীর-উজ-যাইউসকে দেওগীর রাখিয়া যান এবং দ্রুতগতিতে বারোচ অভিমুখে অগ্রসর হন। দেওগীয়ের তখনও যে সমস্ত অধিবাসী অবশিষ্ট ছিলেন, তিনি তাহাদের সকলকেই তাহার সঙ্গে নিয়া যান; এবং তিনি যখন বারোচ পৌঁছেন তখন তিনি নর্বদা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন।

তখন তাঘি বারোচ পরিত্যাগ করেন এবং কামবায়াত গমন করেন। সুলতান এক বিরাট বাহিনীসহ মালিক ইউসুফ বাম্বাকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মালিক ইউসুফ যখন কামবায়াত পেঁৗছেন তখন তাঘি তাহার মোকাবিলা করেন এবং যুদ্ধ করেন এবং মালিক ইউসুফ বাম্বা এবং তাহার সঙ্গীয় কতিপয় আমীর নিহত হন; আর তাহার সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশ পলায়ন করে এবং বারোচে সুলতানের নিকট আগমন করে। তাঘি, শেখ মুইযযুদ্দীন এবং অন্যান্য যে সব অফিসার-গণকে তিনি বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ নর্বদা অতিক্রম করেন এবং কামবায়াত অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঘি কামবায়াত হইতে আসাওয়াল পলায়ন করেন। আর সুলতান যখন ঐ স্থানের সন্নিকটে গমন করেন তখন তিনি নহরওয়ালায় পলায়ন করেন। অনবরত বৃষ্টি হইবার ফলে সুলতান এক মাসকাল আসাওয়ালে অপেক্ষা করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে তাঘি নহরওয়ালা হইতে আসাওয়ালা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন এবং গরি অপেক্ষা করিতেছেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ বৃষ্টির মধ্যেই আসাওয়াল হইতে যাত্রা করেন এবং গরিতে আগমন করেন। তাঘি এবং তাহার সৈন্যগণ যখন দেখিলেন যে সুলতানের বাহিনী আসিয়া পেঁৗছিয়াছে, তখন তাহারা নিজেদের মাতাল করিয়া নেয় আর যে সব লোক উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে জীবন দান করিতে যায় তাহাদের ন্যায় সুলতানের সেনাবাহিনী কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু তাহাদের অগ্রগতি হস্তীগুলির জন্য বাধা-প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারা কোন কিছুই করিয়া উঠিতে সক্ষম হয় না এবং পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং কতিপয় বৃক্ষের মধ্যে, যেগুলি ঐ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, আশ্রয় নেয়; আর তথা হইতে তাহারা নহরওয়ালা পলায়ন করে। বিদ্রোহীদের পাঁচশত লোক, যাহারা তাঘির সেনাবাহিনীর পশ্চাতভাগে ছিল, জীবন্ত বন্দী করা হয় এবং তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হয়।

অতঃপর সুলতান মুহম্মদ, মালিক ইউসুফ বাম্বার খানের পুত্রকে তাঘির পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য নহরওয়ালা অভিমুখে প্রেরণ করেন। যখন রাত্রি হইল তখন মালিক ইউসুফের পুত্র পথিমধ্যে অপেক্ষা করিলেন। তাঘি তাহার এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের পরিবার এবং পরিজনদের নহরওয়ালা হইতে আনয়ন করেন এবং রান অতিক্রম করিয়া কচ্ছের কান্ত-এ গমন করেন; আর তথায় কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া থাঠা পলায়ন করেন। তিন দিন পরে সুলতান নহরওয়ালা আগমন করিলেন এবং সহস্রলিঙ্গ জলাশয়ের তীরে শিবির স্থাপন করিলেন এবং গুজরাটের ব্যাপারসমূহে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। চতুর্দিক হইতে প্রদেশের গ্রাম প্রধান এবং রায়গণ তাহার নিকট আগমন করিলেন। তাহার জন্য কর আনয়ন করিলেন এবং সম্মানীয়

অঙ্গাবরণ এবং অন্যান্য অনুগ্রহ দ্বারা পুরস্কৃত হইলেন। যেসব বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ প্রদেশটিকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, সেই সব সুলতানের যত্ন এবং চেষ্টায় দূরীভূত হইল। তাঘির বাহিনীর কতিপয় আমীর তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাহারা রানা মণ্ডল সিরির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। শেষোক্ত জন তাহাদিগকে হত্যা করিলেন এবং তাহাদের শিরগুলি সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন।

সুলতান তখনও গুজরাটের ব্যাপারসমূহের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিলেন, যখন সংবাদ আসে যে হাসান কাঙকু এবং অন্যান্য বিদ্রোহীগণ, যাহারা ইতিপূর্বে দেওগীরে পরাজিত হইয়াছিল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় একত্র মিলিত হইয়াছে এবং ইমাদুল মুলক সরতেয্ সুলতানীকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে; আর খুদাবন্দযাদা কওয়া-মুদ্দীন, মালিক জওহর এবং যহীর উজ-জয়উশ দেওগীর হইতে ধারাগড় অভিমুখে গমন করিয়াছেন; আর হাসান কাঙকু দেওগীরে আগমন করিয়াছে এবং রাজকীয় চাঁদোয়া ধারণ করিয়াছে আর সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। ধারাগড় দুর্গ রক্ষা করিবার ভার যে সেনাবাহিনীর উপর ন্যস্ত ছিল তাহারাও তাহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছে, আর এইরূপে এক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে। সুলতান যখন ইহা শুনিলেন, তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং দুঃখে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বহু বিবেচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে এই সব বিশৃঙ্খলার সবগুলিই তাহার কঠোরতা এবং তাহার দ্বারা পুনঃপুনঃ শাস্তি দানেরই পরিণাম, আর যে অল্প কয়েকদিন তিনি নহরওয়ালায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সে কয়দিন তিনি বলা যাইতে পারে যে আরও শাস্তি দেওয়া হইতে বিরত থাকেন।

কবিতা

তুমি যদি দুর্বল হও, তোমার শত্রুর সাহস বাড়িয়া যাইবে
যদি অতি কঠোর হও, তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিবে;
শৈল্য চিকিৎসকের মত হও, কখনও কোমল, কখনও কঠোর
তিনি কাটিয়া ফেলেন, আর মলম দিয়া শান্ত করেন।

এই সময়ে সুলতান দিল্লী হইতে মালিক ফিরোয, আহমদ আয়ায, মালিক মমনীন, আমীর কতলীয়া এবং সদর জাহানকে তাহাদের সেনাবাহিনীসহ তলব করেন যাহাতে তিনি তাহাদিগকে হাসান কাঙকুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারেন, আর তাহারা এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু যেহেতু ক্রমাগত

সংবাদ আসিতে থাকে যে হাসান কাঙকুর চতুর্দিকে এক বিপুল বাহিনী সমবেত হইয়াছে, তিনি তাহাদের প্রেরণ করিতে বিলম্ব করেন ; আর স্থির করেন যে, গুজরাটের সব ব্যাপারের ফয়সালা করিয়া এবং কর্ণাল অধিকার করিয়া, যাহা সাধারণতঃ জুনাগড় নামে পরিচিতি, তিনি তাহার মন হইতে সকল চিন্তা ভাবনা দূর করিয়া, তিনি স্বয়ং হাসান কাঙকুকে ধ্ব স করিতে অগ্রসর হইবেন। এই কারণে তিনি দুই বৎসরকাল গুজরাটে অবস্থান করেন। প্রথম বৎসরে তিনি প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতি এবং তাহার সেনাবাহিনী সজ্জিত করিবার ব্যাপারে তামাম মনোযোগ নিবিষ্ট করেন। দ্বিতীয় বৎসরে তিনি জুনাগড় দুর্গ দখলে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কর্ণালের কেল্লা এবং ইহার অধীনস্থ স্থানসমূহ দখল করিবার পর, ঐ অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম প্রধান এবং রায়গণ তাহার নিকট তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। কচ্ছ অঞ্চলের শাসনকর্তা কঙ্কারও আসিয়া তাহার আনুগত্য প্রকাশ করেন।

যিয়া-ই-বার্ণী বলেন, যে এই সময়ে সুলতান তাহাকে বলেন, "আমার সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রকার রোগের শিকারে পরিণত হইয়াছে। আমি যদি এইগুলির একটির প্রতি মনোযোগ দেই তবে অন্যটি বাড়িয়া যায়। আপনি যেহেতু ইতিহাস গ্রন্থসমূহ পাঠ এবং চর্চা করিয়াছেন, বলিতে পারেন যে এই অবস্থার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা আপনি দিতে পারেন কি-না ?' তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে কোন দেশের লোকেরা যখন তাহাদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে ঘৃণা অনুভব করে, আর তাহার ফলে বহু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তখন সেই শাসনকর্তা তাহার কোন পুত্র বা ভ্রাতার, যিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিবার উপযুক্ত, পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন আর নিজে গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্যান্যগণ আবার যে সব অফিসার জনগণের বিরাগভাজন হইবার কারণ তাহাদের অপসারণ করাকেই এইরূপ রোগের উপযুক্ত প্রতিষেধকরূপে গণ্য করিয়াছেন।" প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন, "আমার কোন পুত্র বা অন্য কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে ; আর আমার শাস্তি দানের কঠোরতা শিথিল না করিবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। যাহা কিছু ঘটিবার তাহা ঘটুক।"

কর্ণাল হইতে পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত গোণ্ডালে সুলতান অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহার ঐ স্থানে আগমনের পূর্বেই, দিল্লীতে মালিক কবিরের ইন্তেকাল করিবার ফলে তিনি আহমদ আয়ায এবং সাম্রাজ্যের নায়েব উযির মালিক কাবুলকে রাজধানী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং খুদাবন্দযাদা এবং মখদুমযাদা এবং অন্যান্য আমীরগণকে দিল্লী হইতে গোণ্ডাল তলব করেন। সুলতান যখন গোণ্ডালে পৌঁছেন তখন এই লোকদের সকলেই হারেমের মহিলাগণ এবং বিরাট একদল অনুচরসহ তথায় আগমন

করেন। এইরূপে সুলতানের চতুর্দিকে এক বিপুল জনসমাবেশ হয়, ইতিমধ্যে সেনা-বাহিনীও সুসজ্জিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং সুলতানও তাহার রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি দিবালপুর, মুলতান, উছ এবং সিবিস্তান হইতে নৌকা সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে এইগুলির সবই থাঠায় একত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং গোণ্ডাল হইতে যাত্রা করিলেন; আর নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া তাহার সেনাবাহিনী এবং হস্তীসমূহসহ তাহা অতিক্রম করিলেন এবং নদীতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময়ে আমীর কাযঘন-এর নিকট হইতে পাঁচ সহস্র মুঘলসহ আগত আলতুন বাহাদুর সুলতানের সঙ্গে যোগদান করেন। শেষোক্ত জন তাহার এবং তাহার সৈন্যদের প্রতি মহা-অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি সোমরা নামীয় উপজাতিকে এবং তাহাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী দুরাত্মা তাঘিকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে থাঠা অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন থাঠা হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হন তখন মহরম মাসের দশ তারিখ। তিনি রোজা রাখেন এবং রোজা খুলিবার সময় তিনি কিছু মাছ ভক্ষণ করেন। তিনি যে জ্বরে ভুগিতেছিলেন, তাহা পুনরায় দেখা দেয়। ইহা সত্ত্বেও তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করেন এবং থাঠা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরবর্তী একটি স্থানের অভিমুখে গমন করেন; কিন্তু অসুখের প্রাবল্য হেতু তিনি ঐ স্থানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন। আঃ হিঃ ৭৫২ সনের ২১ শে মহরম পর্যন্ত দিনের পর দিন অসুখ বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর ঐ দিনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি আটাশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। যিয়া-ই-বার্ণী তাহার ইতিহাসে তাহার সম্বন্ধে নিম্নের প্রশস্তিটি লিখিয়া গিয়াছেন ঃ

কবিতা

এই পৃথিবীর বায়ু বিষ দ্বারা তিক্ত হয়
এই স্থানে আদম সন্তানদের নিকট সব ফলই বিষাক্ত!
হে শূন্যতার বন্ধু! তুমি বিরত হও!
এই শয়তানী এবং অন্তঃসারশূন্য দুনিয়ার কথা আর বলিও না
বিচারের ভোর জাগিয়া উঠিতেছে; আর আমরা নিদ্রিত!
পৃথিবীর ঘুমন্তগণ জাগিয়া উঠ।
ভোরের মলয় সমীরণ কি সুন্দর গালিচা প্রসারিত করিয়াছে!
হায়! আনন্দের ঐ শয্যা গুটাইয়া নাও!
ধ্বংসের দিন সমাগত! ওঠ আর খিলান ভাঙ্গিয়া ফেল
আর প্রাসাদের ছাদ চূর্ণ করিয়া দাও;

শাহ মুহম্মদ মৃত্যুর ধূলায় লুণ্ঠিত ;
নিজেকে শোকের নীল আবরণে ঢাকিয়া ফেল !
সমস্ত পৃথিবীতে যাতনার চীৎকারে রব উঠিতেছে
এই উজ্জ্বল চকচকে পোশাক ছিঁড়িয়া ফেল ছিঁড়িয়া ফেল ।

সুলতান ফিরোয শাহ

তিনি ছিলেন সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র । আর সিবিস্তানের শিবিরে সুলতান মুহম্মদ তুঘলক শাহের অসুস্থতা যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়, এবং তাহার মৃত্যুর সময় নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার চাচাত ভাই মালিক ফিরোয, যিনি নায়েব ছিলেন, আর যাহার তাহার উত্তরাধিকারী হইবার ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে সুলতান ন্যায়সঙ্গত উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেন, শেষোক্তের চিকিৎসা সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসার দাবী পূরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার প্রতি সুলতানের অনুগ্রহ এবং দয়া সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায় । সুলতান যখন দেখিলেন যে তাহার শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি নির্দেশ দেন যে মালিক ফিরোয তাহার উত্তরাধিকারী হইবেন । তিনি বলিলেন ঃ

শ্লোক

ওহে ! তোমার শাসনকালে তুমি উন্নতি কর। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হোক
কারণ বাহ ! আমার মাথা তাকিয়া ছাড়িয়া দিতেছে ।

থাঠার উপকণ্ঠে যখন সুলতান ইন্তেকাল করিলেন, সেনাবাহিনীতে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মালিক ফিরোয বারবক ইহা সুবিবেচনার কাজ বলিয়া মনে করিলেন যে, যে কোন ছলছুতায় তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বাহির করিতে পারেন তাহা দ্বারা আমীর কাযঘান কর্তৃক প্রেরিত তিনি (পাঁচ) সহস্র মুঘল অশ্বারোহীকে প্রধান সেনাবাহিনী হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের ধ্বংস সাধন হইতে ইহা রক্ষা করা যায় । ফলে তিনি ঐ দলের প্রধানগণকে এবং অন্যান্য অশ্বারোহীগণকে পুরস্কার এবং অঙ্গাবরণ এবং পোশাক প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন ; আর ইহাও নির্দেশ দেন যে তাহারা যেন তৎক্ষণাৎ সেনাবাহিনীর বাকী অংশ হইতে আলাদা করিয়া নেয় এবং ইহা হইতে যেন দূরত্ব রাখিয়া শিবির স্থাপন করে। এইরূপ পরিবেশে, সুলতান মুহম্মদের

ইন্তেকালের দুই দিন পরে, সেনাবাহিনী যখন মুঘলদের লুণ্ঠন ও আক্রমণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, বারমা শিরিনের জামাতা, নওরোয গুরগীন, যিনি সুলতান মুহম্মদ কর্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন, অকৃতজ্ঞার সঙ্গে মুঘলদের সঙ্গে যোগদান করেন; আর তাহারা যখন তাহাদের যাত্রা আরম্ভ করিবেন এবং যে সময় শিবিরে চরম বিশৃঙ্খলা এবং চাঞ্চল্য থাকিবে, ঠিক সেই সময়ে সেনাবাহিনীতে লুণ্ঠন, বন্দী করা এবং ধ্বংস করিবার হস্ত প্রসারিত করিবার জন্য উত্তেজিত করে। বহু সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং ঐ দিন বহু স্ত্রীলোক এবং শিশু মুঘল এবং থাঠার নিকৃষ্ট লোকদের দ্বারা বন্দী হয়। সৈন্যগণ ঐ দিনটি অবর্ণনীয় উদ্বেগ এবং ভীতির মধ্যে অতিবাহিত করে। পরদিন অতি যত্নের সঙ্গে সেনাবাহিনীকে সন্নিবেশ করা হয়, এবং তাহাদের যাত্রা আরম্ভ হয়। এই দিনেও মুঘলগণ এবং থাঠার লুণ্ঠনকারীগণ বিধ্বস্ত এবং লুটতরাজ করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী নদীতীরে পৌঁছিতে সক্ষম হয় এবং তথায় শিবির স্থাপন করে। তাহারা যেন রাখাল ছাড়া এক পাল ভেড়া এবং তাহাদিগকে নিহত এবং বিধ্বস্ত করা হইতে লাগিল। তৎপর মখদুমযাদা আব্বাসী এবং শেখ নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ আউধী, যিনি দিল্লীর প্রদীপরূপে সুবিখ্যাত ছিলেন এবং শেখ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার উত্তরাধিকারী ছিলেন, এবং ওলেমাগণ এবং শেখগণ এব' মালিকগণ এবং আমীরগণ একত্র সমবেত হইলেন এবং মালিক ফিরোয বারবককে অনুরোধ করেন যেন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কবিতা

সৈন্যদের সকলেই ভূমি চুম্বন করিল
যেখানে সুলতান তাহার শুভ পদ স্থাপন করিলেন;
যেখানে তিনি পদক্ষেপ করেন তথায় তাহারা তাহাদের মাথা রাখে
তাহার নির্দেশে তাহারা নিজেদের মুকুটে ভূষিত করে
তিনি যদি তাহাদের স্থান অগ্নি ও পানিতে পূর্ণ করিতেন
তবু তাহাদের হৃদয় তাহার প্রতি বিমুখ হইত না।

মালিক ফিরোয হেজাযে গমন করিবার এবং পবিত্র স্থানগুলিতে হজ্জ পালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিতে বলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত উচ্চ নীচ সকলের অনুরোধে তিনি আঃ হিঃ ৭৫২ সনের ২৪ই মহরম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং হাজার হাজার লোক যাহারা লুণ্ঠনকারীদের কবলে পতিত

হইয়াছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইহার পর তৃতীয় দিনে তাহারা এমন নিয়ম-তান্ত্রিকভাবে এবং এমন সুশৃঙ্খলরূপে অশ্বারোহণ করে যে যখনই মুঘলগণ বা থাঠার লুণ্ঠনকারীগণ তাহাদিগকে যে কোন দিক হইতেই আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা হয় এবং বন্দী করা হয় ; আর এইরূপে ঐ সময় পর্যন্ত তাহারা যে দুরবস্থায় ছিল তাহা বন্ধ হয়।

কবিতা

ফনিক্সের ন্যায় যখন রাজকীয় চাঁদোয়া প্রসারিত হয়
কোন পেচকের-ই তখন বাজপাখীর ভূমিকা পালনের সাহস হয় না।
তাহার মহত্বের সাথে পৃথিবী এত শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল
যে যুদ্ধের জিনিসগুলিও সুমধুর আলাপন করিল।

সুলতান ফিরোয শাহের সিংহাসনারোহণের পর প্রথম বৎসরেই বিনয়ী এবং সরল উভয় প্রকারের লোকই বহু রাজকীয় উপকার লাভ করিল। কিছুকাল পর, তাহারা অনবরত পথ চলিয়া সিবিস্তানে আসিয়া পৌঁছিল, আর তথায় আমীর, মালিক, শেখ এবং সেনাবাহিনীর সেনাপতিগণকে অশ্ব, সম্মানীয় অঙ্গাবরণ, তরবারি এবং কটিবন্ধ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। সিবিস্তানের লোকেরাও পুরস্কার এবং ভাতা লাভ দ্বারা সম্মানীত হয়। ঐ স্থান হইতে সেনাবাহিনী হিন্দুস্তানের অভিমুখে যাত্রা করে আর তাহারা যে সব শহর ও গ্রামে আসে সে সবের প্রত্যেকটির স্থানের লোকদের হৃদয়কেই উপহার ও ভাতা দান করিয়া উৎফুল্ল করা হয়।

শ্লোক

সতর্কতার সঙ্গে তিনি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিতেন
উপহার দ্বারা তিনি সকলের অভাব দূর করিলেন ;
তাহার ধন সম্পদ সকল মানুষকেই ধনী করিল ;
তাহার সেনাবাহিনী পরিশ্রম করিয়া তাহার মণিমাণিক্য বহন করিল।

ঠিক এই সময়েই মালিক আহমদ আয়াযের, যাহার উপাধি ছিল খাজা ই-জাহান, বিদ্রোহের সংবাদ আসে ; তিনি ছিলেন সুলতান মুহম্মদ শাহের একজন অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী আর তিনি তাহার অবর্তমানে তাহাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া যান। দেখা গেল যে তিনি এক অজ্ঞাত কুলশীল বালককে সিংহাসনে স্থাপন

করেন আর তাহাকে সুলতান মুহম্মদ শাহের পুত্ররূপে ঘোষণা করেন ; আর তাহাকে সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ উপাধি দান করেন, এবং নিজেকে সর্বময় ক্ষমতাসহ রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। সুলতান (ফিরোয শাহ্) তাহার এইসব ঘৃণ্য কার্যাবলী, তাহার বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত বলিয়া গণ্য করেন ; তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া এক হুকুমনামা জারি করেন ; এবং তাহাকে বহু সুবিজ্ঞ উপদেশসহ তাহার নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করেন। হস্তীসমূহের তত্ত্বাবধায়ক মালিক সরফুদ্দীন এই সংবাদ মালিক আহমদ আয়াযের নিকট নিয়া যান ; কিন্তু তিনি ইহাতে কোন কর্ণপাত করিলেন না আর তিনি, সৈয়দ জালাল, মালিক খিলান, মৌলানা নজমুদ্দীন রাজি এবং তাহার নিজস্ব মৌলানা-যাদা দাউদের অসময়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়া এই মর্মে এক সংবাদ প্রেরণ করেন যে সাম্রাজ্য এখনও সুলতান মুহম্মদের দখলে আছে ; আর তাহার উচিত হইবে নায়েব-এর পদ গ্রহণ করা এবং উত্তম সহকারে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করা ; আর তিনি যে কোন আমীরকে পছন্দ করিবেন তাহাকেই তিনি তাহার সহকর্মীরূপে নিতে পারিবেন। এই প্রতিনিধিদল আগমনের পর সুলতান এক সভা আহ্বান করেন ; এবং শেখ নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ আউধী, মৌলানা কামালুদ্দীন আউধী, মৌলানা কামালুদ্দীন সামানা, মৌলানা শামসুদ্দীন বাখারযী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার এবং মালেকগণকে একত্র ডাকিয়া সমস্ত বিষয়টি তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করেন ; এবং এই বিষয়ে তাহাদের মতামত কি জানিতে চাহেন ; আর মহানবীর বিধান অনুযায়ী তাহার কর্তব্য কি ? মালিক কামালুদ্দীন বলিলেন, যে কেহ সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহা চালাইয়া যাইবেন। সুলতান আহমদ আয়ায কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিগণকে পাহারাধীন রাখিলেন, আর তাহার মৌলানা-যাদা দাউদের মারফতে. পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইনিও আহমদ আয়াযের প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সং উপদেশ দিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। যখন দাউদ আগমন করেন, তখন আহমদ আয়ায বুঝিতে পারেন যে তিনি তাহার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না, যেহেতু তিনি দেখিলেন যে আমীর-গণের অধিকাংশ, বিশেষভাবে গৃহাধ্যক্ষ মালিক নাথু, এবং মালিক হাসান মুলতানী এবং তাহাদের ন্যায় অন্যান্যগণ, যাহারা প্রথমে তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা সুলতানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এবং তাহার সেনাবাহিনীতে যোগ দিবার জন্য দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে তাঘি, যে বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং গুজরাটে গমন করিয়াছিল, ঐ স্থানে নিহত হইয়াছে, আর সর্ব দিকেই সুলতান মুহম্মদের সৌভাগ্যের লক্ষণসমূহ দেখা যাইতে লাগিল। আহমদ আয়ায অত্যন্ত উদ্বেগ এবং হতাশ হইয়া

আনুগত্য প্রকাশ করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পক্ষে সুপারিশ করিবার জন্য আশরাফ-উল-মূলক এবং মালিক খালজিন, এবং মালিক কবির এবং হাসান আমীর-ই-মিরানকে প্রেরণ করেন। সুলতান তাহাকে ক্ষমা করেন এবং তাহাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেন। আহমদ আয়ায তাহার অনুচরদেরসহ, তাহাদের মাথা অবনত করিয়া এবং খালি মাথায় আর তাহাদের পাগড়ী তাহাদের গলায় বাঁধিয়া আগমন করেন; আর হানসীর নিকটে তাহার অভিবাদন প্রদান করেন। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে আহমদ আয়াযকে হানসীর কোতোয়ালের নিকট প্রদান করা হইবে এবং মালিক ঘিয়াসুদ্দীন খিতাবকে (অর্থাৎ যে বালকটিকে আহমদ আয়ায সুলতান ঘোষণা করিয়াছিলেন—তাহার নামের সঙ্গে কেন খিতাব শব্দটি যুক্ত করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট নয়) তাবারিন্দা প্রেরণ করিতে হইবে; আর শেখযাদা বস্তামীকে নির্বাসন দণ্ড দিতে হইবে। নিম্নের প্রবচন অনুযায়ী সময়ের ভাষা মুখর হইয়া উঠিল ঃ

কবিতা

তোমার শত্রুদের সকলেরই বিভিন্ন পথে সময় পাইয়াছে
এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসের ঘূর্ণিঝড়ে নিমগ্ন হইয়াছে; এক জন মৃত;
আর ভাগ্য তাহার ধারাল ছোরা দ্বারা একজনের গলা কাটিয়াছে;
আর একজন তাহার সমস্ত পরিবারসহ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আঃ হিঃ ৭৫২ সনে সুলতান ফিরোয শাহ পরিপূর্ণ ক্ষমতা এবং মহা আড়ম্বরের সঙ্গে দিল্লীতে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন, আর ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতার সুসমাচার ছড়াইয়া দেন; আর উচ্চ নীচ এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানব জাতির সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়; আর ছোট বড় সকল লোকের মধ্যে মহা আনন্দ দেখা দেয়।

কবিতা

মহা সৌভাগ্যবান সুলতান, তাহার শত্রুদের ধ্বংসকারী
শুভ লক্ষণের তারকার অধীনে সিংহাসনে আরোহণ করেন;
তাহার সমুজ্জ্বল মহত্ব, বিজয় ও সাফল্যে মণ্ডিত হয়
এই যুগে নানা আনন্দ আর মহা উল্লাস আনয়ন করে।

আঃ হিঃ ৭৫৩ সনের ৫ই সফর সুলতান এক প্রমোদ ভ্রমণে এবং শিকার অভিযানে সরযুর পর্বতশ্রেণীর অভিমুখে অগ্রসর হন। দেশের অধিকাংশ জমিদার আগমন করেন তাহাদের কর্ণে বন্ধনের কুন্তল আর স্কন্ধে খেদমতের জিনের কাপড়সহ তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

কবিতা

তাহার জাঁকজমক কি ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।
আনন্দ আর বিজয়ের কি ধ্বনি আকাশে উত্থিত হইয়াছে।
ইহা কি তাহার সেনাবাহিনীর উত্থিত ধূলা অথবা বেহেশতের সমীরণ
যে মানুষের জীবনে শান্তি সুগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে।

এই বৎসরের ৩রা জমাদিউল আউয়াল দিল্লীতে শাহযাদা মুহম্মদ খান জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান মহা-ভোজ উৎসব পালন করেন এবং লোকদের পুরস্কার প্রদান এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। পর বৎসর আঃ হিঃ ৭৪৫ সনে তিনি কালানুরে এবং ঐ অঞ্চলের পর্বতসমূহের পাদদেশে তিনি শিকার করেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি সরযু তীরে সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পুত্র শেখ সদরুদ্দীনকে সেইখ-উল-ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি সাম্রাজ্যের নায়েব উযির মালিক কাবুলকে খান-ই-জাহান উপাধি দান করেন এবং তাহাকে উযির নিযুক্ত করেন, আর খুদাবন্দযাদা কাওয়ামুদ্দীনকে খুদাবন্দ খান উপাধি দান করেন এবং তাহাকে ভকিলদার নিযুক্ত করেন। মালিক তাতার, তাতার খান হন; আর মালিক শরফ হন নায়েব ভকিলদার। সরখ-উল মুলককে করা হয় শিকার বেগ; আর খুদাবন্দযাদা ইমাদ-উল মুলককে করা হয় সিলাহাদার। আইন-উল মুলক দিওয়ানের মুস্তৌফি এবং মুশারফ পদটি লাভ করেন আর মালিক হাসান আমীর-ই-মিরানকে দেওয়া হয় ইসতিফা-ই-কুল পদটি।

আঃ হিঃ ৭৫৪ সনের সাওয়াল মাসে সুলতান খান-ই-জাহানকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাসহ রাজধানীতে রাখিয়া যান এবং এক বিরাট বাহিনীসহ লক্ষণাবতীতে এক অভিযানে যাত্রা করেন; যাহাতে তিনি ইলিয়াস হাজীর অত্যাচার বন্ধ করিতে সক্ষম হন; ইনি নিজেকে সুলতান শামসুদ্দীন উপাধি দান করিয়াছিলেন; আর পাণ্ডুয়াতে একটি মহানগর প্রতিষ্ঠা করিয়া বানারসের সীমান্ত পর্যন্ত তাহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছেন। তিনি যখন গোরখপুরের সন্নিকটে উপনীত হন, ঐ স্থানের গ্রাম প্রধান উদয় সিংহ আসিয়া আনুগত্য প্রকাশ করেন আর দুইটি হস্তীসহ উপযুক্ত কর প্রদান করিয়া রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। রায় কাপুরও বহু বৎসরের কর প্রদান করেন এবং তাহাদের

উভয়েই তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ইলিয়াস হাজী পাণ্ডুয়া ত্যাগ করেন এবং একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা ছিল বাঙ্গালা দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ। ৭ই রবিউল আউয়াল সুলতান তথায় উপস্থিত হন। ঐ দিনেই এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়; আর ঐ মাসের ২৯ তারিখে সুলতানের সেনাবাহিনী শহরের নিকটবর্তী এলাকা ত্যাগ করে এবং গঙ্গা তীরে শিবির স্থাপন করে। ৫ই রবিউল আখির তারিখে ইলিয়াস হাজী যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন; কিন্তু তিনি এক ঘুরপথে গমন করেন এবং পলায়ন করেন এবং পুনরায় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চুয়াল্লিশটি হস্তী এবং তাহার চাঁদোয়া এবং পতাকা এবং কিছু পরিমাণ যুদ্ধের মালমসলা এবং তাহার বহু অনুচর সুলতানের হস্তগত হয়; আর তাহার বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিহত হয়। ইহার পর দ্বিতীয় দিনে সুলতান বন্দীদের মুক্তি দিবার নির্দেশ জারি করেন, আর ৭শে রবিউল আখির তারিখে অতি-রিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে তিনি শান্তি স্থাপন করিতে সম্মত হন: এবং দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করেন। তিনি মানিকপুরের ফেরীতে গঙ্গা অতিক্রম করেন, এবং ১২ই শাবান তারিখে দিল্লী পৌঁছেন। অতঃপর তিনি জুন নদীর (যমুনা) তীরে ফিরোযাবাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন।

আঃ হিঃ ৭৫৬ সনে তিনি দিবালপুর অভিমুখে শিকার করিতে গমন করেন এবং শতদ্রু নদী হইতে একটি খাল খনন করিয়া তাহা ৪৮ ক্রোশ দূরের ঝাপর নদীতে নিয়া যান। পর বৎসর তিনি মণ্ডল এবং সরমুরের সন্নিকটে জুন নদী হইতে একটি খাল খনন করান; আর ইহার সঙ্গে আরও সাতটি খাল যুক্ত করিয়া ইহাকে হানসী পর্যন্ত নিয়া। ঐ স্থান হইতে তিনি ইহা আলিসিন নিয়া যান, আর তথায় একটি দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহার নামকরণ করেন হিসার ফিরোযা। অতঃপর তিনি দুর্গটির সম্মুখে একটি বিস্তৃত জলাশয় খনন করেন এবং ইহা হইতে পানি নিয়া একটি নালা পূর্ণ করেন; আর খাখর নদী হইতে অপর একটি খাল খনন করেন এবং ইহাকে সরস্বতির দুর্গের পাদদেশ দিয়া নিয়া ইহাকে কারার নতুন খালের সহিত যুক্ত করেন। এই খাল-গুলির মধ্যস্থলে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন আর ইহার নাম দেন ফিরোযাবাদ। তিনি বুধি নদী হইতে অপর একটি খাল খনন করান এবং ইহাকে পূর্বোল্লিখিত জলাশয়ে নিয়া যান; এবং ইহার পরও আর কিছু দূর পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত করেন।

এই বৎসরেরই যিহিজ্জা মাসে ঈদোজ্জোহার দিনে সুলতানকে হিন্দ এবং সিন্ধের রাজ্যদ্বয়ে সুলতানের কর্তৃত্বে অনুমোদন করিয়া মিশরের খলিফা আবুল ফতেহ্-এর নিকট হইতে এক ফরমান আসে। শেষোক্ত জন ইহাকে সুখ, এবং গর্ব এবং অভিনন্দনরূপে গ্রহণ করেন। এই বৎসরই ইলিয়াস হাজী উপযুক্ত কর প্রেরণ করেন

এবং রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করেন। এই সময়ে লক্ষণাবতী এবং দাক্ষিণাত্য ছাড়া সম্পূর্ণ হিন্দুস্তান দেশটি সুলতানের আয়ত্বাধীনে ছিল ; সুলতান মুহম্মদ তুঘলক শাহের ইন্তেকালের পর হইতে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস হাজী প্রথমটি অধিকার করিয়াছিলেন, আর হাসান কাঙ্কা দাক্ষিণাত্যের সম্পূর্ণটা অধিকার করিতেছিলেন ; তিনি কর দানে স্বীকৃত হইলে সুলতান তাহার সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আঃ হিঃ ৭৫৮ সনে যাফর খান ফাজরী দুইটি হস্তীসহ সোনার গাঁও হইতে আগমন করেন এবং নিজেকে দরবারের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাহাকে সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং নায়েব উযির পদে নিযুক্ত করা হয়। আঃ হিঃ ৭৫৯ সনের যিহিজ্জ মাসে সুলতান সামানা অভিমুখে যাত্রা করেন আর ঐ স্থানে শিকার করিবার সময় তিনি এক মুঘল বাহিনীর সংবাদ পান, ইহা লাহোরের উপকণ্ঠে আগমন করিয়াছিল এবং কোনরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত না হইয়াই প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতঃপর সুলতান দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বৎসরের প্রায় শেষ দিকে তাজুদ্দীন অন্যান্য আমীরগণসহ লক্ষণাবতী হইতে দূতরূপে আগমন করেন। কর রূপে মূল্যবান এবং মনোরম দ্রব্যসম্ভার প্রদান করেন ; এবং রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানীত হন। সুলতান, রাজকীয় হস্তীসমূহের তত্ত্বাবধায়ক মালিক সরফুদ্দীনকে আরবী ও তুর্কী অশ্ব এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহারসহ মালিক তাজুদ্দীনের সঙ্গে সুলতান শামসুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন। বসন্তকালে শেষোক্ত জনের ইন্তেকালের এবং তাহার পুত্র সুলতান সিকান্দরের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ আসে। মালিক সরফুদ্দীন এইসব ঘটনার সংবাদ দিয়া সুলতানের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। সুলতান নির্দেশ দেন যে সুলতান শামসুদ্দীনের জন্য যে সব উপহার প্রেরণ করা হইয়াছিল সে সব যেন ফেরৎ আনা হয় ; অশ্বগুলি যেন বিহারের সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয় আর দূতকে যেন কারায় নিয়া যাওয়া হয়। ইহার পর আঃ হিঃ ৭৬০ সনে সুলতান তাহার অবর্তমানে তাহার প্রতিনিধিরূপে খানই ই-জাহানকে দিল্লীতে রাখিয়া লক্ষণাবতী অভিমুখে গমন করেন। এই সময়ে তিনি তাতার খানকে ঘযনীন হইতে মুলতান পর্যন্ত ভূখণ্ডের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। লক্ষণাবতীতে গমনের পথে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য তিনি যাফরপুরে কয়েক দিন অপেক্ষা করেন। এই সময়ে শেখযাদা বুস্তামী, যাহাকে (সাম্রাজ্য হইতে) নির্বাসন করা হইয়াছিল, মিশরের খলিফার নিকট হইতে একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ আনয়ন করেন এবং আযম-উল-মুলক উপাধি লাভ করেন। এই একই সময়ে লক্ষণাবতী হইতে যে দূত আগমন করিয়াছিল তাহার সঙ্গে সৈয়দ রসুলদারকে সুলতান সিকান্দরের দরবারে প্রেরণ করা হয়। শেষোক্ত জন সৈয়দ রসুলদারের সঙ্গে পাঁচটি হস্তী, অন্যান্য মূল্যবান এবং মনোরম উপহার দিল্লীতে প্রেরণ করেন। সৈয়দ রসুলদারের আগমনের পূর্বেই

আলম খান লক্ষণাবতী হইতে দূতরূপে আগমন করেন; আর সুলতান লক্ষণাবতী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি শাহযাদা ফতেহ খানকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রতীকসমূহ যেমন চাঁদোয়া, একটি দূরবাশ, হস্তী এবং একটি লাল মঞ্চ প্রদান করেন এবং তাহার নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার এবং তাহার অধীনে অফিসার নিযুক্ত করিবার নির্দেশ দান করেন।

সুলতান যখন পাণ্ডুয়ায় আগমন করিলেন তখন সুলতান সিকান্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান সিকান্দর ইহার সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন এবং অবরোধ চালাইতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পর সুলতান সিকন্দার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং হস্তী এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীতে বাৎসরিক কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর সুলতান ঐ বৎসরের ২০ই জমাদি-উল আউয়াল তাহার প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন জৌনপুর পেঁাছিলেন তখন বর্ষা শুরু হইল। তিনি বর্ষাকাল ঐ স্থানে অতিবাহিত করিলেন। আর ঐ বৎসরের যিহিজ্জা মাসে তিনি বিহার হইয়া জাজনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এই স্থানটি কারা কটঙ্ক নামক দেশের সীমান্তে অবস্থিত। তিনি যখন জাজনগরে পেঁাছিলেন তখন তিনি যাফর খানের ভ্রাতা মালিক কুতবুদ্দীনের শিবির ও সেনাবাহিনীর নিকট রাখিয়া যান; আর স্বয়ং স্বল্প সংখ্যক রক্ষীবাহিনীসহ দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন সংক্রায় পেঁাছিলেন তখন ঐ স্থানের রাজা রায় সারবীন পলায়ন করিলেন আর তাহার কন্যা সুলতানের হস্তে পতিত হইল। শেষোক্ত জন তাহাকে 'কন্যা' সম্বোধন করিলেন এবং তাহাকে রক্ষা করিলেন। আহমদ খান লক্ষৌতি হইতে পলায়ন করিয়া রণথম্ভোর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আসিলেন এবং পথিমধ্যে তাহার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানীত ও গৌরান্বিত করা হইল। সুলতান যখন মহানদী অতিক্রম করিলেন এবং জাজনগরের রায়ের সুদৃঢ় দুর্গ এবং বাসস্থান বানারসে পেঁাছিলেন, শেষোক্ত জন পলায়ন করিলেন এবং তিলাং-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুলতান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন না, কিন্তু তিনি শিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রায় দূত প্রেরণ করিলেন এবং শান্তি স্থাপনের প্রার্থনা করিলেন। তিনি তেত্রিশটি হস্তী এবং অন্যান্য মূল্যবান ও মনোরম উপহার প্রেরণ করিলেন। সুলতান এই সময়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হস্তী শিকারের জন্য হস্তীর প্রিয় চারণক্ষেত্র পদ্মাবতী অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি ইহাদের তেত্রিশটি জীবন্ত ধরিলেন আর দুইটিকে বধ করিলেন। এই বিষয়ে যিয়া-উল-মুলক নিম্নের কবিতাটি রচনা করিয়াছেন:

সুলতান ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা মহত্ব অর্জন করিয়াছেন
সমুজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় তিনি সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়াছেন,
হস্তী শিকারের জন্য তিনি জাজনগরে আসিলেন
তেত্রিশটি তিনি ধরিলেন আর দুইটিকে বধ করিলেন।

ঐ স্থান হইতে তিনি নিয়মিত পথ চলিয়া কারা আগমন করিলেন আর আঃ হিঃ ৭৭২ সনের রজব মাসে তিনি দিল্লী আগমন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পর তিনি আসলিমা নামক একটি খালের অভিমুখে গমন করিলেন। ইহা দুইটি প্রশস্ত সারা বৎসর পানি থাকে তেমন স্রোত দ্বারা গঠিত দুইটি মিলিয়া গিয়া গঠিত) কিন্তু সুউচ্চ বাঁধ দ্বারা বিভক্ত। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে পঞ্চাশ হাজার বেলদার (কোদালী) সংগ্রহ করিতে হইবে এবং খালটি খনন করিতে হুকুম দিলেন। বাঁধের অভ্যন্তরে হাতীর এবং মানুষের অতি বড় বড় হাড় আবিষ্কৃত হইল; যেমন মানুষের বাহুর একটি হাড় পাওয়া গেল, যাহার দৈর্ঘ তিন গজ। ইহা আংশিক শীলিভূত হইয়া গিয়াছে আর আংশিক হাড় আছে। এই সময়ে তিনি সরহিন্দকে আলাদা করিয়া দিলেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে সামানার রাজস্ব বিভাগের অন্তর্গত ছিল; আর ইহার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন যিয়া-উল-মুলক শামসুদ্দীন আবু রাজা। তিনি তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন আর ইহার নাম দিলেন ফিরোযপুর। ঐ স্থান হইতে তিনি নগরকোট অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি যখন পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইলেন, লোকেরা তাহার নিকট কিছু বরফ নিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "সুলতান মুহম্মদ শাহ, (তাহার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক), যিনি আমার প্রভু ছিলেন। যখন এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন তখন তাহার পরিচায়কগণ তাহার জন্য বরফের শরবত তৈরী করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পান করেন নাই, যেহেতু আমি উপস্থিত ছিলাম না।" অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাহাদের সঙ্গে শিবিরে যে কয়েকটি হস্তী ও উট বোঝাই মিছরী আছে তাহা যেন বরফের শরবত প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয় এবং তাহা সুলতান মুহম্মদ শাহের স্মৃতিতে সৈন্যদের মধ্যে বিলি করা হয়। কিছু সময় অবরোধ এবং কিছু যুদ্ধের পর নগরকোটের রাজা তাহার পুত্রদেরসহ দ্রুত আসিয়া সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং আনুগত্যের জিনের কাপড় তাহাদের গলায় ধারণ করেন। সুলতান তাহার সহিত সদয় ব্যবহার করেন। তিনি নগরকোটের নাম পরিবর্তন করেন এবং মৃত সুলতান মুহম্মদ শাহের নামানুসারে ইহার নাম রাখেন মুহম্মদাবাদ। এই সময়ে লোকেরা সুলতানের নিকট নিবেদন

করেন যে যখন সিকান্দর যুলকারনাইন[১] এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে এই দেশের লোকেরা নুশাবার[২] একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া তাহা একটি গৃহে স্থাপন করে আর ইহা লোকের নিকট একটি পূজনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে ; আর এই মন্দিরে, যাহা জ্বালামুখি নামে পরিচিত, প্রাচীন ব্রাহ্মণদের এক সহস্র তিন শত পুস্তক আছে।[৩] আর সুলতান ঐ উপজাতির পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; এবং কতিপয় পুস্তক অনুবাদ করিতে নির্দেশ দিলেন। ইহাদের মধ্যে ঐ যুগের কবি-গণের মধ্যে অন্যতম ইযযুদ্দীন খালিদ খানি স্বাভাবিক দার্শনিক তত্ত্ব এবং শুভাশুভের লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক অনুবাদ করেন আর ইহার নাম দেন দলায়েল-ই-ফিরোজ শাহী। এই ফকির ইহা পাঠ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা বৈজ্ঞা-নিক ও ব্যবহারিক বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত পুস্তক।[৪]

সংক্ষেপে নগরকোট বিজয়ের পর সুলতান থাঠা অভিমুখে গমন করিলেন এবং তিনি যখন তথায় পৌঁছিলেন তখন ঐ স্থানের শাসনকর্তা জাম নিজেকে পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন এবং পানির উপর নির্ভর করিয়া কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন ; আর শস্যের অপ্রতুলতা এবং পশুর খাদ্যের দুর্মূল্যতার এবং পানির প্রসারতার জন্য সুলতান গুজরাট গমন করিলেন। বর্ষাকাল তথায় অতিবাহিত করিয়া তিনি পুনরায় থাঠায় আগমন করিলেন। তিনি গুজরাটের শাসনভার যাফর খানের হস্তে ন্যস্ত করিলেন এবং নিযামুল মুলককে[৫] বরখাস্ত করিলেন। শেষোক্ত জন তাহার পরিবার পরিজন-সহ দিল্লী আগমন করিলেন নায়েব উযির নিযুক্ত হইলেন। সুলতান যখন থাটা পৌঁছিলেন, জাম নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলেন এবং বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সম্পূর্ণ সত্য সম্বলিত কবিতাটির অর্থ ঃ

সে নিরাপত্তার প্রার্থনা করিল আমি ইহা তাহাকে মঞ্জুর করিলাম
সে বিনীতভাবে আগমন করিল, আমি তাহাকে তাহার জীবন প্রত্যর্পণ করিলাম।

১. যুলকারনাইন অর্থ দুই শিংওয়ালা। জুপিটার আম্মোন, মহান আলেকজাণ্ডার, এবং আলী বিন আবি তালিবকে যুলকারনাইন বলা হয়।

২. নুশাবা ছিলেন বরদা নামক এক দেশের রাণী। এই দেশটি লুণ্ঠিত হয় এবং তিনি রুশগণ কর্তৃক বন্দী হন। মহান আলেকজাণ্ডা'র তাহাকে উদ্ধার করেন এবং পরে তিনি তাহার পত্নীতে পরিণত হন। বরদা দেশটির অবস্থান কোথায় ছিল বলা দুষ্কর। এককালে ককেশাসের সর্ববৃহৎ শহরটির নাম ছিল বরদা, কিন্তু বর্তমানে ইহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা তাতার নদীর তীরে, তাতার ও কুরা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

৩. কর্ণেল রেভিং এই নামটি লিখিয়াছেন জওয়ালামুখি ; কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত নামটি হইবে জ্বালামুখি।

৪. বদাওনী এই পুস্তকটিতে মোটামুটি ভাল বলিয়াছেন, ইহাতে ভাল ও মন্দ দুইই আছে।

৫. তাহার নাম আমীর হসেন পিতা আমীর মীরণ।

তাহার আলোকিত মন গ্রহণ করিল এবং সুলতান ঐ দেশের সকল জমিদারদের-সহ তাহাকে দিল্লীতে নিয়া আসিলেন।

আঃ হিঃ ৭৭২ সনে (১৩৭০ খ্রীঃ) খান-ই জাহান ইন্তেকাল করেন এব তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনান শাহ[১] এই উপাধি লাভ করেন।

আঃ হিঃ ৭৭৩ সনে (১৩৭১-৭২ খ্রীঃ) যাফর খান গুজরাটে ইন্তেকাল করেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যাফর খান উপাধি দান করা হয় এবং গুজরাটের শাসনভার দেওয়া হয়। ৭৭৬ আঃ হিজরা সনের সফর মাসের ১২ তারিখ শাহযাদা ফতেহ খান কাহতুরে[২] ইন্তেকাল করেন।

আঃ হিঃ ৭৭৬ সনে শামসুদ্দীন দামঘানী সুলতানের নিকট নিবেদন করেন যে তাহাকে যদি গুজরাটের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয তবে তিনি প্রতি বৎসর নির্ধারিত রাজস্বের উপরেও চল্লিশ লক্ষ তংকা আর চারিশত হস্তী এবং দুইশত আরবী অশ্ব ও চারিশত ক্রীতদাস দিবেন। সুলতান নির্দেশ দান করেন যে যাফর খানের নায়েব যিয়াউল মুলক মালিক শামসুদ্দীন আবু রাজা যদি এই অতিরিক্ত রাজস্ব ও অন্যান্য কর দিতে স্বীকৃত হয় তবে গুজরাট তাহারই দাযিত্বে রাখা হইবে। মালিক শামসুদ্দীন সম্মত হইলেন না, আর শামস দামঘানীকে সোনার লেসের একটি বেণ্ট, একটি বল্লম এবং একটি রূপার চৌদোল[৩] দান করা হয় এবং তাহাকে মৃত যাফর খানের স্থলে গুজরাটে প্রেরণ করা হয়।[৪] কিন্তু যেহেতু তিনি তাহার অঙ্গীকৃত কর দিতে অপরাগ হন, ফলে তিনি বিদ্রোহ বীজ বপন করেন এবং গুজরাটের মীর সদহদের কয়েকজনের, যেমন শেখ ফরিদউদ্দীন ও অন্যান্য নেতাগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া শত্রুতা আরম্ভ করেন। সুলতান এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন এবং শামসুদ্দীন দামঘানী নিহত হয় আর তাহার শির সুলতানের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাহাকে হত্যা করিবার পর গুজরাট মালিক মুফররাহ সুলতানীকে দেওয়া হয় আর তিনি ফরহাত-উল-মুলক উপাধি লাভ করেন।

১. এই নামটি পাণ্ডুলিপিগুলিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন জুনান শাহ এবং খুবান শাহ। তিনি বিশ বৎসর কাল উযির ছিলেন, কিন্তু রাজত্বের শেষ দিকে তাহার মধ্যে আর শাহযাদা মুহম্মদ খানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়; শাহযাদা মুহম্মদ খান পরে সুলতান মুহম্মদ শাহ হন।

২. নামটি কাহতুর বা কাহতোয়ার হইবে, ইহা রোহিলাখণ্ডের প্রাচীন নাম। বদাওনী এই স্থানের নাম উল্লেখ করে নাই।

৩ এইগুলি হইল পদের প্রতীক চিহ্ন।

৪ পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই দেওয়া আছে, কিন্তু অল্প আগেই আছে যে যাফর খানের ইন্তেকালের পর তাহার পুত্রকে যাফর খান উপাধি এবং গুজরাটের শাসনভার দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ যাফর খানের পুত্রের এই নিয়োগ কার্যকরী হয় নাই, অথবা ইহা সাময়িক নিয়োগ ছিল মাত্র।

৫. অর্থাৎ একশত জনের নেতা, এক প্রকারের গ্রাম প্রধান হইবে।

আঃ হিঃ ৭৭৯ সনে সুলতান ইতাওয়া এবং আখল অভিমুখে যাত্রা করেন এবং রায় সিপর দাধরণ[১] এবং ইতাওয়ার[২] সকল জমিদারকে, যাহারা একবার সুলতানের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, অনুগ্রহ ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানগণসহ দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তিনি আখল এবং বতলাহীতে[৩] দুর্গ নির্মাণ করেন। আর মালিক তাজুদ্দীন তুর্কের পুত্র মালিকযাদা ফিরোযকে আরও কতিপয় আমীরসহ তথায় রাখিয়া আসেন। ফিরোযপুর বতলাহীর দায়িত্বও তাহার উপর অর্পণ করা হয় এবং আখলের দায়িত্ব দেওয়া হয় মালিক আফঘানকে। অতঃপর সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এই একই বৎসরে অযোধ্যার শাসনকর্তা, যিনি সুলতানের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তিনি ইন্তেকাল করেন আর প্রদেশটি তাহার পুত্র মালিক সাইফুদ্দীনকে[৪] অর্পণ করা হয়।

আঃ হিঃ ৭৮১ সনে (১৩৭৯ খ্রীঃ তিনি সামানাহ[৫] গমন করেন এবং গভর্ণর মালিক কাবুল বহু কর প্রদান করেন এবং তিনি আম্বালা ও শাহবাদ হইয়া সান্তরের[৬] পার্বত্য অঞ্চলে আগমন করেন; আর সরমুরের রায় ও অন্যান্য রায়গণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সংবাদ আসে যে কৈথার-এর প্রধান ব্যক্তি খারকু[৭] বদাওনের গভর্ণর সৈয়দ মুহম্মদ ও তাহার ভ্রাতা সৈয়দ আলাউদ্দীনকে তাহার নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের উভয়কেই হত্যা করিয়াছে। আর ৮২ আঃ হিজরাতে (১৩৮০ খ্রীঃ) সুলতান কৈথার অভিমুখে সৈয়দ-গণের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অভিযান করেন; খরকু পলায়ন করে; কৈথার অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হয়। খরকু কমাউনের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে। সুলতান ঐ দেশটি লুণ্ঠন করিয়া বদাওন মালিক কাবুলকে অর্পণ করেন আর খরকুকে

---

১. কর্ণেল রেঙ্কিং ইহার নাম লিখিয়াছেন আকচক।

২. পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন কপিতে ইহার নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। বদাওনী কোন নাম উল্লেখ করেন নাই।

৩. পাণ্ডুলিপিতে ইহা বতলাহী বা পতলাহী আছে। বদাওনীতে আছে বটলাহী। ফিরিশতা ইহার নাম দিয়াছেন তিসাই।

৪. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে ইউসুফউদ্দীন।

৫. সামানা পাঞ্জাবের একটি রাজস্ব বিভাগ ছিল, গোড়ার দিকে সরহিন্দও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সুলতান ফিরোয শাহ শেষোক্ত স্থানটিকে একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করেন।

৬. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি দেওয়া আছে সাথুর, আর একটিতে আছে সানতুর, আর একটিতে আছে সার্নভুয়ার।

৭. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে খরকু, খুখু, এবং খুকর। বদাওনী তাহাকে বলেন রায় নখুধর, কৈথারের প্রধান ব্যক্তি। কর্ণেল রেঙ্কিং তাহার ইংরাজী অনুবাদে লিখিয়াছেন খুখর রায়, কৈথারের প্রধান। কৈথার (কহতর) রোহিলাখণ্ডের প্রাচীন নাম।

শাস্তি দানের জন্য মালিক খিতাব আফঘানকে[১] সম্বলে[২] রাখিয়া দেশটিকে তাহার মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করেন, যাহার ফলে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও জনহীন হইয়া পড়ে।

আঃ হিজরা ৭৮৭ সনে বদাওনের সাত কারোহ দূরবর্তী কেউলী[৩] নামক স্থানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ইহার নামকরণ করেন ফিরোযপুর আর যেহেতু ইহার পর তিনি আর কোন দুর্গ নির্মাণ করেন নাই তাহার ফলে এই দুর্গটি আখিরিন-পুর নামে পরিচিত হয়। এই বৎসরে সুলতান অক্ষম হন এবং বার্ধক্যে পতিত হন।[৪] আর খান-ই-জাহান তাহার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি শাহজাদা মুহম্মদ খান ও অন্যান্য আমীরগণকে, যেমন যাফর খানের পুত্র দরিয়া খান ও মালিক ইয়াকুব মুহম্মদ হাজী ও মালিক শামসুদ্দীন ও মালিক কামালুদ্দীন, যাহারা তাহার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অসহায় করিয়া দিবার মনস্থ করিলেন। তিনি সুলতানকে জানাইলেন যে উপরিল্লিখিত আমীরদের সহযোগিতায় শাহজাদা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। শেষোক্ত-জন তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমীরগণকে গ্রেপ্তার করিবার নির্দেশ দান করিলেন। শাহজাদা এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং কয়েকদিন তাহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বন্ধ করিলেন; খান-ই-জাহান সাহাবার হিসাব পত্র দেখিবার ছল করিয়া দরিয়া খানকে[৫] ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে তাহার নিজের গৃহে কারারুদ্ধ করিলেন। শাহজাদা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া হতবুদ্ধি ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন[৬] আর সুলতানকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে খান-ই-জাহান বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা

১. নিঃসন্দেহে ইহার অধীনেই জায়গীর দেওয়া হয়। ফিরিশতা ইহার নাম লিখিয়াছেন মালিক দাউদ আফঘান।

২. ইহা সম্বল ও সম্ভল এই উভয় প্রকারই পাণ্ডুলিপিতে আছে। ইহা রোহিলাখণ্ডে অবস্থিত, মোরাদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

৩. এই নামটি পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ লেখা আছে, যেমন কেউলী, কুলি। বদাওনীতে আছে বাবুলী। রেঙ্কিং এর মতে এই স্থানে অধিক সংখ্যক বাবুল গাছ থাকিবার দরুন সম্ভবতঃ ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। ফিরিশতা ইহার নাম লিখিয়াছেন বাবুলী।

৪. বদাওনী বলেন যে এই সময় তাহার বয়স হইয়াছিল নব্বই বৎসর।

৫. বদাওনী ইহা উল্লেখ করেন নাই। মাহোবা কারার নিকটের একটি জেলা, ইহা হামিরপুরের ৫৪ মাইল দক্ষিণে বেত্তোয়া ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

৬. ফিরিশতা বলেন যে তিনি তাহার স্ত্রীর ছদ্মবেশ ধরিয়া একটি মহিলাদের পাল্কীতে চড়িয়া গমন করেন, কিন্তু পূর্ববর্তী কোন ঐতিহাসিক ইহা উল্লেখ করেন নাই।

করিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে খ্যাতনামা আমীরগণকে অপসারণ করিতে এবং তৎপর তাহাকে বন্দী করিতে মনস্থ করিয়াছে। সুলতান খান-ই-জাহানকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন এবং দরিয়া খানকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। শাহজাদা মালিক ইয়াকুবকে নির্দেশ দিলেন বিশেষ আস্তাবলের[১] অশ্বগুলিকে প্রস্তুত রাখিতে আর হস্তীরক্ষক মালিক কুতবুদ্দীনকে নির্দেশ দিলেন হস্তীসমূহ সন্নিবেশ করিয়া এক যুদ্ধ আরম্ভ করিতে। রাত্রির শেষ দিকে শাহজাদা প্রচণ্ড শক্তিতে খান-ই-জাহানকে আক্রমণ করিলেন। খান-ই জাহান কিছু সংখ্যক লোকসহ তাহার গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আহত হন এবং পরাজিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, এবং অপর এক দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়া মেওয়াটের জমিদার কুকা চৌহানের[২] আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাজাদা তাহার গৃহ ধ্বংস করিয়া দেন এবং যুদ্ধের সময় তাহার হস্তে ধৃত মালিক ইমদাদদ্দৌলা ও মালিক শামসুদ্দীন এবং মালিক সালেহকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর সুলতান শাহজাদাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া উজির নিযুক্ত করেন; আর সার্বভৌমত্বের সমস্ত উপকরণ যেমন অশ্বাদি, সেনাবাহিনী ও হস্তীসমূহ তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া এবং তাহাকে নাসিরুদ্দীন ওয়াদ্দুনিয়া মুহম্মদ শাহ উপাধি দান করিয়া নিজে ধ্যান ধারণা ও আল্লাহর সেবায় মনোনিবেশ করেন। শুক্রবারে দুই বাদশাহের নামেই খোৎবা পাঠ হইতে লাগিল।

সুলতান মুহম্মদ শাহ আঃ হিঃ ৭৮৯ সনের (১৩৮৭ খ্রীঃ) শাবান মাসে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং রাষ্ট্রের অফিসারগণকে তাহাদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখিয়া তাহাদিগকে সম্মানীয় পোশাক দান করেন। মালিক ইয়াকুবকে সিকান্দর খান উপাধি দেওয়া হয় আর গুজরাট তাহাকে অর্পণ করা হয়। মালিক রাজু মুবারিখ খান, কামাল উমর দস্তর খান এবং সীমা উমর মুইয-উল মুলক উপাধি লাভ করেন।

---

১. ইহা সুলতানের অথবা শাহজাদার আস্তাবল তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

২, চৌহান একটি রাজপুত উপজাতির নাম। মেওয়াট মেওদের দেশ, ইহাদের উৎপত্তি অজ্ঞাত তবে ইহারা নিজেদের রাজপুত বলিয়া দাবী করে, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা কোন মিশ্র জাতি, মিনাদের সমশ্রেণীভুক্ত। সম্ভবতঃ গজনীর সুলতান মাহমুদের সময়ে ইহা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মেওয়াট দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত আর মুসলমানদের আমলে ইহা আগ্রা সুবার অংশ ছিল। ইহার প্রধান শহর হইল নরমৌল, আলওযার, তিজারাহ এবং রেওয়ারী। বর্তমানে ইহা মথুরা, গুরগাও জেলা আলওয়ারের উদ্বৃত অংশ ও ভরতপুরের কিছু অংশের অন্তর্গত।

৩. এই স্থানে পাণ্ডুলিপির কিছু শব্দ ঠিক বুঝা যায় না; ইহা সম্ভবতঃ কোন লোকের নাম অথবা ইহার অর্থ হইতে সহস্র অত্যাচার দ্বারা। বদাওনী খান-ই-জাহানের দলীয় কোন লোকের নাম উল্লেখ করেন নাই।

৪. বদাওনী বলেন তাহাকে পূর্ণ ক্ষমতাসহ উজির নিযুক্ত করা হয়।

৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, শুক্রবার ১০ই রজব, উল্লেখিত বৎসরের।

মালিক ইয়াকুব, যিনি সিকান্দর খান উপাধি লাভ করিলেন তাহাকে শক্তিশালী একদল সৈন্যসহ খান-ই-জাহানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। সেনাবাহিনী যখন মেওয়াটের নিকটবর্তী হইল, তখন কুকা চৌহান খান-ই-জাহানকে বন্দী করিলেন, এবং তাহাকে সিকান্দর খানের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার শির শাহজাদা মুহম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং গুজরাট গমন করিলেন। ঐ বৎসর শাহজাদা মুহম্মদ শাহ এক শিকার অভিযানে সরমুর পর্বতের অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি যখন শিকারে ব্যাপৃত তখন সংবাদ আসে যে গুজরাটের মালিক মুফাররাহ[১] এবং শতজনের নেতাগণ একত্র হইয়া সিকান্দর খানকে হত্যা করিয়াছে আর তাহার সহিত যে সৈন্য ছিল তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা আহত হইয়াছিল তাহাদের কিছু সংখ্যক সিপাহ্‌সালারের[২] সঙ্গে দিল্লী আগমন করিয়াছে। মুহম্মদ শাহ এই সংবাদ শুনিয়া দিল্লী আগমন করিলেন; কিন্তু সিকান্দর খানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া তিনি আরাম আয়েস ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন হইয়া পড়িলেন; আর তাহার অবহেলার দরুন রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে মহা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

এই সব ঘটনাবলীর পাঁচ মাস পরে সুলতানের সেনাবাহিনী সামাউদ্দীন ও কামালউদ্দীনের[৩] প্রতি তাহাদের ঈর্ষা ও রোষবশতঃ তাহারা মুহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে চলিয়া গেল এবং শত্রুতার ভিত্তি স্থাপন করিল। সৈন্যদের বিদ্রোহ দমনের জন্য মুহম্মদ শাহ মালিক যহিরুদ্দীন লাহোরীকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তিনি যখন যেখানে ফিরোয শাহের সৈন্যগণ একত্র সমবেত হইয়াছে সেই ময়দানে পৌঁছিলেন, তখন শেষোক্তগণ তাহার প্রতি পাথর ছুঁড়িয়া তাহাকে আহত করিল আর ঐ অবস্থায় তিনি শাহজাদা মুহম্মদ শাহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আর শেষোক্ত জন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুলতানের সৈন্যদের সম্মুখীন হইতে গমন করিলেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাত্রির শেষ দিকে শাহজাদার সেনাগণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিল এবং সুলতানের বাহিনীকে পরাভূত করিল। শেষোক্তগণ সুলতানের নিকট গিয়া তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দুই দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। তৃতীয় দিনে যখন ফিরোয শাহের দাসগণ (সৈন্যগণ) চরম দুর্দশায় পতিত হইল তখন তাহারা

১. শামসুদ্দীন দামঘানীকে হত্যা করিবার পর তাহাকে ফরহাত-উল-মুলক উপাধি দিয়া গুজরাটের গভর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

২. এই ব্যক্তি কে তাহা ঠিক বুঝা যায় না। এই শব্দগুলি দ্বারা "সেনাবাহিনীর নেতা" বুঝায়; বদাওনীও সিপাহসালার লিখিয়াছেন।

৩. সামাউদ্দীন ও কামালউদ্দীন উভয়েই মুহম্মদ শাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সুলতানকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিল এবং সৈন্যদের তাহাকে দেখাইল। মুহম্মদ শাহের সৈন্যগণ ও হস্তীচালকগণ যখন সুলতানকে (ফিরোয শাহ) দেখিল তখন তাহারা যুদ্ধ করা হইতে বিরত রহিল এবং তাহার নিকট আগমন করিল আর সুলতান মুহম্মদের সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া গেল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ; আর তিনি সামান্য সংখ্যক সৈন্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাদেরসহ সরমুর পর্বতের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। সুলতানের (ফিরোয শাহের) সৈন্যগণ, যাহাদের সংখ্যা অশ্বারোহী এবং পদাতিকসহ প্রায় এক লক্ষ ছিল, মুহম্মদ শাহ ও তাহার বন্ধুদের প্রাসাদসমূহে প্রবেশ করিল এবং লুটতরাজ ও ধ্বংস আরম্ভ করিল। সুলতান কুচক্রী লোকদের[১] মন্ত্রণা শুনিয়া মুহম্মদ শাহের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং ফতেহ খানের পুত্র এবং তাহার পৌত্র তুঘলক শাহকে[২] তাহার উত্তরাধিকারী করিলেন আর তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। তুঘলক শাহ সুলতানের জামাতা আমীর হাসানকে[৩], যিনি মুহম্মদ শাহের বিশেষ বন্ধুগণের অন্যতম ছিলেন, প্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন।

মুহম্মদ শাহের সহিত তাহার বন্ধুত্ব থাকার জন্য সামানার আমীর ঘালিব খানকে[৪] তিনি বন্দী করিলেন এবং তাহার নির্বাসন দিয়া বিহার প্রদেশে প্রেরণ করিলেন ; আর সামানাহ দিলেন মালিক সুলতান শাহকে।[৫]

রমযান মাসের ১৮ তারিখে[৬] সুলতান ফিরোয শাহ[৭] ইন্তেকাল করিলেন।

দ্বিপদী কবিতা[৮]

মাথা অবনমিত করানোই আকাশের ধর্ম
কপালের লিখন হইতে কাহারও মাথা অপসারণ করা উচিত নয়।

১. বদাওনী লিখিয়াছেন স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা।

২. বদাওনী সঠিকভাবে তাহাকে তুঘলক খান বলিয়াছেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি তুঘলক শাহ হন। তিনি ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহ দ্বিতীয় হন।

৩. বদাওনী ইহার নাম মীর হাসান লিখিয়াছেন।

৪. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে আলী শাহ, কিন্তু অন্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে ঘালিব শাহ। সামানা হান্সীর ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আর দিল্লীর ১০০ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

৫. একটি পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে মালিক সুলতান। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে মালিক সুলতান শাহ। বদাওনী কাহাকে সামানা দেওয়া হইল সে সম্বন্ধে নীরব।

৬. রেঙ্কিং কর্তৃক অনূদিত বদাওনীর পুস্তকে এই তারিখটি ১৬ই দেওয়া আছে।

৭. বদাওনী আরও বলেন যে তাহাকে হাউস-ই-খাসের সীমান্তে সমাহিত করা হয় আর তাহার কবরের উপরে একটি সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করা হয়।

৮. এই পংক্তিগুলি এবং ইহাদের আগে আরও ৪টি পংক্তি বদাওনীর পুস্তকেও উদ্ধৃত করা আছে, কিন্তু খাজা নিযামউদ্দীন ঐ চার পংক্তি বাদ দিয়াছেন।

কে জানে এই উৎক্ষিপ্ত ধূলোর সাথে
কোন হৃদয়ের রক্ত মিশিয়া আছে ?
চক্ষু যদি অন্ধ না হয়, তবে সকল পথেই দেখা যাইবে
ধূলায় আচ্ছন্ন নয়, জীবন্ত প্রাণীর অবশিষ্টাংশে ঢাকা।

তিনি আটচল্লিশ বৎসর কয়েক মাস এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন আর ওয়াকাত-ই-ফিরোয এই শব্দ গুলিতে তাহার ইন্তেকালের তারিখ নিহিত আছে। এই ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ লোকের মধ্যে বহু ন্যায়পরায়ণ ও সদাশয়তার বিধি আর নিরাপত্তা ও রক্ষা ব্যবস্থার বহু আইন রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার সকল বিধির মধ্যে তিনটি অতি চমৎকার। প্রথমটি হইল এই যে তিনি শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং কখনও কোন মুসলমানকে অথবা (প্রকৃতপক্ষে) কোন লোককেই শাস্তি দেন নাই; আর তাহার অসংখ্য উপহার ও দানের জন্য এবং তাহা দ্বারা লোকের হৃদয় জয় করার দরুন তাহার লোককে সাজা দিবার প্রয়োজন হয় নাই। যদিও শাস্তি দেও সার্বভৌমত্বের একটা বৃহৎ অংশ তবুও তাহার প্রশংসনীয় ব্যবহার আর চমৎকার গুণাবলী তাহার প্রজাগণের মধ্যে ন্যাযপরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা কারণ স্বরূপ হয় আর উৎপীড়ন ও অত্যাচারের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়; আর তাহার শাসনকালে কোন সৃষ্ট জীবেরই কাহাকেও যন্ত্রণা দিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় বিধিটি এই ছিল যে তিনি রায়তগণের নিকট হইতে ভূমির উৎপাদিত ফসল অনুযায়ী এবং তাহাদের দিবার ক্ষমতা অনুযায়ী খাজনা আদায় করিতেন; আর সকল অতিরিক্ত কর ও সেস রহিত করিয়া দেন আর রায়তগণের ব্যাপারে কাহারও কোন কুমন্ত্রণা তিনি কানে তুলিতেন না; আর এই বিধিই কৃষিকার্যের প্রসার ও রায়ত ও প্রজাগণের সুখ সম্পদের কারণ স্বরূপ হয়। তৃতীয় বিধিটি হইল এই যে তাহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান ও শাসন করিবার জন্য তিনি সৎ এবং বিশ্বাসী ও আল্লাহর ভয়ে ভীত অফিসার নিয়োগ করিতেন; আর কখনও কোন দুষ্ট প্রকৃতির ও শয়তান লোককে তাহার চাকুরীতে গ্রহণ করিতেন না এবং কখনও এরূপ কোন লোককে গভর্ণর বা আমীর পদে উন্নীত করেন নাই। আর এই নিয়ম অনুযায়ী লোকগুলি তাহাদের শাসনকর্তার স্বধর্মীয় হয়, সকল লোকেই তাহাদের শাসনকর্তার অনুকরণ করে এবং তাহাদের মধ্যে নিরপেক্ষতা ন্যায়পরায়ণতার নিয়ম প্রচলিত হইয়া উঠে আর কোন ব্যক্তি বিশেষেরই হয়রান করিবার এবং উৎপীড়ন করিবার ক্ষমতা নাই; আর উচ্চ নীচ সকলের মধ্যেই পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করিতেছিল। তাহার দান, অনুগ্রহ এবং উপহার ও ভাগ হিন্দুস্তানের অন্য সব সুলতানের চেয়ে অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ছিল।

সুলতান ফিরোয শাহ্ একটি পুস্তিকা সংকলন করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি তাহার রাজত্বকালের ঘটনাসমূহ সন্নিবেশিত করেন আর তিনি ইহার নাম দেন ফতুহাত ফিরোযশাহী (ফিরোয শাহের বিজয়সমূহ)। পুস্তকটি আমি দেখিয়াছি। রাজাদের বাণী যে বাণীদের রাজা এই নিয়ম অনুযায়ী ইহাতে সন্নিবেশিত কতিপয় বিষয় তাহাদের শুভলক্ষণ এবং মাধুর্যের জন্য আমি এইখানে উদ্ধৃত করিয়াছি; যাহাতে এই বাদশাহের স্বভাবের মাধুর্য আর তাহার ফেরেশতার মত প্রকৃতির অমায়িক গুণসমূহ অনুসন্ধিৎসু ও দূরদর্শী লোকদের নিকট প্রচার হইতে পারে। ন্যায়পরায়ণতার আঁধার এই রাজা ফিরোযাবাদের জামে মসজিদে একটি সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করিয়াছিলেন[1] আর ইহা ছিল অষ্টভূজ। এই গম্বুজের আটটি দিকে এই পুস্তকটির, যাহা আট অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, আটটি অধ্যায় পাথরে খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি অধ্যায়ে মসজিদের জন্য দান ভাণ্ডার সম্বন্ধে লিখিত আছে আর ইহাতে এই ভাণ্ডারের অর্থ বিতরণের ভারপ্রাপ্ত লোক কি প্রকারে তাহা বিতরণ করিবে সে সম্বন্ধে নির্দেশাবলী লিখিত আছে আর এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অপর এক অধ্যায়ে আছে যে পূর্বে সামান্য অপরাধের জন্যও মুসলমানদের রক্তপাত করা হইত, আর বহু রকমের শাস্তি যেমন হাত, পা, কান, নাক কাটিয়া ফেলা, চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাড় মুগুর দিয়া গুড়া করিয়া ফেলা, আগুন দিয়া দেহ পুড়াইয়া দেওয়া, হাত, পা, আর বুকে খোটা দিয়া বিদ্ধ করা, মাংসপেশী ও পেশীবন্ধ কাটিয়া ফেলা এবং দেহ কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করা এবং অন্যান্য প্রকারের শাস্তি বহুল প্রচলিত ছিল; আর মহান আল্লাহ্ আমার মধ্যে করুণার সঞ্চার করিয়াছেন এবং আমি এইরূপ সকল কাজ রহিত করিয়া দিয়াছি। আর ভূতপূর্ব সুলতানদের, যাহাদের প্রচেষ্টায় হিন্দ ইসলামের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে, মহান নামসমূহ খোৎবা হইতে অপসারণ করা হইয়াছিল, আমি সেই সব নাম পুনর্জীবিত করিয়াছি, সেইগুলি পুনরায় খোৎবায় প্রবর্তন করিয়াছি, যাহাতে এইরূপে তাহাদের পাপ স্খালনের জন্য সর্বদাই মোনাজাত করা হইতে পারে, আর কতিপয় অত্যাচারী ব্যক্তি কর্তৃক ন্যায়সঙ্গত রাজস্বের সহিত কতিপয় অসঙ্গত, বেআইনী সেস যোগ করিয়াছিল আর সেইগুলি প্রতি বৎসরই

১. ফতুহাত-ই-ফিরোয শাহীতে আছে যে সুলতান পুরাতন দিল্লীর মসজিদ-ই-জামা সম্পূর্ণরূপে সংস্কার সাধন ও পুনর্নির্মাণ করেন। ইহা সুলতান মুইযুদ্দীন শাম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, এবং কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই স্থানে উল্লেখিত জামে মসজিদ পুরাতন দিল্লীর এই মসজিদটিই হইবে, কিন্তু ফতুহাত-ই-ফিরোয শাহীতে তাহার বিষয়বস্তু এই মসজিদের গম্বুজে খোদাই করা সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ নাই। বদাওনী এই ফতুহাত-ই-ফিরোয শাহীর কোন উল্লেখই করেন নাই। তিনি বাদশাহের উদ্যোগের উল্লেখ করিয়া তৎপর ঐ সময়ের কবিদের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কঠোরভাবে আদায় করা হইতেছিল যেমন গরু চারন, এবং ফুল বিক্রি করা এবং নীল প্রস্তুত করা আর মাছ বিক্রি করা আর তুলা পরিষ্কার করা আর রেশম বিক্রি করা, ধান শুকনো, নির্বাহী[1] আর মদ বিক্রি করিবার গৃহসমূহ আর দারোগা, কোতোয়াল এবং খবরদারী করিবার লোকের পদের জন্য আরোপিত সেন। আমি এইগুলির প্রত্যেকটিকেই বাতিল করিয়া দিয়াছি ; কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়া গিয়াছেন ঃ

দ্বিপদী কবিতা

বন্ধুর শান্ত হৃদয় ধন রত্নের চেয়ে ভাল।
মানুষের যাতনার চেয়ে শূন্যে কোষাগার ভাল।

আর আমি স্থির করিয়াছি যে হযরতের (তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) প্রবর্তিত আইনের পরিপন্থী এমন কোন রাজস্ব ধার্য করিব না। আর ইহার পূর্বে এইরূপ নিয়ম ছিল যে শত্রুর নিকট হইতে ধৃত সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ সৈন্য (যে সম্পত্তি ধার) পায় আর চারি অংশ নেওয়া হয় কোষাগারে। আর আমি পবিত্র আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দেশ দেই যে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ কোষাগারে নেওয়া হইবে। আর ইহা ছাড়া আমি আমার রাজ্য হইতে সকল নাস্তিক, বিধর্মী আর নূতন মতবাদ প্রচারকারী এবং ভণ্ডগণকে, যাহারা লোকের বিপথে গমনের কারণ স্বরূপ হয়, বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি ; আর আমি তাহাদের বদাওনীতে, আচার ব্যবহার আর পুস্তকাদি রহিত ও বাতিল করিয়া দিয়াছি। আর তাছাড়া লোকের মধ্যে রেশমের পোশাক পরিধান[2] করা এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ ব্যবহার করা প্রচলিত নিয়মে পরিণত হইয়াছে।

১. নির্বাহী সম্ভবতঃ বিবাহ সংক্রান্ত কোন কর হইবে। শেষ তিনটা কর দারোগা, কোতোয়াল ও খবরদারীকারকদের উপর ধার্য কর নয়, তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের উপর এই কর ধার্য করা হইত। ফতুহাতের অনুবাদক একটা ভিন্নরূপ তালিকা দিয়াছেন যেমন, মণ্ডভী বার্ক, দলালত-ই-বাজারহা, বাবারী, আমিরী তব, গুনকারোশী, জবিবা-ই-তাম্বুল, চাল্দী-খালা, কিওবী, কিলগরী, বহিকারোশী, গাতিনকবি, বিসমান কারোশী, বৌংশকরী, নাখুদ-বিরিয়ান, তাহ-বাজারী, ঝবা, কিমারখালা, দাদবাংকী, কোতোয়ালী, ইহতিসাবী, করহী, চবাই, মুসাদরাত, কিন্তু তিনি এইগুলির কোন ব্যাখ্যা বা অর্থ দেন নাই।

২. ফতুহাতের মতে সুলতান সিল্ক ও স্বর্ণের ব্রোকেডের তৈরী পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ করিয়া দেন আর শুধুমাত্র হযরতের প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী পোশাক পরিধান অনুমোদন করিতেন। তবে স্বর্ণের ব্রোকেড, এমব্রয়ডারী অথবা কাজ করা চার ইঞ্চি চওড়া পাড় মাত্র অনুমোদন করিতেন। তিনি রাজকীয় খানাপিনায় ও স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন কোসন ও অন্যান্য পাত্রাদি নিষিদ্ধ করিয়া দেন ; তাহার নিজস্ব তরবারির বাটে ও খাপে স্বর্ণ ও মণি মুক্তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। তিনি সাজ পোশাকে ও সম্মানীয় অঙ্গাবরণে ছবি নিষিদ্ধ করেন আর অন্যান্য আসবাবপত্রেও যেমন জিন, পেয়ালা, পান পাত্র, বাসন কোসন, তাঁবু, পর্দা চেয়ার ইত্যাদি ছবি নিষিদ্ধ করেন।

আর আমি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছি এবং হযরতের প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী নির্দেশ দান করিয়াছি। আর তাছাড়া মুসলমান ও কাফের উভয় মহিলাগণই পবিত্র লোকদের দরগাহ্ এবং মন্দিরে গমন করিতেন এবং ফলে নানারূপ বিশৃঙ্খলার কারণ হইতেন। আমি ইহা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং পৌত্তলিক মন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মাণ করিলাম। আর তাছাড়া আমি মসজিদ এবং পবিত্র ও জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত পূর্ববর্তী সুলতানের দ্বারা নির্মিত গৃহাদি যেমন মসজিদ[১] এবং ফকিরদের জন্য নির্মিত গৃহ, এবং কলেজ, এবং কুয়া ও জলাশয়, সেতু, কবরখানা, যে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল সেইগুলির সংস্কার সাধন ও পুনর্নির্মাণ করিয়াছি এবং এইগুলির ব্যয়ভার নিবাহের জন্য ভূমি দান করিয়াছি। আর যে সব লোককে আমার প্রভু সুলতান মুহম্মদ (তাহার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক) শান্তি দিবার জন্য প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন অথবা যাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদনের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহাদের পুত্র ও উত্তরাধিকারীগণকে পুরস্কার ও ভাতা বরাদ্ধ করিয়া তাহাদের হৃদয় শান্ত করিয়াছি এবং তাহাদের নিকট হইতে সুলতানের দায়মুক্তির পত্র লইয়া সেগুলি তাহার স্মৃতিসৌধে স্থাপন করিয়াছি। আর তাছাড়া যখনই আমি কোন দরবেশ বা ফকিরের কথা শুনিয়াছি, তখনই আমি তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার হৃদয়ে শান্তি দান করা আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। আর তাছাড়া সৈন্য ও আমীরগণের মধ্যে যে কেহ বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকেই আমি আমার উপদেশ ও নীতিকথা দ্বারা প্রবোধ দিয়াছি এবং তাহাদিগকে ভাতা ও উপহার বরাদ্ধ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে পরবর্তী জগতে (মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য) জন্য কাজ করিবার নির্দেশ দিয়াছি।

নিম্নলিখিতগুলি হইল তাহার দ্বারা সৎ কাজ ও জনহিতকর কাজের জন্য স্থাপিত ও নির্মিত গৃহাদির একটি তালিকাঃ জলপথ ও খাল—সংখ্যায় পঞ্চাশটি; মসজিদ, সংখ্যায় চল্লিশটি; কলেজ, সংখ্যায় ত্রিশটি, ফকিরদের জন্য গৃহ, সংখ্যায় বিশটি; প্রাসাদ, সংখ্যায় একশতটি; সরাইখানা, সংখ্যায় দুইশতটি; শহর, সংখ্যায় ত্রিশটি; জলাশয়, সংখ্যায় একশতটি; হাসপাতাল, সংখ্যায় পাঁচটি; স্মৃতিসৌধ, সংখ্যায় একশতটি; সর্বসাধারণের স্নানাগার, সংখ্যায় দশটি; মিনার সংখ্যায় দশটি; কুপ, সংখ্যায় একশত পঞ্চাশটি; সেতু, সংখ্যায় একশত পঞ্চাশটি; উদ্যান অসংখ্য; আর প্রত্যেকটি গৃহের জন্য দানপত্র লিখিতে হয় এবং এইগুলির জন্য রাজস্ব মওকুফ নির্ধারণ করা হয়; আর সকল মসজিদ, এবং কলেজ, এবং খানকাহ এবং স্নানাগার এবং কুপের জন্য পরিচালক ও ভৃত্য নিযুক্ত করা হয়; আর তাহাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়; আর ইহাদের বিবরণ অতি দীর্ঘ হইবে বলিয়া দেওয়া গেল না।

১. ফতুহাত ইহাদের একটি তালিকা দিয়াছে।

আর তাছাড়া তিনি বলেন যে, তাহারা তাহাকে দুইবার বিষ দিয়াছিল আর তিনি জানিয়া শুনিয়াই[১] তাহা পান করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। এই পুস্তকে অন্যান্য যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব এই ইতিহাসে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাই সেইগুলির আর এই স্থানে পুনরাবৃত্তি করা হইল না। মহান আল্লাহ্ যেন তাহার উপর তাহার করুণা বর্ষণ করেন।

সুলতান তুঘলক শাহ

সুলতান তুঘলক শাহের পিতা ফতেহ খান, আর তাহার পিতা ফিরোয শাহ। তিনি আঃ হিজরা ৭৯০ সালের (১৩৩৮ খ্রীঃ) রমযান মাসের ১৮ তারিখে[২] কতিপয় আমীরের সহায়তায় সিংহাসনে আরোহণ কবেন এবং ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনি মালিক তাজুদ্দীনের পুত্র মালিক ফিরোযকে তাহার উজির নিযুক্ত করেন[৩] এবং তাহাকে খান ই জাহান উপাধি দান করেন। ঘিয়াসুদ্দীন তরমুযী সিলাহদার (অস্ত্রশস্ত্রের রক্ষক) পদ লাভ করেন; আর তিনি মালিক ফিরোয আলীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে জামদার[৪] পদে নিয়োগ করেন। তাহার পিতা এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। মালিক ফিরোয আলী এবং বাহাদুর নাহিরকে সুলতান মুহম্মদ শাহকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করা হয়; আর সামানার গভর্ণর সুলতান শাহ, এবং রায় কামাসুদ্দীন এবং আরও কতিপয় আমীরকে এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ঐ বৎসরেরই শাওয়াল মাসে সেনাবাহিনী সরমুর পর্বতে পৌঁছে। শাহজাদা মুহম্মদ শাহ ঐ স্থান ত্যাগ করেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে গমন করিয়া বাকনারী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন; আর যখন তুঘলক শাহের সেনাবাহিনী তথায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, তখন তিনি ঐ স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া শেষ পর্যন্ত নগরকোট দুর্গে আগমন করেন, এবং সেনাবাহিনী (তুঘলক শাহের)[৫] পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

যেহেতু সুলতান তুঘলক শাহ তাহার তারুণ্যের পৌরুষ ও সজীবতার[৬] জন্য নিজেকে আরাম-আয়েস ও ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন করিয়া রাখে আর সার্বভৌমত্বে

১. চারিটি পাণ্ডুলিপিতে আছে জানিয়া শুনিয়া আর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে না জানিয়া।
২. বদাওনী কোন তারিখ দেন নাই।
৩. বদাওনী এই নিয়োগগুলি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই, অথবা মুহম্মদ শাহকে আক্রমণের জন্য প্রেরিত আমীরগণেরও নামোল্লেখ করেন নাই।
৪. সম্ভবতঃ সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি।
৫. বদাওনী বলেন যে সেনাবাহিনী দুর্গম পথের জন্য প্রত্যাবর্তন করে।
৬. বদাওনী এই সম্বন্ধে কোন কিছুই বলেন নাই অথবা তুঘলক শাহের দাদার শাহকে কারারুদ্ধ করা সম্বন্ধেও কিছু উল্লেখ করেন নাই।

কর্তব্য সম্পাদন হইতে বিরত থাকেন এবং শাসনকার্যে ভুল ভ্রান্তি দেখা দিতে আরম্ভ করে। তুঘলক শাহ্ তাহার অভিজ্ঞতার অভাব ও অসাবধনাতার ফলে তাহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতা সালার শাহকে কারারুদ্ধ করেন ; আর যাফর খানের পুত্র[১] এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু বকর উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং নিজেকে আলাদা করিয়া নেয় এবং পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। সহকারী উজির মালিক রুকনুদ্দীন[২] এবং অন্যান্য আমীরগণ তাহার সহিত যোগদান করেন এবং তাহারা এক বিদ্রোহের সূচনা করে এবং তাহারা ফিরোযাবাদে তুঘলক শাহের প্রাসাদের দ্বারে[৩] মালিক মুবারক কবিরকে[৪] হত্যা করে। তুঘলক শাহ বিদ্রোহের কথা জানিতে পারিয়া এবং বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া যমুনা নদীর দিকের এক দরজা দিয়া খান-ই-জাহানের[৫] সহিত প্রাসাদ ত্যাগ করেন। মালিক রুকুদ্দীন তথায় আগমন করেন এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে হত্যা করেন আর তাহাদের শির ঐ দ্বারেই ঝুলাইয়া রাখেন। এই ঘটনা ঘটে আঃ হিজরা ৭৯১ সনের (১৩৮৯ খ্রীঃ) সফর মাসের ২১ তারিখে ; আর তাহার সালতানাতের সময় ছিল পাঁচ মাস এবং তিন দিন। আর আল্লাহ্ই প্রকৃত সত্য অবগত আছেন।[৬]

সুলতান আবু বকর শাহ

এই ঘটনার পর আহাম্মক আমীরগণ সুলতান ফিরোয শাহের পৌত্র এবং যাফর খানের পুত্র আবু বকরকে সিংহাসনে বসান এবং তাহাকে আবু বকর শাহ উপাধি দান করেন। রুকনুদ্দীনকে দেওয়া হয় ওযারতের পদ। কিছুকাল পর আবু বকর শাহ জানিতে পারেন যে রুকনুদ্দীন জনদাহ[৭] কতিপয় ফিরোয শাহী আমীরের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে অপসারণ করিয়া স্বয়ং বাদশাহ হইতে চাহিতেছে। আবু

---

১. ইনি ছিলেন সুলতান ফিরোযের পুত্র।

২. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন মালিক রুকনুদ্দীন চন্দ, উযির, সহকারী উযির নয়।

৩. ফিরিশতা ইহাকে আমীর-উল-উমরা অভিহিত করিয়াছেন।

৪. কর্ণেল রেঙ্কিং ইহার অনুবাদ করিয়াছেন মেহমানখানা।

৫. বদাওনী ইহাকে বলিয়াছেন উযির-খান-ই-জাহান।

৬. বদাওনী তারিখ উল্লেখ করেন নাই ; তিনি রাজত্বকাল লিখিয়াছেন ৫ মাস ১৮ দিন। তবকাতের একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ৬ মাস ১৮ দিন, কিন্তু অন্যান্য সবগুলিতে আছে ৫ মাস ৩ দিন। আর ৭৯০ আঃ হিঃ ১৮ই রমযান তাহার সিংহাসনারোহণের সময় হইতে আঃ হিঃ ৭৯১ সনের ২১ই সফর পর্যন্ত ৫ মাস ৩ দিনই হয়।

৭. এই প্রথমবারের মত তাহাকে জনদাহ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বদাওনী তাহাকে প্রথম হইতেই চন্দা নামে অভিমত করিয়াছেন।

বকর শাহ কতিপয় আমীরের সহিত যোগ দিয়া আরও দ্রুত কাজ করিয়া তাহাকে হত্যা করিল ও তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলাইল ;[১] আর যে সব লোক তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল তাহারাও তরবারির খাদ্য হইল। আবু বকর শাহ এইবার দিল্লী আয়ত্তে আনিয়া এবং বাদশাগণের হস্তীসমূহ ও ধনরত্ন দখল করিয়া প্রভূত ক্ষমতা ও প্রাধান্য সঞ্চয় করিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে শত জনের আমীরগণ ঐ বৎসরেরই সফর মাসের ২৪ তারিখে সামানার গভর্ণর সুলতান শাহ খুসদিলকে[২] সুনাম[৩] নামীয় জলাশয়ের তীরে তাহাদের ছোরা ও তরবারির আঘাতে হত্যা করে আর তাহার গৃহ সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠন করে এবং তাহার শির নগরকোটে শাহজাদা মুহম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ করে। সুলতান মুহম্মদ শাহ নগরকোট হইতে যাত্রা করিয়া জলন্ধর হইয়া সামানা আগমন করেন: আর রবিউল আউয়াল মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামানার শতজনদের আমীরগণ আর পর্বতের পাদদেশের অঞ্চলের জমিদারগণ তাহার নিকট নূতন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করে আর দিল্লীর কিছু সংখ্যক আমীর আবু বকরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাহার সহিত যোগদান করেন আর বিশ সহস্র অশ্বারোহী[৪], সৈন্য এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য তাহার চতুর্দিকে জমায়েত হয়। তিনি যখন সামানা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং যখন তিনি ঐ শহরের সন্নিকটে উপনীত হন তখন তাহার অনুগামীদের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী। আঃ হিজরা ৭৯১ সনের (১৩৮৯ খ্রীঃ) রবিউল আখির মাসের ২৫ তারিখে তিনি জাহানুমা প্রাসাদে অবতরণ করেন। আবু বকর শাহ মুহম্মদ শাহের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য এবং তাহাদের বাধা দিবার জন্য তাহার সৈন্যদের ফিরোযাবাদে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এই সৈন্যগণ ঐ বৎসরেরই ২রা জমাদিউল আউয়াল মাসে ফিরোযাবাদের রাস্তায় রাস্তায় মুহম্মদ শাহের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করে। ঐ একই দিনে বাহাদুর নাহির[৫] বিরাট একদল সৈন্যসহ শহরে আগমন করেন; আর ইহাতে আবু বকর শাহের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে যে আর তিনি তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিলেন।
২. বদাওনী বলেন যে তাহাকে পর্বতের পাদদেশে মুহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছিল।
৩. বদাওনী ইহাকে সামানার জলাশয় বলিয়াছেন।
৪. বদাওনী বলেন যে তাহার সহিত পঞ্চাশ হাজার অনুগামী ছিল। ইহারা অশ্বারোহী কি পদাতিক তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।
৫. বদাওনী ইহাকে মেওয়াটের খানজাদা নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ খানজাদা দ্বারা শাহজাদা বুঝাইতেছে।

পরদিন আবু বকর শাহ তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মুহম্মদ শাহ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং যমুনা অতিক্রম করিয়া দোয়াব অভিমুখে গমন করেন। তিনি তাহার দ্বিতীয় পুত্র হুমায়ুন খানকে সামানায় প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন ; আর তিনি ঐ দেশের জায়গীরদার মালিক যিয়া উল-মুলক আবু রাজা এবং রায় কামালউদ্দীন মুইন এবং রায় খলজিন বিহিতকেও প্রেরণ করেন আর তিনি স্বয়ং গঙ্গাতীরে অবস্থিত জালেসরে[১] অবস্থান করেন।

কতিপয় ফিরোয শাহী আমীর যেমন শহনা বা শহরের তত্ত্বাবধায়ক মালিক সারওয়ার[২] এবং মালিক উশ শর্ক এবং মুলতানের গভর্ণর নাসিরুল মুলক।[৩] বিহারের গভর্ণর খাওয়াস-উল-মুলক এবং অযোধ্যার গভর্ণর মালিক হিসামুদ্দীন এবং সরফুদ্দিন এবং মালিক কবির এবং হিসামুদ্দিনের পুত্রগণ এবং দৌলত ইয়ারের পুত্রগণ এবং কাম্প-কুজের গভর্ণর এর রায় শির এবং অন্যান্য রায়গণ এবং পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক মুহম্মদ শাহের সহিত যোগদান করে। তিনি মালিক সারওয়ারকে খাজাহ-ই-জাহান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাহাকে তাহার উজির নিযুক্ত করেন আর খাওয়াস-উল-মুলকে করেন খাওয়াস খান, সরফুদ্দীনকে সরফ খান আর নাসিরুল মুলককে খিযর খান এবং রায় শিরকে করেন রায় রায়ান। ঐ বৎসরই সফর মাসে তিনি পুনরায় তাহার পতাকা উত্তোলন করেন এবং দ্বিতীয়বারের জন্য দিল্লী অভিযান করেন। কুন্দি নামক একটি স্থানে আবু বকর শাহের সহিত তাহার এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর যেহেতু সার্বভৌমত্বের মোর তখনও সুলতান মুহম্মদের দিকে ফিরে নাই, ফলে তাহার সেনাদল পরাজিত হয়।

দ্বিপদী কবিতা

যতক্ষণ কোন কার্যের সময় না আসে ততক্ষণ
কোন বন্ধুর সাহায্যই তোমার কোন কাজে আসিবে না।

---

১. বদাওনীতে এই স্থানটির নাম দেওয়া আছে চপতর বা চিতোর। সম্ভবতঃ ইহা জালেসরই হইবে। ফিরিশতাও এই স্থানটির নাম জালেসর লিখিয়াছেন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে ইহাকে শহরের হস্তীসমূহের তত্ত্বাবধায়ক অভিহিত করিয়াছেন। বদাওনী বলেন যে মুহম্মদ শাহ জাহান্নুমা প্রাসাদে তাহার বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি বিভিন্ন পদ ও মর্যাদা বিলি করিতে আরম্ভ করেন এবং অন্যান্যদের মধ্যে তিনি মালিক সারওয়ার মুলককে করেন খাজা-ই-জাহান এবং মুলতানের গভর্ণর মালিক-উশ-শর্ক নাসিরুল মুলককে খিযর খান।

৩. বদাওনী লিখিয়াছেন মুলতানের গভর্ণর মালিক-উশ-শর্ক নাসিরুল মুলক, অর্থাৎ একজন লোক, দুইজন নহে।

আবু বকর শাহ্ তিন ক্রোশ পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তৎপর দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

মুহম্মদ শাহ পুনরায় জালেসরে তাহার ঘাঁটি স্থাপন করেন। ঐ বৎসরেরই রমযান মাসে মুলতান এবং লাহোর ও অন্যান্য শহরের অধিবাসীগণের প্রতি ফরমান ও নির্দেশ জারি হয় যে, যে কোন মহল্লা বা রাস্তায় ফিরোয শাহী ক্রীতদাসদের[১] দেখা যাইবে সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে; আর যে সব স্থানে এই নির্দেশ কার্যকরী করা হয় সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ দিন মহা হত্যাকাণ্ড এবং প্রচুর লুটতরাজ ও ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় এবং জনগণের মধ্যে এক অদ্ভুত উশৃঙ্খলা দেখা দেয়; পথ ঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, গৃহাদি লুটতরাজ ও ধ্বংস করা হয়। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ রাযতই খাজনা ও ট্যাক্স দান হইতে বিরত থাকে এবং প্রচুর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

আঃ হিজরা ৭৯২ সনের (১৩৮৯—৯০ খ্রীঃ) মহরম মাসে শাহজাদা হুমায়ুন খান অন্যান্য আমীরগণসহ, যেমন সামানার গভর্ণর ঘালিব খান[২] এবং যিয়াউল মুলক এবং আবু রাজা এবং মুবারক খান এবং মুল্লাহুন[৩] এবং হিসার ফিরোযার গভর্ণর শামস খান একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পানিপথে আগমন করেন আর দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করেন তাহাদের বাধা দিবার জন্য আবু বকর চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্যসহ ইমাদুল মুলককে প্রেরণ করেন; আর পানিপথের উপকণ্ঠে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শাহজাদা হুমায়ুনের বাহিনী পরাজিত হয় এবং তাহারা সামানা অভিমুখে পলায়ন করে। যেহেতু আবু বকর শাহের পুনঃ পুনঃ জয়লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তিনি ঐ বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে একটি বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্যদলসহ মুহম্মদ শাহকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে জালেসর অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি দিল্লী হইতে বিশ কারোহ দূরে শিবির স্থাপন করেন। মুহম্মদ শাহ তাহার অধিকাংশ সৈন্য জালেসরে রাখিয়া এবং আবু বকরের সৈন্যদের সহিত কোন যুদ্ধ না করিয়াও তাহার সহিত চারি সহস্র[৪] সাহসী যোদ্ধা লইয়া বাম দিকের রাস্তা ধরিয়া দিল্লী চলিয়া যান। আবু বকর শাহ শহরের প্রবেশ দ্বার রক্ষা করিবার জন্য যে সৈন্যদের রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহারা সামান্য যুদ্ধ করিল।

১. বদাওনী ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।
২. বদাওনী কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে হুমায়ুন খান সামানার সীমান্ত হইতে বহু আমীরকে ডাকাইয়া আনান।
৩. এই নামটি পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন মুল্লা হন, মুল্লা জুন এবং মুল্লা জুন।
৪. ফিরিশতা বলিয়াছেন, চারি সহস্র বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য।

১৯—

মুহম্মদ শাহ শহরের বদাওন দরওয়াজায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন এবং শহরে প্রবেশ করিলেন এবং হুমায়ুন প্রাসাদে[১] তাহার বাসস্থান স্থাপন করিলেন। শহরের উচ্চ নীচ সকল অধিবাসী সুলতান মুহম্মদ শাহের সহিত যোগ দিলেন। আবু বকর শাহ এই সংবাদ শুনিলেন এবং একই দিনে প্রাতঃকালীন আহারের সময় বহু সৈন্যসহ ঐ একই পথে শহরে প্রবেশ করিলেন; আর মালিক বাহাউদ্দীন জঙ্গীকে, যাহাকে মুহম্মদ শাহ প্রবেশ দ্বার রক্ষার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, হত্যা করিয়া হুমায়ুন প্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হন। মুহম্মদ শাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া হাউস-ই-খাস (সুলতানের জলাশয়) এবং দরওয়াজা দিয়া বাহির হইয়া যান এবং পুনরায় জালেসর গমন করিয়া তাহার নিজের সৈন্যদের সহিত মিলিত হন। মুহম্মদ শাহের দলভুক্ত কতিপয় আমীর যেমন খলিল খান বরবক[২] ও মালিক আদম এবং সুলতান ফিরোয শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ইসমাইলকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়; আর কিছু সংখ্যক যুদ্ধে নিহত হয়।

ঐ বৎসরের রমযান মাসে মীর হাজিব সুলতানী[৩] আবু বকর শাহের শত্রু হইয়া উঠে এবং ফিরোয শাহের কতিপয় দাস, যাহারা আমীরে উন্নীত হইয়াছেন, তাহারাও তাহার শত্রু হয় এবং গোপনে মুহম্মদ শাহের নিকট পত্র লেখে। আবু বকর শাহ সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন[৪] হইয়া পড়ে এবং কোটলা-ই-বাহাদুর নাহির[৫] অভিমুখে পলায়ন করেন যাহাতে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন আর মালিক শাহীন ইমাদুল মুলক এবং মালিক বহরী এবং সফদর খান সুলতানীকে দিল্লীতে রাখিয়া যান।[৬] তাহার রাজত্বকাল ছিল এক বৎসর ছয় মাস।

১. বদাওনী লিখিয়াছেন কসর হুমায়ুন। কর্ণেল রেঙ্কিং ইহার অনুবাদ করিয়াছেন হুমায়ুনের প্রাসাদ। কিন্তু মনে হয় ইহা ভ্রান্ত। কারণ এই স্থানে হুমায়ুন কাহারও নাম নয়। ইহা সৌভাগ্যশালী এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২. বদাওনী এইসব নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কতিপয় ক্ষমতাশালী আমীর এবং তাহার বিশেষ ভৃত্যগণকে হত্যা করা হয়।

৩. এই নামটি সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই নামটির সঠিক পাঠ বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা সুলতানের গৃহাধ্যক্ষ বুঝাইতেছে।

৪. এই গ্রন্থে এবং বদাওনীতে তাহার অসহায়তা বুঝাইতে যে পদ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইল "হস্ত পদ হারাইয়া।"

৫. বদাওনী ইহাকে বলিয়াছেন কোটলা-ই-মেওয়াট। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বাহাদুর নাহির ছিলনে মেওয়াটের খানজাদা। কর্ণেল রেঙ্কিং কোটলার সঠিক অর্থ দিয়াছেন 'ক্ষুদ্র দুর্গ' এবং বলিয়াছেন যে কোটলা মেওয়াট দ্বারা হরিদ্বার অথবা ইহার সন্নিকটস্থ কোন শহর বুঝাইতেছে। কিন্তু তবকাতের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় কর্ণেল রেঙ্কিং-এর এই ধারণা ভুল। কোটলা নামীয় কোন স্থানই বুঝাইতেছে।

৬. বদাওনীর মতে মালিক শাহীন এবং ইমাদুল মুলক দুই আলাদা ব্যক্তি। কিন্তু এই পুস্তক অনুযায়ী ইহারা দুই ব্যক্তি নহেন; একই লোকের নাম এবং উপাধি।

সুলতান মুহম্মদ শাহ পিতা সুলতান ফিরোয শাহ

উপরোক্ত রমযান মাসের ১৬ তারিখে মীর হাজিব এবং ফিরোয শাহের কতিপয় ক্রীতদাসের এক আবেদনপত্র মুহম্মদ শাহের নিকট পৌঁছিল। ইহাতে তাহাকে জানান হইল যে আবু বকর শাহ তাহার দলভুক্ত কতিপয় লোকসহ কোটলা গমন করিয়াছেন, এবং খান-ই-খানান সুলতান মুহম্মদ শাহের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রকে একটি হাতীতে আরোহণ করাইয়া তাহার মাথার উপরে রাজকীয় ছত্র স্থাপন করিয়াছেন। রমযান মাসের ১৯ তারিখে মুহম্মদ শাহ দিল্লীতে পৌঁছেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মীর হাজিব সুলতানীকে উযির পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে ইসলাম খান উপাধি দান করিলেন আর ফিরোয শাহের ক্রীতদাসগণ এবং দিল্লীর সকল অধিবাসী তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। দিন কয়েক পর তিনি ফিরোযাবাদ হইতে শহরে আগমন করিলেন এবং হুমায়ুন প্রাসাদে বসবাস আরম্ভ করিলেন।

ফিরোয শাহী ক্রীতদাসদের নিকট যে সব হস্তী ছিল তিনি সেইগুলি সব হস্তগত করিলেন এবং সেগুলিকে ভূতপূর্ব হস্তীচালকগণের হস্তে প্রদান করিলেন।[১] এই ব্যাপারে প্রথমোক্তগণ অসন্তুষ্ট হইল এবং এক রাত্রিতে তাহারা শহর হইতে পলায়ন করিল এবং তাহাদের স্ত্রী সন্তানগণসহ কোটলা নাহিরে গমন করিল এবং আবু বকরের সহিত যোগদান করিল। মুহম্মদ শাহ নির্দেশ দিলেন যে সুলতানের ক্রীতদাসদের যে কেহ শহরে বর্তমান আছে, তাহারা অবশ্যই শহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, এবং তাহাদিগকে তিন দিন সময়ের মধ্যেই ইহা করিতে হইবে। তাহাদের বেশীর ভাগই এই নির্দেশ পালন করিল আর যাহারা তিন দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না তাহাদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হইল। ইহা সর্বজনবিদিত যে সুলতানের কতিপয় ক্রীতদাসকে তিন দিনের নির্দিষ্ট সময়ের পর ধরা হইল এবং তাহার প্রাণভয়ে বলেন যে "আমরা আসিল।"[২] মুহম্মদ শাহ নির্দেশ দিলেন যে তাহাদের মধ্যে যে বলে 'ঘরাঘরি' সেই আসিল। যেভাবে মুহম্মদ শাহ উচ্চারণ করিতে বলিলেন, যেহেতু

১. বদাওনী এই কারণটির কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে সুলতান মুহম্মদ শাহ ফিরোযী ক্রীতদাসগণকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করেন। যেহেতু বিশৃঙ্খলার সময়ে তাহারাই বহু গণ্ডগোল ও বিদ্রোহের জন্য দায়ী ছিল।

২. এই অংশটির সঠিক অর্থ বুঝা যায় না। এ সম্বন্ধে বদাওনী যাহা বলিয়াছেন, কর্ণেল রেঙ্কিং তাহার সঠিক অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এই স্থানেও অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগত অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছিল। যাহারা স্থানীয় অধিবাসী বা আসলী নয় তাহাদিগকে শহর হইতে বিতাড়িত করা হইল, আর যাহারা নির্দিষ্ট সময় তিন দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করিতে পারিল না তাহাদিগকে হত্যা করা হইল। স্থানীয় অধিবাসী আর বহিরাগতগণের পার্থক্য তাহাদের উচ্চারণ হইতে ধরা হইত।

তাহারা সেইরূপে উচ্চারণ করিতে পারিল না এবং পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের এবং বাংলা-দেশের লোকদের ন্যায় উচ্চারণ করিল, সেইজন্য তাহাদিগকে হত্যা করা হইল ; আর পূর্বাঞ্চলের বহুলোক যাহারা আসিল ; কিন্তু ভালভাবে উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহারাও নিহত হইল। তিন দিন পর শহরে আর কোন ফিরোয শাহের ক্রীতদাস এবং খানাহযাদ (ক্রীতদাসের পুত্র ক্রীতদাস অথবা প্রভুর গৃহে জন্মানো ক্রীতদাস) যাহারা মুহম্মদ শাহের প্রতি বিরূপ হইয়াছিল, অবশিষ্ট রহিল না।

মুহম্মদ শাহ এইবার শাসনকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। এবং সর্বদিক ও সর্বপ্রান্ত হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। সামানায় অবস্থিত তাহার পুত্র হুমায়ুন খান সম্পূর্ণ এক বাহিনী সৈন্যসহ দিল্লী আগমন করিলেন এবং তাহার সহিত যোগদান করিলেন ; আর মুহম্মদ শাহ আরও অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি হুমায়ুন খানকে ইসলাম খান, এবং ঘালিব খান এবং রায় কামালুদ্দীন, এবং রায় খলজিনসহ আবু বকর শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সেনা-বাহিনী যখন কোটলা পৌঁছিল তখন আবু বকর এবং বাহাদুর নাহির এবং ফিরোয শাহের খানাহ্‌যাদগণ শাহজাদা হুমায়ুন খানের বাহিনীকে তাহার সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আঃ হিজরা ৭৯৩ সনের মহরম মাসের কোন এক দিনে আক্রমণ করিলেন এবং কতিপয় লোককে আহত করিলেন। ইত্যবসরে ইসলাম খান আর এক দিক হইতে আগমন করিলেন আর ঐ সময়েই শাহজাদা তাহার সৈন্যদের সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রথম আক্রমণেই আবু বকর শাহ এবং তাহার দলভুক্তগণ সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হইলেন এবং কোটলা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সংবাদ যখন মুহম্মদ শাহের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি অবিরাম পথ চলিয়া কোটলা আগমন করিলেন। আবু বকর শাহ এবং বাহাদুর নাহির আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন এবং তাহার নিকট আগমন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। বাহাদুর নাহিরকে একটি সম্মানীয় পোশাক উপহার দেওয়া হইল এবং তাহাকে ফেরৎ পাঠানো হইল। আবু বকর শাহকে তাহাদের সঙ্গে কান্দি গমনে বাধ্য করা হইল ; আর তথা হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করা হইল (সেনাবাহিনী হইতে) এবং মিরাট দুর্গে প্রেরণ করা হইল, আর তথায় কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করিলেন ; আর সুল-তান মুহম্মদ দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঐ বৎসরের মধ্যেই গুজরাটের গভর্ণর মুফাররাহ-ই-সুলতানীর বিদ্রোহ এবং অত্যাচারের সংবাদ আসে। ওয়াজিহ-উল মুলকের পুত্র যাফর খানকে ঐ প্রদেশের গভর্ণর করিয়া পাঠান হয়। আঃ হিজরা ৭৯৪ সনে (১৩৯১-৯২ খ্রীঃ) দোয়াবের

জমিদার নরসিং মযকুর[১] এবং সরদাধরণ এবং বীর ভানের বিদ্রোহের সংবাদ আসে এবং সুলতানের নির্দেশে ইসলাম খান তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। নরসিং ইসলাম খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু পরাজিত হয় এবং কাফেরগণের বহু সংখ্যক নিহত হয় আর সুলতানের বাহিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে তিনি নিরাপত্তা ভিক্ষা করেন এবং ইসলাম খানের সঙ্গে দিল্লী আগমন করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে সরদাধরণ বলারাম[২] শহর আক্রমণ করেন। তখন সুলতান স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন আর তিনি যখন কাল নদীর[৩] তীর পর্যন্ত পেঁৗছেন তখন তাহারা ইতাওয়া দুর্গে পলায়ন করে। যে দিন সুলতান ইতাওয়া পেঁৗছেন, সেদিন কাফেরগণ প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া যুদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে দুর্গ ত্যাগ করে এবং পলায়ন করে। পরদিন সুলতান দুর্গটি বিধ্বস্ত করিয়া দেন এবং কান্যকুব্জ অভিমুখে গমন করেন এবং কান্যকুব্জের কাফিরদের আর দলমৌ-এর রায়গণকে শাস্তি দান করিয়া জালেসর আগমন করেন এবং তথায় একটি দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহার নাম দেন মুহম্মদাবাদ।

ঐ বৎসরের রজব মাসে খাজা-ই-জাহান নায়েব, যিনি (দিল্লী) শহরে অবস্থান করিতেছিলেন, এর নিকট হইতে একটি পত্র আসে আর ইহাতে জানান হয় যে ইসলাম খান বিদ্রোহ করিবার মনস্থ করিয়াছে এবং পাঞ্জাব গমন করিয়া তথায় বিশৃঙ্খলা স্বষ্টির চেষ্টায় আছে। সুলতান এই সংবাদ পাইবামাত্র জালেসরের বাহিনীসহ শহরে আগমন করিলেন এবং একটি বিচার সভা সংগঠন করিলেন এবং ইসলাম খানকে তলব করিয়া তাহাকে এই সংবাদের সত্যতা ব্যাখ্যা করিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি ইহা অস্বীকার করিলেন। গজু নামে একজন হিন্দু আর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র, যাহারা তাহার শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহারা এই ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিল। সুলতান ইসলাম খানকে শাস্তি দিলেন এবং খান-ই-জাহানকে উযির পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি মালিক মুকাররব-উল-মুলককে একদল সৈন্যসহ মুহম্মদাবাদে প্রেরণ করিলেন।

আঃ হিঃ ৭৯৫ সনে (১৩৯২-৯৩ খ্রীঃ) সরদাধরণ[৪] এবং জিত সিং রাঠোর এবং ভাস্নহর প্রধান ব্যক্তি বীর ভানের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা স্বষ্টির সংবাদ সুলতানের নিকট

১. পাণ্ডুলিপিতে এই নামগুলি সঠিক বুঝা যায় না। যে নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। প্রথম নামটি সম্ভবতঃ নরসিংহ অথবা নরসিংহ হইবে। বদাওনী শুধু একটি নাম দিয়াছে হরসিং রায়, যাহা, অনেকটা বরসিং বা নরসিং এর অনুরূপ। মযকুর শব্দের কি অর্থ তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা কোন রাজপুত উপজাতির নামের ভুল রূপ।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ইহা বিভিন্নরূপ আছে যেমন মলকরম, বলাবাম ও দিলারাম। বদাওনী লিখিয়াছেন বলারাম।

৩. আবসিয়াহ বা কালাপানি বা কালি নদী বা কালিনী যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী একটি নদী।

৪. বদাওনী কোন বিদ্রোহীর নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি সকলকে একত্রে 'ইতাওয়ার বিদ্রোহীগণ' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। নামগুলি পাণ্ডুলিপি হইতে সঠিক বুঝা যায় না, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইয়াছে।

পৌঁছিল। তিনি এই বিদ্রোহ দমনের জন্য মালিক মুকাররব-উল-মুলককে নিযুক্ত করিলেন। উভয় পক্ষ যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন মালিক মুকাররব উল-মুলক শান্তি স্থাপনের জন্য আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং রায়গণকে চুক্তি ও অঙ্গীকার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে সুলতানের নিকট আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকারে সম্মত করাইলেন এবং তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে কান্যকুব্জে আনিলেন আর তথায় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। রায় শির[1] কিন্তু পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন এবং ইতাওয়া গমন করিলেন আর মালিক মুকাররব-উল-মুলক মুহম্মদাবাদ প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঐ বৎসরের শাওয়াল মাসে সুলতান মেওয়াট অভিমুখে গমন করিলেন এবং (ঐ অঞ্চলটি) লুটতরাজ ও বিধ্বস্ত করিলেন; আর মুহম্মদাবাদ হইতে জালেসর গমন করিয়া তথায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে বাহাদুর নাহির দিল্লীর নিকটস্থ কতিপয় স্থান আক্রমণ করিয়াছে এবং ক্ষতিসাধন করিয়াছে। সুলতান তাহার দুর্বলতা সত্ত্বেও মেওয়াটের দিকে অগ্রসর হন। তিনি যখন কোটলা পৌঁছেন তখন বাহাদুর নাহির তাহার সম্মুখে আগমন করিয়া বাধা দেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া কোটলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু যেহেতু তিনি তথায় নিজেকে টিকাইয়া রাখিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি পলায়ন করিলেন এবং জর জর[2] গমন করিলেন। সুলতান মুহম্মদাবাদে তিনি যে অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন সেইগুলির তদারক করিতে তথায় গমন করিলেন এবং এই সময় তাহার অসুখ বৃদ্ধি পায়। আঃ হিজরা ৭৯৬ সনের (১৩৯৩-৯৪ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসে তিনি শেইখা খোখরের বিরুদ্ধে এক বাহিনী সৈন্য পরিচালনা করিবার জন্য শাহজাদা হুমায়ুন খানকে নিযুক্ত করেন। শেইখা খোখর বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং লাহোর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। শাহজাদা যখন লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন ঐ বৎসরেরই রবিউল আউয়ালের ১৭ তারিখে সুলতানের ইন্তেকালের সংবাদ আসে।[3] আর শাহজাদা শহরে অপেক্ষা করে। সুলতান মুহম্মদের রাজত্বকাল ছিল ছয় বৎসর সাত মাস।

১. পাণ্ডুলিপিতে সিব বা সর আছে। সম্ভবতঃ ইহা সরদাধরণ হইবে।

২. এই স্থানের নামটি পরিষ্কার বুঝা যায় না। জর জর আন্দাজ করিয়া লেখা।

৩. বদাওনী বলেন যে তাহাকে তাহার পিতার কবরের পাশে হাউস-ই-খাসের তীরে সমাহিত করা হয়। এই শেষোক্ত জলাশয়টি ফিরোয শাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইয়াযদীর যাফরনামাতে বলা হইয়াছে যে ইহা এত সুবৃহৎ ছিল যে ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীর যেখা যাইত না। বর্ষাকালে ইহা বৃষ্টির পানিতে পূর্ণ হইত আর দিল্লীর লোকেরা সারা বৎসর ইহা হইতে পানি সংগ্রহ করিত। ইহার তীরেই ফিরোয শাহের কবর।'

সুলতান আলাউদ্দীন সিকান্দর শাহ

তিনি ছিলেন সুলতান মুহম্মদ শাহের দ্বিতীয় পুত্র আর তাহার উপাধি ছিল হুমায়ুন খান। সুলতান মুহম্মদ শাহ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি তিন দিন শোক পালন করেন; এব, তৎপর ঐ বৎসরের ১৯ই রবিউল আউয়াল তিনি আমীর এবং সৈয়দ এবং কাযী আর শহরের (দিল্লী) খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সমর্থনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খাজা-ই জাহানকে তাহার উযির নিযুক্ত করেন; আর তিনি সকল অফিসারের স্ব স্ব পদে পুনর্বহালে সম্মতি দান করেন। ঐ বৎসরেরই জমাদিউল আউয়াল মাসের পঞ্চম দিনে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন।[১]

দ্বিপদী কবিতা

ভাগ্য যদি তোমার বন্ধু না হয় তা হ'লে ধনরত্ন আর সম্পদের কি দাম আছে!
এই দুনিয়ায় কেহই তাহার নির্ধারিত পরিমাণের বেশী আহার করিতে পারে না।

তাহার রাজত্বকাল ছিল এক মাস ষোল দিন। আর আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।

সুলতান মাহমুদ শাহ (মুহম্মদ শাহের কনিষ্ঠতম পুত্র)

সুলতান আলাউদ্দীন যখন ইন্তেকাল করেন তখন অধিকাংশ আমীর যেমন সামানার গভর্ণর ঘালিব খান এবং রায় কামালুদ্দীন মুইন, এবং মুবারক খান হালাজু এবং আন্দেরী ও কর্ণার গভর্ণর খাওয়াস খান সুলতান মাহমুদের নিকট হইতে কোন অনুমতি না নিয়াই শহর ত্যাগ করেন এবং তাহাদের জায়গীরে গমন করিতে মনস্থ করেন। খান-ই-জাহান ইহার সংবাদ পাইয়া এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার আশা দান করিয়া শহরে ফিরাইয়া আনেন এবং ঐ বৎসরেরই জমাদিউল আউয়াল মাসের ২০ তারিখে আমীর এবং মালিক এবং শহরের গণ্যমান্য লোকের সাহায্যে তিনি হুমায়ুন প্রাসাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন আর সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি খাজা-জাহানকে উযির পদে বহাল রাখেন; আর মুকাররব-উল-মুলককে মুকাররব খান উপাধি দান করিয়া তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী[২] নিযুক্ত করেন; আর আবদুর রশিদ সুলতানীকে সাদত খান উপাধি দান করিয়া তাহাকে বারবেগী (গৃহাধ্যক্ষ) নিযুক্ত করেন; আর মালিক সারঙ্গকে

১. তাহাকে তাহার পিতা ও পিতামহের কবরের পাশে হাউস-ই-খাসের তীরে সমাহিত করা হয়।
২. ফিরিশতা বলেন যে তাহাকে ভকিল-উস-সালতানাত এবং আমিরুল উমারা নিযুক্ত করা হয়।

সারঙ্গ খান উপাধি লাভ করেন এবং দিবালপুরের গভর্ণর নিযুক্ত হন; আর মালিক দৌলতিয়ার দবিরকে দেওয়া হয় দৌলত খান উপাধি আর তাহাকে আরিয-ই-মুমালিক[১] পদে নিয়োগ করা হয়। পূর্বে ইমাদুল মূলক এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

যেহেতু জমিদারগণের উশৃঙ্খলতার ফলে হিন্দুস্তানের সর্ব দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ[২] যেমন জৌনপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, সুলতান কান্যকুব্জ হইতে বিহার[৩] পর্যন্ত দেশটি খাজা সারওয়ারের হস্তে প্রদান করেন, এবং তাহাকে খাজা-ই-জাহান উপাধি দান করেন; সুলতান মুহম্মদও তাহাকে জৌনপুরের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তাহাকে সুলতান-উশ-শর্ক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আঃ হিজরা ৭৯৬ সনের রজব মাসে তিনি তাহাকে ২০টি হস্তী এবং শক্তিশালী এক দল সৈন্যসহ ঐ দেশে প্রেরণ করেন। সুলতান-উশ-শর্ক ঐ জেলাগুলিতে অত্যন্ত শক্তি সংগ্রহ করে এবং জমিদার-গণকে দমন করে[৪] এবং তাহাদিগকে আয়ত্বাধীনে আনয়ন করে। তাহারা যে সব দুর্গ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল সে সব দুর্গের কিছু সংখ্যক তিনি পুনর্নির্মাণ করেন।[৫] জাজনগরের রায় এবং লক্ষণাবতীর বাদশাহ প্রতি বৎসর সুলতান ফিরোয শাহকে যে উপহার ও কর দিতেন, এখন তাহা তাহার নিকট প্রেরণ করেন।

এই বৎসরই সুলতানের নির্দেশে সারঙ্গ খানকে দিবালপুর আয়ত্বে আনয়নের জন্য এবং শেইখা খোখরের উশৃঙ্খলতা দমন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়[৬]; আর ঐ বৎসরের শাবান মাসে দিবালপুরে পৌঁছিয়া এবং তাহার সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খল করিয়া লইয়া তিনি আঃ হিজরা ৭৯৬ সনের (১৩৯৩-৯৪ খ্রীঃ) যিকাযাহ মাসে রায় খালজিন বেহতি, রায় দাউদ এবং কামাল মইন এবং সুলতানের

১. আরিয-ই-মুমালিক, সেনাবাহিনীর বেতন দানকারী। যাহারা চাকুরী বা পদোন্নতি চায় সে সব বিষয় তিনি সুলতানের নিকট পেশ করেন এবং বিষয়টি তাহার নিকট ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী কালে এই পদটির নাম হয় বকসী।

২. এই স্থানটির বিভিন্ন রূপ পাঠ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা যাহা এই স্থানে দেওয়া হইয়াছে এইরূপই হইবে।

৩. বদাওনীও প্রায় এইরূপই বলেন, যে তাহাকে কান্যকুব্জ হইতে বিহার পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগটির গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। এই স্থানে কর্ণেল রেঙ্কিং যে অনুবাদ করিয়াছেন যে তাহাকে কান্যকুব্জ হইতে বিহারে বদলী করা হয় তাহা ঠিক নহে।

৪. বদাওনী বলেন যে তিনি জাজনগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৫. বদাওনী বলেন যে, যেসব দুর্গ তিনি পুনর্নির্মাণ করেন সেইগুলি কাররা, অযোধ্যা, সন্দিলা, মালুতা, বাহরাইচ ও তিরহুত জেলায় অবস্থিত ছিল। মালুতা সম্ভবতঃ দলমৌ হইবে।

৬. বদাওনীর মতে সারঙ্গ খান সুলতান-উশ-শর্ক কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির তাহার নিয়োগে কোনরূপ হাত থাকা সম্ভবপর নয়।

সেনাবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া লাহোর অভিমুখে গমন করেন; আর তিনি যখন ঐ শহরের নিকটে উপস্থিত হন তখন শেইখা খোখর সম্পূর্ণ এক বাহিনী যুদ্ধের জন্য পুরাপুরি প্রস্তুত সৈন্যসহ তাহার সম্মুখীন হন এবং লাহোরের দ্বাদশ কারোহ দূরবর্তী[১] একটি স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে। সারঙ্গ খানের পতাকার উপরে বিজয়ের সমীরণ প্রবাহিত হয়; আর শেইখা খোখর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া জমুন পর্বতে পলায়ন করে। পর দিন সারঙ্গ খান লাহোর দুর্গ দখল করে এবং তাহার ভ্রাতা মালিক কাজুকে তিনি আদিল খান উপাধি দিয়া তথায় রাখিয়া যান এবং স্বয়ং দিবালপুর আগমন করেন।

উপরোল্লিখিত বৎসরের শাবান মাসে সুলতান মাহমুদ সাদত খানকে তাহার সঙ্গে লইয়া এব মুকাররব খানকে কতিপয় হস্তী এবং বিশেষ বাহিনীর কতিপয় সৈন্যসহ শহরে রাখিয়া গোয়ালিয়র ও বিয়ানা অভিমুখে গমন করেন। সুলতান যখন গোয়ালিয়রের সন্নিকটে উপস্থিত হন[২] তখন মালিক আলাউদ্দীন ধরভাল এবং মুবারক খান[৩] এবং মালিক রাজুর পুত্র এবং সারঙ্গ খানের ভ্রাতা মল্লু সাদত খানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। শেষোক্ত ব্যক্তি ইহার সংবাদ পাইয়া মালিক আলাউদ্দীন এবং মুবারক খানকে বন্দী করে এবং তাহাদিগকে হত্যা করে। মল্লু পলায়ন করিয়া দিল্লীতে মুকাররব খানের নিকট উপস্থিত হয়। সুলতান অতি দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন।[৪] মুকাররব খান দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন আর যেহেতু মল্লু তাহার নিকট আগমন করিয়াছে সেইজন্য তাহার মনে কিছুটা অসন্তোষের ভাব দেখেন। তিনি চাতুরী ও কৌশল করিয়া শহরে প্রবেশ করেন[৫] এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। সুলতান সাদত খানকে সহ শহরটি তিন মাস কাল অবরোধ করিয়া রাখেন এবং প্রত্যেকদিন খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে। তিন মাস কাল ধরিয়া[৬] এই অবস্থা চলিতে থাকে। এই সময়ে[৭] মুকাররব খানের

১. বদাওনী এই স্থানটির নাম লিখিয়াছেন সামোথলা অথবা সামোথালা।

২. বদাওনী বলেন যে সুলতানের গোয়ালিয়র গমনের পথে বাগাউর নামক স্থানে তিনি পাথরের একটি বিস্তৃত মসজিদ নির্মাণ করেন, যাহা তাহার সময়েও বিদ্যমান ছিল।

৩. বদাওনী বলেন যে মুবারক খান ছিলেন মালিক রাজুর পুত্র, অর্থাৎ এই পুস্তকে লিখিত মুবারক খান ও মালিক রাজুর পুত্র একই ব্যক্তি। বদাওনী মল্লুকে মল্লু খান নামে অভিহিত করেন।

৪. বদাওনী বলেন যে সুলতান শহরের কিছু দূরে শিবির স্থাপন করেন।

৫. বদাওনী বলেন যে তিনি নিজেকে পরিখার মধ্যে সুরক্ষিত করেন।

৬. এই স্থানে অর্থ সঠিক বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ এইরূপই অর্থ হইবে।

৭. এই ব্যাপার সম্বন্ধে ফিরিশতা নিম্নরূপ লিখিয়াছেন: (১) মুকাররব খান সুলতানের জাঁকজমক ও সৈন্য সন্নিবেশ দেখিয়া যেহেতু তিনি মল্লু আশ্রয় খানকে দিয়াছেন, সেজন্য ভীত হইয়া পড়েন এবং শহরের অভ্যন্তরে পলায়ন করেন এবং (২) সুলতান মাহমুদ বুঝিতে পারেন যে এই

কতিপয় শুভাকাঙ্খী সুলতানের সহিত প্রতারণা করে এবং তাহাকে শহরে আনয়ন করে, কিন্তু হস্তী ও অশ্বসমূহ এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সাদত খানের নিকট থাকিয়া যায়। মুকাররব খান সুলতানের আগমনের জন্য নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য শহর হইতে বাহির হইয়া আসে, কিন্তু পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাদত খান যখন দেখিলেন যে দিল্লী দুর্গ দখল করা দুঃসাধ্য হইবে আর বর্ষাকাল শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি শহরের উপকণ্ঠ ত্যাগ করেন এবং ফিরোযাবাদ গমন করেন আর তাহার দলভুক্ত লোকদের সহিত একযোগে কাজ করিয়া মেওয়াটে অবস্থিত নসরত শাহকে আনয়ন করেন। নসরত শাহের পিতা ছিলেন ফতেহ খান, আর তাহার পিতা ছিলেন ফিরোয শাহ। আর ঐ বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসে ফিরোযাবাদে তাহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং তাহাকে নাসিরুদ্দীন নসরত শাহ উপাধি দান করেন।

নসরত খানের আমীরগণ যখন দেখিলেন যে তিনি একজন ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নহেন তখন তাহারা প্রতারণা ও কৌশল করিয়া সাদত খানের নিকট হইতে তাহাকে আলাদা করিয়া নেন এবং তাহাদের বেশ কিছু সংখ্যক সাদত খানকে আক্রমণ করে আর সাদত খান এই অতর্কিত আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া যান। তিনি তাহাদের বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া দিল্লী গমন করেন এবং মুকাররব খানের সহিত যোগদান করেন, আর ঐ বিশ্বাসঘাতক তাহাকে বন্দী করেন এবং তাহাকে হত্যা করেন। নসরতশাহী আমীরগণ যেমন মুহম্মদ মুযাফফর এবং শাহাব নাহির এবং ফযলুল্লাহ বলখী আর ফিরোয শাহী ক্রীতদাসগণের সকলেই নসরত শাহের প্রতি পুনরায় তাহাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন। মুহম্মদ মুযাফফরকে ভকিল-ই-মুমালিক[১] নিযুক্ত করা হইল এবং তাহাকে তাতার খান উপাধি দান করা হইল। শাহাব নাহিরকে উপাধি দেওয়া হইল শাহাব খান আর ফযলুল্লাহ বলখীকে করা হইল কুতলুঘ খান। আর দিল্লী ও ফিরোযাবাদের মধ্যে দুইজন বাদশাহ থাকেন। মুকাররব খান এক শক্তিশালী বাহিনীসহ বাহাদুর নাহিরকে পুরাতন দিল্লীর দুর্গে রাখিয়া যান এবং তিনি বহির্ভাগের দুর্গভার মল্লুর হস্তে অর্পণ করেন এবং তাহাকে ইকবাল খান উপাধি দেন। প্রতিদিনই দিল্লী এবং ফিরোযাবাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ এবং সংঘর্ষ হইতে থাকে এবং সাধারণভাবে দুই পক্ষই প্রায় সমান বলশালী দেখা গেল। দোয়াবের কতিপয়

যুদ্ধটা সাদত খানের জন্যই সংঘটিত হইতেছে এবং তিনি তাহার অন্তরঙ্গ লোকদের পরামর্শেই মুকাররব খানের সহিত যোগদান করেন। কিন্তু বদাওনীও বলেন যে মাহমুদ শাহ মুকাররব খানের দলভুক্ত লোকদের দ্বারা প্রতারিত হন।

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহা বিভিন্ন রূপ আছে যেমন, ভকিল, ভকিল উযির, উযির।

পরগণা এবং পানিপথ এবং সোনপাত[১] ও রুহ্তাক ও ঝাজর ও দিল্লী হইতে বিশ কারোহ পর্যন্ত স্থান নসরত শাহের অধিকারে থাকে, আর মাহমুদ শাহের অধিকারে থাকে শুধু দিল্লীর দুর্গ এবং কোষাগার।[২] এই দুই বাদশাহের প্রত্যেকটি মালিক ও আমীর একটি করিয়া প্রদেশ দখল করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য বেষ্টিত হয় এবং তাহাদের নিজেদের হিসাবেই শাসনকর্তা এবং রাজাতে পরিণত হন; আর তিন বৎসর কাল এই অবস্থা চলিতে থাকে।

শ্লোক

যে দেশের দুই রাজা থাকে তাহার দুরবস্থার অন্ত থাকে না।

আঃ হিজরা ৭৯৮ সনে (১৩৯৫ খ্রীঃ) দিবালপুর এবং লাহোরের গভর্ণর সারঙ্গ খান, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে মাহমুদ শাহই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মুলতানের গভর্ণর খিযর খানের প্রতি বৈরী হইয়া উঠেন। মালিক বেহ্তির কতিপয় ক্রীতদাস সারঙ্গ খানের সহিত যোগদান করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুলতান অধিকার করেন। আর আঃ হিজরা ৭৯৯ সনের (১৩৯৬ খ্রীঃ রমযান মাসে নসরত শাহের পক্ষীয় সামানার গভর্ণর ঘালিব খানকে আক্রমণ করেন। ঘালিব খান তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং পরাজিত হইয়া পানিপথে তাতার খানের নিকট আগমন করেন। নসরত খান এই সংবাদ পাইয়া দশটি হস্তী এবং কতিপয় সৈন্য তাতার খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।[৩] আঃ হিজরা ৮০০ সনের (১৩৯৭ খ্রীঃ) মহরম মাসের ১৫ তারিখে কোটলা শহরের সন্নিকটে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সারঙ্গ খান পরাজিত হন এবং মুলতান অভিমুখে পলায়ন করেন। মালিক আলমাস[৪] সামানা অধিকার করেন এবং তাহা ঘালিব খানের[৪] হস্তে সমর্পণ করেন এবং সারঙ্গ খানকে তালওয়ান্দী পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করেন।

১. বদাওনী সোনপাত ছাড়া আর সবগুলি স্থানের নাম দিয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে সমতা যোগ করিয়াছেন।
২. এই শব্দটির পাঠ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে, কোনটি সঠিক বুঝা যায় না। ইহা কোষাগার না হইয়া কোন স্থানেরও নাম হইতে পারে। এই সম্বন্ধে বদাওনী বলেন "এবং কতিপয় প্রাচীন ও ভগ্নপ্রায় দুর্গ যেমন দিল্লী এবং সিরি, ইত্যাদি সুলতান মাহমুদের অধিকারে থাকে"; আর তিনি এই প্রবচনটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন যে "পৃথিবীর বাদশাহের শাসন দিল্লী হইতে পালাম পর্যন্ত বিস্তৃত।"
৩. এই স্থানের পাঠও বিভিন্নরূপ আছে।
৪. বদাওনী লিখিয়াছেন 'আলমাস'। আর ফিরিশতা লিখিয়াছেন মালিক ইলিয়াস।
৫. ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না মালিক আলমাস আর তাতার খানের মধ্যে কে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বদাওনী বলেন যে তাতার খান তালওয়ান্দীর সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং কামালুদ্দীন মুবিনকে সারঙ্গ খানের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

রবিউল আউয়াল মাসে আমীর সাহিব কিরান তাইমুর গুরিগানের পৌত্র মির্যা পীর মুহম্মদ[১] সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া আসেন[২] এবং উছের দুর্গ অবরোধ করেন। সারঙ্গ খানের পক্ষে উছের গভর্ণর ছিলেন মালিক আলী, তিনি নিজেকে পরীখায় সুরক্ষিত করেন এবং এক মাস ধরিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন[৩]। সারঙ্গ খান চারি সহস্র সাহসী অশ্বারোহীসহ মালিক তাজুদ্দীন নায়েব[৪]কে মালিক আলীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। মির্যা পীর মুহম্মদ ইহা অবগত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যান এবং শত্রুদের বাধা দানে অগ্রসর হইয়া সহসা তাহাদের উপর নিপতিত হন। মালিক তাজুদ্দীন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন আর মির্যা পীর মুহম্মদ তাহার পায়ে পায়ে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অগ্রসর হন এবং মুলতান দুর্গ অবরোধ করেন। ছয় মাস কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং প্রত্যেক দিনই যুদ্ধ হয়। অবশেষে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং মির্যা পীর মুহম্মদের নিকট গমন করিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি মুলতান অধিকার করিবার পর ঐ অঞ্চলে কিছুদিন অপেক্ষা করেন।

ঐ বৎসরেরই শাওয়াল মাসে ইকবাল খান[৫] নসরত শাহের নিকট গমন করেন এবং তাহারা শেখ কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর (আল্লাহ্ যেন তাহার কবর পবিত্র করেন) কবরে পবিত্র গ্রন্থের নামে (পাক কুরান) নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং তিনি নসরত শাহকে জাহান-পানাহ[৬] দুর্গে নিয়া যান। মাহমুদ শাহ, মুকাররব খান ও বাহাদুর নাহিরসহ পুরাতন দিল্লীতে সুরক্ষিত থাকেন। ইহার পর তৃতীয় দিনে ইকবাল খান নসরত শাহকে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অসাবধান করিয়া তাহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করেন। নসরত শাহ অসহায় অবস্থায় দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং ফিরোযাবাদ গমন করেন। কিন্তু সেখানেই তিনি অবস্থান না করিয়া (তাহার) উযির তাতার খানের[৭] নিকট গমন করেন; আর ফিরোযাবাদ ইকবাল

১. কিরান দ্বারা বুঝায় দুইটি উপকারী গ্রহের সংযোগ যেমন বৃহস্পতি ও শুক্র। তাইমুর এইরূপ এক সংযোগের সময়ে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাহাকে সাহিব-ই-কিরান বলা হয়।

২. ফিরিশতা বলেন যে "নৌকায় তৈরী সেতু দ্বারা।"

৩. এই স্থানটির প্রকৃত অর্থ হইবে 'ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন'।

৪. বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন মালিক তাজুদ্দীন বখতিয়ার এবং আরও বলেন যে তাহার সঙ্গে মাত্র ১000 অশ্বারোহী ছিল।

৫. বদাওনী বলেন যে তিনি মল্লু নামেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন।

৬. বদাওনীতে আছে জাহান-নুমা, কিন্তু পাদটিকায় আছে যে একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে জাহান-পানা, তবে ফিরিশতায় আছে জাহান-নুমা। তবকাতে আছে জাহান পানাহ। দিল্লীর তিনটি দুর্গের অন্যেরটির নাম ছিল জাহান পানাহ। ইহার প্রাচীন দিল্লীকে সিরির সহিত সংযোগ করিত। জাহন-নুমা একটি প্রাসাদের নাম।

৭. বদাওনীর মতে তিনি তখন পানিপথে ছিলেন।

খানের অধিকারে আসে। মুকাররব খান তখন জাহান-পানাহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার আত্মরক্ষায় যত্নবান হন। ইকবাল খান[১] একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অতর্কিতে মুকাররব খানের গৃহ আক্রমণ করেন এবং তাহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিয়া হত্যা করেন।[২] তিনি কিন্তু সুলতান মাহমুদ শাহের কোন ক্ষতি সাধন করেন নাই এবং তাহাকে ক্রীড়নক করিয়া রাষ্ট্রের কার্যাবলী স্বয়ং পরিচালনা করিতে থাকেন।

এই বৎসরের যিকাদেহ মাসে তিনি পানিপথে তাতার খানকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। শেষোক্ত জন কতিপয় হস্তীসহ একজন সৈন্য দুর্গে রাখিয়া অপর এক পথ দ্বারা দিল্লী গমন করেন। তিন দিন পর পানিপথের দুর্গ অধিকৃত হয় আর হস্তীগুলি এবং তাতার খানের জিনিসপত্র ইকবাল খানের হস্তগত হয়। যদিও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন তবু তাতার খান দিল্লী অধিকার করিতে ব্যর্থ হইলেন এবং পানিপথের পতনের সংবাদ পাইয়া তিনি[৩] অসহায় হইয়া পড়েন এবং গুজরাটে তাহার পিতার নিকট গমন করেন। ইকবাল খান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমিরুল মুলককে আদিল খান উপাধিতে ভূষিত করেন। আদিল খান তাহার দলভুক্ত ছিলেন যদিও তিনি তাতার খানের আমীর হইতেন এবং তাহার কারণেই তিনি তাতার খানকে আক্রমণ করিতে পানিপথে গমন করিয়াছিলেন। ইকবাল খান দোয়াব পর্যন্ত সামানা তাহার হস্তে ন্যস্ত করেন আর তিনি দৃঢ়ভিত্তির উপর তাহার শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

আঃ হিজরা ৮০১ সনের (১৩৯৮ খ্রীঃ) সফর মাসে সংবাদ আসে যে মহান আমীর তাইমুর গুরগান তালামবাহ[৪] আক্রমণ করিয়া মুলতান আগমন করিয়াছেন; আর তিনি মির্যা পীর মুহম্মদ যাহাদের বন্দী করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকেই হত্যা করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া ইকবাল খান শঙ্কিত হইয়া উঠেন[৫] এবং তাহার সৈন্য

১. সকল পাণ্ডুলিপিতেই এইরূপ পাঠ আছে কিন্তু মনে হয় এইস্থানে কোন কিছু বাদ পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে বদাওনী বলেন, "নসরত শাহের সমস্ত বাহিনী এবং হস্তীসমূহ চতুর ইকবাল খানের হস্তগত হয় আর পূর্ণ দুই মাসকাল ধরিয়া মুকাররব খান এবং ইকবাল খানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইতে থাকে; শেষ পর্যন্ত কতিপয় আমীরের হস্তক্ষেপের ফলে এই দুই নেতার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু কয়েকদিন পর ইকবাল খান মুকাররব খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং কোনরূপ সতর্ক না করিয়াই অতর্কিতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অবরোধ করেন; আর তাহাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াও তাহাকে শহীদ পর্যায়ে উন্নীত করেন।

২. কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে আশ্রয়দানে অস্বীকার করিয়া, আবার কোন পাণ্ডুলিপিতে এবং বদাওনীতে আছে 'নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া।'

৩. তাহার পিতার নাম ছিল যাফর খান। বদাওনীর মতে তিনি বহু সংখ্যক অনুচরসহ তাহার পিতার নিকট গমন করেন।

৪. ঝিলাম ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত স্থান।

৫. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে শঙ্কিত হইয়া; একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শঙ্কিত না হইয়া।

সংগ্রহ ও সজ্জিত করিতে আরম্ভ করেন। আমীর তাইমুর (অথবা হযরত সাহিব কিরান) মুলতান হইতে আগমন করিয়া ভাটনীর[১] দুর্গ অবরোধ করেন এবং রায় খালজিন বেহতিকে[২] বন্দী করিয়া ঐ দুর্গে যে সব লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলকে হত্যা করেন আর ঐ স্থান হইতে তিনি সামানার জেলাসমূহ বিধ্বস্ত করেন। দিবালপুর, এবং অযোধান[৩] এবং সরস্বতি হইতে বহুসংখ্যক লোক পলায়ন করিয়া দিল্লী আগমন করেন আর অধিকাংশ লোককে বন্দী করা হয় এবং হত্যা করা হয়। আমীর সাহিব কিরান ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া এবং সৌভাগ্য দ্বারা এবং উচ্চ নিয়তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দোয়াব অঞ্চলে আগমন করেন; আর ঐ দেশটি লুণ্ঠন করিয়া এবং লোকগণকে বন্দী করিয়া[৪] লুনি শহরে[৫] শিবির স্থাপন করেন। লোকে বলে যে সিন্ধু নদী এবং গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ হইতে তিনি পঞ্চাশ হাজার লোককে বন্দী করেন আর অসংখ্য লোককে হত্যা করেন। আর বহু সংখ্যক লোক পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করে।[৬]

আঃ হিঃ ৮০১ সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি যমুনা নদী অতিক্রম করেন এবং ফিরোযাবাদে শিবির স্থাপন করেন এবং তাহার পরদিন তিনি হাউস-ই-খাসের তীরে আসিয়া উপনীত হন। ইকবাল খান শহর হইতে বাহিরে আগমন করিয়া শেষবারের মত প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু প্রথম আক্রমণেই বিজয়ী বাহিনীর বীরদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন; আর বহু লোক পায়ের নীচে চাপা পড়িয়া নিহত হয় আর বাকী লোককে বন্দী করা হয় অথবা হত্যা করা হয়। আর তাহার অধিকাংশ হস্তী ও সাজ-সরঞ্জাম মহান তাইমুরের হস্তগত হয়; যখন রাত্রি হইল তখন

১. এই স্থানের নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপে দেওয়া আছে যেমন ভিরা, বাহিরা বা ভাটনীর। বদাওনীতে আছে ভাট, তবে কর্ণেল রেঙ্কিং বলেন যে একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ভাতির, আর তিনি বলেন যে ইহা ভাটনীর হইবে।

২. বদাওনীর ইহার নাম লিখিয়াছেন জলজিন। ফিরিশতা লিখিয়াছেন রাও খালজি। মুলফুযাত তাইমুরি তাহার নাম লিখিয়াছেন রাও দুলচাইন। বদাওনী বলেন যে ইহাকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু তবকাত ইহা স্পষ্টরূপে লিখেন নাই।

৩. পাকপাতানে অবস্থিত অযোধান। এই স্থানে শেখ ফরিদুদ্দীন গঞ্জ-ই-শকরের কবর অবস্থিত। তাইমুর এই কবর দর্শনে আগমন করেন।

৪. এইস্থানে মূল পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবতঃ কিছু ভুল আছে।

৫. লুনি দিল্লীর ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে যমুনা ও হালিমের মধ্যবর্তী দোয়াবে অবস্থিত। তাইমুর ২৭ই রবিউল আউয়াল তথায় আগমন করেন।

৬. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, "পার্বত্য অঞ্চলে আগমন করিয়া নিজেদের লুকাইয়া রাখে।"

মল্লু খান[১] তাহার পরিবার ও সন্তানদের ত্যাগ করিয়া বারান[২] শহরে গমন করেন; আর সুলতান মাহমুদ তাহার অল্প কয়েকজন ভৃত্য[৩] এবং বিশেষ অনুচরগণকে সঙ্গে লইয়া গুজরাটের পথ ধরেন। পরদিন মহান সাহিব-ই-কিরান দিল্লীর লোকদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন; আর এই নিরাপত্তার আশ্বাসের মূল্য আদায়ের জন্য লোক নিযুক্ত করেন। অর্থ আদায়কারী লোকদের কঠোরতার ফলে দৈবাৎ কতিপয় লোক অর্থ আদায়ে অসম্মতি জানায় এবং শেষোক্তগণের কয়েকজনকে হত্যা করে। ইহার ফলে শক্তিমান তাইমুরের ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়; আর তিনি শহরের অধিবাসীগণকে হত্যা এবং বন্দী করিবার নির্দেশ দেন। দিনের মধ্যে অসংখ্য লোককে হত্যা করা হয় এবং বন্দী করা হয়, কিন্তু অবশেষে শহরবাসীদের অন্যায় প্রতি রাজকীয় ক্ষমার[৪] কলম চালিত হয় এবং তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দান ও নিরাপত্তা দান করেন। কয়েকদিন পর মেওয়াটে পলাতক খিযর খান নিরাপত্তার আশ্বাস প্রার্থনা করেন এবং বাহাদুর নাহির, এবং মুবারক খান এবং উযির খানসহ আগমন করেন এবং তাইমুরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। শেষোক্ত জন একমাত্র খিযর খান[৫] ছাড়া, যাহাকে তিনি একজন সৈয়দ এবং একজন ধার্মিক লোকরূপে জানিতেন, অন্যান্য সকলকে বন্দী করিবার নির্দেশ দান করেন; আর প্রত্যাবর্তনের[৭] জন্য তাহার পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া পর্বতের পাদদেশের একটি পথ ধরিয়া যাত্রা করেন; আর শিবালিক পর্বতের পাদ-দেশের অঞ্চলটির উচ্চতা বিজয়ী বাহিনীর পদভারে[৬] নীচু হইয়া যায়।

তিনি যখন লাহোর গমন করেন তখন কৌশল করিয়া তিনি শেইখা খোখরকে (যাহার সহিত সারঙ্গ খানের শত্রুতা ছিল, ফলে তিনি তাইমুরের চাকুরী গ্রহণ করেন

১. তাহার সৌভাগ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইকবাল হইতে মল্লু খানে পরিণত হন।

২. বারান আধুনিক বুলন্দশহর।

৩. কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে 'ভৃত্যগণ' আর কোনটাতে আছে তাহার নিকটস্থ লোকগণ।

৪. বদাওনীর মতে শেখ আহম্মদ কথুর হস্তক্ষেপের ফলে এই ক্ষমা লাভ সম্ভবপর হয়। তিনি বলেন, যে চতুর্থ দিনে তিনি সকল অধিবাসীগণকে বন্দী করিবার নির্দেশ দেন এবং তাহাদের সকলকে ট্র্যান্স সক্সিয়ানার দিকে নিতে থাকেন। অবশেষে শেখ আহমদ কথু, গুজরাটের আহমদাবাদের নিকটস্থ সরখেয যাহার কবর সুবিখ্যাত, সেনাবাহিনীর সঙ্গে গমন করেন এবং মহান তাইমুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার প্রভুত জ্ঞান প্রদর্শন করেন ও সেনাদের সহিত আগত ট্র্যান্স সক্সিয়ানার পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া তাহার গভীর জ্ঞানের প্রমাণ দেন আর তিনি যে একজন দরবেশ তাহাও প্রকাশিত হয় এবং বন্দীদের পক্ষ হইয়া তাইমুরকে অনুরোধ করেন; মহান তাইমুর তাহার ভক্ত হইয়া উঠে তাহার আবেদন গ্রহণ করিয়া সকল বন্দীকে মুক্তি দান করে।

৫. বদাওনী বলেন যে তিনি খিযর খানকে রক্ষা করেন পূর্বে তিনি তাহার কোন উপকার করিয়াছিলেন।

৬. বদাওনী তাহার সেনাবাহিনীর মার্চ করাকে ভূমিকম্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এবং তাহার পথ প্রদর্শক ও শুভাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হন এবং প্রতারণা করিয়া লাহোর অধিকার করেন) তাহার সমস্ত পরিবার ও অনুগামীদেরসহ বন্দী করেন এবং লাহোর লুটতরাজ ও ধ্বংস করেন। তিনি মুলতান ও দিবালপুর খিযর খানের হস্তে ন্যস্ত করেন এবং কাবুলের পথে সমরখন্দ অভিমুখে গমন করেন।

দুই মাস ধরিয়া দিল্লী জনশূন্য[১] অবস্থায় থাকে। পূর্বোল্লেখিত বৎসরের রজব মাসে নসরত শাহ, যিনি ইকবাল খানকে লক্ষ্য করিয়া দোয়াবে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র একদল সৈন্যসহ মিরাট গমন করেন এবং আদিল খান তাহার নিজের সৈন্য ও চারিটি হস্তীসহ তাহার সহিত যোগদান করেন আর যে সব লোক মুঘলদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া এবং দোয়াবে অবস্থান করিতেছিল তাহারাও তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। আর তিনি দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ ফিরোযাবাদে আগমন করেন; এবং দিল্লী দখল করেন; তখনও ইহা ধ্বংস হইয়া আছে। শাহাব খান দশটি হস্তী এবং একটি সুসজ্জিত বাহিনীসহ মেওয়াট হইতে আগমন করেন, মালিক আলমাস[২] দোয়াব হইতে আগমন করেন। সৈন্যসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন নসরত শাহ, বারানে অবস্থিত ইকবাল খানের বিরুদ্ধে শাহাব খানকে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে ইকবাল খানের প্ররোচনায় কতিপয় জমিদার রাত্রিকালে অতর্কিতে আক্রমণ করে; আর শাহাব খান শহীদ হন এবং তাহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহার সাজ-সরঞ্জাম ও হস্তী-সমূহ ইকবাল খানের হস্তগত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি দিনে দিনে অধিকতর শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হইয়া উঠিতে থাকে, তিনি দিল্লীর দিকে নজর দেন আর নসরত শাহ তাহার মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরোযাবাদ ত্যাগ করেন এবং মেওয়াটে[৩] পলায়ন করেন আর দিল্লী ইকবাল খানের দখলে আসে। যে সব লোক মুঘলদের ভয়ে দিল্লী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা অল্প-কালের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করে; আর হিসার সিরি পুনরায় জনবহুল হইয়া উঠে।

ইকবাল খান দোয়াব অঞ্চল এবং শহরের উপকণ্ঠের ভূমিসমূহ তাহার দখলে রাখিয়াছিল, আর ভারতের সব দেশটাই বিভিন্ন আমীরের দখলে থাকে।[৪] গুজরাট ছিল যাফর খান আর তাহার পুত্র তাতার খানের দখলে। সৈয়দ খিযর খানের দখলে ছিল মুলতান এবং দিবালপুর এবং সিন্ধু দেশের কিয়দংশ। মাহোবা এবং কাল্পী ছিল

১. বদাওনী বলেন যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয় এবং যে সব লোক ফেলিয়া যাওয়া হয় তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
২. কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে মালিক ইলিয়াস।
৩. বদাওনী বলেন যে তথায় তিনি দ্রুত তাহার স্থায়ী ভবনে গমন করেন অর্থাৎ ইন্তেকাল করেন।
৪. ফিরিশতাতেও বিভিন্ন স্বাধীন নৃপতিগণের নাম দেওয়া আছে।

মালিকযাদা ফিরোযের পুত্র মাহমুদ খানের অধিকারে। খাজা জাহান সুলতান-উশ-শর্ক দখল করিতেন কান্যকুব্জ এবং অযোধ্যা, এবং দলমৌ এবং সন্দিলা এবং বাহরাইচ এবং বিহার এবং জৌনপুর ; দিলাওয়ার খানের অধিকারে ছিল মালব ; আর মালিক খানের ছিল সামানা আর শামস খান আউহাদির ছিল বিয়ানাহ ; আর তাহাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং ইহাদের কেহই অন্য কাহারও প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতেন না।

আঃ হিঃ ৮০২ সনের (১৩৯৯ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসে ইকবাল খান বিয়ানা অভিমুখে গমন করেন আর শামস খান আসিয়া তাহাকে বাধা দান করেন।[১] কিন্তু পরাজিত হইয়া বিয়ানাহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহার হস্তীসমূহ (ইকবাল খানের) হস্তগত হয়।[২] অতঃপর তিনি বদাওনের চতুষ্পার্শ্বস্থ খ্যাতনামা স্থান কৈথার অভিমুখে গমন করেন এবং রায় নরসিংহের[৩] উপর কর ধার্য করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। একই বৎসরে খাজা-ই-জাহান জৌনপুরে ইন্তেকাল করেন।[৪] আর তাহার পালক পুত্র মালিক মুবারক করণফুলকে[৫] তাহার স্থলে সুলতান করা হয় এবং তিনি সুলতান মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং খাজা-ই-জাহানের অধিকৃত স্থানসমূহ তাহার দখলে আসে।

আঃ হিজরা ৮০৩ সনের (১৪০০ খ্রীঃ) জমাদিউল আউয়াল মাসে ইকবাল খান মুবারক শাহ শর্কীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন ; আর বিয়ানার গভর্ণর শামস খান এবং মুবারক খান ও বাহাদুর নাহির[৬] তাহার মিত্ররূপে তাহার সঙ্গে গমন করেন আর তাহারা যখন গঙ্গাতীরের বৈতালী[৭] শহরে উপনীত হন তখন রায় সির এবং ঐ দেশের

১. বদাওনী বলেন যে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয় নুহ ওয়া পটল নামক স্থানে।
২. এই স্থানের পাঠ অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই আছে কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে ভিন্নরূপ আছে।
৩. এই নামটি পাণ্ডুলিপিতে নরসিংহ বা বরসিং দেওয়া আছে। বদাওনী নামটি লিখিয়াছেন হরসিং রায় বা রায় হরসিং। ইনিছিলেন ইতাওয়ার প্রধান।
৪. অথবা বদাওনী যেমন তাহার কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলেন, "আল্লার করুণার সহিত মিলিত হইয়াছেন।"
৫. বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন করণকল। তবকাত-ই-আকবরীর অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে করণফুল। কর্ণেল রেঙ্কিং এক ব্যাখ্যায় বলেন যে তিনি ছিলেন খাজা-ই-জাহানের পালক পুত্র মালিক ওয়াসিল।
৬. বদাওনী মুবারক খানকে (তিনি অবশ্যই মুবারক শাহ শর্কী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি) বাহাদুর নাহিরের পুত্ররূপে আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তবকাতের কোথায়ও এই সম্পর্কের কোন উল্লেখ নাই।
৭. বদাওনী বলেন যে এই শহরটি কালনদীর তীরে অবস্থিত। কর্ণেল রেঙ্কিং এক টীকায় বলেন যে কালাপানি বা কালানদী বা কালিনী নদী যমুনা ও গঙ্গার মধ্যে অবস্থিত। জাইবুর এই নদীর নাম বলিয়াছেন কালাম্বু (কালাপানি)। ফিরিশতা কিন্তু বলেন যে ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

সকল জমিদার অগ্রসর হইয়া তাহাদের বাধা দান করেন এবং এক যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ইতাওয়া পলায়ন করেন আর ইকবাল খান কান্যকুব্জ গমন করেন। এইক্ষণে মুবারক খান সম্মুখে আগমন করেন এবং দুই মাস ধরিয়া গঙ্গা নদীর তীরে তাহারা পরস্পরের বাধা দান করেন। অবশেষে তাহারা চুক্তি সম্পাদন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে ইকবাল খান, মুবারক খান ও শামস খান আউহাদির প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠেন এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উভয়কে বন্দী করেন এবং তাহাদিগকে হত্যা করেন। এই বৎসরেই সামানার গভর্ণর মালিক খানের জামাতা তাঘি খান তুর্ক বাচাহ এক বিরাট বাহিনীসহ খিযর খানকে আক্রমণ করেন এবং পূর্বোক্ত বৎসরের রজব মাসের ৯ তারিখে উভয় পক্ষ শেখ ফরিদের পাতান নামে খ্যাত অযোধানে পরস্পরের সম্মুখীন হন এব এক সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পর তাঘি খান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং ভৌদার[১] শহরে পলায়ন করেন। ঘালিব খান ও অন্যান্য আমীরগণ যাহারা তাহার সহিত ছিলেন, তাহারা তাঘি খানকে বন্দী করেন এবং হত্যা করেন। আর আঃ হিজরা ৮০৪ সনে (১৪০১ খ্রীঃ) সুলতান মাহমুদ, যিনি তাইমুরের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রত্যাগমনের পর তথা হইতে ধার এ আগমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিবার পর ধার হইতে দিল্লী আগমন করেন। ইকবাল তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আগাইয়া যান এবং তাহাকে জাহান-পানার[২] হুমায়ুন প্রাসাদে স্থাপন করেন। কিন্তু যেহেতু সার্বভৌমত্ব ও শাসন তাহারই আয়ত্তাধীনে ছিল, তিনি সুলতানের প্রতি কপট আচরণ করিতে থাকেন। শেষোক্ত জন ইকবাল খানকে তাহার সঙ্গে লইয়া কান্যকুব্জ অভিমুখে রওয়ানা হন; আর তাহারা যখন তাহাদের গমন পথে তখন সংবাদ আসে যে মুবারক শাহ শর্কী ইন্তেকাল করিয়াছেন আর তাহার ভ্রাতা সুলতান ইব্রাহীম তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। সুলতান মাহমুদ জৌনপুর দখল করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া তাহা করিবার চেষ্টা করেন। সুলতান ইব্রাহীমও সুসজ্জিত এক বাহিনী সৈন্য এবং পর্বত প্রমাণ হস্তীসমূহসহ তাহাকে বাধা দিতে আগমন করেন; আর কয়েকদিন ধরিয়া উভয় পক্ষের সাহসী যোদ্ধাগণ একসঙ্গে যুদ্ধ করেন। যেহেতু সুলতান মাহমুদ ইকবাল খানকে অত্যন্ত সন্দেহ[৩] করিতেন এবং ভয় পাইতেন আর সুলতান ইব্রাহীমকে

১. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে ভৌদর, ভৌদ, ভৌহর। কর্ণেল রেঙ্কিং লিখিয়াছেন ভুহর।

২. বদাওনী বলেন জাহান-নুমা প্রাসাদে।

৩. বদাওনী বলেন যে সুলতান মাহমুদের অন্তরে ইকবাল খানের প্রতি বৈরী ভাব বিরাজ করিতেছিল। কারণ তিনিই সার্বভৌমত্বের আনুসঙ্গিক সব কিছু ভোগ করিতেছিলেন।

তাহার অনুগত মনে করিতেন এবং তাহার পরিবারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও লালিত হইয়াছিলেন,[১] এক রাত্রে তিনি তাহার নিজস্ব সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া একাকী ও কোন সঙ্গী না লইয়া সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনীতে গমন করেন ; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার নীচ বংশ ও অকৃতজ্ঞতার দরুন আতিথেয়তার কর্তব্য সম্পাদন ও প্রয়োজনীয় পরিচর্চা না করিবার ফলে সুলতান মাহমুদ তথায়ও অবস্থান করেন না, তাহার প্রতি যে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয় ইহাও না থাকিবার একটি কারণ ; আর তিনি কান্যকুব্জে আগমন করেন এবং শর্কী রাজ্যের অধীনস্থ তথাকার গভর্ণর শাহজাদা হারিভীকে[২] বিতাডিত করিয়া শহরটি অধিকার করেন। ইকবাল খান দিল্লী অভিমুখে গমন করেন আর সুলতান ইব্রাহীম জৌনপুর প্রত্যাগমন করেন। কান্য-কুব্জের উচ্চ নীচ সকল অধিবাসীই সুলতান মাহমুদের সহিত যোগদান করেন আর তাহার ক্রীতদাস ও অনুচরগণ যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারা চতুর্দিক হইতে আসিয়া জমায়েত হয় এবং তিনি কান্যকুব্জ নিয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

আঃ হিজরা ৮০৫ সনের (১৪০২ খ্রীঃ) জমাদি উল-আউয়াল মাসে ইকবাল খান গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন।[৩] ইহা তাইমুরের সেনাবাহিনীর আগমনের সময় দিল্লীর সুলতানগণের হাত হইতে চলিয়া যায় এবং রায় নরসিংহের হস্তগত হয় আর তাহার মৃত্যুর পর ইহা তাহার পুত্র বিরাম দেও-এর অধিকারে যায়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত শক্তিশালী বিধায় ইকবাল খান ইহা দখল করিতে অপারগ হন। ফলে তিনি ইহার চতুর্দিকস্থ জেলাসমূহ বিধ্বস্ত করেন এবং তৎপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। পর বৎসর তিনি পুনরায় গোয়ালিয়র অভিযান করেন। বিরাম দেও তাহাকে বাধা দিতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসেন এবং ধোলপুর দুর্গের সম্মুখে এক যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হন এবং দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যখন রাত্রি হয় তখন তিনি দুর্গ পরিত্যাগ করেন এবং গোয়ালিয়র অভিমুখে

১. বদাওনী ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তিনি বলেন যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে সুলতান মাহমুদ শিকার অভিযানে গমনের নাম করিয়া ইকবাল খানের বাহিনী ত্যাগ করিয়া যান এবং সুলতান ইব্রাহীমের নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, আর শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতি অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন।

২. বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন ফতেহ খান হারাই এবং কর্ণেল বেক্সিং লিখিয়াছেন হিরাতের ফতেহ খান।

৩. এই পদটি পাণ্ডুলিপিতে অসম্পূর্ণ তবে অর্থ বুঝিতে অসুবিধা হয় না। নর সিংহ ও বিরাম নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে, যেমন বরসিংহ ও পরম। বদাওনীর এক স্থানে নামটি দেওয়া আছে হরসিংহ এবং অপর স্থানে দেওয়া আছে বরসিংহ। বদাওনী আরও বলেন যে বরসিংহ দুর্গটি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হস্তগত করিয়াছিলেন।

পলায়ন করেন। ইকবাল খান গোয়ালিয়র দুর্গ পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং লুটতরাজ ও ধ্বংসলীলা সম্পন্ন করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিজরা ৮০৬ সনে (১৪০৩ খ্রীঃ) সংবাদ আসে যে গুজরাটের গভর্ণর যাফর খানের পুত্র তাতার খান তাহার পিতাকে আমীর পদ হইতে ও তাহার শাসন হইতে অপসারণ করিয়াছেন এবং নিজেকে নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহ[১] উপাধি দান করিয়াছেন।

আঃ হিজরা ৮০৭ সনে (১৪০৪ খ্রীঃ) ইকবাল খান ইতাওয়া অঞ্চলের জমিদারগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান করেন আর রায় সারওয়ার[২] এবং গোয়ালিয়রের রায় এবং রায় জালহার ও অন্যান্য রায়গণ ইতাওয়ায় নিজেদের সুরক্ষিত করেন এবং চারি মাস কাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি স্থাপন করেন এবং প্রতি বৎসর চারিটি হস্তী ও গোয়ালিয়রের রায় দিল্লীর শাসনকর্তাদের বৎসরে যে কর প্রদান করিতেন তাহা দিতে সম্মত হন। পূর্বোল্লিখিত বৎসরের শাওয়াল মাসে ইকবাল খান কান্যকুব্জে গমন করেন এবং সুলতান মাহমুদকে অবরোধ করেন আর যদিও তিনি বহু যুদ্ধ করেন কিন্তু তিনি কোন সুবিধাই লাভ করিতে পারেন না এবং ব্যর্থ মনোরথ হইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। আর আঃ হিজরা ৮০৮ সনের মহরম মাসে ইকবাল খান সামানা অভিমুখে গমন করেন। বাহরাম খান তুর্কবাচা যিনি সারঙ্গ খানের প্রতি বৈরী হইয়াছিলেন, ইকবাল খানের ভয়ে তাহার প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং বধনোর পর্বতে পলায়ন করেন। ইকবাল খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং ঐ পর্বতের এক উপত্যকার নিকটে শিবির স্থাপন করেন। কয়েকদিন পর শেখ জালাল বখারীর পৌত্র শেখ ইলমুদ্দীন[৩] হস্তক্ষেপ করেন এবং তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ইকবাল খান বাহরাম খানকে তাহার সঙ্গে লইয়া মুলতান অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন তালওয়ান্দী পৌঁছেন তখন তিনি রায় দাউদ এবং কামাল মুইন[৪] আর রায় খালজিন বেহতির পুত্র রায়

১. বদাওনী আরও বলেন যে তিনি দিল্লী দখল করিবার জন্য সেইদিকে গমন করিতেছিলেন কিন্তু তাহার চাচা শামস খান তাহাকে বিষ প্রয়োগ করেন এবং তৎপর যাফর খানকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

২. এই নামগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ নাম দেওয়া আছে কিন্তু ইহাদের পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ। বদাওনী কোন নাম উল্লেখ করেন নাই।

৩. বদাওনী বলেন যে তিনি মুলতান হইতে রূপার (আম্বালা শহর হইতে ৪৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত) গমন করেন এবং তথায় বাহরাম খানকে বন্দী করেন এবং তার শিরচ্ছেদ করেন।

৪. এই নামগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কামাল বা কামালুদ্দীন মুইনকে বদাওনী বলিয়াছেন কামালুদ্দীন মুবিন আর তিনি একমাত্র এই রায়কেই নাম সহ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে ইকবাল খান বাহরাম খানের শিরচ্ছেদ করিবার পর রায়দের মোকাবিলা করেন; আর তিনি তাহাদের বন্দী

ভৌকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করেন এবং তৃতীয় দিনে তিনি সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন এবং বাহরা'ম খানের চামড়া তুলিয়া নেন। তিনি যখন অযোধানে[১] দেহেন্দা নদীর[২] তীরে শিবির স্থাপন করেন, তখন খিযর খান দিবালপুর হইতে আগমন করেন এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া তাহাকে বাধা দান করেন এবং উপরিলিখিত বৎসরের ১৯শে জমাদিউল আউয়াল তারিখে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর প্রথম আক্রমণেই ইকবাল খান[৩] খিযর খানের সৈন্যদের হস্তে ধৃত হন এবং নিহত হন; আর তাহার নীচ অকৃতজ্ঞতা এবং তাহার পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার দ্রুত তাহাকে বরাদ্দ করা হয়।

দ্বিপদী কবিতা

বিশ্বাসঘাতকতায় সাহসী হইও না, কারণ ঘূর্ণমান অদৃষ্ট
তোমার কৃতকর্মের পুরস্কার দ্রুত তোমার কোলে নিক্ষেপ করিবে।

এই সংবাদ দিল্লী পৌঁছিলে দৌলত খান এবং ইখতিয়ার খান এবং অন্যান্য আমীরগণ যাহারা তথায় ছিলেন, কান্যকুব্জ হইতে মাহমুদ শাহকে তলব করেন; আর উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসে মাহমুদ শাহ দিল্লী আগমন করেন এবং পুনরায় সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেন; আর ইকবাল খানের পরিবার সন্তান এবং আত্মীয় স্বজন ও অধীনস্থ লোকদের সকলকে দিল্লী হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং কোলে প্রেরণ করা হয়, তবে তাহাদের কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করা হয় না। দোয়াবের ফৌজদারী দেওয়া হয় দৌলত খানকে আর ফিরোযাবাদ ইখতিয়ার খানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এই সময়ে আকলিম খান এবং বাহাদুর নাহির উভয়ের প্রত্যেকে কর রূপে দুইটি করিয়া হস্তী আনয়ন করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন।

সুলতান মাহমুদ সাফল্য লাভ করিয়া এবং তাহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া আঃ হিজরা ৮০৯ সনে (১৪০৬ খ্রীঃ) তাহারা পতাকা উত্তোলন করেন এবং তাহাকে যে অপমান করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জৌনপুর অভিমুখে গমন

করেন নাই, তিনি যখন খিযর খানকে আক্রমণ করিতে গমন করেন তখন তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে নিয়া যান। রায় খালজিন বেহতিকে অন্যত্র দুলচাইন বলা হইয়াছে।

১. অযোধান আধুনিক পাকপাত্তান বা পাত্তান-ই-শেখ ফরিদুদ্দীন গঞ্জ শকর।

২. দেহেন্দা নদী শতদ্রুর প্রধান স্রোত হইতে নির্গত হইয়া অযোধানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়া ৩৫ মাইল নীচে পুনরায় ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

৩. বদাওনী বলেন যে তাহার অশ্ব আহত হয় এবং তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহিরে নিয়া যাইতে সক্ষম হয় আর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করা হয়।

করেন ; আর তিনি এক বিরাট বাহিনীসহ দৌলত খানকে বিরাম খান তুর্কবাচার[১] বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহরাম খান তুর্কবাচার হত্যার পর বিরাম খান তুর্কবাচা সামানা অধিকার করিয়াছিলেন। মাহমুদ শাহ যখন কান্যকুব্জের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন, সুলতান ইব্রাহীম তাহাকে বাধা দানের জন্য জৌনপুর হইতে আগমন করেন ; এবং উভয় বাহিনী গঙ্গা নদীর তীরে পরস্পরের মুখোমুখি শিবির স্থাপন করে ; আর কয়েকদিন ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমীরদের প্রচেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হয়। প্রত্যেকেই তাহার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই প্রত্যাবর্তনের পর সুলতান ইব্রাহীম শাহ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, এই সময়ে সুলতান মাহমুদের আমীর ও সৈন্যগণের অধিকাংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাই সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করিয়া কান্যকুব্জে আগমন করেন। সুলতান মাহমুদের পক্ষীয় কান্যকুব্জের গভর্ণর মালিক মাহমুদ তরমতি দুর্গে অবস্থান করেন এবং চারি মাস কাল ধরিয়া যুদ্ধ করেন, কিন্তু তিনি যখন সুলতান মাহমুদের নিকট হইতে সাহায্য ও সৈন্য পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন তখন তিনি সুলতান ইব্রাহীমের নিকট নিরাপত্তা ভিক্ষা করেন এবং কান্যকুব্জ তাহার নিকট সমর্পণ করেন। সুলতান ইব্রাহীম মালিক দৌলতিয়ার কাম্বালার[২] পৌত্র ইখতিয়ার খানের উপর কান্যকুব্জের দায়িত্ব অর্পণ করেন ; আর বর্ষাকাল তথায় অতিবাহিত করেন।

আর আঃ হিজরা ৮১০ সনে (১৪০৭ খ্রীঃ) নসরত খান করকানদায[৩] এবং সারঙ্গ খানের পুত্র তাতার খান এবং ইকবালের একজন ক্রীতদাস মালিক মারহাবা নিজেদের সুলতান মাহমুদের নিকট হইতে আলাদা করিয়া নেয় এবং সুলতান ইব্রাহীমের নিকট গমন করে। শেষোক্ত ব্যক্তি তথা (কান্যকুব্জ) হইতে সম্বল[৪] গমন করেন। সুলতান মাহমুদের প্রতিনিধি আজাদ খান লোদী দুই দিন পর কোন যুদ্ধ না করিয়াই সম্বল দুর্গ তাহার নিকট হস্তান্তর করেন। সুলতান ইব্রাহীম ঐ স্থানটি তাতার খানের নিকট সমর্পণ করেন ; এবং দিল্লী অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন যমুনা নদীর তীরে উপনীত হন[৫] এবং তাহা অতিক্রম করিত উদ্ধত হন তখন সংবাদ আসে

১. বদাওনী তাহার কোন উল্লেখই করেন নাই, বা তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযানেরও উল্লেখ করেন নাই।
২. বদাওনী লিখিয়াছেন কাম্পিলার মালিক দৌলতিয়ার।
৩. বদাওনীর পারসিক গ্রন্থে আছে নসরত খান নেকড়ে শিকারী, কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে আছে করকানদায্।
৪ রোহিলখণ্ডে অবস্থিত।
৫. বদাওনী আরও বলেন যে দিল্লীর সন্নিকটের কিচা দুর্গের নিকটে।

যে গুজরাটের শাসনকর্তা যাফর খান মালব দেশটি জয় করিয়াছেন আর দিলাওয়ার খানের পুত্র আলপ খান,[১] যিনি সুলতান হোমান্দ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি তাহার হস্তে বন্দী হইয়াছেন। এ সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করেন।

উপরোক্ত বৎসরের যিকাদা মাসে সুলতান মাহমুদ মালিক মারহাবাকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে বারান শহরে গমন করেন। সুলতান ইব্রাহীম তাহাকে ঐ স্থানের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই পরাজিত হন এবং পুনরায় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাহমুদ শাহের সৈন্যগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং দুর্গে প্রবেশ করে এবং তাহাকে হত্যা করে। অতঃপর মাহমুদ শাহ সম্বল অভিমুখে গমন করেন। তাতার খান যুদ্ধ করেন না, তিনি সম্বল ত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জে পলায়ন করেন; আর মাহমুদ শাহ আসাদ খান[২] লোদীকে সম্বল রাখিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

আ. হিজরা ৮০৯ সনে[৩] (১৪০৬ খ্রীঃ) সামানার দুই কারোহ দূরবর্তী এক স্থানে দৌলত খান এবং আর বিরাম খান তুর্কবাচার মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বিরাম খান পরাজিত হন আর সিরহিন্দে[৪] গমন করিয়া তথায় নিজেকে সুরক্ষিত করেন; এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া দৌলত খানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যেহেতু বিরাম খান ইহার পূর্বে শপথ গ্রহণপূর্বক খিযর খানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, খিযর খান, এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং দৌলত খানকে আক্রমণ করেন। শেষোক্ত জন তাহাকে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া যমুনা নদী অতিক্রম করেন। তাহার সহিত যোগদানকারী সব আমীর এইক্ষণে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় এবং খিযর খানের সহিত যোগদান করে। (শেষোক্ত ব্যক্তি) হিসার ফিরোযা কাওয়াম খানের নিকট সমর্পণ করেন। তিনি বিরাম খানের নিকট হইতে সামানা ও সুনাম ছিনাইয়া নিয়া সেইগুলি খিযর খানকে প্রদান করেন আর সিরহিন্দ এবং আরও কতিপয় পরগণা বিরাম

১. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন আলক, আলপ, আলব। বদাওনী তাহাকে বন্দী করার কথা উল্লেখ করেন নাই।

২. বদাওনী এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে সুলতান মাহমুদ বিনা যুদ্ধে সম্বল অধিকার করিয়া তাহা তাহার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাসাদ খানকে তথায় রাখিয়া যান।

৩. আঃ হিঃ ৮১০ এর ঘটনা আগে উল্লেখ করা হইয়াছে; এই স্থানে পূর্ববর্তী বৎসরের (আঃ হিঃ ৮০৯) সনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪. ইহাকে বলা হইয়াছে শহর হিন্দ, হিরহিন্দ, এবং শহর বরহিন্দ।

খানের হস্তে ন্যস্ত করেন এবং স্বয়ং ফতেপুর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে শুধু দোয়াব এবং রোহটাক মাত্র সুলতান মাহমুদের দখলে থাকে।

আঃ হিজরা ৮১১ সনে (১৪০৮ খ্রীঃ) সুলতান মাহমুদ কাওয়াম খানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন আর শেষোক্ত ব্যক্তি হিসার ফিরোযায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কয়েক দিন পর তাহার পুত্রকে বড় রকমের করসহ সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন এবং নানা-রূপ অজুহাত প্রদর্শন করেন আর সুলতান তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দিল্লী গমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া খিযর খান ফতেহবাদে আগমন করেন; এবং ঐ স্থানের লোকদের হয়রানি করেন যেহেতু তাহারা মাহমুদ শাহের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। আর সুলতানের দখলের দোয়াব ও দেহতারাত[১] অধিকার করিবার জন্য মালিক তুহফাকে নিযুক্ত করেন; ফতেহ খান[২] দেহতারাত হইতে যাত্রা করিয়া দোয়াব অভিমুখে গমন করেন; আর যে কতিপয় লোক দেহতারাতে অবস্থান করিতে-ছিল তাহাদিগকে বন্দী করা হয় আর খিযর খান রোহটাক হইতে দিল্লী আগমন করেন। মাহমুদ শাহ ফিরোযাবাদ প্রবেশ করিয়া কিন্তু শক্তি সংগ্রহ করেন এবং ফিরোযাবাদের দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল না করিয়াই ফতেহপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

আর আঃ হিজরা ৮১২ সনে (১৪০৯ খ্রীঃ) বিরাম খান খিযর খানের প্রতি বৈরী হইয়া, দৌলত খানের নিকট গমন করেন এবং তাহার পরিবার এবং অধীনস্থ লোকদের পার্বত্য অঞ্চলে প্রেরণ করেন। খিযর খান যখন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যমুনা নদীর তীরে উপনীত হন, তখন তিনি অনুতপ্ত হন এবং পুনরায় বিনীতভাবে খিযর খানের চাকুরীতে যোগদান করেন আর পূর্বে যেসব পরগণায় তাহার জায়গীর ছিল, সেইগুলি পুনরায় তাহাকে দেওয়া হয়। খিযর খান তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ফতেহপুরে আগমন করেন।

আঃ হিজরা ৮১৩ সনে (১৪১০ খ্রীঃ) খিযর খান, মাহমুদ শাহের দলীয় রোহ-টাকের গভর্ণর মালিক ইদ্রিসকে আক্রমণ করিবার জন্য গমন করেন; আর শেষোক্ত ব্যক্তি রোহটাক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ছয় মাসকাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়া

১. এই নামটি বুঝা শক্ত। বদাওনী এই সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই যে সুলতান মাহমুদ কাওয়াম খানের নিকট হইতে হিসার ফিরোযা অধিকার করিয়া রতা গ্রামে আগমন করেন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। বদাওনীর একটি পাণ্ডুলিপিতে রতার বদলে রনা আছে। এই স্থানটি কোথায় সনাক্ত করা যায় নাই।

২. সব পাণ্ডুলিপিতেই আছে ফতেহ খান, কিন্তু তিনি কে তাহার কোন পরিচয় নাই। সম্ভবতঃ খিযর খানের পরিবর্তে ভুলবশতঃ এই নাম লেখা হইয়াছে।

যাইতে থাকেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের দুর্বলতা বুঝিতে পারিয়া তাহার পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ প্রেরণ করিয়া এবং প্রচুর অর্থ কররূপে দান করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। তৎপর খিযর খান সামানার পথে ফতেহপুর গমন করেন। খিযর খানের প্রত্যাবর্তনের পর মাহমুদ শাহ কৈথালে[১] শিকার সমাপন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন[২] এবং এই-রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিজেকে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদে নিয়োজিত করেন।

আর আঃ হিজরা ৮.৪ সালে (১৪১১ খ্রীঃ) খিযর খান রোহটাকের অভিমুখে গমন করেন। এই স্থানটি ছিল মাহমুদ শাহের অধিকৃত স্থানগুলির অন্তর্ভুক্ত। মালিক ইদ্রিস ও তাহার ভ্রাতা মুবারিয খান অগ্রবর্তী হইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং হাসীতে তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। খিযর তাহাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের হৃদয় উৎফুল্ল করেন এবং ইহার পর নারনৌল শহরটি লুণ্ঠন করেন। আকলিম খান ও বাহাদুর নাহির এই স্থানটি শাসন করিতেছিলেন। আর ইহার পর খিযর খান দিল্লী গমন করেন এবং সিরির দুর্গ অবরোধ করেন। মাহমুদ শাহ দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন : আর ফিরোযাবাদে তাহার গভর্ণর ইখতিয়ার খান খিযর খানের চাকুরীতে যোগদান করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি অতঃপর সিরির দুর্গের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখ হইতে গমন করিয়া ফিরোযাবাদের প্রাসাদের সম্মুখে অবতরণ করেন এবং দোয়াবের শহর-সমূহ এবং রাজধানীর উপকণ্ঠীয় অঞ্চলসমূহ দখল করেন। কিন্তু শস্য ও পশুর খাদ্যের অভাবে তিনি অবরোধ পরিত্যাগ করেন ; এবং পানিপথের পথ ধরিয়া আঃ হিঃ ৮১৫ সনে (১৪১২ খ্রীঃ) ফতেহপুর গমন করেন। আর উপরোক্ত বৎসরের রজব মাসে মাহমুদ শাহ এক শিকার অভিযানে কৈথাল গমন করেন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পথিমধ্যে ঐ একই বৎসরের যিকাদা মাসে অসুস্থ হইয়া পড়েন আর এক মাস সময়ের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ঐ দিন হইতে সার্বভৌমত্ব ফিরোয শাহের বংশের হাত হইতে চলিয়া যায়। ফিরোয শাহের পুত্র সুলতান মুহম্মদ শাহ, তাহার পুত্র সুলতান মাহমুদ শাহের নামমাত্র রাজত্বকাল বিশ বৎসর এবং দুই মাসকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

ইহার পর দুই মাসকাল দিল্লীতে চরম বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। সুলতান মাহমুদ শাহের আমীরগণ দৌলত খানের সহিত যোগদান করেন। মালিক ইদ্রিস এবং মুবারিয খান খিযর খানের দল ত্যাগ করিয়া দৌলত খানের সহিত যোগদান করেন।

---

১. বদাওনী কৈথার (কৈথাল ও কৈথার একই স্থান) অভিযানের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই।

২. অর্থাৎ সম্ভবতঃ তাহার শত্রু দ্বারদেশে থাকা সত্ত্বেও।

এই বৎসরটি খিযর খান ফতেহপুরে অতিবাহিত করেন। আঃ হিজরা ৮১৬ সনের (১৪১৪ খ্রীঃ) মহরম মাসে দৌলত খান কৈথার অভিমুখে গমন করেন; রায় নরসিংহ ও অন্যান্য রায়গণ আগমন করেন এবং তাহার পরিচর্যা করেন। তিনি যখন পাতিয়ালী শহরে আগমন করেন তখন মহাবত খান বদাওনী[1] তাহার চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী[2] কান্দীতে মাহমুদ খানের পুত্র কাদির খানকে অবরোধ করিয়াছেন আর দৌলত খানের সঙ্গে সুলতান ইব্রাহীমের মোকাবিলা করিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য না থাকিবার ফলে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিল্লী আগমন করেন। ঐ বৎসরেরই রমযান মাসে খিযর খান দিল্লী অভি-মুখে আগমন করেন আর তিনি যখন হিসার ফিরোযায় আগমন করেন, ঐ দেশের আমীরগণ তাহার চাকুরী করিবার জন্য আগমন করেন এবং তাহার শুভাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হন। মালিক ইদ্রিস রোহটাক দুর্গে অবস্থান করিতে থাকেন। খিযর খান তাহার উপর কোন হস্তক্ষেপ করেন না, এবং ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া মেওয়াট গমন করেন। বাহাদুর নাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র জালাল খান তথায় চাকুরী করিতে আগমন করেন। ঐ স্থান হইতে তিনি সম্বল শহরে গমন করেন এবং স্থানটি লুটতরাজ এবং বিধ্বস্ত করিয়া ঐ বৎসরেরই যিল হিজ্জা মাসে পুনরায় দিল্লী আগমন করেন এবং সিরির প্রবেশ পথের সম্মুখে শিবির স্থাপন করেন; আর দৌলত খান চারি মাসকাল স্থানটি রক্ষা করেন। অবশেষে মালিক ইউনান[3] ও খিযর খানের অন্যান্য সমর্থকগণ কৌশলে বুটখানার দরওয়াজা দখল করেন; আর দৌলত খান দেখিতে পান যে অবস্থা তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি বাধ্য হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং খিযর খানের নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাহাকে কাওয়াম খানের হস্তে অর্পণ করেন। আর নির্দেশ দেন যে তাহাকে হিসার ফিরোযায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে; আর এই ঘটনা ঘটে আঃ হিঃ ৮১৭ সনের (১৪১৫ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসে।[4]

রায়াত আলী খিযর খান পিতা মালিক সুলেমান[5]

কথিত আছে যে সুলতান ফিরোয শাহের একজন আমীর মালিক মারওয়ান দৌলত খিযর খানের পিতা মালিক সুলেমানকে তাহার বাল্যকালে তাহাকে

১. বদাওনী তাহাকে বদাওনের ওয়ালী অভিহিত করিয়াছেন।
২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে সুলতান ইব্রাহীমের নামের শেষে শর্ক লেখা আছে।
৩. এই নামটি বিভিন্ন রূপ দেওয়া আছে, যেমন তুখান, ইউনাস, বুরনা, বুনা—বদাওনী লিখিয়াছেন লুনা।
৪. বদাওনীর মতে এই তারিখটি হইল আঃ হিজরা ৮১৬ সনের ১৭ই রবিউল আউয়াল।
৫. বদাওনী খিযর খানকে মালিক আপরাফের পুত্র বলিয়াছেন।

পালক গ্রহণ করেন এবং তাহাকে লালন পালন করে ; আর ইহা সত্য যে আমীর মারওয়ান দৌলত, আমীর জালাল বুখারীকে, (আল্লাহ যেন তাহার কবরকে পবিত্র রাখেন), অতিথিরূপে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের ভোজ শুরু হইবার পূর্বে মালিক মারওয়ান দৌলতের হুকুমে মালিক সুলেমান সমাগত অতিথিগণের হাত ধৌত করিবার কাজে নিযুক্ত হন। সৈয়দ জালাল ঘোষণা করেন যে তরুণ সৈয়দযাদার পক্ষে এই কাজ সঙ্গত হয় নাই এবং মীর সৈয়দ জালালের কথা হইতে মালিক সুলেমানের বংশ পরিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। খিযর খান ছিলেন একজন ধর্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী, অমায়িক ব্যবহারী এবং বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন তরুণ ; আর তাহার বিশ্বাসের পবিত্রতা এবং তাহার পদমর্যাদার মহত্ব তাহার উচ্চ বংশজাত হইবার পরিচয়।

দ্বিপদী কবিতা

যদিও শিক্ষা হইতে সৎ কর্মের সৃষ্টি হয়, কিন্তু
প্রশংসনীয় গুণাবলীর উৎস সদ্‌বংশে জন্মলাভ।

সংক্ষেপে, সুলতান ফিরোয শাহের আমলে মালিক মারওয়ান দৌলত মুলতানের কর্তৃত্বে ছিলেন আর তাহার ইন্তেকালের পর মালিক শেখ এই দায়িত্ব লাভ করেন এবং অল্পকাল পরেই ইন্তেকাল করেন। অতঃপর সুলতান ফিরোয শাহ মুলতান খিযর খানের হস্তে অর্পণ করেন আর ঐ সময় হইতে খিযর খান একজন প্রতিপত্তিশালী আমীরে পরিণত হন ; আর তিনি দিল্লী অধিকার করিবার পূর্ব হইতেই তিনি বহু বড় বড় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বহু খ্যাতনামা বিজয় লাভ করেন, যাহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। আঃ হিজরা ৮১৭ সনের (১৪১৫ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখে[১] তিনি দিল্লী অধিকার করেন আর যদিও তিনি সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিলেন আর রাজকীয় আনুসাঙ্গিকের সবকিছুই তাহার দখলে ছিল তবু তিনি কখনও নিজেকে বাদশাহ উপাধি দান করেন নাই, তিনি নিজে রায়াত-ই-আলী উপাধি গ্রহণ করেন ; আর তাহার রাজত্বের প্রথম দিকে খোৎবায় এবং মুদ্রায় আমীর তাইমুরের নাম প্রচলিত করেন এবং শেষ দিকে মির্যা শাহ রুখের নাম প্রচলিত করেন। আর শেষে খিযর খানের নাম মুদ্রায় ও খোৎবায় প্রচলন করেন।

১. বদাওনী বলেন যে তিনি আঃ হিঃ ৮১৬ সনের ১৭ই রবিউল আউয়াল তারিখে দিল্লী দখল করেন।

তিনি মালিক তুহফাকে[১] তাজুল-মুলক উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাহাকে তাহার উযির নিযুক্ত করেন ; আর শাহরানপুর প্রদেশটি দেন সৈয়দ সলিমকে, এবং মুলতান ও ফতেহপুর দেন মালিক সুলেমানের পালক পুত্র মালিক আবদুর রহিমকে, আর তাহাকে তিনি আলাউল-মুলক উপাধি দান করেন। তিনি মালিক সারওয়ারকে শহরের শাহনা (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করেন, মালিক খয়রুদ্দীন ঘানীকে নিযুক্ত করেন সেনাদের বেতন দানকারী, মালিক কালুকে হস্তীসমূহের তত্ত্বাবধায়ক আর মালিক দাউদকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তিনি ইখতিয়ার খানকে দোয়াবের শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন এবং সুলতান মাহমুদের সকল খানাযাদাগণকে তাহারা যে ভাতা ও বৃত্তি ভোগ করিতেছিল তাহা পুনঃবরাদ্দ করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের জায়গীরে পাঠাইয়া দেন।

এই বৎসরেই তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ তাজুল-মুলককে বদাওন ও কৈথার অভিমুখে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি ঐ দেশের বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে সক্ষম হন এবং তাহাদিগকে শান্তিপূর্ণ রায়তে পরিণত করিতে পারেন। তাজুল-মুলক যমুনা ও গঙ্গা নদী[২] অতিক্রম করেন এবং কৈথার আগমন করিয়া দেশের জমিদারদের কঠোর শাস্তি দান করেন। রায় নরসিংহ[৩] পলায়ন করেন এবং আনুলা[৪] উপত কায় আশ্রয় গ্রহণ করেন আর যখন তিনি চরম দুর্দশায় পতিত হন, তখন তিনি বিনীতভাবে রাজস্ব দান করেন এবং একজন রায়ত হন ; আর বদাওনের গভর্ণর মহাবত খানও আগমন করেন এবং চাকুরী গ্রহণ করেন। ঐ স্থান হইতে[৫] (তাজুল-মুলক) রহবের তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া সরগদওয়ারীর চড়ায় উপস্থিত হন এবং তথায় গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া কাহওয়ারের কাফেরদের শাস্তিদান করেন। কাহওয়ার শামসাবাদ[৬] এবং কাম্বালা[৭]

১. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন মালিক নহর কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে তুহফা।

২. বদাওনী বলেন যে তিনি পিবাহাব চড়া দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করেন।

৩. বদাওনী পূর্বের ন্যায় তাহাকে রায় হরসিংহ অভিহিত করিয়াছেন ; তবকাতের একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপই আছে, দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে নরসিংহ' একটিতে 'আছে বরসিংহ আর একটিতে আছে বীর সিং।

৪. বদাওনী বলেন তিনি আনুলার জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৫. বদাওনী বলেন যে তাজুল-মুলক এবং মহাবত খান উভয়েই বাহাব নদীর তীর ধরিয়া গমন করেন। কিন্তু তবকাতের কোন পাণ্ডুলিপিতেই কে গমন করিয়াছেলেন তাহা স্পষ্টরূপে লেখা নাই, তবে তাজুল-মুলক গিয়াছিলেন তাহাই বুঝা যায়।

৬. শামসাবাদ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ফররুখাবাদ জেলার একটি শহর, বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তীরে, ফতেহগড়ের ১৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

৭. বদাওনী বলেন কাম্পিলা। তবকাতের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে কানিলা, কানলাহ এবং কানবালাহ।

নামে পরিচিত, এবং তৎপর সকিত[১] শহরের পথ ধরিয়া বাধম শহরে গমন করেন। রাপরীর[২] শাসনকর্তা হাসান খান এবং তাহার ভ্রাতা হামযা[৩] তাহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন; আর রায় সরও[৪] বিনীত এবং অনুগত হইয়া আগমন করেন এবং চাকুরী করেন; গোয়ালিয়র, রাব্রী[৫] ও চান্দোয়ারের[৬] রাজাগণ রাজস্ব প্রদান করেন। তিনি চান্দোয়ারের রাজপুতদের নিকট হইতে জালেসর শহরটি দখল করিয়া নেন এবং তাহার পূর্বে ইহা যে মুসলমানদের দখলে ছিল তাহাদের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং ইহার একদল তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন; আর তথা হইতে গোয়ালিয়র অঞ্চলে গমন করিয়া তাহা লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন এবং রায়ের নিকট হইতে পূর্ণ নির্ধারিত বাৎসরিক কর আদায় করেন; আর তথা হইতে তিনি চান্দোয়ায় গমন করেন এবং কাম্বালা এবং বাটিয়ালীর জমিদার নরসিংহের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া চন্দোয়ারের সন্নিকটে যমুনা নদী অতিক্রম করেন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

জমাদিউল আউয়াল মাসে সংবাদ আসে যে বিরাম খান তুর্কবাচার উপজাতীয় বিরাট একদল[৭] তুর্কী সিরহিন্দ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা শাহজাদা মুবারক খানের পক্ষে নিযুক্ত ঐ স্থানের গভর্ণর মালিক স্তধু নাহিরকে হত্যা করে। খিযর খান এক বিরাট বাহিনীসহ যিরক খানকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তুর্কীগণ শতদ্রু নদী অতিক্রম করে এব পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে। যিরক খান তথায় তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন; এবং দুই মাসকাল আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন।

আর ঐ বৎসরেরই রজব মাসে সুলতান আহমদ গুজরাটি নাগোর[৮] দুর্গটি অবরোধ করেন। এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে খিযর খান তুদাহ হইয়া ঐ স্থানে গমনের জন্য যাত্রা করেন। সুলতান আহমদ তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়াই তাহার

১. কাম্পিলা এবং রাপবীর মধ্যের সোজা পথের উপরে, ইতাহ শহরের ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে সকিত অবস্থিত।
২. রাপরী, মৈনপুরী শহরের ৪৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম।
৩. বদাওনীর ইংরাজী অনুবাদে এই নামটি হামরা লিখা হইয়াছে, কিন্তু মূল গ্রন্থে হামযা আছে।
৪. বদাওনী তাহাকে রায় সর লিখিয়াছেন।
৫. রাব্রী পূর্বোল্লিখিত রাপরী—ভিন্নরূপে লিখা হইয়াছে।
৬. এই স্থানের পাঠ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ।
৭. তবকাতের গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই যে খিযর খান ফিরোযপুর এবং সিরহিন্দ অঞ্চলটি বিরাম খানের নিকট হইতে নিয়া নেন এবং এইগুলি মালিক মুবারকের কনিষ্ঠতম পুত্র সৈয়দ খিযর খানকে অর্পণ করেন। আর শেষোক্ত ব্যক্তি মালিক স্তধু নাহিরকে তাহার নায়েব নিযুক্ত করেন। বদাওনী এই বিবরণ দিয়াছেন। এই গ্রন্থের শাহজাদা মুবারক খান বদাওনীর মতে মালিক মুবারকের কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ খিযর খান।
৮. নাগোর রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যে অবস্থিত। ইহা নাসিরাবাদের ৪৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং যোধপুর শহরের ৮৫ মাইল উত্তর পূর্বে। ফিরিস্তার অনুবাদে এই স্থানটিকে বাগোর লেখা হইয়াছে।

নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। খিযর খান পিছন ফিরিয়া নৌ-উরুস-জাহান[১] শহরে গমন করেন। এই শহরটি সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর প্রতিষ্ঠিত শহরগুলির অন্তর্ভুক্ত। ঐ শহরের গভর্ণর ইলিয়াস তাহার নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। সুলতান ঐ দেশের শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীগণকে শাস্তি দান করিয়া গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন। যেহেতু দুর্গটি অধিকার করা দুঃসাধ্য হয়, তিনি রায়ের নিকট হইতে নির্ধারিত রাজস্ব গ্রহণ করেন এবং বিয়ানা গমন করেন; এবং তথাকার গভর্ণর শামস খান আউহাদীর নিকট হইতে কর আদায় করেন; তৎপর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

আর আঃ হিঃ ৮২০ সনে (১৪১৭ খ্রীঃ) তুঘান এবং কতিপয় তুর্কীর,[২] যাহারা মালিক সুধুকে হত্যা করিয়াছিল বিদ্রোহের সংবাদ আসে। সামানার গভর্ণর যিরক খানকে তাহাদের আক্রমণ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়; তিনি যখন সামানার[৩] সন্নিকটে আগমন করিলেন তখন বিদ্রোহীগণ সিরহিন্দ দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিল এবং পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করিল। ঐ দুর্গে অবরুদ্ধ মালিক কামাল বুধন তাহার মুক্তি লাভ করিয়া যিরক খানের খেদমত করিতে আসিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পায়েল শহরে আগমন করিলেন। তুঘান, যিনি তুর্কীদের নেতা ছিলেন, তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। কর দিতে সম্মত হইলেন এবং তাহার পুত্রকে প্রতিভু স্বরূপ দিলেন আর তাহার নিকট হইতে যে তুর্কীগণ মালিক সুধুকে নিহত করিয়াছিল তাহাদের আলাদা করিয়া দিলেন। যিরক খান সামানা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কর এবং তুঘানের পুত্রকে খিযর খানের নিকট প্রেরণ করেন।

আঃ হিঃ ৮২১ সনে (১৪১৮ খ্রীঃ) খিযর খান, কৈথারের রাজা রায় নরসিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য তাজুল-মুলককে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনী যখন গঙ্গা অতিক্রম করে, তখন নরসিংহ দেশ ত্যাগ করিয়া আনুলার[৪] জঙ্গলে প্রত্যাবর্তন করে এবং জঙ্গলের নিরাপত্তায় থাকিয়া কিছুকাল যুদ্ধ করিবার পর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন; তাহার অশ্বসমূহ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সমস্ত আসবাবপত্র ধৃত হয় আর কতিপয় সৈন্য কমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করে এবং পঞ্চম দিনে পুনরায় প্রধান বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। ইহার পর তাজুল-মুলক

১. এই নামটি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সঠিক পাঠ দুরূহ।
২. বদাওনী এই সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই।
৩. সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই এই স্থানে সামানা আছে কিন্তু মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ইহা সিরহিন্দ হইবে। যিরক খান সিরহিন্দ গমনের জন্য সামানা হইতে যাত্রা করিবেন।
৪. বদাওনী এই স্থানে জঙ্গলটির ঠিক নামই দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ইহার পরিধি ২৪ ক্রোশ।

পুনরায় বদাওন হইয়া গঙ্গা নদীর তীরে আগমন করেন এবং বজলানেহের চড়া দিয়া নদী আক্রমণ করিয়া তিনি বদাওনের গভর্ণর মহাবত খানকে বরখাস্ত করেন এবং ইতাওয়ার দিকে অগ্রসর হন। রায় সর[১] শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাজুল মুলক দেশটি লুণ্ঠন করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ঐ বৎসরেরই রবিউল আখির মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। এই বৎসরেই খিযর খান কৈথারের বিশৃঙ্খলাকারী ও বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে কোল দেশের বিদ্রোহীদের শাস্তি দান করেন এবং তৎপর রহব নদী অতিক্রম করিয়া সম্বল বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত বৎসরের যিল কাজেহ মাসে বদাওন অভিমুখে গমন করেন এবং পাতিয়ালীর নিকটে গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন। এইসব ঘটনা হইতে মহাবত খানের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি বদাওন গমন করেন এবং যিল হিজ্জা মাসে তিনি নিজেকে দুর্গাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করেন; এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষে ছয় মাসকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। প্রায় এই সময়ে কতিপয় আমীর যেমন কওয়াম খান এবং ইখতিয়ার খান এবং মাহমুদ শাহের সকল অনুচর, যাহারা দৌলত খানের নিকট হইতে আলাদা হইয়া আসিয়া খিযর খানের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, শেষোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। খিযর খান এই সম্বন্ধে অবহিত হন এবং অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এব এই যাত্রা পথে গঙ্গা নদীর তীরে আঃ হিজরা ৮২২ সনের (১৪১৮ খ্রীঃ) জমাদিউল আউয়াল মাসের ২০ তারিখে তিনি কওয়াম খান এবং ইখতিয়ার খান এব মাহমুদ শাহের অনুচরগণ এবং সকল বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করেন এবং তৎপর দিল্লী আগমন করেন।

ইহার কিছুদিন পর সংবাদ আসে যে একটি লোকের[২] মাথায় বিদ্রোহ করিবার দুর্বুদ্ধি জাগিয়াছে এবং নিজেকে সারঙ্গ খান নাম দিয়া বাজওয়ারাহের পার্বত্য অঞ্চলে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। (খিযর খান) সরহিন্দের শাসনভার মালিক সুলতান শাহ বারহাম লোদীর[৩] হস্তে অর্পণ করেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ইহাকে নিযুক্ত করেন। মালিক সুলতান শাহ ঐ বৎসরই রজব মাসে সিরহিন্দ পৌঁছেন আর সারঙ্গ

১. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন সর, সরুর, সির।

২. বদাওনী ইহাকে একজন অজ্ঞাত লোক আখ্যা দিয়াছেন আর সাগর খান সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তিনি পূর্বেই নিহত হইয়াছেন। স্থানটি সম্বন্ধে তিনি বলেন বাজওয়ারাহ সীমান্তে কিন্তু ফিরিশতা বলেন মাচিওয়ারার নিকটে। আইন-ই-আকবরীর মতে মাচিওয়ারা শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত আর রেনেলের মানচিত্রে ইহার অবস্থান দেখান হইয়াছে রুপর ও লুধিয়ানার মধ্যবর্তী এবং শেষোক্ত শহরটির ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন শহর। মহাভারতেও ইহার উল্লেখ আছে; বাজওয়ারা আরও উত্তরে হোশিয়ারপুরের নিকটে অবস্থিত।

৩. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন সুলতান শাহ লোদী।

পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া শতদ্রু নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। রুপর-এর লোকেরা তাহার সহিত যোগদান করেন এবং সিরহিন্দের উপকণ্ঠে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সারঙ্গ পরাজিত হন এবং সিরহিন্দের একটি অধীনস্থ স্থান লাহোরী শহর অভিমুখে গমন করেন। খাজা আলী ইন্দ্রানী তাহার সেনাবাহিনীসহ আগমন করেন এবং সুলতান শাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন; আর সামানার গভর্ণর যিরক খান এবং জলন্ধরের গভর্ণর তুঘান তুর্কবাচাও সুলতান শাহকে সাহায্য করিবার জন্য সিরহিন্দে আগমন করেন। সারঙ্গ পশ্চাতে ফিরিয়া রুপর গমন করেন আর সেনাবাহিনীগুলি যখন তথায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে তখন তিনি পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন; আর সেনাদল তথায় থাকিয়া যায়। আর ইত্যবসরে মালিক খয়রুদ্দীনকে সারঙ্গকে আক্রমণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইলে তিনিও বিশাল এক বাহিনীসহ আগমন করেন; আর উপরোক্ত বৎসরের রমযান মাসে তিনি রুপর পৌঁছেন এবং কিছুকালের জন্য তাহারা সকলেই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান করেন, আর সারঙ্গের অনুচরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে তিনি অল্প কিছু লোকসহ নিজেকে পর্বতে লুকাইয়া রাখে এবং সেনাবাহিনীগুলি প্রত্যাবর্তন করে। মালিক খয়রুদ্দীন রাজধানীর অভিমুখে গমন করেন, আর যিরক খান সামানা অভিমুখে গমন করেন, আর সুলতান শাহ তাহার সৈন্যগণসহ রুপরে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে সারঙ্গ পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসে এব আঃ হিজরা ৮২৩ সনের (১৭২০ খ্রীঃ) মহরম মাসে তুঘানের সহিত যোগ দেয়। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহাকে হত্যা করে। এই সময়ে খিযর খান রাজধানীতে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন; এব, তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের জমিদারগণকে দমন করিবার জন্য তাজুল মুলককে প্রেরণ করেন; আর তিনি বারান হইয়া কোল[১] গমন করেন এবং ঐ দেশের বিদ্রোহীদের নির্মূল করিয়া দেন আর মৌযা দহলি লুণ্ঠন করিয়া ইতাওয়া গমন করেন। মৌযা দহলি একটি অতি শক্তিশালী স্থান ছিল। ইতাওয়াতে রায় সর[২] বাধা দান করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপোষ করেন এবং যে রাজস্ব নির্ধারিত করা হইয়াছে তাহা দিতে স্বীকৃত হন। তাজুল মুলক চান্দোয়ারে গমন করেন এবং তাহা লুটতরাজ এবং বিধ্বস্ত করেন এবং তৎপর কৈথার গমন করেন এবং রায় নরসিংহের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। আর উপরোক্ত বৎসরের রজব মাসে সংবাদ আসে যে তুঘান তুর্কবাচা[৩] পুনরায় শত্রুতা প্রদর্শন

১. বদাওনী এইসব গতিবিধির কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে তাজুল মুলককে ইতাওয়ায় প্রেরণ করা যায়।

২. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন সব্বর, সর ও সির। বদাওনী এই নামটি সির লিখিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে রায় সিপর লিখা হইয়াছে।

৩. বদাওনীও তুঘানের বিদ্রোহের কোন বিশদ বিবরণ দান করেন নাই।

শুরু করিয়াছে এবং সিরহিন্দ দুর্গ অবরোধ করিয়াছে এবং মনসুরপুর এবং পায়েল পর্যন্ত দেশটা দখল করিয়া নিয়াছে। খিযর খান তাহার বিরুদ্ধে খয়রুদ্দীনকে প্রেরণ করিলেন, আর তিনি সামানায় উপস্থিত হইয়া খিযর খানের সহযোগিতায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি লুধিয়ানার নিকটে শতদ্রু অতিক্রম করিয়া জসরথ খোখরের অঞ্চলে উপস্থিত হন। তুখানের জায়গীর যিরক খানকে দেওয়া হয়; আর মালিক খয়রুদ্দীন দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আঃ হিজরী ৮২৪ সনে (১৪২১ খ্রীঃ) খিযর খান মেওয়াটের বিদ্রোহীগণকে দমনের জন্য সাহসিকতার রেকাবে দৃঢ় পদক্ষেপ করেন। তাহাদের কতিপয় বাহাদুর নাহিরের কোটলা দুর্গে আশ্রয় নেয় আর কতিপয় খিযর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। দুর্গটি যখন অবরোধ করা হয় তখন মেওয়াটিগণ আসিয়া তাহাকে বাধা দান করে; কিন্তু প্রথম আক্রমণেই তাহারা পলায়ন করে এবং কোটলা অধিকৃত হয়। মেওয়াটিগণ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। খিযর খান দুর্গটি ধ্বংস করিয়া দেন এবং গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন। ঐ বৎসরের ৮ই মহরম তারিখে তাজুল-মুলক ইন্তেকাল করেন আর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকান্দরকে উযির নিযুক্ত করা হয় এবং মালিক উশ-শর্ক উপাধি দেওয়া হয়। গোয়ালিয়রের রাজা নিজেকে দুর্গে অবরোধ করেন, আর তাহার দেশটি লুণ্ঠিত হয় এবং (খিযর খান) তাহার উপর কর ধার্য করিয়া ইতাওয়া অভিমুখে গমন করেন। রায় সর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পুত্র আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং কর দিতে সম্মত হন। এই সময়ে খিযর খান অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন, আর আঃ হিজরা ৮২৪ সনের ১৭ই জমাদিউল আউয়াল তারিখে তিনি আল্লাহর করুণার সহিত মিলিত হন। তাঁহার রাজত্বকাল ছিল সাত বৎসর এবং দুই মাস এবং দুই দিন। তাহার নিকট হইতে বহু দান ও উপকরণের সৃষ্টি হয় আর যে সব লোক তাইমুরের আক্রমণের সময়ের বিশৃঙ্খলার দরুন সব কিছু হারাইয়া সর্বশান্ত হইয়া যায়, তাহারা তাহার সৌভাগ্যসূচক সাহায্যে পুনরায় সুখী ও সম্পদশালী হইয়া উঠে।

সুলতান মুবারক শাহ পিতা রায়াত আলী খিযর খান

খিযর খানের অসুস্থতা যখন গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন তাহার ইন্তে-কালের তিন দিন পূর্বে তিনি মুবারক খানকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনিত করেন; আর তাঁহার ইন্তেকালের একদিন পর মুবারক খান আমীরগণের সম্মতিক্রমে সার্ব-ভৌমত্বের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করেন।

তিনি আমীর মালিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ইমামদের প্রত্যেককে, তাহারা খিযর খানের রাজত্বকালে যে কোন গ্রাম বা পরগণা হইতে যে কোন বৃত্তি বা ভাতা পাইতেন তাহার সবই পুনর্বহাল করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বৃদ্ধিও করেন। তিনি মালিক রজব নাদিরার নিকট হইতে ফিরোযাবাদ ও হান্সী বদল করিয়া তাহার নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক বদাহকে দেন; আর ইহাদের পরিবর্তে মালিক রজবকে দেন দিবালপুর।

এই সময়ে শেইখা খোখর[১] এবং তুখান রইসের বিদ্রোহের সংবাদ আসে। শেইখার বিদ্রোহের কারণ ছিল এই যে আঃ হিজরা ৮২৩ সনের (১৪২০ খ্রীঃ জমাদিউল আউয়াল মাসে কাশ্মীরের বাদশাহ সুলতান আলী থাটা আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন থাটা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন শেইখা তাহার সম্মুখীন হন এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করেন। যেহেতু সুলতান আলীর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল ফলে তিনি পরাজিত হন এবং শেইখা তাহাকে বন্দী করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন লাভ করেন তাহাতে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, আর তাহার মাথায় বিদ্রোহ করিবার চিন্তা প্রবেশ করে। তিনি দিল্লী এবং হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য অধিকারের সংকল্প করেন। তিনি তাহার নিকটবর্তী পরগণাগুলি দখল করেন এবং শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া রায় কামাল মুইনের তালওয়ান্দী[২] লুণ্ঠন করেন। ঐ স্থানের জমিদার রায় ফিরোয পলায়ন করেন এবং যমুনা অভিমুখে গমন করেন। শেইখা লুধিয়ানা শহরে আগমন করিয়া রুপরের সীমান্ত পর্যন্ত দেশটি অধিকার করেন; এর পরে শতদ্রু অতিক্রম করিয়া জালন্ধর দুর্গ অবরোধ করেন। এই দুর্গের গভর্ণর যিরক খান নিজেকে ইহার মধ্যে বন্ধ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। শেইখা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দাবী করে যে যিরক খানের দুর্গটি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইহা তুখানকে দিয়া দিতে হইবে, আর তুখান তাহার পুত্রকে মুবারক শাহের অধীনে চাকুরী করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন এবং শেইখা নিজেও শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট কর প্রেরণ করিবেন। আঃ হিজরা ৮২৪ সনের (১৪২১ খ্রীঃ) রা জমাদিউল আখির তারিখে যিরক খান

---

১. বদাওনী বলেন শেইখার পুত্র জসরত খোখরই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ফিরিশতাও লিখিয়াছেন যে এই বিদ্রোহ করেন জসরত, তবে তিনি বলেন যে তিনি শেইখার ভ্রাতা ছিলেন। তাবাকাতের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে শেইখা এই বিদ্রোহ করেন তবে একটা পাণ্ডুলিপিতে আছে শেইখা এবং জসরত।

২. বদাওনী এবং ফিরিশতাও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কর্নেল রেভিং মনে করেন যে ইহা শতদ্রুর উত্তর তীরের অবস্থিত তুলুর, রেনেলের মানচিত্রে লুধিয়ানার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। রায় কামাল মুইনকে বদাওনী লিখিয়াছেন রায় কামালুদ্দীন মুবিন।

জালন্ধর দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং শেইখার একদল সৈন্যের[১] সঙ্গে মুইন নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন।

পরদিন শেইখা চুক্তি ভঙ্গ করিলেন এবং যিরক খানকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিলেন; এবং পুনরায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন। তিনি শতদ্রু অতিক্রম করিলেন এবং লুধিয়ানায় আগমন করিলেন এবং উপরোক্ত বৎসরের ২০শে জমাদিউল আখির সিরহিন্দে আগমন করিলেন। ঐ স্থানের গভর্ণর সুলতান শাহ লোদী নিজেকে দুর্গে আটক করিয়া রাখিলেন আর যেহেতু বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, শেইখা যদিও প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন কিন্তু ইহা অধিকার করিতে পারিলেন না।

আর উপরোক্ত বৎসরের রজব মাসে সুলতান মুবারক শাহ বৃষ্টি সত্ত্বেও রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সিরহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন সামানার নিকটবর্তী হইলেন তখন শেইখা লুধিয়ানার অভিমুখে গমন করিলেন। সামানায় যিরক খান সুলতান মুবারক শাহের সহিত যোগদান করিলেন আর শেষোক্ত ব্যক্তি লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শেইখা শতদ্রু অতিক্রম করিয়া নদীর অপর তীরে সুলতানের বাহিনীর বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করিলেন। নদী যেহেতু প্রশস্ত ছিল আর সকল নৌকা শেইখার হস্তগত হইয়াছিল, মুবারক শাহ নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন না;[২] আর চল্লিশ দিন ধরিয়া উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। যখন অগস্ত্য তারকা উদিত হইল এবং নদী সংকীর্ণতর হইল তখন মুবারক শাহ নদীর তীর ধরিয়া কাবুলপুর অভিমুখে গমন করিলেন আর শেইখাও তখন নদীর অপর তীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন সুলতানের বাহিনীর বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করিতে লাগিলেন; অবশেষে উপরোক্ত বৎসরের শাওয়াল মাসের ১১ তারিখে সুলতান, মালিক সিকান্দর তুহফাহ, এবং যিরক খান এবং মাহমুদ হাসান এবং মালিক কালু এবং অন্যান্য আমীরগণকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী আর ছয়টি হস্তীসহ নদীর আরও উপরের দিকে প্রেরণ করিলেন যাহাতে তাহারা পরদিন সকালে কোন চড়া স্থানে পৌঁছিতে পারে আর নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়; আর তিনি নিজেও

১. এই পংক্তিটির পাঠ সন্দেহজনক এবং বিভিন্নরূপ দেখা যায়। ইহা কোথাও আছে একদল সৈন্য কোথাও আছে তিন দল সৈন্য, অথবা অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে এক দলপতির সঙ্গে। নদী বা স্রোতটির নামও যেন, মুইন বা হেইন, ইহার যে কোনটি হইতে পারে। বদাওনী বলেন যে জসরত সরস্বতীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন এবং তথায় শান্তি স্থাপিত হইল এবং চুক্তি সম্পাদিত হইল আর তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যিরক খানকে বন্দী করিলেন। বদাওনীর মতে নদীটি ছিল সরস্বতী।

২. বদাওনী এইরূপ বিশদ বিবরণ দান করেন নাই। তিনি শুধু বলেন যে অগস্ত্য তারকা উদয়ের পর নদী অতিক্রমযোগ্য হইয়া উঠে এবং সুলতান ইহা অতিক্রম করেন আর জসরত পলায়ন করেন।

এইরূপ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। শেইখার তাহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা না থাকিবার ফলে জালন্ধর অভিমুখে পলায়ন করিলেন আর প্রচুর সংখ্যক সাজ-সরঞ্জাম এবং সম্পদ লুণ্ঠিত দ্রব্যরূপে সম্রাটের বাহিনীর হস্তগত হইল। আর শেইখার বাহিনীর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য বহু সংখ্যক নিহত হইল। সুলতানের বাহিনী চন্দ্রভাগা[১] নদী পর্যন্ত শেইখার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। শেইখা নদী অতিক্রম করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে[২] প্রবেশ করিলেন। জমুনের রাজা রায় ভীম[৩] সুলতানের সেবা করিতে আগমন করিলেন এবং সেনাবাহিনীকে পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে চন্দ্রভাগা অতিক্রম করাইয়া শেইখার দুর্গগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ থিকায়[৪] নিয়া যান, আর তাহারা ইহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন; আর শেইখার যে সব অনুচর পার্বত্য অঞ্চলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে বন্দী করিয়া সুলতান নিরাপদে এবং প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী হস্তগত করিয়া আঃ হিজরা ৮২৫ সনের (১৪০১ খ্রীঃ) মহরম মাসে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এক মাস কাল লাহোরে অবস্থান করেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবা গিয়াছিল; আর তিনি ইহার দুর্গ এবং প্রবেশ পথগুলি পুনর্নির্মাণে নিযোজিত থাকেন। দুর্গটি যখন পুনর্নির্মিত হয় আর অধিকাংশ লোক ফিরিয়া আসে এবং তাহাদের পুরাতন আবাসস্থলে বসবাস করিতে থাকে, তখন তিনি মালিক মাহমুদ হাসানকে ইহার গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তাহার সঙ্গে ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিয়া আসেন, আর দুর্গ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম তাহাকে দিয়া তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্বোক্ত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসে শেইখা[৫] খোখর জমিদারগণের সহযোগিতায় এক বিরাট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য এবং পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করেন, আর বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া লাহোর আগমন করেন; এবং সৈয়দ হাসান জিনছানীর, (আল্লাহ যেন তাহাকে পবিত্র রাখেন), কবরের সন্নিকটে

১. বদাওনী ইহাকে বলিযাছেন ছিনাও, কর্ণেল বেক্সিং ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'ছিনাব।'
২. বদাওনী আরও সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, "পর্বত্য অঞ্চলের তলহারে" আর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে ইহা কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলের তালওয়ারাহ নামক স্থান।
৩. কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বায় ভলিম এবং রায় ভিলম দেওয়া আছে। দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে রায় ভীম। বদাওনী এবং ফিরিশতাও ইহাই লিখিয়াছেন। বদাওনীর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে সলিম।
৪. এই নামটি সঠিক বুঝা যায় না। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ আছে যেমন থঙ্কব, থটকহ ভটকর, ভাতকর, বিকাহ। ইহা সম্ভবতঃ বদাওনী বর্ণিত তলওর হইবে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন বিমল।
৫. বদাওনী এবং ফিরিশতা লিখিয়াছেন জসরত।

শিবির স্থাপন করেন এবং উপরোক্ত বৎসর এবং মাসের ১১ তারিখে লাহোরের কাদার দুর্গটি আক্রমণ করিলেন এবং বহু লোককে হত্যা করিলেন ; আর পুনরায় একই মাসের ২১ তারিখে তিনি প্রবল শক্তিতে দুর্গটি আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হইয়া, তাহার প্রথম অবস্থানের কয়েক কারোহ দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন; আর এক মাস এবং পাঁচ দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কোন কিছুই করিতে পারিলেন না। শেইখা যখন কোন কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন তিনি কালানুর[১] অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রায় ভীমের সহিত যুদ্ধ করেন, রায় ভীম মালিক মাহমুদ হাসানকে সাহায্য করিবার জন্য কালানুরে আগমন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত বৎসরের রমযান মাসে শান্তি স্থাপিত হয় আর শেইখা বিপাশা অভিমুখে গমন করেন। এই সময়ে মালিক সিকান্দর তুহফাহ, মালিক মাহমুদ হাসানের সাহায্যার্থে সুলতান মুবারক শাহ যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, তাহা লইয়া পুহির[২] চড়ায় আগমন করেন। শেইখার যুদ্ধ করিবার মত আর কোন শক্তি অবশিষ্ট ছিল না, ফলে তিনি ইরাবতী এবং চন্দ্রভাগা অতিক্রম করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মালিক সিকান্দর পুহির চড়া দিয়া বিপাশা নদী অতিক্রম করেন এবং উপরোল্লিখিত বৎসরের শাওয়াল মাসের ১২ তারিখে লাহোরে পৌঁছেন। মালিক মাহমুদ হাসান অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাহার আগমনকে এক মহা সম্মানরূপে গণ্য করেন। দিবালপুরের গভর্ণর মালিক রজব[৩], এবং সিরহিন্দের গভর্ণর মালিক সুলতান শাহ এবং রায় ফিরোয মুইন এবং জমিদারগণ ইহার পূর্বেই মালিক সিকান্দরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী ইরাবতী নদীর তীর ধরিয়া কালানুর অভিমুখে গমন করেন ; আর যখন ইহা জামুনের সীমান্তে পৌঁছে, রায় ভীম আগমন করেন এবং তাহাদের সহিত যোগদান করেন এবং কর্তব্য সমাপন করেন। একদল খোখর, যাহারা শেইখার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, লুণ্ঠিত হয় এবং তৎপর সেনাবাহিনী লাহোর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে। এই সময়ে মালিক মাহমুদ হাসান[৪] সুলতান মুবারক শাহের ফরমান অনুযায়ী জালন্ধরে গমন করেন এবং তথায়

---

১. গুরুদাসপুর শহরের ১৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত : অক্ষাংশ ৩২° ১´ উঃ দ্রাঘিমাংশ ৭৫° ১১´ ৩০´´ পূর্ব। এই স্থানেই পরবর্তী কালে আকবর তাহার পিতার ইন্তেকালের সংবাদ পান এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২. এই নামটি বুহি এবং পুহি দুই রকমই দেওয়া আছে। বদাওনীও পুহি লিখিয়াছেন। ফিরিশতা লিখিয়াছেন লুই। কর্ণেল রেভিং-এর মতে পুহি, পুনিরই নাম।

৩. বদাওনী এইসব অফিসার মালিক সিকান্দরের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তিনি সিরহিন্দের গভর্ণরের নাম লিখিয়াছেন ইসলাম খান লোদী।

৪. বদাওনী এই রদবদল সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই।

তাহার ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ করিয়া দিল্লী গমন করেন ; আর মালিক সিকান্দর লাহোর আগমন করেন ; আর এই একই সময়ে উযির পদটি মালিক সিকান্দরের নিকট হইতে নিয়া মারওয়ার-উল-মুলককে দেওয়া হয় ।

আঃ হিজরা ৮২৬ সনে (১৪২২ খ্রীঃ) সুলতান মুবারক শাহ ঐ দেশের কাফের এবং বিদ্রোহীদের দমন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন ; আর ঐ বৎসরেরই মহররম মাসে তিনি কৈথার প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং রাজস্ব আদায় করেন ; আর কতিপয় বিদ্রোহীকে তাহাদের পাওনা শাস্তি প্রদান করেন । এই স্থানে বদাউনের গভর্ণর মহাবত খান যিনি খিযর খানের অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাহার নিকট আগমন করিয়া সাক্ষাৎ করেন । সুলতান গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন এবং রাঠোরদের[১] দেশ দখল করেন এবং তাহা লুণ্ঠন করেন এবং বহু সংখ্যক লোক হত্যা করেন এবং বহু লোক বন্দী করেন । তিনি কয়েকদিন গঙ্গা তীরে অবস্থান করেন ; আর রাঠোরগণকে দমন করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনীসহ মালিক মুবারিক, এবং যিরক খান এবং কামাল খানকে কামবালাহ দুর্গে রাখিয়া যান এবং তিনি রায় সরের[২] পুত্রের বিরুদ্ধে মালিক খয়রুদ্দীন ঘানিকে প্রেরণ করেন ; ইনি খিযর খানের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং চুপচাপ ছিলেন ; এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহার দেশটি অধিকার করেন এবং তাহা লুণ্ঠন করেন ; এবং ইতাওয়া গমন করেন । রাজপুতগণ তথায় নিজেদের অবরুদ্ধ করিয়া রাখে এবং যুদ্ধ করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বিনীতভাবে এবং ভীত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে । রায় সরের পুত্র আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাহার জন্য নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করেন । অতঃপর সুলতান মুবারক শাহ বিজয় গৌরবে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন । প্রায় এই সময়েই মালিক মাহমুদ হাসান তাহার সেনাবাহিনীসহ জালন্ধর হইতে দিল্লী আগমন করেন এবং তাহাকে বক্সী পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানীত করা হয় । ঐ সময়ে এই পদটিকে বলা হইত সেনাবাহিনীর আরিযী ।

উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে শেইখা এবং রায় ভীমের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তি নিহত হয় ; আর তাহার ধনরত্ন এবং

১. একটি সুবিখ্যাত রাজপুত উপজাতি । বদাওনী বলেন যে সুলতান গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন এবং খোর-এর সন্নিকটস্থ পটিয়ারগণের দেশ আক্রমণ করেন ; খোর শামসাবাদ নামেও পরিচিত ; আর অধিকাংশ লোককে হত্যা করিয়া দেশটি বিধ্বস্ত করিয়া দেন । কিন্তু তাবাকাতের গ্রন্থকার ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই । পটিয়ারগণ অপর একটি রাজপুত উপজাতি ।

২. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন সর, সির এবং সরওয়ার । বদাওনী রায় সরের পুত্রের প্রতি আক্রমণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই । রায় ভীমের সহিত শেইখার যুদ্ধ সম্বন্ধেও তিনি নীরব ।

সাজসরঞ্জাম শেইখার হস্তগত হয়। ইহার ফলে শেইখা নিজেকে শক্তিশালী অনুভব করিতে থাকে এবং দিবালপুর এবং লাহোর অঞ্চল দখল করে। মালিক সিকান্দর তাহাকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন এবং চন্দ্রভাগা নদী অতিক্রম করেন, কিন্তু কোন কিছু না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে মুলতানের গভর্ণর আলা-উল মুলকের পুত্র মালিক আলউদ্দীনের ইন্তেকালের সংবাদ আসে। আরও সংবাদ আসে যে স্থর ঘনামিশের[১] পুত্র ও প্রতিনিধি শেখ আলী ভকর ও সিবিস্তান দেশগুলি আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে কাবুল হইতে আগমন করিতেছেন। মুঘলগণ কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য সুলতান মালিক মাহমুদ হাসানকে এক বিরাট বাহিনী সৈন্য-সহ প্রেরণ করেন, আর মুলতান এবং সিন্ধু এলাকা তাহাকে প্রদান করেন। তিনি যখন মুলতান পেঁৗছেন, তখন তিনি তথায় বাসস্থানকারী সকল লোক এবং সর্বসাধারণ মুসলমানদের হৃদয় অনুগ্রহ এবং উপহারের দ্বারা উৎফুল্ল করিয়া তোলেন এবং তিনি মুলতান দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কারণ মুঘলদের আক্রমণের ফলে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে মুঘল বাহিনী প্রত্যাবর্তন করে।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে ধারের[২] গভর্ণর আলপ খান, যিনি সুলতান হোসাঙ্গ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিতে আগমন করিতে-ছেন। মুবারক শাহ গোয়ালিয়র অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন বিয়ানার সন্নিকটে উপস্থিত হন তখন তিনি শুনিতে পান যে বিয়ানার গভর্ণর এবং অউহাদ খানের পুত্র, আমীর খান[৩] তাহার চাচা মুবারক খানকে হত্যা করিয়াছেন এবং বিয়ানা ধ্বংস করিয়া দিয়া, এক পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। মুবারক শাহ্ পর্বতের পাদদেশের নিকটে শিবির স্থাপন করেন এবং সংবাদ আদান-প্রদানের পর বাৎসরিক নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতান মুবারক শাহ ঐ স্থান হইতে গোয়ালিয়র গমন করেন। আলপ খান এমন এক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন যে স্থান হইতে নদী অতিক্রমের চড়া আয়ত্বে রাখা যায়। মুবারক শাহ অপর একটি চড়া স্থান আবিষ্কার করেন[৪] এবং দ্রুত নদী

১. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন স্থুর ঘটমাশ, স্থুর ঘামিশ খান, সিউর উতমিশ এবং সিউর ঘনমিশ। বদাওনী এই অভিযানের কোন উল্লেখ করেন নাই।

২. ধার ও উজ্জয়িনী বিভিন্নরূপ সময়ে মালবের রাজধানী ছিল। ফিরিশতা সুলতান হোশাঙ্গকে মালবের ওয়ালী আখ্যা দিয়াছেন।

৩. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন শামস খান অউহাদী পিতা অউহাদ খান অউহাদী, ফিরিশতা তাহার নাম লিখিয়াছেন আমীর খান, ইবন-ই-দাউদ খান, ইবন-ই-শামস খান।

৪. গোয়ালিয়রের ঘটনা সম্পর্কে বদাওনীও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। চম্বল যমুনার প্রধান উপনদী। ইহা মালবে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কালি সিন্ধু, পার্বতী ও বানাস নদী ইহার সাথে আসিয়া যুক্ত

অতিক্রম করেন। কতিপয় আমীর যাহারা সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন তাহারা আলপ খানের সেনাবাহিনীর বহির্ভাগ লুণ্ঠন করেন এবং বহু সংখ্যক বন্দী আনয়ন করেন। বন্দীগণ যেহেতু মুসলমান ছিল, সুলতান তাহাদের মুক্তির নির্দেশ দেন। পরদিন আলপ খান শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং উপযুক্তরূপ কর প্রদান করিয়া ধার অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন আর মুবারক শাহ্ চম্বল নদীর তীরে অবস্থান করেন; আর প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ঐ অঞ্চলের জমিদারগণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া আঃ হিজরা ৮২৭ সনের (১৪২৩ খ্রীঃ) রজব মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

আর আঃ হিঃ ৮২৮ সনের (১৪২৪ খ্রীঃ) মহরম মাসে সুলতান কৈথার অভিমুখে গমন করেন। কৈথারের রায় নরসিংহ গঙ্গা নদীর তীরে আগমন করেন, আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তিন বৎসরের রাজস্ব আদায় না করিবার ফলে কয়েকদিনের জন্য কারারুদ্ধ থাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজস্ব প্রদান করায় তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ স্থান হইতে সুলতান গঙ্গা নদী অতিক্রম করেন এবং ঐ তীরের বিশৃঙ্খলার জন্য শান্তি বিধান করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে মেওয়াটিগণের বিদ্রোহ এবং বল প্রয়োগের সংবাদ আসিয়া পৌঁছে। সুলতান ঐ অঞ্চলের অভিমুখে গমন করেন এবং লুটতরাজ ও ধ্বংস করিয়া মেওয়াটের অধিকাংশ অঞ্চল পর্যুদস্ত করেন। মেওয়াটিগণ তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ ত্যাগ করিয়া ঝারের[১] পার্বত্য অঞ্চলে গমন করে। শস্যের এবং পশুর খাদ্যের প্রাদুর্ভাব হইবার ফলে এবং দেশটি শক্তিশালী হইবার ফলে সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমীরগণকে তাহাদের জায়গীরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আমোদ প্রমোদে গা ঢালিয়া দেন। আর আঃ হিঃ ৮২৯ সনে, (১৪২৫ খ্রীঃ) তিনি ঐ দেশের বিদ্রোহীগণকে দমন করিবার জন্য পুনরায় মেওয়াট অভিমুখে গমন করেন। জল্লু এবং কদ্দু এবং তাহাদের সহিত যোগদানকারী সকল মেওয়াটি তাহাদের বাসস্থান খালি ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যায়; এবং নিজেরা আন্দ্রুনের পার্বত্য অঞ্চলে গমন করে; আর প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তাহারা দুর্গ পরিত্যাগ করে এবং আলওয়ালের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সুলতান তাহাদিগকে প্রত্যেক দিন আক্রমণ করেন এবং উভয় পক্ষেরই লোক ক্ষয় হইতে থাকে। অবশেষে মেওয়াটিগণ অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়ে এবং আশ্রয় ভিক্ষা করে। কদ্দু আগমন করিয়া তাহার

হইয়াছে এবং তৎপর ইহা ইতাওয়া শহরের চল্লিশ মাইল নিম্নে যমুনা নদীতে পতিত হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ ইহার নাম লিখিয়া গিয়াছে চরমানবতী।

১. নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন, ঝর, ঝরাহ এবং ছরাহ।

২. বদাওনী বলেন যে কৈথারে এই অভিযান করা হয় আঃ হিঃ ৮২৭ সনে,; কিন্তু এইসব ঘটনা সম্বন্ধে বদাওনীর বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত।

আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং কারারুদ্ধ হন। সুলতান মেওয়াট দেশটি লুণ্ঠন করেন এবং তৎপর প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি পুনরায় চারি মাস এগার দিন পর এবং আঃ হিঃ ৮৩০ সনের (১৪২৬ খ্রীঃ) মহরম মাসে তাহার সেনাবাহিনীসহ মেওয়াট অভিমুখে গমন করেন এবং ঐ দেশের বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দিয়া বিয়ানা গমন করেন। অউহাদ খানের পুত্র মুহম্মদ খান[১] পর্বতের চুড়ায় উঠিয়া যান এবং ষোল দিন ধরিয়া যুদ্ধ করেন। তাহার অধিকাংশ লোক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সুলতান মুবারক শাহের সহিত যোগদান করেন; আর তাহার যখন শেষোক্ত জনকে বাধা দিবার আর কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকে না তখন তিনি অতি বিনয়ের সহিত এবং অনুগতভাবে তাহার গলার চারিদিকে রশি বাঁধিয়া আগমন করেন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন; এবং তাহার দুর্গে তাহার যে অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী যাহা ছিল সেই সব কর রূপে সুলতানকে প্রদান করেন। মুবারক শাহ তাহার পরিবার এবং অনুচরগণকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনেন এবং তাহাদিগকে দিল্লী প্রেরণ করেন। তিনি বিয়ানা মকবুল খানকে প্রদান করেন; আর সিবি, যাহা ফতেহপুর নামেও পরিচিত, দেন মালিক খয়রুদ্দীন তুহফাকে এবং স্বয়ং গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন। গোয়ালিয়র, থকর[২] এবং চন্দওয়ারের রায়গণ তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং পূর্ব প্রথা অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করেন এবং উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে সুলতান দিল্লী আগমন করেন। তিনি মালিক মাহমুদ হাসানের জায়গীর পরিবর্তন করিয়া দেন এবং হিসার ফিরোযা তাহাকে প্রদান করেন আর মালিক রজব নাদিরাহ মুলতান লাভ করেন।

মুহম্মদ খান তাহার পরিবার সহ পলায়ন করেন এবং মেওয়াট গমন করেন[৩]। তাহার কতিপয় অনুচর তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা পুনরায় তাহার সহিত যোগদান করিল। এই সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে মালিক

---

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই তাহার এই নাম লিখা হইয়াছে। বদাওনীও ইহার নাম মুহম্মদ খান অউহাদী লিখিয়াছেন, কিন্তু পূর্বে আমরা তারাবাতে দেখিয়াছি অউহাদ খানের পুত্র আমীর খান আর বদাওনীর মতে অউহাদ খানের পুত্র শামস খান আর ফিরিশতার মতে দাউদ খানের পুত্র আমীর খান ছিলেন বিয়ানার গভর্ণর।

২. নামটি সন্দেহজনক। ইহা বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন থকর. থংকর ও ভকর। বদাওনী বলেন যে তিনি ঐ দেশের রায়দের নিকট হইতে আনুগত্য লাভ করেন।

৩. বদাওনী এই ঘটনাগুলির কোন বিবরণ দান করেন নাই। তিনি মুহম্মদ খানের বিয়ানা প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তিনি আঃ হিঃ ৮৩১ সনের ঘটনাবলী শুরু করেন কাদির খানের নিকট হইতে দূত সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর বান্দী আক্রমণ সম্বন্ধে মুবারক শাহের নিকট সংবাদ আনয়ন করা হইতে।

আহমদ মকবুল খানি তাহার সৈন্যদলসহ মহাওয়ান গমন করিয়াছেন, আর মালিক খয়রুদ্দীন তুহফাহকে দুর্গে রাখিয়া গিয়াছেন আর বিয়ানা শহরটি শূন্য (অর্থাৎ অরক্ষিত)। মুহম্মদ খান এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এবং বিয়ানার জমিদারদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এক ক্ষুদ্র বাহিনীসহ তথায় গমন করিলেন। শহর এবং অঞ্চলটির বেশীর ভাগ লোক তাহার সঙ্গে যোগদান করিল। মালিক খয়রুদ্দীন দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং দুর্গটি প্রত্যর্পণ করিয়া দিল্লী আগমন করিলেন। মুবারক শাহ বিয়ানা মালিক মুবারিযকে দিলেন এবং তাহাকে মুহম্মদ খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেন। মালিক মুবারিয অঞ্চলটি দখল করিলেন এবং তাহা আয়ত্বে আনিলেন। মুহম্মদ খান তাহার একদল বিশেষ অনুচরকে দুর্গে রাখিয়া একাকী অবিরাম পথ চলিয়া সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর দরবারে গমন করিলেন। মুবারক শাহ মালিক মুবারিযকে ডাকাইয়া আনিয়া স্বয়ং বিয়ানা বিজয়ের উদ্দেশ্যে গমন উচিত বিবেচনা করিলেন।

পথিমধ্যে কাল্পীর গভর্ণর কাদির খানের নিকট হইতে এক আবেদন পত্র তাহার নিকট পৌঁছিল, আর ইহাতে জানানো হইল যে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ কাল্পী আক্রমণের জন্য আগমন করিতেছেন। সুলতান মুবারক শাহ বিয়ানার ব্যাপারটা স্থগিত রাখিলেন এবং সুলতান ইব্রাহীমের সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে শর্কী সেনাবাহিনী ভুগাও[১] আক্রমণ করিয়াছিল এবং বদাওন[২] অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সুলতান মুবারক শাহ যমুনা নদী অতিক্রম করিয়া মওযামের খ্যাতনামা শহরগুলির অন্যতম মৌযা জায়তলি আক্রমণ করিলেন। আর তথা হইতে তিনি আক্রৌলি[৩] গমন করিলেন। ইব্রাহীম খান শর্কীর ভ্রাতা মুখতাস খান ইতাওয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুলতান মুবারক শাহ তাহার বিরুদ্ধে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ মাহমুদ হাসানকে[৪] প্রেরণ করিলেন। মাহমুদ হাসান যখন শর্কী বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন, শেষোক্তগণ তাহাকে বাধা দানে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং ইহার নিজেদের সুলতানের নিকট গমন করিল। মাহমুদ হাসান কয়েকদিন অপেক্ষা করিলেন এবং তাহার নিজের (অর্থাৎ সুলতান মুবারক শাহের সেনাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

১. বদাওনী লিখিয়াছেন ভোন গাও। ফিরিশতা তাবাকাতের ন্যায় ভু-গাও লিখিয়াছেন। ভোন গাও মৈনপুরী জেলায়, মৈনপুরী শহর হইতে ৯½ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

২. বদাওন ভোনগাও-এর ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

৩. আক্রৌলী আলীগড় শহর হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪. ইহার উপাধি ছিল মালিক-উশ-শর্ক।

সুলতান ইব্রাহীম শর্কী আবসিয়াহ[১] এর তীর ধরিয়া মারহরার অধীনস্থ স্থান বুরহানাবাদের নিকটে আগমন করিলেন। মুবারক শাহ্ আক্রৌলী হইতে মালি কোটা শহরে[২] আগমন করিলেন। সুলতান মুবারক শাহের বাহিনীর বিরাটত্ব এবং চাকচিক্য দেখিয়া তাহার সহিত মোকাবিলা করিবার মতলব ত্যাগ করেন এবং উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে রাপ্রী শহর অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ স্থান হইতে তিনি যমুনা অতিক্রম করিলেন এবং বিয়ানা গমন করিলেন; আর কৈথার নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। মুবারক শাহ্ চন্দোয়ারের নিকটে যমুনা অতিক্রম করিলেন এবং সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনীর পাঁচ কারোহ্ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন: তাহার সৈন্যগণ শেষোক্ত বাহিনীর প্রান্তগুলি প্রতিদিন আক্রমণ করিতে লাগিল এবং অশ্ব, গবাদি পশু এবং সব লোক ধরিয়া নিয়া আসিতে লাগিল। বিশ দিন ধরিয়া ব্যাপার এইরূপ চলিল, অবশেষে উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসের ৭ তারিখে, সুলতান শর্কী তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং যুদ্ধ করিবার দৃঢ় সংকল্প করিলেন। সুলতান মুবারক শাহ, মাহমুদ হাসান, এবং সুলতান মুযাফফরের পুত্র ফতেহ্ খান এবং যিরক খান এব ইসলাম খান এবং খান-ই-জাহানের পৌত্র মালিক চমন, এবং হস্তী-সমূহের তত্ত্বাবধায়ক মালিক কলু এবং মালিক আহমদ মকবুল খানকে তাহাকে বাধা দানের জন্য প্রেরণ করিলেন; এবং তাহারা মধ্যাহ্ন হইতে বৈকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, এবং ঐ সময় তাহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া বসিলেন। পরদিন[৩] অর্থাৎ জমাদিউল আখির মাসের ১৭ তারিখে সুলতান শর্কী রওয়ানা হইলেন এবং জৌনপুরের পথ ধরিলেন; আর মুবারক শাহ্ হটকানত[৪] হইয়া গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করিলেন।

তিনি পূর্ব প্রথা অনুযায়ী গোয়ালিয়রের রায়ের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলেন; এবং তৎপর বিয়ানা প্রত্যাবর্তন করিলেন। যদিও মুহম্মদ খান অউহাদী প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন তবু তিনি কোন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না, আর যেহেতু তিনি সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন,

১. বদাওনী নদীর নাম লিখিয়াছেন কালি পানি অর্থাৎ কালিনী।

২. বদাওনী লিখিয়াছেন কোটা, কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন মালি কোটা।

৩. সব পাণ্ডুলিপিগুলিতেই এইরূপ আছে, কিন্তু পূর্ববর্তী তারিখের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য নাই। ইহা সম্ভবতঃ অপর একদিন হইবে, পরদিন নয়।

৪. বদাওনী বলেন যে মুবারক শাহ, সুলতান ইব্রাহীমের পশ্চাদ্ধাবন করেন নাই, তাহার কারণ হইল যে উভয় পক্ষই মুসলমান। বদাওনী স্থানটির নাম লিখিয়াছেন সতগণাহ আর ফিরিশতা লিখিয়াছেন হলঘাট।

তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং মুবারক শাহের নিকট আগমন করিয়া তাহার খেদমত করিলেন। সুলতান তাহার অপরাধের উপর ক্ষমার কলমের দাগ দিয়া দিলেন এবং তাহাকে আশ্রয় দিলেন ; এবং রজব মাসের ২০ তারিখে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মেওয়াট অভিমুখে গমন করিলেন। সুলতান দুর্গটি পাহারা দিবার জন্য এবং প্রদেশটি শাসন করিবার জন্য মাহমুদ হাসানকে তথায় রাখিয়া গেলেন। আর প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হইয়া আঃ হিজরা ৮৩১ সনের ১৪২৭ খ্রীঃ) শাবান মাসের ১১ তারিখে দিল্লী পেঁ ৗছিলেন।

উপরোক্ত বৎসরের শাওয়াল মাসে সুলতান মালিক কদ্দু মেওয়াটিকে বন্দী করাইয়া হত্যা করাইলেন এবং মেওয়াট প্রদেশটি শাসন করিবার জন্য মালিক পরওয়ারকে প্রেরণ করিলেন। অধিকাংশ অধিবাসী তাহাদের এলাকাসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া দিল এবং পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিল। কদ্দুর ভ্রাতা জালাল খান[১] এবং আহমদ খান এবং মালিক ফখরুদ্দীন এবং তাহার সকল আত্মীয়-স্বজন আন্দরূন[২] দুর্গে সমবেত হইলেন। মালিক সরওয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া শহর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর যি'কাদাহ মাসে সংবাদ আসিল যে শেখ খোখরের পুত্র জসরত, কালানুর অবরোধ করিয়াছেন, আর লাহোরের গভর্ণর মালিক সিকান্দর তাহাকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়াছেন ; আর লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। জসরত বিপাশা নদী অতিক্রম করিলেন এবং জালন্ধর দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ইহা করিতে ব্যর্থ হইলেন, তিনি সন্নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ পর্যুদস্ত করিলেন এবং বহু লোক বন্দী করিয়া লইয়া পুনরায় কালানুরের দিকে ফিরিলেন। মুবারক খান, সামানার গভর্ণর যিরক খান এবং সিরহিন্দের আমীর ইসলাম খানকে নির্দেশ প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা মালিক সিকান্দরকে সাহায্য করেন। কিন্তু ইহাদের আগমনের পূর্বেই মালিক সিকান্দর, রায় ঘালিক কালানুরী এবং তাহার বাহিনী তাহার সঙ্গে নিয়া বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। জসরত আসিয়া তাহার মোকাবিলা করিলেন এবং পরাজিত হইয়া যিকাহ অভিমুখে গমন করিলেন। আর সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে তিনি জালন্ধরের চতুর্দিকস্থ জেলাসমূহ হইতে যেসব লুণ্ঠিত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার সবই মালিক সিকান্দরের বাহিনীর হস্তগত হয়।

১. পূর্বে তাহাকে জল্লু বলা হইয়াছে।
২. একটি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ দেওয়া আছে। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে ইন্দোর এবং ইদর। বদাওনী এই ঘটনাবলী আদৌ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু পূর্বের এক ঘটনা উপলক্ষে তিনি মেওয়াটের দুইটি দুর্গ ইন্দোর-এবং আলওয়ারের উল্লেখ করিয়াছেন।

আঃ হিজরা ৮৩২ সনের (১৪২৮ খ্রীঃ) মহরম মাসে বিয়ানায় মুহম্মদ হাসান অউহাদী কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খল দমন করিয়া মালিক মাহমুদ হাসান দিল্লী আগমন করিলেন। ইহার পর সুলতান মুবারক শাহ মেওয়াটের পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং মহদোরাই আগমন করিলেন এবং তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। জালাল খান মেওয়াটি এবং মেওয়াটিগণের সকলেই, যাহারা দুর্বল ছিল, তাহাদের নিকট যে রাজস্ব দাবী করা হইল তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইল আর তাহাদের কতিপয় সুলতানের নিকট আগমন করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিল। আর সুলতান উপরোক্ত বৎসরের শাওয়াল মাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রায় এই সময় মুলতানের গভর্ণর মালিক রজব নাদিরার ইন্তেকালের সংবাদ আসিল। সুলতান মালিক মাহমুদ হাসানকে মুলতানে প্রেরণ করিলেন। ইহার পূর্বে তাহাকে ইমাদুল-মূলক উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

আঃ হিঃ ৮৩৩ সনে (১৪২৯ খ্রীঃ) সুলতান তাহার সেনাবাহিনীসহ গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করিলেন এবং বিয়ানার পথে তথায় আগমন করিলেন; আর ঐ দেশের বিশৃঙ্খলা দমন করিয়া তিনি হটকানত গমন করিলেন। রায় সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া পাহাড়ের পাদদেশে পলায়ন করিলেন। সুলতান তাহার দেশ লুণ্ঠন করিলেন এবং বহু সংখ্যক অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া রাপ্রী আগমন করিলেন এবং ঐ প্রদেশটি হাসান খানের পুত্রের নিকট হইতে নিয়া তাহা মালিক হামযাকে দেন; আর উপরোক্ত বৎসরের রজব মাসে (দিল্লীতে) প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথিমধ্যে সৈয়দ সলিম ইন্তেকাল করিলেন এবং সুলতান তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম খান আর তাহার অপর পুত্রকে শুজা-উল-মূলক উপাধি দান করিলেন। উপরোক্ত সৈয়দ ত্রিশ বৎসর কাল বেহেশতবাসী খিযর খানের চাকুরী করিয়াছিলেন এবং একজন অন্যতম প্রধান আমীর ছিলেন আর তাবারিন্দা দুর্গের রক্ষকরূপে বহু বৎসর ধরিয়া তিনি প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের শাওয়াল মাসে ফৌলাদ তুর্কবাচা তাবারিন্দা দুর্গে আগমন করিলেন এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিলেন। মুবারক শাহ সৈয়দ সলিমের পুত্রদের কারারুদ্ধ করিলেন এবং ফৌলাদকে দমন করিবার জন্য এবং সৈয়দ সলিমের সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য রায় হনু বেহতিকে[১] তাবারিন্দা প্রেরণ করিলেন। তাহারা যখন তাবারিন্দার

১. এই স্থানে ঘটনা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বদাওনী বলেন যে ফৌলাদ সৈয়দ সলিমের একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং তিনি সৈয়দ সলিমের প্রভূত ধনবস্তু হস্তগত করেন। কিন্তু তিনি বা তাবাকাতের গ্রন্থকার কেহই বলেন নাই যে সৈয়দ সলিমের পুত্রদের এই বিদ্রোহে কোন হাত ছিল। কিন্তু মুবারক শাহের তাহার পুত্রগণকে কারারুদ্ধ করা হইতে মনে হয় ইহাতে তাহাদেরও যোগসাজশ ছিল। ফিরিশতা বলেন যে তাহাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে অনুরক্ত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না এবং তাহারা ফৌলাদ তুর্কবাচাকে প্ররোচিত করিয়াছিল।

উপকণ্ঠে আগমন করিলেন তখন ফৌলাদ শান্তির প্রস্তাব করিলেন এবং এইরূপে তাহাদিগকে অসতর্ক করিলেন এবং পরদিন সহসা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া অতর্কিতে সৈন্যদের উপর নৈশ আক্রমণ করিলেন। মালিক ইউসুফ এবং রায় হনু,[১] যাহারা এই বিশ্বাসঘাতকতার সংকল্প সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, যুদ্ধ করিলেন কিন্তু পরাজিত হইলেন এবং সরস্বতি অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন আর তাহাদের সাজ-সরঞ্জাম এবং জিনিসপত্র ফৌলাদের হস্তে পতিত হইল; এবং এইগুলি তাহার শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হইল। সুলতান এই সংবাদ শুনিয়া তাবারিন্দা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং চতুর্দিক হইতে আমীরগণ ও সৈন্যবাহিনী আসিয়া সুলতানের বাহিনীর সহিত যোগদান করিল আর জমিদারগণও খেদমত করিতে আগমন করিল। যেহেতু ফৌলাদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল, তিনি নিজেকে তাবারিন্দা দুর্গে আবদ্ধ রাখিলেন। সুলতান পথ হইতে, যিরক খান এবং মালিক কলু এবং ইসলাম খান এবং কামাল খানকে তাবারিন্দা অবরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন। ফৌলাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য মুলতানের গভর্ণর ইমাদুল-মুলককে তলব করা হইল। পূর্বোক্ত বৎসরের যি হিজ্জা মাসে ইমাদুল-মুলক সরস্বতি আগমন করিলেন এবং সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যেহেতু ফৌলাদের ইমাদুল-মুলকের কথার প্রতি আস্থা ছিল, তাই ফৌলাদকে আশ্বাস দিবার জন্য তাহাকে তাবারিন্দা প্রেরণ করা হইল। শেষোক্ত ব্যক্তি বহু কথা বলিলেন কিন্তু বিদ্রোহ চালাইয়া যাইতে দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন; আর ইমাদুল-মুলক তাহার উদ্দেশ্য সফল না করিয়াই মুবারক শাহের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হিজরা ৮৩৪ সনে (১৪৩০ খ্রীঃ) সফর মাসে সুলতান ইমাদুল-মুলককে মুলতান প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান করিলেন এবং তিনি স্বয়ং, ইসলাম এবং কামাল খান এবং রায় ফিরোয মুইনকে তাবারিন্দার অবরোধ চালাইয়া যাইবার জন্য রাখিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইমাদুল-মুলক তথায় গমন করিলেন এবং অবরোধ সম্বন্ধে আমীরগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করিয়া মুলতান গমন করিলেন। ফৌলাদ ছয় মাস কাল যুদ্ধ চালাইলেন এবং বিশ্বাসভাজন অনুচরদের দ্বারা প্রচুর অর্থ কাবুলে শেখ আলীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ঐ বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে শেখ আলী তাবারিন্দা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন তাবারিন্দার দশ কারোহর মধ্যে আগমন করিলেন এবং ইসলাম খান এবং কামাল

১. বদাওনী বলেন যে মালিক ইউসুফ সরওয়ার এবং রায় হলমু বেহতিকে তাবারিন্দা প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাবাকাতে প্রথমবার মালিক ইউসুফ সরওয়ারের কোন উল্লেখ নাই। যদিও শেষের দিকে মালিক ইউসুফের উল্লেখ আছে। অপর নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন রায় হনু, রায় ভু, রায় হপু ও রায় হিপু।

খান এবং আমীরগণের সকলেই অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং তাহাদের নিজস্ব সরকারের নিকট গমন করিলেন। ফৌলাদ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং শেখ আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন আর তাহাকে দিবার জন্য অঙ্গীকার করা দুই লক্ষ তংকা প্রদান করিলেন। শেখ আলী ফৌলাদ পরিবার এবং সন্তানগণকে তাহার সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।[১] জালন্ধরের রায়তগণকে বন্দী করিয়া নিয়া উপরোক্ত বৎসরের রজব মাসে লাহোর অভিমুখে গমন করিলেন। মালিক সিকান্দর প্রতি বৎসর তাহাকে যে অর্থ প্রদান করিতেন সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। তথা হইতে শেখ আলী তালওয়ারা[২] গমন করিলেন এবং তাহা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিলেন। ইমাদুল-মুলক তাহাকে বাধা দানের জন্য তুলুম্বা[৩] শহরে আগমন করিলেন তাহাকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি শেখ আলীর না থাকিবার ফলে তিনি খতিবপুর[৪] অভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে সুলতানের নির্দেশ আসে যে ইমাদুল-মুলক তুলুম্বা ত্যাগ করিবেন এবং মুলতান গমন করিবেন এবং উপরোক্ত বৎসরের শাবান মাসের ২৪ তারিখে তিনি মুলতান অভিমুখে তাহার যাত্রা আরম্ভ করিলেন। শেখ আলী অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি খতিবপুরের নিকটে ইরাবতী নদী অতিক্রম করিলেন এবং ঝিলাম নদীর তীরবর্তী পরগণাগুলি, যাহা পাঞ্জাব নামে পরিচিত, বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপর মুলতান অভিমুখে ফিরিলেন। তিনি যখন মুলতানের দশ কারোহর মধ্যে উপনীত হইলেন ইমাদুল-মুলক তাহাকে বাধা দিবার জন্য মালিক বহলোল লোদীর চাচা সুলতান শাহ লোদীকে[৫] প্রেরণ করিলেন। তিনি পথিমধ্যে শেখ আলীর সম্মুখীন হইলেন এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইলেন এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর এক অংশ নিহত হইল আর বাকী অংশ পলায়ন করিল এবং মুলতান প্রত্যাবর্তন করিল। উপরোক্ত বৎসরের রমযান মাসের তৃতীয় দিনে শেখ আলী মুলতানের সন্নিকটস্থ খয়রাবাদে[৬] শিবির স্থাপন

১. বদাওনী বলেন যে শেখ আলী তাহার সঙ্গে ফৌলাদের পরিবার, সন্তানগণের সঙ্গে ফৌলাদকেও নিয়া গিয়াছিলেন।

২. বদাওনী এইস্থানে তালওয়ারার উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন যে শেখ আলী দিবালপুর অভিমুখে গমন করিলেন এবং ইমাদুল-মুলক মুলতান হইতে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন।

৩. মুলতান হইতে ৫২ মাইল উত্তর পূর্বে, ইরাবতী বাম তীরে অবস্থিত।

৪. বদাওনী লিখিয়াছেন খুতপুর; ফিরিশতা লিখিয়াছেন খতিবপুর।

৫. বদাওনী বলেন যে ইমাদুল-মুলক স্বয়ং পরাজিত হন এবং সেনাবাহিনী অগ্রভাগের রক্ষী বাহিনীর সুলেমান শাহ লোদী নিহত হন। কিন্তু তবাকাতের সব পাণ্ডুলিপিতেই তাহার নাম সুলতান শাহ লোদী লেখা আছে।

৬. বদাওনী বলেন যে যে যুদ্ধে ইমাদুল-মুলক পরাজিত হন এবং মালিক সুলেমান শাহ লোদী নিহত হন। সেই যুদ্ধের পর শেখ আলী খুসরুয়াবাদে আগমন করেন। ফিরিশতা বলেন যে যুদ্ধটি মুলতান হইতে তিন দিনের পথ খয়রাবাদে সংঘটিত হয়।

করিলেন ; এবং ৪ঠা রমযান দুর্গের প্রবেশ পথের সম্মুখে এক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইমাদুল-মুলক তাহার পদাতিক বাহিনী বাহিরে প্রেরণ করিলেন যাহাতে তাহারা শেখ আলীর সৈন্যগণকে উস্থানে রাখিতে পারে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ঐ দিনে কোন কিছু না করিয়া তাহার শিবিরে ফিরিয়া যান। ২৭শে রমযান শুক্রবার তিনি পুনরায় এক যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হন, এব বহু লোক নিহত হয় আর শেখ আলী প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার শিবিরে অবস্থান করিতে থাকে। কিছুকাল ধরিয়া এইরূপে যুদ্ধ চলিতে থাকে।[১]

সুলতান মুবারক শাহ, যাফর খান গুজরাটির পুত্র ফতেহ খানকে, কতিপয় আমীর যেমন যিরক খান[২], এবং হস্তীসমূহের তত্ত্বাবধায়ক মালিক কালু, এবং ইসলাম খান, এবং মালিক ইউসুফ এব কামাল খান, এবং রায় হনু বেহতিসহ ইমাদুল-মুলককে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা শাওয়াল মাসের ২৬ তারিখে মুলতান শহরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন ; এবং পরদিন শেখ আলীর সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে পরাজিত করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি আর তাহাদিগকে বাধা দিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি তাহার সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে যে পরিখা খনন করিয়াছিলেন তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায়ও রহিলেন না ; ঝিলাম নদী অতিক্রম করিয়া পলায়নের সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহার সৈন্যদের বেশীর ভাগই ডুবিয়া গেল আর এক অংশ নিহত হইল আর এক অংশ বন্দী করা হইল। তিনি স্বয়ং অল্প কয়েক জন অনুচরসহ শুর[৩] শহরে গমন করিলেন। আর তাহার অশ্বসমূহ এবং উটসমূহ, এবং অস্ত্রশস্ত্র এবং তাহার সেনাবাহিনীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম হাতছাড়া হইয়া গেল। ইমাদুল-মুলক এবং আমীরগণের সকলে শুর পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ; শেখ আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র মীর মুযাফফর তথায় নিজেকে সুরক্ষিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ; আর শেখ আলী স্বয়ং অল্প একদল সৈন্যসহ কাবুল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যে আমীরগণ ইমাদুল-মুলকের সাহায্যে আগমন করিয়াছিলেন নির্দেশ অনুযায়ী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুবারক শাহ সুলতান ইমাদুল-মুলকের নিকট হইতে হস্তান্তর করিয়া তাহা খয়রুদ্দীন খানির অধীনে ন্যস্ত করিলেন।

১. বদাওনী এইসব বিশদ বিবরণ দেন নাই। তিনি শুধু বলেন যে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার মধ্যে (অর্থাৎ শেখ আলী) এবং ইমাদুল-মুলকের মধ্যে প্রতিদিন যুদ্ধ হয়।

২. বদাওনী এই নামগুলি উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন যে সুলতান মুবারক শাহ এক বিরাট বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন আর সুলতান মুযাফফর খান গুজরাটির পুত্র ফতেহ খানকে তাহার সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাবাকাতের সকল পাণ্ডুলিপিতে ফতেহ খানের পিতার নাম দেওয়া আছে যাফর খান।

৩. নামটি এক পাণ্ডুলিপিতে আছে শুর, আর অন্যগুলিতে আছে গনুর। বদাওনী লিখিয়াছেন সনপুর বা সিনুর। ফিরিশতা লিখিয়াছেন শিওয়ার্য।

এই সময়ে শেইখা খোখর[১] তাহার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া এবং শক্তি এবং ক্ষমতা সংগ্রহ করিয়া, বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ শুরু করিলেন। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মালিক সিকান্দর তুহফাহ্[২] জালন্ধর অভিমুখে অগ্রসর হন। শেইখা বিরাট এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং সকরের[৩] পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এবং ঝিলাম এবং ইরাবতী এবং বিপাশা নদী অতিক্রম করিয়া জালন্ধরের সন্নিকটের মইন[৪] নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন আর মালিক সিকান্দরকে অসতর্ক করিয়া দিয়া অতর্কিতে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পরাজিত হন এবং বন্দী হন। শেইখা বিরাট বাহিনী লইয়া লাহোর গমন করিলেন এবং তাহা অবরোধ করিলেন। মালিক সিকান্দরের নায়েব সৈয়দ নজমুদ্দীন, আর তাহার ক্রীত-দাস মালিক খুশ খবর, নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ রাখিলেন এবং প্রত্যেক দিন সংঘর্ষ হইতে লাগিল। এই সময়ে শেখ আলী[৫] পুনরায় কাবুল হইতে আগমন করিলেন এবং মুলতানের চতুর্দিকস্থ অঞ্চলসমূহ বিধ্বস্ত করিলেন এবং খতপুর[৬] এবং ঝিলাম নদীর তীরবর্তী অধিকাংশ গ্রামের অধিবাসীগণকে বন্দী করিলেন।

আর উপরোক্ত বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ই তারিখে তিনি তালামবা[৭] শহরে আসিয়া পেঁৗছিলেন এবং ঐ স্থানের অধিবাসীগণকে সন্ধির শর্তের আশ্বাস দিয়া তাহার আয়ত্বে আনয়ন করেন এবং তাহাদের মধ্যে খ্যাতনামা লোক-গণকে বন্দী করিলেন আর দুর্গটি দখল করিয়া লইলেন। তিনি কতিপয় মুসলমানকে নিহত করিলেন এবং কতিপয়কে মুক্তি দান করিলেন[৮] এবং তাহাদের উপর নানারূপ বিপদ দেখা দিল। আর এই সময়ে ফৌলাদ তুর্কবাচা একদল সৈন্যসহ তাবারিন্দা ত্যাগ করিয়া রায় ফিরোযের দেশটি পর্যুদস্ত করিলেন আর শেষোক্ত ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হই-লেন। সুলতান মুবারক এই সব ঘটনাবলীর কথা শুনিলেন, এবং ঐ বৎসরের জমাদিউল

১. বদাওনী লিখিয়াছেন জসরত।
২. ইনি লাহোরের গভর্ণর ছিলেন।
৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে সকর, অন্যান্যগুলিতে আছে বতকহ এবং বতকব, একটিতে আছে খকর।
৪. পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে যেমন, মিন, সিন, মুইন।
৫. ফিরিশতার মতে জসরতের প্ররোচনায়।
৬. পাণ্ডুলিপিতে খতবপুর এবং খতপুর দুই রকমই আছে।
৭. বদাওনী লিখিয়াছেন তালিম্বা।
৮. বদাওনীর মতে তিনি এরূপ দয়ালু ছিলেন না। তিনি বলেন, তিনি ঐ স্থানের সকল লোককে বন্দী করেন এবং লুটতরাজ ও তাহাদের ধ্বংস করেন, তিনি তাহাদের অধিকাংশকে হত্যা করেন আর বাকী সকলকে তাহার দেশে নিয়া যান।

আউয়াল মাসে লাহোর ও মুলতান অভিমুখে গমন করিলেন এবং মালিক সরওয়ারকে অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যখন সামানা পৌঁছিলেন তখন শেইখা খোখর অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং সকলে পর্বতের পাদদেশের অভিমুখে গমন করিয়া মালিক সিকান্দরকে সঙ্গে নিলেন। শেখ আলী সুলতান মুবারক শাহের সেনাবাহিনীর ভয়ে ভীত হইয়া পেছন ফিরিলেন এবং বলুত[১] গমন করিলেন। সুলতান মুবারক শাহ, লাহোর, মালিক-উশ-শর্ক ইমাদুল মুলকের[২] নিকট হইতে হস্তান্তর করিয়া তাহা নসরত খান গুর্গ-আন্দাজের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। মালিক সরওয়ার লাহোর দুর্গ হইতে মালিক উশ-শর্কের-পরিবার এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে বাহির করিয়া আনিলেন এবং তাহাদের দিল্লী প্রেরণ করিলেন।

আর উপরোক্ত বৎসরের যিহিজ্জা মাসে শেইখা পুনরায় এক বিপুল বাহিনী সৈন্য লইয়া পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসেন; এবং কতিপয় পরগণা পর্যুদস্ত করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে সুলতান মুবারকের শিবির ছিল যমুনা নদীর তীরবর্তী পানিপথ শহরে; আর কিছুকাল ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া এবং ইমাদুল-মুলকে এক সুসজ্জিত বাহিনীসহ ঐ বৎসরের রমযান মাসে বিয়ানা ও গোয়ালিয়রের জমিদারগণকে দমনের জন্য প্রেরণ করিয়া তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আর আঃ হিজরা ৮৩৬ সনের[৩] (১৪৩৩ খ্রীঃ) মহরম মাসে (সুলতান) সামানায় বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য গমন করিলেন এবং ফৌলাদ তুর্কবাচাকে আক্রমণ করিবার জন্য মালিক সরওয়ারকে প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে পরিখায় সুরক্ষিত করিয়া যুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মালিক সরওয়ার, যিরক খান, এবং ইসলাম খানকে বিরাট এক বাহিনী সৈন্যসহ তাবারিন্দা দুর্গের চতুর্দিকে রাখিয়া যান এবং স্বয়ং সুলতানের খেদমত করিতে গমন করেন। শেষোক্ত জন তাহার এই আগমন অনুমোদন করিলেন না; আর লাহোর এবং জালন্ধর নসরত খানের নিকট হইতে নিয়া নেন এবং

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ আছে যেমন বলুত, বাবতুত, মালুত, মাবতুত। বদাওনী বলেন, শেখ আলী তাহার নিজের দেশে পলায়ন করিলেন।

২. বদাওনী বলেন যে শামসুল মুলকের নিকট হইতে লাহোর ও জালন্ধরের শাসনভার হস্তান্তরিত করিয়া নসরত খান গুর্গ-আন্দাজ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে মালিক সিকান্দর ছিলেন লাহোরের গভর্ণর, ইমাদুল-মুলক বা শামসুল মুলক কেহই নয়।

৩. বদাওনী বলেন যে আঃ হিঃ ৮৩৬ সনে সুলতান জসরতের বিদ্রোহ দমনের জন্য সামানা গমন করিলেন, কিন্তু এই ঘটনা তাবাকাতে উল্লেখ করা হয় নাই। বদাওনী বলেন যে এই সময়ে মুবারক শাহের মাতা, যিনি মখদুম-ই-জাহান নামে পরিচিত ছিলেন, দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন; আর তিনি সামান্য কিছু রক্ষীসহ শিবির ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করিলেন আর নিয়মমত শোক পালন করিয়া পুনরায় শিবিরে আসিয়া যোগদান করেন। তাবাকাতে এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

এইগুলি মালিক ইলহাদাদ লোদীকে দেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যখন জালন্ধর অঞ্চলে গমন করেন, তখন শেইখা বিপাশা নদী অতিক্রম করিয়া তাহাকে বাধা দান করেন। মালিক ইলহাদাদ পরাজিত হন এবং কোথি বাজওয়ারার[১] পর্বতের পাদদেশে পলায়ন করেন আর শেইখার বিদ্রোহ জোরদার হইয়া উঠে।

উপরোক্ত বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান মেওয়াট অভিমুখে গমন করিলেন আর তিনি যখন নাওয়ার[২] শহরে পৌঁছিলেন তখন জালাল খান মেওয়াটি এক বিরাট বাহিনী সৈন্যসহ নিজেকে আন্দরুন দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পরদিন জালাল খান দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিলেন; আর ইহাতে জমানো শস্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সুলতানের হস্তগত হইল। শেষোক্ত জন তথা হইতে যাত্রা করিলেন এবং তাজারাহ গমন করিয়া দেশটির বেশীর ভাগ বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। তখন জালাল খান বিনীতভাবে আগমন করিলেন এবং তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং পূর্ব প্রথা অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করিলেন। ইমাদুল-মুলক এক বিরাট বাহিনী সৈন্যসহ বিয়ানা অঞ্চল হইতে আগমন করিলেন এবং তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। সুলতান গোয়ালিয়র এবং ইতাওয়া দেশটিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় আমীরসহ মালিক কামালুদ্দীনকে প্রেরণ করিলেন; আর ঐ বৎসরের জমাদিউল আউয়াল মাসে দিল্লী গমন করিলেন।

প্রায় এই সময়েই সংবাদ আসিল যে শেখ আলী যে সব আমীর তাবারিন্দা অবরোধ করিয়াছিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। সুলতান আমীরগণের সাহায্যের জন্য এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে শেখ আলী অবিরাম পথ চলিয়া শুর হইতে আগমন করিলেন এবং বিপাশার তীরবর্তী অঞ্চলটি পর্যুদস্ত করিলেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া লাহোর অভিমুখে গমন করিলেন আর শহরটির গভর্ণরদ্বয় মালিক ইউসুফ[৩] এবং মালিক ইসমাইল, নিজেদের ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং নিজেদের সম্মুখে নিষেধের বর্ম স্থাপন করিলেন এবং দুর্গ

১. বদাওনী বলেন যে মালিক ইলহাদাদ বাজওয়ারাতে পরাজিত হন। কর্ণেল রেভিং বলেন যে ইহা হোসিয়ারপুরেরর ১২½ মাইল পূর্বে অবস্থিত একটি গ্রাম আর জালন্ধর হইতে ২৫ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত।

২. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন নরওয়ার্দ, বাওয়ার্দ, বাওয়ার, নাওয়ার।

৩. বদাওনী বিভিন্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন খিরক খান এবং অন্যান্য আমীরগণ যাহারা লাহোরে ছিলেন নিজেদের তথায় সুরক্ষিত করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ যুদ্ধে লিপ্ত হন, অবশেষে এক রাত্রে লাহোরের অধিবাসীগণ তাহাদের পাহারাদারদের সম্বন্ধে অসতর্ক হইয়া উঠিলেন এবং মালিক ইউসুফ সরওয়ার-উল-মুলক এবং মালিক ইসমাইল রাত্রীর অন্ধকারে খিরক খানের সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হন, তৎপর দুর্গ হইতে সহসা বহির্গত হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হন, কিন্তু পরাজিত হন।

এবং শহরটি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা যখন শহর-বাসীদের শত্রুতার সম্বন্ধে অবহিত হইলেন, তখন তাহারা পলায়নের সিদ্ধান্ত করিলেন এবং দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন। শেখ আলী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন; আর তাহারা অসংখ্য লোককে হত্যা করে এবং কিছু লোক বন্দী করে; প্রধান ব্যক্তিদের অন্যতম মালিক রাজাও বন্দী হন। শেখ আলী লাহোর অধিকার করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠন করেন এবং ধ্বংস করিয়া দেন; এবং দুর্গটি পুনর্নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং শহরটি রক্ষা করিবার জন্য বাছাই করা দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রাখিয়া তিনি দিবালপুর অভিমুখে গমন করিলেন।[১] মালিক ইউসুফ লাহোর দুর্গ ত্যাগ করিয়া দিবালপুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তথায় দুর্গে আবদ্ধ রহিলেন। এই সব ঘটনাবলীর সংবাদ যখন তাবারিন্দায় ইমাদুল-মুলকের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি এক বিরাট বাহিনী সৈন্যসহ তাহার ভ্রাতা মালিক আহমদকে, মালিক ইউসুফকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে শেখ আলী দিবালপুর ত্যাগ করিলেন; এবং লাহোর ও দিবালপুরের মধ্যবর্তী শহর-গুলি দখল করিয়া লইলেন।

উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসে যখন শেখ আলী কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা এবং গণ্ডগোলের সংবাদ মুবারক শাহের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি সামানা গমন করিলেন, এবং তাহার সৈন্যগণের সমাবেশের জন্য কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন। মালিক কামালুদ্দীন এবং অন্যান্য আমীরগণ আগমন করিলে, তিনি তালওয়ান্দী গমন করিলেন। তাবারিন্দার জন্য মনোনীত করা ইমাদুল-মুলক এবং ইসলাম খান আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। তাবারিন্দার সন্নিকটস্থ স্থানসমূহ ত্যাগ করিবার জন্য অন্যান্য আমীরদের নিকট এক ফরমান জারি করা হইল। তিনি স্বয়ং অতি দ্রুত গতিতে পুহির চড়ায় গমন করিলেন। শেখ আলী পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং পলায়ন করিলেন। সুলতান মুবারক শাহ দিবালপুরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেখ আলী তখন চন্দ্রভাগা নদী অতিক্রম করিয়া গেলেন। সুলতান মালিক সিকান্দর তুহফাহকে শামসুল মুলক উপাধি দান করিলেন। শেইখা খোখর তাহাকে যে বন্দীদশায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করা হইয়া-ছিল, সুলতান তাহাকে দিবালপুর এবং জালন্ধরের গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে শেখ আলীর পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি কিন্তু পলায়ন

১. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ বিভিন্নরূপ, তবে এই পাঠই সঠিক বলিয়া মনে হয়। বদাওনীর বিবরণও অনুরূপ।

করিতে সক্ষম হইলেন, আর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুযাফফরকে[১] শুর দুর্গে রাখিয়া গেলেন এবং তাহার সাজ-সরঞ্জামের এক অংশ এব অস্ত্রশস্ত্র শামস্‌উল মুলকের সৈন্যদের হস্তগত হয়। সুলতান তালাম্বার দিকে ইরাবতী নদী অতিক্রম করিলেন। এবং শুর দুর্গ অবরোধ করিলেন; মুযাফফর এক মাসকাল প্রতিরোধ করিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তির দরজায় করাঘাত করিলেন, এবং প্রচুর করসহ তাহার নিজের কন্যাকে সুলতান মুবারকের পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুলতান পেছনে ফিরিলেন এবং শামস্‌উল মুলককে লাহোরে প্রেরণ করিলেন আর উপরোক্ত বৎসরের শাওয়াল মাসে লাহোরে শেখ আলীর যে সৈন্যগণ ছিল তাহারা আশ্রয় প্রার্থনা করিল এবং দুর্গ পরিত্যাগ করিল। শামস্‌উল মুলক ইহা দখল করিলেন। মুবারক শাহ যখন শুর এবং লাহোর সম্বন্ধে তাহার কাজ সম্পন্ন করিলেন, তখন তিনি সামান্য কতিপয় রক্ষীসহ[২] মুলতানের শেখগণের কবর জেয়ারত করিবার জন্য গমন করিলেন; আর তথা হইতে দিবালপুর আগমন করিলেন।

যেহেতু তাহার ইমাদুল-মুলকের চেয়ে ভাল আর কোন অফিসার ছিল না, তাই তিনি দিবালপুর এবং জালন্ধর প্রদেশগুলি শামস্‌উল মুলকের নিকট হইতে নিয়া সেই-গুলি তাহাকে দিলেন; আর ইমাদুল মুলকের জায়গীর বিয়ানা দেওয়া হইল শামস্‌উল মুলককে। অতঃপর সুলতান দিল্লী গমন করিলেন।[৩] যেহেতু সারওয়ার-উল-মুলক ঠিকমত ওজারতের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতেছিলেন না এবং মালিক কামালুদ্দীন সর্ববিষয়েই বিশ্বাসভাজন ছিলেন,[৪] সুলতান আমীরগণের ব্যাপারসমূহ তাহার উপর ন্যস্ত করিলেন এবং স্থির করিলেন যে এই দুইজন সর্ববিষয়েই পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন। মালিক কামালুদ্দীন ছিলেন[৫] একজন সুবিবেচক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি লোকের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠেন এবং সরকারী কার্য সম্পাদনে তিনি প্রাধান্য লাভ করেন। সারওয়ার-মুলক দিবালপুর এবং তাহার পুরাতন জায়গীর হস্তান্তর করিবার ফলে মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং ঈর্ষাবশতঃ বৈরীভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং কানজু[৬] এবং কাজুর পুত্রগণকে, যাহারা এই পরিবার (অর্থাৎ সুলতানের)

---

১. বদাওনী তাহাকে আমীর মুযাফফর রূপে অভিহিত করিয়াছেন।
২. একাকী অথবা সামান্য রক্ষীসহ।
৩. বদাওনী বলেন যে সামান্য রক্ষীসহ তিনি অতি দ্রুত পথ চলিয়া কোরবানীর ঈদের দিনে দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন।
৪. বদাওনী ইহাকে মালিক কামালুল-মুলক অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন কামালুদ্দীন, কিন্তু পরে ফিরিশতা ও তাহাকে কামালুল-মুলক বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাবাকাতের পাণ্ডুলিপিগুলিতে কামালুদ্দীন এবং কামালুল-মুলকের মধ্যে যথেষ্ট গোলমাল দেখা যায়।
৫. বদাওনী তাহাকে মালিক কামালুল-মুলক, যিনি সেনাবাহিনীর নায়েব ছিলেন, রূপে অভিহিত করিয়াছেন।
বদাওনী ইহাদের বলিয়াছেন কানজু এবং কাজভী ক্ষত্রি।

কর্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং যাহারা অর্থ এবং প্রতিপত্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহার সহিত যোগদান করিতে সম্মত করাইলেন, এবং মিরণ সদর নায়েব আরিয মুমালিক এবং বিশেষ গৃহাধ্যক্ষ কাজী আবদুল সামাদকে তাহার সহিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করাইলেন, এবং সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আঃ হিজরা ৮৩৭ সনের (১৪৩৩ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে সুলতান মুবারক শাহ যমুনা নদীর তীরে একটি শহরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন মুবারকাবাদ।[১]

এই সময়ে তাবারিন্দায় যুদ্ধ জয়ের সংবাদ এবং ফৌলাদ তুর্কবাচার শির দিল্লীতে আনয়ন করা হইল। সুলতান মুবারক শাহ শিকার করিবার ছল করিয়া তাবারিন্দা গমন করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ দেশের জমিদারগণকে নির্দেশ পালনে বাধ্য এবং অনুগত করিয়া মুবারকাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময়ে সংবাদ আনয়ন করা হয় যে কাল্পীতে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী এবং সুলতান হোসাঙ্গ মালভীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইতেছে এবং সুলতান মুবারক শাহ উপরোক্ত বৎসরের জমাদিউল আখির মাসে কাল্পী গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, ইহার পূর্বেই তিনি প্রদেশসমূহের আমীরগণকে তলব করিয়া ফরমান জারি করিলেন; আর দিল্লীর উপকণ্ঠে তাহার সৈন্য সমাবেশের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে আঃ হিজরা ৮৩৭ সনের রজব মাসের ৯ তারিখে শুক্রবারে। সুলতান মুবারক শাহ মুবারকাবাদের কাজকর্ম তদারক করিতে গমন করিলেন; আর তাহার সঙ্গে অতি অল্প কয়েকজন বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ অনুচর ছাড়া আর কেহ ছিল না। সরওয়ারুল মুলক সুযোগের সন্ধানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তাহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুর্দান্ত লোকদের এক ইঙ্গিত করিলেন, আর তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদের তরবারি উত্তোলন করিল এবং সুলতান মুবারক শাহকে শহীদে পরিণত করিল। তাহার রাজত্বকাল ছিল তের বৎসর, তিন মাস এবং ষোল দিন।

মুহম্মদ শাহ[২], পিতা মুবারক শাহ, পিতা খিযর খান

মুহম্মদ শাহের পিতা শাহজাদা ফরিদ আর তাহার পিতা ছিলেন খিযর খান। যেহেতু মুবারক শাহ তাহাকে নিজ পুত্র বলিতেন, মুবারক শাহের রাজত্বকালে লিখিত

১. সুলতানের নামানুসারে এই নামকরণ করা হইল। এই শব্দের অর্থ সৌভাগ্যশালী শহর। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে এই স্থানেই তিনি নিহত হন।

২. মুহম্মদ শাহ ছিলেন ফরিদ খানের পুত্র এবং বদাওনীও তাহাই লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার তাহাকে মুবারক শাহের পুত্র লিখিবার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তারিখ-ই মুবারক শাহী গ্রন্থের লেখক তাহাকে মুবারক শাহের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ-ই বাহাদুর শাহীর গ্রন্থকার তাহাকে ফরিদ শাহজাদার পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থেও তাহাকে মুবারক শাহের পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থেও যে সম্পর্ক সকলের জ্ঞাত তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে, যে শুক্রবারে মুবারক শাহ শহীদ হন, সেই দিনের শেষ দিকে সুলতান মুহম্মদ শাহ আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান অফিসারগণের সম্মতিক্রমে সার্বভৌমত্বের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরওয়ারুল-মুলক যদিও বাহ্যত আনুগত্য প্রকাশ করিলেন, তবু তিনি সার্বভৌমত্বের আনুসঙ্গিক উপকরণ দখল করিয়া রাখিলেন, যেমন কোষাগার, হস্তীসমূহ, এবং অস্ত্রাগার। সরওয়ারুল-মুলক খান-ই-জাহান উপাধি লাভ করিলেন আর মিরণ সদর লাভ করিলেন মুইনুল মুলক উপাধি। মালিক উশ-শর্ক কামালুদ্দীন, মুবারক শাহের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সরওয়ারুল-মুলক এবং মিরণ সদর এবং সব অকৃতজ্ঞ শয়তানদের বিরুদ্ধে সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। মুহম্মদ শাহের সিংহাসনারোহণের পরদিন সরওয়ারুল-মুলক মুবারক শাহের যে সব ক্রীতদাসের কিছু মাত্র শক্তি ছিল তাহাদিগকে তাহাদের আনুগত্য প্রকাশের নাম করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদের কিছু সংখ্যককে বন্দী করিলেন এবং তাহাদিগকে হত্যা করিলেন আর অন্যান্যদের কারারুদ্ধ করিলেন, যেমন করম চান্দ এবং মালিক মকবুল এবং মালিক ফতুহ;[১] আর মুবারক শাহী ক্রীতদাসগণকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার জন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালাইতে লাগিলেন। তিনি রাজধানীর সন্নিকটস্থ পরগণাগুলি তাহার নিজের দখলে রাখিলেন, যেগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান; আর অন্যান্য আমীরগণের মধ্যেও কিছু কিছু বণ্টন করিলেন এবং তিনি বিয়ানা, এবং আমরোহা এবং নারনোল এবং কুহরামের পরগণাসমূহ আর দোয়াবের কতিপয় পরগণা সিধ পাল[২] এবং সিধারণ এবং তাহাদের আত্মীয়দের প্রদান করিলেন। তিনি তাহার নিজস্ব ক্রীতদাস আবু শাহকে[৩] কয়েক বৎসরের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের

১. ফিরিশতা বলেন যে সরওয়ারুল-মুলক সৈয়দ সালিমের পুত্রকে খান-ই-আযমকে সৈয়দ খান উপাধি দান করেন এবং তাহাকে বড় জায়গীর দান করেন এবং এইরূপে তাহাকে নিজের দলভুক্ত করেন; আর তিনি স্বয়ং সুলতান হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

২. এই নামগুলি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। বদাওনী ইহাদের সিধ পাল এবং সিধারণ ক্ষেত্রী অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে মুবারক শাহের হত্যাকারী আখ্যা দিয়াছেন। বদাওনীর মতে প্রকৃতপক্ষে সিধ পালই সুলতানকে হত্যা করে।

৩. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন রানুন সিয়াহ, আর তিনি ছিলেন সিধ পালের ক্রীতদাস।

জন্য বিয়ানায়[১] প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত বৎসরের ১২ তারিখে বিয়ানা শহরে পৌঁছিলেন এবং দুর্গটি দখল করিতে চেষ্টা করিলেন। ইউসুফ খান অউহাদী ইহার সংবাদ পাইয়া হিন্দোয়ান[২] হইতে বিয়ানা আগমন করিলেন এবং আবু শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাকে নিহত করিলেন আর তাহার পরিবারের লোকজন এবং তাহার পুত্রগণকে বন্দী করা হইল। যেহেতু সরওয়ারুল-মুলকের অকৃতজ্ঞতা সকলের নিকটেই প্রকট হইয়া উঠিল, অধিকাংশ আমীর যাহারা খিযর খান এবং সুলতান মুবারক শাহের নিমক খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন, চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাহার বিরুদ্ধে তাহারা কি করিতে পারে। সরওয়ার-মুলকও কি করিয়া তাহাদের বন্দী করা যায় তাহার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল যে সম্বল এবং আহারের[৩] গভর্ণর ইলহাদাদ ককা লোদী[৪] এবং বদাওনের গভর্ণর মালিক চমন এবং আমীর আলী গুজরাটি এবং আমীর কবিক[৫] তুর্কবাচা বিরুদ্ধতার পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন; আর সরওয়ারুল মুলক তাহাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য কামালুদ্দীন[৬] এবং সৈয়দ খান এবং সরওয়ারুল-মুলকের কনিষ্ঠ পুত্র ইউসুফ খান এবং সিধারণ ও কানকুকে প্রেরণ করিলেন। কামালুদ্দীন রমযান মাসে যমুনা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। তথা হইতে তিনি বরণ শহরে গমন করিলেন এবং সরওয়ারুল-মুলকের পুত্র এবং সিধারনের প্রতি মুবারক শাহের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মালিক ইলহাদাদ জানিতেন যে কামালুদ্দীন একজন বন্ধু, ফলে তিনি আহার হইতে অগ্রসর হইলেন না।

১. বদাওনীও লিখিয়াছেন বিয়ানা, কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন সাগানা; ফিরিশতা সম্ভবতঃ ভুল করিয়াছেন।

২. বদাওনী লিখিয়াছেন হিন্দোন, কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন হিন্দেয়ান। হিন্দোন বিয়ানার ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা জয়পুর রাজ্যে।

৩. যুক্ত প্রদেশের বুলন্দ শহর জেলায়, বুলন্দ শহর হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

৪. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপই আছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে এবং ফিরিশতায় আছে ইলহাদাদ লোদী। বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন ইলহাদাদ কালু লোদী।

৫. এই নামটি পাণ্ডুলিপিতে কাবিক এবং কিক এই দুই প্রকারই দেওয়া আছে। বদাওনী তাহার নামই উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা নাম লিখিয়াছেন কঙ্ক।

৬. এই নামগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বদাওনী বলেন যে মালিক-উশ-শর্ক কামালুল মুলক এবং সৈয়দ সালিমের পুত্র সৈয়দ খানকে মনোনীত করা হইয়াছিল, কিন্তু সরওয়ারুল মুলকের পুত্র মালিক ইউসুফ এবং সিধারণ এবং কানকুকেও তাহাদের সঙ্গে গমনের জন্য নিযুক্ত করা হয়। ফিরিশতা বলেন যে সরওয়ারুল মুলক, কামালুল মুলকের সঙ্গে সৈয়দ খান এবং সিধারণ এবং তাহার পুত্র ইউসুফ খানকে প্রেরণ করিলেন।

সরওয়ারুল-মুলক এইক্ষণে কামালুদ্দীনের বিশ্বাঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার ছল করিয়া তাহার ক্রীতদাস মালিক হুসিয়ারকে[১] তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন, যাহাতে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া তিনি ইউসুফ এবং সিধারণের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারেন। এই সময়ে মালিক চমন আহার আগমন করিলেন এবং মালিক ইলহাদাদের সহিত যোগদান করিলেন। মালিক ইউসুফ এবং সিধারণ এবং হুসিয়ার ইতিপূর্বেই কামালুদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলেন; আর তাহাদের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল; এবং তাহারা সেনাবাহিনী হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং দিল্লী চলিয়া আসিল; আর রমযান মাসের শেষে মালিক ইলহাদাদ এবং মালিক চমন এবং তাহাদের সহিত এক মতাবলম্বী অন্যান্য আমীরগণ কামালুদ্দীনের সহিত যোগদান করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তৎপর এক বিরাট বাহিনীসহ দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন এবং সরওয়ারুল-মুলক নিজেকে দিল্লী দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদের সহিত তিন মাসকাল যুদ্ধ করিলেন।

এই সময়ে সামানার গভর্ণর যিরক খানের ইন্তেকালের সংবাদ দিল্লী পৌঁছিল। তাহার জায়গীর তাহার পুত্র মুহম্মদ খানকে দেওয়া হইল। মুহম্মদ শাহ যদিও বাহ্যত দুর্গের অভ্যন্তরের লোকদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব বজায় রাখিলেন, তবু তিনি তাহার পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত মুহূর্ত এবং উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আর সরওয়ারুল-মুলকও ইহা অবহিত হইয়া মুহম্মদ শাহকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন সহসা আঃ হিঃ ৮৩৮ সনের (১৪৩৪ খ্রীঃ) মহরম মাসের ৮ তারিখে সরওয়ারুল-মুলক এবং মিরান সদরের পুত্রগণ চতুরতাপূর্বক এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের তরবারি উত্তোলন করিলেন এবং মুহম্মদ শাহের মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ইহাদের ভয়ে সর্বদা তাহার বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী-গণের একটি বড় দল তাহার সঙ্গে রাখিতেন এবং সর্বদাই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানেই সরওয়ারুল-মুলককে হত্যা করিলেন; আর মিরান সদরের পুত্রগণকে বন্দী করিয়া দরবারের সম্মুখে তাহাদের শাস্তি বিধান করেন।

শ্লোক

যে মৃগ যুদ্ধের জন্য সিংহকে সন্ধান করে
তাহার রক্তে পৃথিবীর মাটি রাঙ্গা হইয়া উঠে।

১. বদাওনী তাহাকে সরওয়ারুল মুলকের নায়েব অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তাহাকে বাহ্যত মালিক কামালুদ্দীনকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করা হয়।

সিধ পাল এবং অন্যান্য নীচ দুরাত্মাগণ নিজেদের আবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। মুহম্মদ শাহ কামালুদ্দীনকে শহরের অভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন। সিধ পাল তাহার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন এবং তাহার স্ত্রী এবং পুত্র আগুনের খাদ্য হইল, আর তিনি নিহত হইলেন। মুহম্মদ শাহের নির্দেশে সিধারণ, কানকু এবং ক্ষেত্রিগণকে[১] যাহাদের বন্দী করা হইয়াছিল, মুবারক শাহের খৈতিরায়[২] শাস্তি দেওয়া হইল। মালিক হুসিয়ার এবং মুবারক কোতোয়ালকে লাল দরওয়াজার সম্মুখে শিরচ্ছেদ করা হইল।

পরদিন কামালুদ্দীন সকল আমীর যাহারা দুর্গের বাহিরে ছিলেন, সহ পুনরায় নুতন করিয়া মুহম্মদ শাহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। আর জনসাধারণের সহিত একমত হইয়া তাহাকে সার্বভৌমত্বের সিংহাসনে বসাইলেন। কামালুদ্দীন ওজারত পদটি লাভ করিলেন আর কামাল খান উপাধি পাইলেন। মালিক চমন ঘাযিউল মুলক উপাধি লাভ করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় আমরোহা এবং বদাওন জেলা-সমূহ তাহাকে প্রদান করা হইল। মালিক ইলহাদাদ লোদী তাহার নিজের জন্য কোন উপাধি গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু তাহার ভ্রাতার[৩] জন্য দরিয়া খান উপাধি গ্রহণ করিলেন। মালিক খতরাজ মুবারক খানি[৪], ইকবাল খান উপাধি লাভ করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় হিসার ফিরোযা জেলাটি তাহাকে প্রদান করা হইল; আর সকল আমীরকেই পুরস্কার এবং ভাতা বৃদ্ধি দ্বারা সম্মানীত করা হইল। সৈয়দ সালিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মযলিস-ই-আলী সৈয়দ খান উপাধি লাভ করিলেন আর তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লাভ করিলেন শুজা-উল-মুলক উপাধি; আর মালিক বদাহ[৫] লাভ করিলেন আলাউল-মুলক উপাধি। মালিক রুকনউদ্দীনকে করা হইল নাসিরুল মুলক; আর মালিক-উশ-শর্ক হাজী[৬]কে করা হইল দিল্লীর শাহনা (তত্ত্বাবধায়ক)।

১. এই শব্দটির পাঠ ঠিক বুঝা যায় না। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে। তবে এই পাঠটিই মনে হয় শুদ্ধ। ইহাদের শাস্তি সম্বন্ধে বদাওনী বলেন যে তাহাদের চামড়া তুলিয়া নেওয়া হয়। ফিরিশতা বলেন যে অত্যন্ত কষ্টকরভাবে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়।

২. ইহার সাধারণ অর্থ ঘেরাও স্থান। কিন্তু এই স্থানে দেওয়াল ঘেরা কবর বুঝাইতেছে।

৩. শুধু একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে তাহার ভ্রাতা। বদাওনী এবং ফিরিশতাও বলেন 'তাহার ভ্রাতা।'

৪. নামটি সন্দেহজনক। আর ইহার অর্থও বুঝা যায় না। বদাওনী তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

৫. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম আছে মালিক বদাহ। কিন্তু একটিতে তাহার নাম দেওয়া আছে মালিক সইদা, এবং আর একটিতে মালিক সদহ। বদাওনী বা ফিরিশতা তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

৬. পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম মালিক উশ-শর্ক হাজী বা কাজি বা হাজিব আছে। বদাওনী তাহার উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা তাহার নাম লিখিয়াছেন হাজী সন্দলী-অল মশহুর বা হিসাম খান।

পূর্বোল্লিখিত বৎসরের রবিউল আউয়াল মাসে মুহম্মদ শাহ মুলতান অভিমুখে ভ্রমণ করিলেন। মুবারকপুরের শিবিরে অধিকাংশ আমীর যেমন ইমাদুল মুলক[১] এবং ইসলাম খান, এবং নসরত খানের পুত্র মুহম্মদ খান এবং ইউসুফ খান অউহাদী এবং ইকবাল খান এবং সমস্ত রাজকীয় ভৃত্যগণ আগমন করিলেন এব' তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। মুহম্মদ শাহ মুলতানের শেখগণের দরগাহ জেয়ারত করিয়া, এবং খান ই-খানানকে তথায় রাখিয়া ঐ একই বৎসরে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আঃ হিজরা ৮৪০ সনে (১৪৩৬ খ্রীঃ) তিনি সামানা অভিমুখে গমন করিলেন এবং শেইখা খোখরের[২] বিরুদ্ধে এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং তাহার দেশটি ধ্বংস করিয়া দিল্লী আগমন করিলেন।

আঃ হিজরা ৮৪১ সনে (১৪৩৭ খ্রীঃ) সংবাদ আনয়ন করা হইল যে একদল লনকাহ[৩] এর দৌরাত্মের ফলে মুলতানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। আরও সংবাদ আসে যে সুলতান ইব্রাহীম শর্কী কতিপয় পরগণা অধিকার করিয়া নিয়াছেন; এবং গোয়ালিয়রের রায় এবং অন্যান্য রায়গণ রাজস্ব প্রদান স্থগিত রাখিয়াছে। যেহেতু মুহম্মদ শাহের মধ্যে আত্মসম্মানের ধমনী চলাচল করিত না এবং অলসতা এবং অসতর্কতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সকল মস্তকেই পাগলামী বাসা বাধিল আর প্রত্যেক হৃদয়েই অভিলাষ জাগিল ঃ

শ্লোক

শাহ যখন তাহার রাজ্য শাসন বিস্মৃত হয়
সকল মাথাই তাহার সন্ধানে ফিরে।

কতিপয় মেওয়াটি আমীর মালবের বাদশাহ মাহমুদ খিলজীকে তলব করিলেন; আর আঃ হিজরা ৮৪৪ সনে (১৪৪০ খ্রীঃ) সুলতান মাহমুদ দিল্লী উপস্থিত হইলেন।

১. বদাওনী কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলেন, "তিনি মুবারকপুরে কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন যাহাতে প্রদেশগুলির আমীরগণ আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিতে পারে। ফিরিশতা বলেন, 'অধিকাংশ আমীর আসিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু যখন ইমাদুল-মুলক মুলতান হইতে আগমন করিলেন, তখন সকল আমীর এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণ যেমন ইসলাম খান লোদী এবং ইউসুফ খান অউহাদী, এবং ইকবাল খান দরবারে আগমন করিলেন এবং মূল্যবান পোশাক দ্বারা সম্মানীত হইলেন।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে জসরত শেইখা। বদাওনীও এই স্থানে লিখিয়াছেন শেইখা, কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন জসরত।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই ইহাদের এইরূপ নাম দেওয়া আছে। বদাওনীও এইরূপ লিখিয়াছেন। কর্ণেল রেভিং ইহাদের বলিয়াছেন 'লংগাহ উপজাতি' এবং কর্ণেল ব্রিগস বলিয়াছেন, "লুংগা নামীয় আফগানগণ।"

মুহম্মদ শাহ তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন এবং তাহার নিজের পুত্রকে (দুর্গ বা শহরের) বাহিরে প্রেরণ করিলেন এবং মালিক বহলোল লোদীকে অগ্রবর্তী বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সুলতান মাহমুদ খিলজীও তাহার দুই পুত্র সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন এবং কদম খানকে[১] প্রেরণ করিলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের ধূলা উত্থিত হইল; আর রাত্রিতে উভয় পক্ষ প্রত্যাবর্তন করিল এবং তাহাদের স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিল। পরদিন মুহম্মদ শাহ শান্তির প্রস্তাব করিলেন।

এই সময়ের মধ্যে সুলতান মাহমুদের নিকট সংবাদ আনয়ন করা হয় যে সুলতান আহমদ গুজরাটি মন্দু অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।[২] ফলে তিনি আপোষ করিতে সম্মত হইলেন এব. প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর এই সন্ধি লোকের চোখে এবং মনে মুহম্মদ শাহের পক্ষে অধিকতর অপমানজনক হইয়া উঠিল। সুলতান মাহমুদ যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করিলেন, তখন বহলোল লোদী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহার শিবিরের সাজ'সরঞ্জামের ভারী আসবাবপত্রের এক অংশ[৩] লুঠ করিয়া হস্তগত করিলেন। মালিক বহলোলের এই কার্যে মুহম্মদ শাহ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে পুত্ররূপে সম্বোধন করিলেন।

আঃ হিজরা ৮৪৫ সনে (১৪৪১ খ্রীঃ) সুলতান মুহম্মদ শাহ সামানা অভিমুখে গমন করিলেন; আর দিবালপুর এবং লাহোর মালিক বহলোলকে দিয়া, এবং নসরত

---

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই ঘিয়াসুদ্দীনের নামের পূর্বে সুলতান আছে। কিন্তু দ্বিতীয় নামটির বেলায় বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন, কদন, ফদন, এবং ফদাইন খান। বদাওনী লিখিয়াছেন, ঘিয়াসুদ্দীন এবং মদন খান। ঘিয়াসুদ্দীনের নামের পূর্বে সুলতান লিখেন নাই। কর্ণেল রেঙ্কিং লিখিয়াছেন কদর খান। ফিরিশতা লিখিয়াছেন কদর খান।

২. বদাওনী এইরূপ বিবরণ দেন নাই। তিনি বলেন যে "সুলতান মাহমুদ ইহার সুযোগ (অর্থাৎ শান্তির প্রস্তাবের) গ্রহণ করিয়া এবং স্বহস্তে মালব রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এই দেখিবার ভান করিয়া, রাত্রিকালে মালবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।" উভয় সুলতানই ভীরুতায় পরস্পর পরস্পরকে ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। ফিরিশতার মতে উভয়ের মধ্যে সুলতান মুহম্মদই অধিকতর ভীরু ছিলেন। তিনি বলেন যে তাহার জাঁকজমক এবং অসংখ্য সৈন্য থাকা সত্ত্বেও সুলতান মুহম্মদ পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন যে তাহার শত্রুর মোকাবিলা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর তাহার সৈন্যগণ যে জয়লাভ করিয়াছিল তাহা প্রধানতঃ বহলোল লোদীর বীরত্বের জন্য সম্ভব হইয়াছিল; আর রাত্রিবেলা সুলতান মাহমুদ স্বপ্ন দেখিলেন; আর সকাল বেলা সুলতান আহমদ কর্তৃক মালব আক্রমণের সংবাদ পাইলেন। কিন্তু শুধু লজ্জার জন্য সন্ধির প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। আর তখনই সুলতান মুহম্মদ বিনা কারণে এবং বিনা প্রয়োজনে এবং কাহারও সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই শান্তির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন।

৩. ফিরিশতা বলেন যে বহুলোক হত্যা করিয়া এবং বহু সম্পত্তি ও সম্পদ হস্তগত করিয়া দিল্লী বাহিনীর মানসম্মান রক্ষা করিলেন।

খোখরকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করিয়া, তিনি স্বয়ং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। জসরত মালিক বহলোলের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন এবং তাহাকে দিল্লীর সুলতান হইবার আশা ভরসা দিলেন।[১] সুলতান হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মাথায় ঢুকিলে মালিক বহলোল লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং চতুর্দিক হইতে আফঘানদের আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে চাকুরীতে নিয়োগ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অসংখ্য লোক তাহার সহিত যোগ দিল; আর তিনি তাহার সন্নিকটস্থ বহু পরগণা দখল করিয়া লইলেন; এবং সুলতান মুহম্মদের সহিত প্রায় বিনা কারণেই শত্রুতার বীজ বপন করিয়া, মহা জাঁকজমক ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া দিল্লী গমন করিলেন এবং বেশ কিছুকাল ধরিয়া ইহা অবরোধ করিয়া রাখিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিলেন। দিনে দিনে সুলতান মুহম্মদ শাহের কার্যাবলীর অবনতি হইতে লাগিল এবং অবস্থা এইরূপ পর্যায়ে পৌঁছিল যে দিল্লীর বিশ কারোর মধ্যে অবস্থিত আমীরগণ ও তাহাদের মস্তক আনুগত্যের দিক হইতে ফিরাইয়া প্রকাশ্যে তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অবশেষে আঃ হিজরা ৮৪৭ সনে[২] (১৪৪৩ খ্রীঃ) সুলতান মুহম্মদ শাহ তাহার প্রাণ সৃষ্টিকর্তার নিকট ফেরৎ দিলেন। তাহার রাজত্ব ছিল দশ বৎসর আর কয়েক মাস।

কবিতা

বিবর্তনের যুগের ইহাই রীতি
ইহা এখন দয়া প্রদর্শন করে, আবার এখনই কষ্ট দেয়
ইহার নিকট হইতে বিশ্বাস আর আনুগত্য আশা করা
সুহা[৩] তারকার নিকট হইতে আলো আশা করার ন্যায়
ইহার চঞ্চল প্রেম মাত্র দুই দিনের জন্য
ইহার মুখে বিশ্বাস ও সত্যের কোন ছাপ দেখা যায় না।

১. ফিরিশতা বলেন যে জসরত বহলোলকে দিল্লীর সুলতানরূপে সম্ভাষণ করিলেন।
২. সব পাণ্ডুলিপিতেই ৮৪৭ আঃ হিঃ দেওয়া আছে, শুধু একটিতে আছে ৮৪৪ আঃ হিঃ। ৮৪৪ অবশ্যই ভুল। বদাওনীও সুলতানের মৃত্যুর তারিখ ৮৪৭ আঃ হিঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার রাজত্বকাল চৌদ্দ বৎসর কয়েক মাস বলিয়াছেন, যাহা ঠিক নহে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন সুলতান মুহম্মদ শাহ ৮৪৯ আঃ হিঃ ইন্তেকাল করেন এবং বলেন যে তিনি বার বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল রেঙ্কিং-এর মতে সুলতান মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ফিরিশতার দেওয়া সময়ই সঠিক। তবে তাহার এই সিদ্ধান্তের পিছনে তেমন জোরালো কোন যুক্তি নাই।
৩. লিটল বিয়ারের একটি অতি অনুজ্জ্বল তারকা।

সুলতান আলাউদ্দীন, পিতা মুহম্মদ শাহ, পিতা মুবারক শাহ, পিতা খিযর খান

সুলতান মুহম্মদ শাহ ইন্তেকাল করিলে আমীরগণ এবং রাষ্ট্রের অফিসারগণ তাহার পুত্রকে সার্বভৌমত্বের সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাহাকে সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি দান করিলেন। মালিক বহলোল[1] এবং সকল আমীর তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন অল্প দিনের মধ্যেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে সুলতান আলাউদ্দীন তাহার পিতার চেয়েও কম বুদ্ধি সম্পন্ন এবং রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্বল। মালিক বহলোলের মগজের পাগলামী আরও বেশী হইয়া উঠে।

শ্লোক

সে যখন দেখে যে সর্প[2] হইতে কোন ভয়ের কারণ নাই
বিজ্ঞগণ তখন কোষাগার হইতে তাহার হস্ত অপসারণ করে না।

আঃ হিজরা ৮৫০ সনে (১৪৪৫ খ্রীঃ সুলতান আলাউদ্দীন সামানা অভিমুখে গমন করেন! আর তিনি যখন পথিমধ্যে ছিলেন তখন তাহার নিকট স বাদ পেঁীছে যে জৌনপুরের বাদশাহ দিল্লী আক্রমণ করিতে আগমন করিতেছেন। সুলতান দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দিল্লী আগমন করিলেন। হিসাম খান ছিলেন সাম্রাজ্যের উযির এবং সুলতানের অনুপস্থিতিতে তাহার অছি। তিনি নিবেদন করিলেন যে, শত্রুর আগমনের শুধু মিথ্যা গুজব শুনিয়া সুলতানের প্রত্যাবর্তন তাহার সাম্রাজ্যের পক্ষে মোটেও শোভনীয় হয় নাই।[3] এই কথা শুনিয়া সুলতান আলাউদ্দীন বিরক্ত হইলেন এবং বেদনা বোধ করিলেন, কারণ এইরূপ কথা সহ্য করা তাহার ধাতে সহিত না। আঃ হিঃ ৮৫১ সনে (১৪৪৭ খ্রীঃ) তিনি বদাওন অভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করিলেন যে বদাওন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং তিনি তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে ইচ্ছা করেন। হিসাম খান তাহার অন্তরের আন্তরিকতার দরুন পুনরায় তাহাকে

---

১. বদাওনীও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, "মালিক বহলোল লোদী অন্যান্য আমীরগণসহ আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করিলেন।" ফিরিশতা কিন্তু ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, মালিক বহলোল লোদী ছাড়া, আমীরগণের সকলেই সিংহাসনের পাদপীঠে আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন।

২. 'গুপ্তধন সাপে পাহারা দেয়' এই প্রবাদ বাক্য হইতে এই কথার উদ্ভব হইয়াছে।

৩. বদাওনী হিসাম খানের এই নিবেদনের বা তিরস্কারের কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে ফিরিশতা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বুঝাইলেন যে তাহার মঙ্গলের জন্য দিল্লী পরিত্যাগ করা এবং বদাওনকে সাম্রাজ্যের রাজধানী করা উচিত হইবে না। এই কথায় সুলতান অধিকতর বিরক্ত হইলেন এবং তাহার নিকট হইতে নিজেকে আলাদা করিয়া নিয়া তাহাকে দিল্লীতে রাখিয়া গেলেন।

তিনি তাহার স্ত্রীর দুই ভ্রাতার একজনকে নিযুক্ত করিলেন শহরের শাহ্না (তত্ত্বাবধায়ক) আর অপর জনকে নিযুক্ত করিলেন রাস্তাঘাটের তত্ত্বাবধায়ক।

শ্লোক

রাজ্য শাসনে তাহার কোন দক্ষতা ছিল না
ভাগ্যের হাতে তিনি কেবল লজ্জা ও অপমান লাভ করিয়াছেন।

পুনরায় আঃ হিজরা ৮৫২ সনে (১৪৪৮ খ্রীঃ) তিনি বদাওন গমন করিলেন এবং তথায় নিজেকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় নিমগ্ন করিলেন এবং তাহার অধীনে যে সামান্য ভূখণ্ড রহিল তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিলেন। কিছুকাল পরে তাহার স্ত্রীর দুই ভ্রাতার মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হইল; তাহারা ছিল দিল্লীতে; এবং তাহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং একজন নিহত হইলেন। পরদিন হিসাম খানের প্ররোচনায় দিল্লীর জনগণ প্রথম ভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দ্বিতীয় ভ্রাতাকে হত্যা করিল। এই সময় বিশ্বাসঘাতক লোকের প্ররোচনায় উযির হামিদ খানকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন;[১] আর তিনি পলায়ন করিলেন এবং দিল্লী আগমন করিয়া হিসাম খানের সহিত যোগদান করিলেন; আর শহরটি করায়ত্ত করিয়া সাম্রাজ্য হস্তগত করিবার জন্য মালিক বহলোলকে তলব করিলেন; আর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের কিছু বর্ণনা মালিক বহলোলের ইতিহাসে উল্লেখ করা হইবে। সংক্ষেপে মালিক বহলোল লোদী এক বিশাল বাহিনী লইয়া দিল্লী আগমন করিলেন এবং তাহা দখল করিলেন।[২] ইহার

১. কর্ণেল বেক্সিং বলেন যে ফিরিশতা হামিদ খানের জীবন নাশের প্রচেষ্টার একটা পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কুতব খান ও রায় পবতাব সুলতানকে প্ররোচনা দিয়াছিলেন। রায় পরতাবের সহিত হামিদ খানের পূর্ব শত্রুতা ছিল। তাবাকাত-ই-আকবরী লেখকও এই বিবরণই দিয়াছেন। তাহা সুলতান বহলোল লোদীর রাজত্বকালের বর্ণনায় দেওয়া হইয়াছে।

২. বদাওনীর মতে বহলোল লোদী দিল্লীতে তাহাকে (আলাউদ্দীনকে) সুলতান করিবার পর, সুলতান আলাউদ্দীনের অবর্তমানে সিরহিন্দ গমন করেন এবং তথায় সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন আর নিজ নামে খোৎবা পাঠ করান। অতঃপর তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া দিল্লী আগমন করেন এবং তাহা অধিকার করেন এবং তৎপর রাজধানী তাহার নায়েবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিবালপুর গমন করিলেন এবং তথায় এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

কয়েকদিন পর তিনি শুভাকাঙ্ক্ষীগণের একটি দল দিল্লীতে রাখিয়া স্বয়ং দিবালপুর গমন করিলেন এবং এক বাহিনী সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট এক সংবাদ পাঠাইয়া নিবেদন করিলেন যে, তিনি শুধু সুলতানের মঙ্গল সাধনেরই চেষ্টা করিতেছেন; আর তিনি সম্যক অবগত আছেন যে তিনি শেষোক্ত জনের ভৃত্য মাত্র। সুলতান আলাউদ্দীন প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, যেহেতু আমার পিতা আপনাকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছিলেন, আমার সামান্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য আমার কোন উদ্বেগ নাই, আমি বদাওনের একটি পরগণা লইয়াই সন্তুষ্ট আছি এবং সাম্রাজ্য আপনাকে দিয়া দিতেছি।

শ্লোক

বল্লম চালনার যন্ত্রণা আর তরবারি উত্তোলন ছাড়াই
সাম্রাজ্য আয়ত্তে আনয়নের উদ্দেশ্যে সক্ষম হইল।

মালিক বহলোল তাহার বিজয় এবং দৈনিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমৃদ্ধি দ্বারা এবং সার্বভৌমত্বের আবরণ তাহার অবয়বে সম্পূর্ণরূপে খাপ খায় এই জ্ঞান দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য সফল করিলেন। তিনি দিবালপুর হইতে দিল্লী আগমন করিলেন এবং সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুলতান বহলোল উপাধি গ্রহণ করিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের আমীরগণের মধ্যে যাহারা তাহার সহিত যোগদান করিলেন তাহাদের বৃত্তি অনুমোদন করেন এবং স্থায়ী করেন। ইহার কিছুকাল পর সুলতান আলাউদ্দীন তাহার শেষ যাত্রা সম্পন্ন করেন;[১] আর পৃথিবীটা সুলতান বহলোলের আয়ত্তে আসে। তাহার (সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ছিল সাত বৎসর কয়েক মাস।

সুলতান বহলোল লোদী[২]

প্রচলিত কাহিনী হইতে জানা যায় যে সুলতান বহলোল ছিলেন সুলতান শাহ লোদীর ভ্রাতুষ্পুত্র। সুলতান শাহ লোদীর উপাধি ছিল ইসলাম খান, আর তিনি

১. তাহার ইন্তেকালের তারিখ তাবাকাতে উল্লেখ করা হয় নাই। বদাওনী বলেন যে ৮৫৫ আঃ হিঃ সনে তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু ফিরিশতার মতে যদিও তাহার রাজত্বকাল আঃ হিঃ ৮৫৫সনে শেষ হইয়া যায়। তিনি ইহার পরেও বহু দিন জীবিত ছিলেন এবং বদাওনি লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং শান্তিতে কালাতিপাত করেন, এবং ২৮ বৎসর বদাওনের রাজত্ব করিবার পর আ; হিঃ ৮৪৩ সনে ইন্তেকাল করেন।

২. একটি ছাড়া সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ শিরোনামা দেওয়া আছে, আর একটিতে লোদী দেওয়া নাই। ফিরিশতাতেও এইরূপ আছে। বদাওনী লিখিয়াছেন 'সুলতান বহলোল পিতা কালা লোদী'।

ছিলেন খিযর খান এবং সুলতান মুবারক শাহের আমলের একজন ক্ষমতাশালী এবং সিরহিন্দ শাসন করিতেন। যেহেতু তিনি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে দক্ষতা এবং পৌরুষ দেখিতে পান, তাই ইসলাম খান তাহাকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন এবং তাহার জীবনের শেষ দিকে তাহাকে নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া ইন্তেকাল করেন। কুতব খান নামে ইসলাম খানের এক পুত্র ছিল। তিনি মালিক বহলোলের নিকট হইতে আনুগত্যের মস্তক ফিরাইয়া লইলেন এবং সুলতান মুহম্মদের নিকট গমন করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি মালিক বহলোলের বিরুদ্ধে হাজী শুধনীকে[১] প্রেরণ করিলেন। হাজী শুধনীর উপাধি ছিল হিসাম খান। উভয় পক্ষের মধ্যে পরগণা খিযরাবাদ এবং সধোরা[২]র কধা[৩] নামীয় গ্রামে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হিসাম খান পরাজিত হন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। মালিক বহলোল অতঃপর প্রচুর ক্ষমতা এব, প্রতিপত্তি সংগ্রহ করিলেন।

তাহারা বলে যে মালিক বহলোল তাহার কর্মজীবনের গোড়ার দিকে একদিন দুইজন বন্ধুসহ সামানা গমন করিয়াছিলেন। তথায় সৈয়দ ইবন[৪] নামে এক দরবেশ ছিলেন। মালিক বহলোল তাহার বন্ধু দুইজনসহ এই পবিত্র লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গমন করেন; এবং তথায় বিনীতভাবে বসিয়া পড়েন। নিবিষ্ট ব্যক্তিটি[৫] বলিলেন, তোমাদের মধ্যে দুই হাজার তংকা দিয়া দিল্লীর বাদশাহী ক্রয় করিবার মত এমন কেহ আছ কি? মালিক বহলোলের থলিতে এক হাজার ছয় শত টাকা ছিল। তিনি তাহা বাহির করিলেন এবং তাহা দরবেশের সম্মুখে রাখিয়া

১. এই নামটি খুব সন্দেহজনক। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে যেমন: হাজী শুধনী, হাজী শর্ণী, এবং হাজী শর্ফী এবং হাজী শর্কী। বদাওনী এই ঘটনাগুলির কোন উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা বলেন, মুহম্মদ শাহ প্রথমে এক শক্তিশালী বাহিনীসহ মালিক সিকান্দর তুহফাকে কুতব খানের সাহায্যে প্রেরণ করেন। বহলোল লোদী তাহার অনুচরগণকে তিন ভাগে ভাগ করিলেন; এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং আফঘানগণ পরাজিত হইল। বহলোল কিন্তু ঐ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এইবার লুণ্ঠনকারীতে পরিণত হন এবং বহু আফঘান এবং কিছু মুঘল সংগ্রহ করিলেন এবং পুনরায় সিরহিন্দ হস্তগত করিলেন। এই সময় তাহার বিরুদ্ধে হিসাম খানকে প্রেরণ করা হইল। ফিরিশতা হিসাম খানের আর কোন নাম উল্লেখ করেন নাই।

২. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নামটি সাধোরা দেওয়া আছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন শাহপুরা।

৩. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে নামটি কধা দেওয়া আছে। ফিরিশতাও ইহাই লিখিয়াছেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে কড়া।

৪. পাণ্ডুলিপিতে নামটি সৈয়দ ইবন দেওয়া আছে। ফিরিশতা দরবেশের নাম লিখিয়াছেন সৈদা। তিনি বলেন যে বহলোল তাহার চাচা ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সামানা গমন করিয়াছিলেন এবং তৎপর দরবেশের নিকট গিয়াছিলেন।

৫. তাবাকাত এবং ফিরিশতাতে 'মজনুন' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার অর্থ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন।

বলিলেন, "ইহা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নাই।" ফকির ইহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "বাদশাহী যেন তোমার পক্ষে সৌভাগ্যসূচক হয় এই দোয়া করি।" তাহার সঙ্গীগণ তাহার প্রতি হাসি তামাসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "ইহা দুই প্রকারের মধ্যে অন্ততঃ একটি হইবে। এই ভবিষ্যৎবাণী যদি সত্যে পরিণত হয়, তবে আমি অতি অল্প মূল্যে তাহা খরিদ করিলাম, আর যদি তাহা সত্য না হয়, তবে একজন দরবেশের উপকার করাতে কোনই লাভ নাই তাহা বলা চলে না।"

শ্লোক

আধ্যাত্মিক জগতের বিচরণকারীগণ যখন প্রকৃত মহত্ব দেখেন
একদল ফকিরকে কাউসের সাম্রাজ্য, আর ফরিদুনের আধিপত্য দান করেন।

আর কোন কোন ইতিহাসে যে লিখিত আছে যে মালিক বহলোল ব্যবসা করিতেন তাহার কোনই ভিত্তি নাই। সম্ভবতঃ তাহার পৈতৃক পূর্বপুরুষগণ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং হিন্দুস্তানে আগমন করিতেন।

সংক্ষেপে, মালিক বহলোল তাহার চাচা মালিক ফিরোয এবং তাহার সকল আত্মীয় পরিজনসহ সিরহিন্দ জেলা দখল করিতেছিলেন এবং প্রভুত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সংগ্রহ করেন। তরুণ বয়স হইতেই দরবেশের কথাগুলি তাহার মনে খেলিতেছিল এবং পূর্বোল্লোখিত জসরত খোখরের প্ররোচনা হইতে সাম্রাজ্যের পাখী তাহার মগজে একটি ডিম পাড়িল আর তিনি তাহার এলাকা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হিসাম খানের বিরুদ্ধে তাহার বিজয়ের পর মালিক বহলোল সুলতানের নিকট এক নিবেদন প্রেরণ করিলেন, তাহাতে হাজী শুধনীর কটপতা আর তাহার আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের এক বিবরণ দান করিলেন; আর তাহাতে উহাও উল্লেখ করিলেন যে সুলতান যদি হাজী শুধনীকে প্রাণদণ্ড দান করেন, এবং উযির পদটি হামিদ খানকে দেন তবে তাহার এই দাসানুদাস (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং) একজন অনুগত ভৃত্য থাকিবেন। সুলতান মুহম্মদ কোন বিচার বিবেচনা না করিয়াই হিসাম খানের প্রাণদণ্ড দান করিলেন আর হামিদ খানকে তাহার উযির নিযুক্ত করিলেন।

শ্লোক

নিঃসন্দেহে তিনি ভাগ্যের দোষে তিনি শত্রুতা দেখিবেন,
আর যে বন্ধু, বিনা কারণে তাহাকে বধ করিবেন।

লোদীগণ এইবার আন্তরিকতার সহিত আগাইয়া আসিলেন এবং সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন; আর তাহাদের জায়গীরসমূহ পুনরায় নূতন করিয়া

অনুমোদন করা হইল। মালিক বহলোল সুলতান মুহম্মদের পক্ষাবলম্বন করিয়া সুলতান মাহমুদ মালভীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পর তাহাকে খান-ই-খানান উপাধি দান করিয়া সম্মানীত করা হয়। ক্রমান্বয়ে লোদীগণ নিজেদের শক্তিশালী মনে করিয়া বলপূর্বক লাহোর এবং দিবালপুর এবং সুনাম এবং হিসার ফিরোযা এবং অন্যান্য পরগণা দখল করিয়া লইলেন; এবং প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি সংগ্রহ করিলেন। সুলতান মুহম্মদের অনুমতি না লইয়া বলপূর্বক তাহারা লাহোর এবং দিবালপুর অধিকার করিয়া লইবার ফলে তাহারা বৈরী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ইহার ফলে তাহারা শত্রুতার পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং সুলতান মুহম্মদের বিরুদ্ধে দিল্লী অভিযান করিলেন। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া দিল্লী অবরোধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু ইহা অধিকার করিতে ব্যর্থ হইয়া সিরহিন্দে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মালিক বহলোল তৎপর সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন, তবে দিল্লী অধিকার না করা পর্যন্ত প্রকাশ্য নামাজে তাহার নাম ঘোষণা করা এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করা হইতে বিরত রহিলেন।[১] এই সময়ে সুলতান মুহম্মদ ইন্তেকাল করিলেন এবং আমীরগণ এবং সাম্রাজ্যের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় সুলতান আলাউদ্দীনকে সিংহাসনে বসান হইল।

শ্লোক

তাহাদের মস্তক অবনত অবস্থায় সাম্রাজ্য আর সম্পদ কি চমৎকার
পিতা গত হইয়াছেন, আর পুত্র রেকাবে পা রাখিয়াছেন।

এই সময়ে হিন্দুস্তানের সম্পূর্ণটাই বিভিন্ন উপজাতীদের দখলে ছিল আর লোদীগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আহমদ খান মেওয়াটির দখলে ছিল মেহরৌতী হইতে দিল্লী শহরের সন্নিকটস্থ লাদু সরাই পর্যন্ত।[২] লোদীগণের দখলে ছিল পানিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সিরহিন্দ এবং লাহোর। দিল্লী শহর সংলগ্ন খাজা ই-খিযরের চড়াস্থান পর্যন্ত সম্বল অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন দরিয়া খান লোদী। ইসা খান

---

১. ফিরিশতাও এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। বদাওনী কিছুটা ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি যখন দিল্লী অধিকার করেন এবং হিসাম খান ও হামিদ খান তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার পর।

২. ফিরিশতা সুলতান আলাউদ্দীনের শাসনকাল বর্ণনা করিতে গিয়া এই বিভাগগুলি এবং ইহাদের শাসনকর্তাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ব্রিগস বলেন যে, "এই রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইগুলি ছাড়াও খান্দেশ, সিন্ধু এবং মুলতান প্রত্যেকটির একজন স্বতন্ত্র মুসলমান রাজা ছিল।" বদাওনী এই বিভাগগুলি উল্লেখ করেন নাই।

তুর্কবাচার দখলে ছিল কোল। হাসান খানের[১] পুত্র কুতুব খানের দখলে ছিল রাপ্রী[২]। ভোনগাঁও, বাতিয়ালী, এবং কম্পিলা ছিল রায় পরতাবের দখলে। বিয়ানা ছিল দাউদ খান অউহাদীর দখলে। আর গুজরাট এবং মালব এবং দাক্ষিণাত্য এবং জৌনপুর এবং বাঙ্গালা প্রত্যেকটিরই একজন স্বাধীন বাদশাহ ছিল। সুলতান আলাউদ্দীনের দখলে ছিল দিল্লী শহর আর কতিপয় গ্রাম। আর এই ভূখণ্ড লইয়াই তিনি ছিলেন বাদশাহ।

সুলতান বহলোল একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়বার সিরহিন্দ হইতে দিল্লী আগমন করিলেন। তিনি দিল্লীর দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না, ফলে তিনি সিরহিন্দ প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময়ে সুলতান আলাউদ্দীন কি করিয়া তাহার নিজের অবস্থা শক্তিশালী করা যায়, সেই সম্বন্ধে কুতব খান এবং ইসা খান, এবং রায় পরতাবের সঙ্গে এক পরামর্শ করেন। প্রত্যুত্তরে তাহারা তাহাকে বলিলেন যে, "সুলতান যদি হামিদ খানকে বন্দী করেন এবং তাহাকে উযির পদ হইতে বরখাস্ত করেন তবে আমরা আমীরগণের নিকট হইতে কতিপয় পরগণা দখল করিয়া লইব আর তাহা সুলতানের এলাকার সঙ্গে যুক্ত করিব।" সুলতান তখন হামিদ খানকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক

যেন গোলাপ ফুলকে কেহ বলিল যে তোমার বাগানের পাখীগুলির মধ্যে
বুলবুল ছাড়া তোমার আর কেহ নাই
তবে কেন তুমি তাহার পাখা বাধিয়া রাখিয়াছ ?

অতঃপর সুলতান দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন এবং মারহাবার নিটকস্থ বুর-হানাবাদে[৩] আগমন করিলেন। তথায় কুতব খান, এবং ইসা খান এবং রায় পরতাব তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, সুলতান যদি হামিদ খানের প্রাণদণ্ড বিধান করেন তবে তাহারা চল্লিশটি পরগণা সুলতানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবেন। যেহেতু ইহার পূর্বে হামিদ খানের পিতা ফতেহ খান রায় পরতাবের ভূখণ্ড ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার স্ত্রীকে নিয়া গিয়াছিলেন, শেষোক্ত ব্যক্তি এই পুরাতন শত্রুতার জন্য হামিদ খানকে হত্যা করিবার জন্য সুলতানকে প্ররোচিত

১. কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে ইহার নাম দেওয়া আছে হাসান খান আর অন্যগুলিতে আছে হুসেন খান।
২. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন রাত্রী, রাপ্রী, রব্রী এবং রপ্রী।
৩. ইতাওয়ার অধীনস্থ একটি স্থান। মারহারা নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন, বাড়রা, পররহর মাররহর। সম্ভবতঃ ইহা দোয়াবের একটি ক্ষুদ্র শহর ছিল।

করিতে লাগিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য শাসনের কোন জ্ঞান না থাকিবার ফলে তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া এবং কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া হামিদ খানকে হত্যার নির্দেশ দান করিলেন। হামিদ খানের ভ্রাতা এবং তাহার বন্ধুগণ তাহার যে প্রকার কৌশল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল তাহার দ্বারাই তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া নিলেন। তিনি পলায়ন করিলেন এবং দিল্লী আগমন করিলেন। তাহার কারারক্ষী মালিক মুহম্মদ জামাল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এবং তাহার গৃহে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি একটি তীর দ্বারা আহত হইলেন এবং নিহত হইলেন এবং বহু সংখ্যক লোক হামিদ খানের চতুর্দিকে জড়ো হইল। মহা গণ্ডগোল বিশৃঙ্খলা এবং উত্তেজনা দেখা দিল। হামিদ খান সুলতানের হারেমে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং পুত্রগণকে শূন্য মস্তকে[১] শহরের দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিলেন আর কোষাগার এবং সার্বভৌমত্বের অন্যান্য আনুসঙ্গিক প্রতীকসমূহ দখল করিয়া লইলেন। সুলতান আলাউদ্দীন তাহার ভাগ্যের শোচনীয়তার ফলে কোনরূপ প্রতিশোধ নেওয়া দিনের পর দিন পিছাইতে লাগিলেন এবং বৃষ্টির জন্য বদাওনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হামিদ খান ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুলতান আলাউদ্দীনের পরিবর্তে অন্য কাহাকেও সিংহাসনে বসাইবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যেহেতু জৌনপুরের বাদশাহ মাহমুদ শর্কী সুলতান আলাউদ্দীনের একজন আত্মীয় ছিলেন,[২] তিনি তাহাকে তলব করা সমীচীন মনে করিলেন না। মান্দুর বাদশাহ সুলতান মাহমুদ অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। লোদীগণ ছিলেন নিকটে, তিনি সিরহিন্দে অবস্থিত মালিক বহলোলকে তলব করিলেন আর শেষোক্ত জন শর্তাবলী নির্ধারণ করিয়া এক বিশাল বাহিনীসহ দিল্লী আগমন করিলেন। হামিদ খান দুর্গের চাবিসমূহ মালিক বহলোলকে প্রদান করিলেন। শেষোক্ত জন আঃ হিজরা ৮৫৫ সনের (১৪৫১ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে[৩] সার্বভৌমত্বের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

১. ফিরিশতা বলেন, "হামিদ খান বাদশাহের হারেমে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং পুত্রকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে খালি মাথায় এবং খালি পায়ে চরম অপমান ও অপদস্থ করিয়া শহরের দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দিলেন ; আর কোষাগার এবং বাদশাহীর প্রতীকসমূহ দখল করিলেন।

২. সুলতান মাহমুদ শর্কীর পুত্রগণের একজন সুলতান হাসান শর্কী, সুলতান আলাউদ্দীনের কন্যা মালকা-ই-জাহানকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৩. বদাওনী তাহার সিংহাসনারোহণের সময় দিয়াছেন আঃ হিঃ ৮৫৫. কিন্তু বলবন তারিখ দেন নাই। ফিরিশতা বলেন ইহা তিনি ইতিপূর্বেই দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন, তবে আঃ হিঃ ৮৫৫ সনের রবিউল মাসের ১৭ তারিখে তিনি খোৎবা হইতে সুলতান আলাউদ্দীনের নাম অপসারণ করিয়া প্রকাশ্যে নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন।

কবিতা

নীলকান্ত মনির এই সিংহাসনে সকাল সন্ধ্যায়
ভাগ্যের এক পাশা খেলায় আসে সাফল্য
কাহারও এই সৌভাগ্য হয় না, আর এই পাশা হাতছাড়া হয়
সার্বভৌমত্বের স্বাদ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হয় না।

ঐ সময়ে সুলতান বহলোলের নয়টি[১] পুত্র সন্তান ছিল যথাঃ খাজা বায়েজিদ, তাহার সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, নিযাম খান, যিনি সুলতান সিকান্দর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বারবক শাহ, মুবারক খান, আলম খান, যিনি সুলতান আলাউদ্দীন নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, জামাল খান, মিয়া ইয়াকুব, ফতেহ খান, মিয়া মুসা, এবং জালাল খান, আর তাহার চৌত্রিশ জন[২] আমীর এবং আত্মীয় ছিল; যথাঃ ইসলাম খান লোদীর পুত্র কুতব খান, দরিয়া খান লোদী, দরিয়া খান লোদীর পুত্র তাতার খান, মুবারক খান লোহানী, তাতার খান ইউসুফ খাইল, উমর খান শরওয়ানী, হাসান খান আফঘানের পুত্র কুতব খান, আহমদ খান মেওয়াটি, ইউসুফ খান জিলওয়ানী, ইউসুফ খান জিলওয়ানীর পুত্র আলী খান, আলী খান তুর্কবাচা, শেখ আবু সইদ করমুলি, আহমদ খান শামী, খান খানান লোহানী, শামস খান, উযির খান, আহমদ খানের পুত্র খান-ই-খানান, শেখ আহমদ খানের পুত্র খান ই খানান, শেখ আহমদ খান শরওয়ানী, নিহাংগ খান, লশকর খান, শাহাব খান, দবির মুবারিয খান বহতা, রুস্তম খান, মালিক ঘাযীর পুত্র জুনান খান, খান-ই জাহানের পুত্র মিয়া চমন, হিসাম খান দৌর, ইমাদুল-মুলক, ইকবাল খান, মিয়া ফরিদ, মিয়া মা'রুফ করমুলি, রায় পরতাব, রায় কিলন, এবং রায় করম।

সুলতান বহলোল বাস্তত অতি দয়াশীল ছিলেন এবং মহানবীর প্রবর্তিত আইন সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া চলিতেন। সব ব্যাপারেই তিনি আইনের বিধান মানিয়া চলিতেন; আর ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে উৎসাহী ছিলেন। তিনি তাহার সময়ের এক বিরাট অংশ পণ্ডিত এবং ফকিরগণের সাহচর্যে কাটাইতেন,

১. তাবাকাত-ই-আকবরীর লেখক এবং ফিরিশতা উভয়েই যদিও বলেন যে বহলোলের নয়টি পুত্র সন্তান ছিল, তাহারা উভয়েই কিন্তু দশটি নাম দিয়াছেন। কর্নেল ব্রিগস মুবারক খানকে বাদ দিয়া নয়টি নাম দিয়াছেন।

২. ফিরিশতাও বলেন যে ৩৪ জন কিন্তু কর্নেল ব্রিগস বলেন ৩৬ জন। উপরোক্ত নামগুলি ফিরিশতারই অনুরূপ। শেষোক্ত ব্যক্তি কিন্তু দরিয়া খান লোদীর নামের পূর্বে খান জাহান লোদী যোগ করিয়াছেন; তাতার খান ইউসুফ খাইলের পরিবর্তে ইউসুফ খাস খান খাইল লিখিয়াছেন আর ইউসুফ খান জালওয়ানীর পুত্র আলী খানের নাম বাদ দিয়াছেন।

আর দীন-দুঃখীর প্রতি দয়া প্রদর্শন ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গণ্য করিতেন। সংক্ষেপে, সুলতান বহলোল যখন দিল্লী আগমন করিলেন তখন হামিদ খানের প্রচুর জাঁকজমক আর ক্ষমতা ছিল। তিনি (বহলোল) তখন সেই সময় তাহার প্রতি সম্ভ্রম এবং শালীনতা প্রদর্শন সুবিবেচনার বলিয়া মনে করিলেন; আর প্রত্যেক দিন তিনি তাহাকে সালাম করিতে গমন করিতেন। একদিন তিনি হামিদ খানের অতিথি হইলেন এবং তিনি আফঘানগণকে এমন কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিতে বলিলেন যেইগুলি যুক্তিপূর্ণ বা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যাহাতে তিনি তাহাদিগকে সরল লোক বলিয়া মনে করে এবং তাহার মন হইতে তাহাদের সম্বন্ধে ভয় এবং সমীহ তিরোহিত হয় এবং তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন না মনে করে। আফঘানগণ যখন সমাবেশের স্থলে আগমন করিল তখন তাহারা অদ্ভুত ব্যবহার আরম্ভ করিল; তাহাদের কিছু সংখ্যক তাহাদের জুতা হামিদ খানের মাথার উপরের একটা তাকের উপর নিয়া রাখিল। হামিদ খান বলিলেন "ইহা কিরূপ ব্যবহার!" তাহারা বলিল, "আমরা চোরদের নিকট হইতে এইগুলি নিরাপদে রাখিতেছি।" কিছুক্ষণ পরে আফঘানগণ হামিদ খানকে বলিল "আপনার মেঝের ঢাকনাগুলির রং চমৎকার, আপনি যদি এই-গুলি হইতে আমাদিগকে একটি করিয়া কম্বল দান করেন, তবে আমরা ইহা হইতে আমাদের ছেলেদের জন্য টুপি এবং মাথার ছাতা তৈরী করিব এবং সেইগুলি মূল্যবান উপহাররূপে প্রেরণ করিব; যাহাতে পৃথিবীর লোকেরা মনে করিতে পারে যে আমরা হামিদ খানের চাকুরীতে আসিয়া প্রচুর সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করিয়াছি। হামিদ খান মৃদু হাস্য করিলেন এবং বলিলেন, "এই কাজের জন্য আমি আপনাদের চমৎকার কাপড় উপহার দিব।" (পরিচারকগণ) যখন সুগন্ধি খাদ্যসমূহ তাহারা যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে আনয়ন করিলেন, কতিপয় আফঘান তাহার সুরা চাখিয়া দেখিলেন আর ফুল খাইয়া ফেলিলেন, আর কতিপয় আফঘান পানের খিলি খুলিয়া শুধু চুনটা খাইলেন এবং তাহাদের মুখ যখন পুড়িয়া গেল তখন তাহারা খিলিগুলি তাহাদের হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। হামিদ খান মালিক বহলোলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কেন এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার করিতেছে। তিনি জবাব দিলেন যে ইহারা বোকা গ্রাম্য লোক, আর লোকসমাজে বেশী চলাফেরা করে নাই। তাহাদের খাওয়া এবং মরিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন দক্ষতা নাই।

আর এক দিন মালিক বহলোল হামিদ খানের অতিথি ছিলেন। ইহা প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল যে যখন মালিক বহলোল গৃহে প্রবেশ করিতেন, কয়েকজন লোক তাহার সঙ্গে যাইতেন আর তাহার অধিকাংশ লোক বাহিরে অপেক্ষা করিত। যখন মালিক বহলোল একজন অতিথি হইয়া আসিলেন, এই উপলক্ষে, আফঘানগণ তাহার

প্ররোচনায় দ্বার রক্ষককে পদাঘাত করিল এবং বলপূর্বক গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং বলিল, আমরাও হামিদ খানের ভৃত্য, তবে আমাদের কেন তাহাকে সালাম করিতে ভিতরে আসিতে দেওয়া হইবে না। যেহেতু এক হট্টগোল এবং গোলমাল সৃষ্টি হইল, হামিদ খান ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তাহাকে জানান হইল যে আফঘানগণ মালিক বহলোলকে গালাগালি করিতেছে এবং বলিতেছে "আমরাও মালিক বহলোলের ন্যায় হামিদ খানের ভৃত্য ; সে ভিতরে গিয়াছে, তবে আমরাও কেন ভিতরে যাইব না এবং আমাদের সালাম নিবেদন করিব না? হামিদ খান বলিলেন, তাহাদের ছাড়িয়া দাও।"

শ্লোক

তোমার পোশাকে যদি তুমি একটি সাপ রাখিয়া দাও
তবে তোমার জীবনের জন্য তোমার কোন আশা করা বৃথা।

আফঘানগণ দল বাঁধিয়া সবেগে ভিতরে প্রবেশ করিল আর হামিদ খানের চতুর্দিকস্থ তাহার পরিচারকগণের প্রত্যেকের পাশে দুইজন করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এই সময়ে কুতব খান লোদী তাহার বুক হইতে একটি শিকল বাহির করিলেন এবং তাহা হামিদ খানের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "আপনার কিছুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই বাঞ্ছনীয় ; আমি যেহেতু আপনার নিমক খাইয়াছি, তাই আমি আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করিলাম না।" তাহারা হামিদ খানকে গ্রেপ্তার করিয়া রক্ষীদের হাতে সমর্পণ করিল। মালিক বহলোল তখন কাহারও নিকট হইতে কোন বাধা নিষেধ বা শত্রুতা ছাড়াই দিল্লী দখল করিয়া লইলেন : আর খোৎবায় তাহার নাম ঘোষণা করাইলেন এব' সিককায় (মুদ্রায়) তাহার নাম মুদ্রণ করিলেন, এবং সুলতান বহলোল উপাধি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট লিখিলেন, "আপনার পিতা আমাকে লালন পালন করিয়াছেন, তাই আমি প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতিনিধিরূপে সরকারের কার্যকলাপে দক্ষতা এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কারণ ইহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল ; আর আমি খোৎবা হইতে আপনার নাম তুলিয়া দিতেছি না।" সুলতান প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, 'আমার পিতা আপনাকে পুত্র সম্বোধন করিতেন, আমি আপনাকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গণ্য করি, আমি আপনার নিকট সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি এবং আমি বদাওন নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।" সুলতান বহলোল এইবার তাহার উদ্দেশ্য সম্পুর্ণরূপে সফল করিয়া সরকারের কার্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন : আর ঐ বৎসরেই

তিনি মুলতান এবং তাহার সন্নিকটস্থ জেলাসমূহের কার্যাবলী সুশৃঙ্খল করিবার জন্য ঐ অঞ্চলে গমন করিলেন।

সুলতান আলাউদ্দীনের যে আমীরগণ লোদীগণের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহারা সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া জৌনপুর হইতে সুলতান মাহমুদ শর্কীকে তলব করিলেন এবং আঃ হিজরা ৮৫৬ সনে (১৪৫২ খ্রীঃ) সুলতান এক বিশাল বাহিনীসহ দিল্লী আগমন করিলেন এবং তাহা অবরোধ করিলেন। সুলতান বহলোলের পুত্র খাজা বায়েজিদ অন্যান্য আমীরগণসহ নিজেকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সুলতান বহলোল এই সংবাদ শুনিয়া দিবালপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নলিরা[১] গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন। ইহা ছিল দিল্লী হইতে পনের কারোহ দূরে অবস্থিত; আর তাহার সৈন্যগণ সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনীর কতিপয় উট এবং ষাড়[২], যে-গুলি চারণভূমিতে দেওয়া হইয়াছিল, ধরিয়া আনিল। শেষোক্ত ব্যক্তি ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী এবং ত্রিশটি হস্তীসহ ফতেহ খান হারাভীকে,[৩] মালিক বহলোলকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। লোদীগণ নিজেদিগকে তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত করিল এবং যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুতব খান লোদী ছিলেন একজন বিশেষ খ্যাতনামা তীরন্দাজ, তিনি ফতেহ খানের বাহিনীর অগ্রবর্তী রক্ষী বাহিনীর যে হস্তীটি পরিচালনা করিতেছিল তাহাকে আহত করেন এবং ইহাকে অকেজো করিয়া দেন, ফলে ইহাকে যুদ্ধ হইতে অপসারণ করিতে হয়। দরিয়া খান লোদী সুলতান মাহমুদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিতেছিলেন। কুতব খান তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনার মা বোনেরা দুর্গে অবরুদ্ধ আছেন। ইহা কি উচিত হইতেছে যে আপনি একজন বিদেশীর পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং (আপনার নিজের লোকদের) মান সম্মান রক্ষা করিবেন না।" দরিয়া খান বলিলেন, "আমি চলিয়া যাইতেছি, আপনি আমার পশ্চাদ্ধাবন করিবেন না।" কুতব খান শপথ গ্রহণ করিলেন, দরিয়া খান পেছন ফিরিলেন; আর তাহার এইরূপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফতেহ খান পরাজিত হইলেন এবং বন্দী হইলেন। যেহেতু ফতেহ খান রায়করণের ভ্রাতা পিথোরা[৪]কে হত্যা করিয়াছিলেন,

১. পাণ্ডুলিপিতে নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। বদাওনী এই স্থানটির নাম আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা ইহার নাম লিখিয়াছেন বীব।

২. ইহার পাঠ বড় দুরূহ। ফিরিশতা বলেন, "মাহমুদ শাহ শর্কীর সেনাবাহিনীর কতিপয় মালবাহী উট এবং ষাঁড়।"

৩. এই শব্দটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন, হারবুই, হারতুই, এবং হারাভী। হারাভী অর্থ 'হিরাতের', এইটি শুদ্ধ পাঠ হইবে।

৪. ইহার বিভিন্নরূপ পাঠ আছে যেমন, বহতুয়ারী, সেহ সওয়ার, পিথোরা, ভানেট; আর ফিরিশতা

রায়করণ ফতেহ খানের শিরোচ্ছেদ করিলেন এবং তাহা সুলতান বহলোলের নিকট আনয়ন করিলেন। সুলতান মাহমুদ এই শোচনীয় পরাজয় সহ্য করিতে পারিলেন না এবং জৌনপুর অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর সুলতান বহলোল স্থায়িত্ব লাভ করিয়া শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তিনি মেওয়াট গমন করিলেন। আহমদ খান মেওয়াটি তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া গেলেন এবং তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। সুলতান তাহার নিকট হইতে সাতটি পরগণা নিয়া নিলেন আর বাকীগুলি তাহার নিকট রহিল। আহমদ খান মেওয়াটি তাহার চাচা মুবারক খানকে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যের চাকুরীতে দিলেন। শেষোক্ত জন তখন মেওয়াট হইতে বরণ গমন করিলেন। সম্বলের শাসনকর্তা দরিয়া খান লোদীও আগমন করিলেন এবং তাহার আনুগত্য এবং বশ্যতা প্রকাশ করিলেন এবং কররূপে সাতটি পরগণা ছাড়িয়া দিলেন। তথা হইতে সুলতান কোলে গমন করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় ইহা ইসা খানকে প্রদান করিলেন। তিনি যখন বুরহানাবাদে আগমন করিলেন তখন সকেতের শাসনকর্তা খেদমত করিতে আগমন করিলেন আর তাহার জায়গীরও তাহার নিকট হইতে নেওয়া হইল না। অনুরূপভাবে ভোনগাঁও-এর শাসনকর্তা রায় পরতাবের জায়গীরও তাহার নিকট রাখা হইল। অতঃপর সুলতান রাপ্রী দুর্গে গমন করিলেন। আর ঐ দুর্গের শাসনকর্তা কুতব খান পিতা হাসান খান, ইহাতে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইহা অধিকার করা হইল। খান-ই জাহান কুতব খানকে আশ্বাস দিলেন এবং তাহাকে সুলতানের নিকট আনয়ন করিলেন এবং তাহার জায়গীর তাহাকে দেওয়া হইল। ঐ স্থান হইতে তিনি ইতাওয়া গমন করিলেন এবং ঐ স্থানের শাসনকর্তাও তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে সুলতান মাহমুদ শর্কী পুনরায় সুলতান বহলোলকে আক্রমণ করিতে আগমন করিলেন এবং ইতাওয়া অঞ্চলে শিবির স্থাপন করিলেন। প্রথম দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। পরদিন কুতব খান এবং রায় পরতাব শান্তির প্রস্তাব করিলেন এবং স্থির হইল যে যাহা কিছু দিল্লীর বাদশাহ মুবারক শাহের দখলে ছিল, তাহার সব সুলতান বহলোলের দখলে থাকিবে আর যাহা কিছু জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম বাদশাহের আয়ত্বাধীন ছিল তাহা সুলতান মাহমুদের থাকিবে ;

লিখিয়াছেন ভাড়ুরী। বদাওনী এই যুদ্ধের কোন বিশদ বিবরণ দেন নাই। পিথোরা নামটিই সম্ভবতঃ শুদ্ধ মনে হয়।

আর ফতেহ খান হারাভীর পরাজয়ের সময় সুলতান মাহমুদের যে সাতটি হস্তী সুলতান বহলোলের হস্তগত হইয়াছিল, তিনি সেইগুলি সুলতান মাহমুদকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর ইহাও স্থির হইল যে বর্ষাকাল শেষ হইলে সুলতান বহলোল শামসাবাদ সুলতান মাহমুদের গভর্ণর জুনা খানের নিকট হইতে শামসাবাদ নিয়া নিবেন।

ইহার পর সুলতান মাহমুদ জৌনপুর গমন করিলেন। আর সুলতান বহলোল জুনা খানের নিকট এক ফরমান জারি করিলেন যে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি শামসাবাদ হইতে চলিয়া যান। শেষোক্ত ব্যক্তি এই নির্দেশ পালন করিলেন না, আর সুলতান বহলোল তাহার বিরুদ্ধে গমন করিলেন; তিনি পলায়ন করিলেন। সুলতান বহলোল শামসাবাদ রায়করণকে দিলেন। সুলতান মাহমুদ এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান বহলোলকে আক্রমণ করিবার জন্য শামসাবাদ আগমন করিলেন। কুতব খান এবং দরিয়া খান লোদী অতঃপর সুলতান মাহমুদের বাহিনীর উপর এক নৈশ আক্রমণ করিলেন। ঘটনাক্রমে কুতব খানের অশ্ব হোচট খাইল আর কুতব খান অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন এবং বন্দী হইলেন। সুলতান মাহমুদ তাহাকে জৌনপুরে প্রেরণ করিলেন; আর তিনি সাত বৎসর কারাগারে রহিলেন। সুলতান বহলোল সুলতান মাহমুদের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য এবং দুর্গে অবস্থিত রায়করণকে সাহায্য করিবার জন্য শাহজাদা জালাল এবং শাহজাদা সিকান্দর, এবং ইমাদুল-মুলককে রাখিয়া গেলেন; আর তিনি স্বয়ং সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে শেষোক্ত জন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তাহার জীবনের অবসান ঘটিল।

কবিতা

এই গ্রামে চিনি আর বিষ দুই-ই আছে
ইহা ক্ষণে জীবনকে ক্ষয় করে আর ক্ষণে জীবনীশক্তি দান করে।
একজনের মাথায় ইহা স্বর্ণের রাজমুকুট স্থাপন করে
অপরজনকে ইহা ঈর্ষায় তরবারির আঘাত হানে।
ইহার ঈর্ষা আর ইহার প্রেম, কোনটাই যথাস্থানে থাকে না।
ইহাতে কোন কোমলতা নাই, আর উহাতে নাই কোন আনুগত্য।

তাহার মাতা বিবি রাজি আমীরগণের সম্মতিক্রমে শাহজাদা ভিখন খানকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাহাকে মুহম্মদ শাহ উপাধি দান করিলেন। দুই বাদশাহের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল; আর তাহারা এক চুক্তিতে নিজেদের আবদ্ধ

করিল যে সুলতান মাহমুদের দখলীয় অঞ্চলসমূহ সুলতান মুহম্মদের দখলে থাকিবে ; আর সুলতান বহলোলের দখলে যাহা কিছু ছিল তাহাই তাহার দখলে থাকিবে। মুহম্মদ শাহ জৌনপুরে গমন করিলেন আর বহলোল দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি যখন দিল্লী উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন তখন কুতব খানের ভগ্নি শামস খাতুন তাহাকে এক বার্তা প্রেরণ করিলেন। তাহাতে জানাইলেন যে যতক্ষণ কুতব খান মুহম্মদ শাহের কারাগারে থাকিবে ততক্ষণ সুলতানের নিকট বিশ্রাম ও আরাম আর নিদ্রা হারাম হইবে। শেষোক্ত জন ইহাতে দুঃখিত হইলেন এবং ধানকুর[১] হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুলতান মুহম্মদকে আক্রমণ করিবার জন্য জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন। শেষোক্ত জনও জৌনপুর হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন শামসাবাদ পৌঁছিলেন, তখন তিনি সুলতান বহলোলের গভর্ণর রায়করণের নিকট হইতে ইহা ছিনাইয়া নিলেন এবং তাহা জুনা খানকে প্রদান করিলেন। রায় পরতাব বহলোলের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, এখন মুহম্মদ শাহের ক্ষমতা দেখিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন। মুহম্মদ শাহ সরস্বতিতে আগমন করিলেন ; আর সুলতান বহলোল সরস্বতির নিকটস্থ রাপ্রীতে শিবির স্থাপন করিলেন এবং কিছুকাল তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। মুহম্মদ শাহ সরস্বতি হইতে জৌনপুরের কোতোয়ালের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া তাহাকে তাহার (সুলতানের) ভ্রাতা হাসান খান এবং ইসলাম খান লোদীর পুত্র কুতব খানকে হত্যা করিবার নির্দেশ দান করিলেন। কোতোয়াল নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে বিবি রাজি তাহাদের উভয়কে এমনভাবে রক্ষা করিতেছেন যে তাহা-দিগকে হত্যা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। মুহম্মদ শাহ যখন এই পত্র পাইলেন তখন তিনি জৌনপুর হইতে তাহার মাতাকে তলব করিলেন, যাহাতে তিনি তাহার (সুলতানের) মধ্যে এবং হাসান খানের মধ্যে একটা শান্তি স্থাপন করিতে পারেন এবং শেষোক্ত জনকে সাম্রাজ্যের একটা অংশ দিতে পারেন। অতঃপর বিবি রাজি জৌনপুর হইতে যাত্রা করিলেন। তখন মুহম্মদ শাহের ফরমান অনুযায়ী কোতোয়াল হাসান খানকে হত্যা করিল। বিবি রাজি কান্যকুব্জে হাসান খানের জন্য শোক যাপন করিলেন এবং তথায় অপেক্ষা করিলেন ; এবং মুহম্মদ শাহের নিকট গমন করিলেন না। শেষোক্ত জন তাহার মাতাকে লিখিলেন যে যেহেতু সকল

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে, যেমন, দিকুদ, দথকুর, দিনকুর এবং ধানকুর। বদাওনী এই সম্বন্ধে শুধু বলেন যে যেহেতু তাহার চাচাত ভাই কুতব খান মুহম্মদ শাহের হস্তে বন্দী ছিলেন, সুলতান বহলোল সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া মুহম্মদ শাহকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। তিনি সুলতান বহলোলের প্রতি শামস খাতুনের আবেদনের কোন উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শাহজাদারই ভাগ্যে এইরূপ ঘটিবে, তাহার শ্রদ্ধেয় মাতা যেন একসঙ্গেই সকলের শোক পালন করিয়া নেন।

মুহম্মদ শাহ বাদশাহ ছিলেন বদমেজাজী এবং রক্তপিপাসু। আমীরগণ তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। একদিন তাহার ভ্রাতা শাহজাদা হুসেন খান, সুলতান শাহ এবং জালাল খান অযোধানীসহ তাহাকে সংবাদ দিলেন যে সুলতান বহলোলের বাহিনী তাহাদের উপর এক নৈশ আক্রমণের মতলব করিয়াছেন, এবং তাহাদের সঙ্গে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং ত্রিশটি হস্তীসহ তাহারা শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার শপথ করিয়া নিজেদিগকে সুলতান মুহম্মদ শাহের সেনাবাহিনী হইতে নিজেদের আলাদা করিয়া লইলেন; এবং এক জলপ্রপাতের তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুলতান বহলোল এই সংবাদ পাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শাহজাদা হুসেন খান শাহজাদা জালাল খানকে তাহার সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহাকে তলব করিবার জন্য একজন লোক প্রেরণ করিলেন। এই সময় সুলতান শাহ বলিলেন যে তথায় অপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। জালাল খান পেছন হইতে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন; এবং তাহারা কান্যকুব্জ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘটনা এইরূপ ঘটে যে, সুলতান বহলোল তাহাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা আসিয়া তাহারা যে স্থানে ছিল ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। শাহজাদা জালাল খান হুসেন খানের তলব অনুযায়ী মুহম্মদ শাহের বাহিনী ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং ঐ জলপ্রপাত অভিমুখে গমন করিলেন; আর তথায় পৌঁছিয়া সুলতান বহলোলের বাহিনীকে শাহাজাদা হুসেন খানের সেনা-বাহিনী বলিয়া মনে করিলেন এবং তাহার সন্নিকটে গমন করিলেন। সুলতান বহলোলের বাহিনী তাহাকে বন্দী করিল এবং তাহাকে সুলতান বহলোলের নিকট নিয়া গেল। আর তিনি তাহাকে কুতব খানের সহিত বিনিময় করিতে পারিবেন ভাবিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মুহম্মদ শাহ তাহার মোকাবিলা করিতে সক্ষম না হইয়া কান্যকুব্জের পথ ধরিলেন। সুলতান বহলোল গঙ্গা নদী পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহার সাজসরঞ্জামের এবং যুদ্ধের জিনিসপত্রের এক অংশ হস্তগত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হিজরা ৮৫৫ সনে (১৪৫১ খ্রীঃ) যখন শাহজাদা হুসেন খান তাহার মাতা রাজি বিবির নিকট আগমন করিলেন, তখন তাহার এবং শর্কী সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি-গণের প্রচেষ্টায় তাহাকে (শাহজাদা হুসেনকে) সিংহাসনে বসান হইল; যাহা শর্কী অধ্যায়ে মুক্তোক্ষরা কলম দ্বারা বিধৃত করা হইয়াছে। মালিক মুবারক গুংগ এবং মালিক আলী গুজরাটি এবং অন্যান্য আমীরগণকে মুহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল।

তিনি তখন রাজনগর দুর্গের নিকটে গঙ্গা তীরে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুলতান হুসেন খানের সেনাবাহিনী যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন মুহম্মদ শাহের সঙ্গীয় কতিপয় আমীর তাহার নিকট হইতে আলাদা হইয়া গেলেন। মুহম্মদ শাহ সামান্য কতিপয় অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়া পলায়ন করিলেন এবং ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ এক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় তাহাকে অবরোধ করা হইল।

কবিতা

ভাগ্য যখন তাহার বন্ধু ছিল
তখন তাহার তীরের কাছে লোহার পাতও ছিল মোলায়েম ফেল্টের ন্যায়
আর ভাগ্য যখন আর তাহার বন্ধু রহিল না
তখন তাহার তীর সর্বাপেক্ষা মোলায়েম রেশমও ভেদ করিতে পারিল না।

যেহেতু মুহম্মদ শাহ ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী তীরন্দাজ, তিনি তাহার তীর ধনুক গ্রহণ করিলেন। বিবি রাজি তাহার অস্ত্রাগার রক্ষকের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং ফলে তাহার তুনের তীরের ফলা অপসারণ করিয়া ফেলা হইয়াছিল। মুহম্মদ শাহ তাহার তুন হইতে যে সব তীর বাহির করিলেন তাহার একটিরও ফলা ছিল না। অবশেষে তিনি তাহার তরবারি গ্রহণ করিয়া কতিপয় লোককে হত্যা করিলেন। তৎপর মুবারক গুংগ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এক তীর তাহার ঘাড়ে আসিয়া বিঁধিল এবং তিনি তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন এবং ইন্তেকাল করিলেন।

কবিতা

পৃথিমাতার এমন কোন সন্তান নাই যাহাকে সে বধ করে না
এই পুত্রহন্তী মায়াবিনীর প্রতি কখনও তোমার হৃদয়ানুরাগ দিও না;
ভিক্ষুক আর রাজা সকলেরই নির্ধারিত দিনে মৃত্যু অবধারিত
সাম্রাজ্য মহত্ব দান করে না, আর মহত্বও কোন কাজে আসে না।
মনে কর পূর্ব পশ্চিম সমস্ত পৃথিবীই তোমার সম্পদ
বেদনার দিনে মৃত্যু কি তাহা তোমার নিকট হইতে কি নিয়া নিবেন?[১]

ইহার পর সুলতান হোসেন সুলতান বহলোলের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন এবং তাহারা এক চুক্তি সম্পাদন করিলেন যে চারি বৎসরকাল তাহারা নিজেদের

১. এই পংক্তিটির পাঠ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে।

সীমানা নিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। রায় পরতাব ইহার পূর্বে মুহম্মদ শাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কুতব খান আফঘান তাহাকে সুলতান বহলোলের সহিত যোগদান করিবার প্রেরণা দিলেন। সুলতান হুসেন যখন কান্যকুব্জ হইতে যাত্রা করিয়া হরিয়া[১] নামক এক জলাশয়ের নিকট আগমন করিলেন এবং তথায় শিবির স্থাপন করিলেন তখন তিনি জৌনপুর হইতে কুতব খান লোদীকে আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে একটি অশ্ব এবং একটি সম্মানীয় পোশাক এবং অন্যান্য অনুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাহাকে সর্বপ্রকার মর্যাদা ও সম্ভ্রমের সহিত সুলতান বহলোলের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জনও শাহজাদা জালাল খানকে উপহার দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাহাকে সুলতান হুসেনের নিকট প্রেরণ করিলেন।

ইহার কিছুকাল পর[২] সুলতান বহলোল শামসাবাদ অভিমুখে গমন করিলেন। এবং ঐ স্থানটি জুনা খানের নিকট হইতে নিয়া তাহা রায়করণকে দিলেন, আর ঐ স্থানে রায় পরতাবের পুত্র নরসিংহ[৩] রায় আগমন করিলেন এবং সুলতান বহলোলের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পূর্বে রায় পরতাব বলপূর্বক একটি বল্লম (যাহা ঐ কালে একজন নেতার পদমর্যাদার প্রতীক ছিল) এবং একটি নাকাড়া দরিয়া খানের নিকট হইতে ছিনাইয়া নেন। শেষোক্ত জন ইহার প্রতিশোধ নিবার জন্য কুতব খানের সম্মতিতে নরসিংহকে হত্যা করিলেন। এই সময়ে হুসেন খান আফঘানের পুত্র কুতব খান এবং দুবারিক খান বেহতার এবং রায় পরতাব সুলতান হুসেন শর্কীর সহিত যোগদান করিলেন। সুলতান বহলোলের এখন আর তাহার সহিত মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা রহিল না, এবং তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পর সুলতান বহলোল পাঞ্জাবের ব্যাপারসমূহ সুশৃঙ্খল করিবার জন্য এবং সুলতানের গভর্ণরের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মুলতান অভিমুখে যাত্রা করিলেন; আর কুতব খান লোদী এবং খান-ই-জাহানকে দিল্লীতে তাহার নায়েব রূপে রাখিয়া গেলেন। সুলতান বহলোল যখন পথিমধ্যে ছিলেন তখনই তাহারা তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে সুলতান হুসেন এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী, পর্বত-প্রমাণ হস্তীসমূহসহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দিল্লী আগমন করিলেন; এবং সব শত্রুর মোকাবিলা করিবার জন্য

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন হরিয়া, হরহা, হরহানা এবং হর্ধা।

২. ফিরিশতা বলেন, ইহার কিছুকাল পর যখন শর্তানুযায়ী সময় অতিক্রান্ত হইল। এই শর্তের সময় ছিল চারি বৎসর।

৩. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন ববসিংহ, দরসিংহ, হবসিংহ। ফিরিশতা লিখিয়াছেন নরসিংহ। বদাওনী এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

অগ্রসর হইয়া চান্দোয়ারে তাহার সম্মুখীন হইলেন এবং সাত দিন ধরিয়া দুই পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। এই সময়ে আহমদ খান মেওয়াটি এবং কোলের গভর্ণর রুস্তম খান সুলতান হুসেনের সহিত যোগদান করিলেন আর তাতার খান লোদী সুলতান বহলোলের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ইহার পর যখন যুদ্ধ এবং নিধন কার্য কিছু কাল ধরিয়া চলিল তখন (দুই রাজ্যের) প্রধান ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় ফলে স্থির হয় যে তিন বৎসর কাল সময় উভয় বাদশাহ নিজ নিজ সাম্রাজ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং পরস্পরের সহিত আর কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না।

এই আপোষের পর সুলতান হুসেন ইতাওয়া অবরোধ করিলেন।[১] সুলতান বহলোল দিল্লী আগমন করিলেন এবং তাহার সাম্রাজ্য এবং সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিন বৎসর কাল নিয়োজিত থাকিলেন.। এই সময়ের মধ্যে সুলতান বহলোল আহমদ খান মেওয়াটির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন ; তিনি ইহার পূর্বেই সুলতান হুসেনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি যখন মেওয়াটে পৌঁছিলেন, তখন সুলতান হুসেনের প্রখ্যাত আমীরগণের অন্যতম আমীর খান-ই-জাহান আহমদ খানকে অনুগ্রহ প্রকাশের আশ্বাস দিলেন এবং তাহাকে সুলতান হুসেনের নিকট নিয়া গেলেন। প্রায় এই সময়েই ইউসুফ খান জিলওয়ানীর পুত্র এবং বিয়ানার গভর্ণর আহমদ খান বিয়ানায় সুলতান হুসেনের নামে খোৎবা পাঠ করান।

যেহেতু তিন বৎসর কাল্ ইতিমধ্যে গত হইয়া গেল, সুলতান হুসেন এখন এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য[২] এবং এক সহস্র হস্তীসহ দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুলতান বহলোল দিল্লী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ভাটওয়ারা[৩] শহরের নিকট তাহার সম্মুখীন হইলেন। খান ই-জাহান হস্তক্ষেপ করিলেন এবং এক সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহার পর সুলতান হুসেন ইতাওয়া গমন করিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ; আর সুলতান বহলোল দিল্লী গমন করিলেন। ইহার

২. ফিরিশতা বলেন যে সুলতান হুসেন নির্ধারিত তিন বৎসরকাল গত হইবার পর ইতাওয়া অবরোধ করেন এবং তিনি সুলতান বহলোলের এক আত্মীয়ের নিকট হইতে ইতাওয়া ছিনাইয়া নেন। আর তিনি আহমদ খান মেওয়াটি এবং কোলের গভর্ণর রুস্তম খান এবং আহমদ খান জিলওয়ানীকে তাহার দলভুক্ত করিয়া নেন।

১. বদাওনী এবং ফিরিশতা উভয়েই এই সংখ্যা লিখিয়াছেন। কর্ণেল রেঙ্কিং কিন্তু অশ্বারোহীর সংখ্যা কমাইয়া মাত্র দশ সহস্র লিখিয়াছেন।

২. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন, মতুরা, মহওয়ারা, ভাটওয়ারা, থানওয়ারা। বদাওনী লিখিয়াছেন ভাটওয়ারা আর ফিরিশতা লিখিয়াছেন থানওয়ারা।

অল্পকাল পরে সুলতান হুসেন পুনরায় সুলতান বহলোলকে আক্রমণ করিলেন।[১] শেষোক্ত জন দিল্লী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং রায় সিংহের নিকট উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং কয়েকদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল এবং শেষ পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হইল। সুলতান হুসেন ইতাওয়া অভিমুখে গমন করিলেন আর সুলতান বহলোল দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই সময়ে সুলতান হুসেনের মাতা বিবি রাজি ইতাওয়ায় ইন্তেকাল করিলেন। গোয়ালিয়রের রাজা করণ সিংহের পুত্র কল্যাণ মল[২] কুতব খান লোদী, যিনি চান্দোয়ার হইতে গোয়ালিয়র গমন করিয়াছিলেন, হুসেন শাহের নিকট গমন করিলেন। যেহেতু কুতব খান দেখিলেন যে সুলতান হুসেনের, সুলতান বহলোলের প্রতি গভীর শক্রতা রহিয়াছে, তিনি তাহাকে খোসামোদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন "সুলতান বহলোল আপনার একজন ভৃত্যের ন্যায়। তিনি কখনও আপনার সমকক্ষ হইতে পারেন না এবং আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দিল্লী আপনার দখলে আনিতে না পারিব ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হইব না।" অতঃপর তিনি নানারূপ কৌশল করিয়া সুলতান হুসেনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সুলতান বহলোলের নিকট আগমন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন "আমি প্রতারণা এবং কৌশল করিয়া সুলতানের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছি। আমি তাহাকে আপনার প্রতি অত্যন্ত শক্রভাবাপন্ন দেখিয়াছি। আপনি সাবধানতা অবলম্বন করুন।"

এই সময়ে সুলতান আলাউদ্দীন বদাওনে ইন্তেকাল করিলেন। সুলতান হুসেন ইতাওয়া হইতে শোক প্রকাশের জন্য তথায় গমন করিলেন[৩] এবং শোক পালন অনুষ্ঠানের পর সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্রের নিকট হইতে নিজ দখলে নেন। তিনি এইরূপ নির্দয় কাজে নিজেকে প্রবৃত্ত করিলেন। তথা হইতে তিনি সম্বল গমন করিলেন এবং তথাকার গভর্ণর, তাতার খানের পুত্র, মুবারক খানকে[৪] বন্দী করিলেন এবং

১. বদাওনী এই ঘটনার কোন উল্লেখ করেন নাই। যে স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহার নাম বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন, রায়সিংহ, বধখার, রংখাব, বলন্দর; ফিরিশতা লিখিয়াছেন সুনকুর।

২. বদাওনী এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা বলেন গোয়ালিয়রের রাজা, তাহার পুত্র নহে, এবং কুতব খান লোদী সুলতান হুসেন শাহের মাতৃ বিয়োগে তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য গমন করিয়াছিলেন।

৩. বদাওনী বলেন যে সুলতান হুসেন ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীনের জামাতা। তিনি বলেন, "সুলতান আলাউদ্দীন, যাহার কন্যা মালকা-ই-জাহানকে সুলতান হুসেনের নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল, বদাওনে ইন্তেকাল করিলেন।"

৪. বদাওনী বলেন যে তাতার খানই গভর্ণর ছিলেন এবং তাহাকেই কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। ফিরিশতা মুবারক খানের নাম দিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে তাতার খানের পুত্র তাহা লিখেন নাই।

তাহাকে সরন[১] প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী এবং এক সহস্র হস্তীসহ আগমন করিলেন এবং আঃ হিজরা ৮৮৩ সনের[২] (১৪৭৯ খ্রীঃ) যিহিজ্জা মাসে যমুনা নদীর তীরে কুনজাহ[৩] দুর্গের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। সুলতান বহলোল খান জাহানের পুত্র হুসেন খানকে মিরাট অভিমুখে প্রেরণ করিলেন; এবং স্বয়ং সিরহিন্দ হইতে দিল্লী আগমন করিলেন। তাহারা কিছুকাল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। শর্কীর অধিকতর সংখ্যা এবং ক্ষমতার জন্য তাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অবশেষে কুতব খান সুলতান হুসেনের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিয়া এই স বাদ দিলেন যে তিনি বিবি রাজির একজন ভৃত্যমাত্র; এবং তাহার নিকট হইতে তিনি বহু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। তিনি যখন জৌনপুরে কারারুদ্ধ ছিলেন তখন ঐ পুণ্যবতী মহিলা তাহার প্রতি বহু মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখন সুলতান হুসেনের পক্ষে শান্তি স্থাপন করিয়া জৌনপুরে প্রত্যাগমন করাই উচিত কাজ হইবে; আর গঙ্গার অপর তীরের সমস্ত ভূভাগ তাহার আয়ত্বে থাকিবে এবং এই পারে যে ভূভাগ আছে তাহার সমস্তটা সুলতান বহলোলের থাকিবে। উভয় পক্ষ ইহাতে সম্মত হইল এবং যুদ্ধ শেষ হইল। সন্ধির শর্তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুলতান হুসেন তাহার সাজ-সরঞ্জাম পেছনে রাখিয়া যাত্রা করিলেন। সুলতান বহলোল এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং সুলতান হুসেনের সাজ-সরঞ্জামের এক অংশ লুট করিলেন এবং তাহার ধনরত্নের কিছু অংশ এবং বহু জিনিসপত্র যাহা অশ্ব এবং হস্তীপৃষ্ঠে বোঝাই করা হইয়াছিল, সেইসব সুলতান বহলোলের হস্তগত হইল। সুলতান হুসেনের বাহিনীর প্রায় চল্লিশ জন সুবিখ্যাত আমীর যেমন উযির কুতলুঘ খান[৪] যিনি ঐ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং সেনাবাহিনীর বেতন দান কারী বুধু[৫] এবং তাহাদের ন্যায় অন্যান্যগণকে বন্দী করা হইল। কুতলুঘ খানকে শৃঙ্খলিত করিয়া কুতব খান লোদীর অধীনে দেওয়া হইল এবং সুলতান বহলোল (সুলতান হুসেনের পশ্চাদ্ধাবনে গমন করিলেন এবং শেষোক্ত জনের অধীনস্থ কতিপয় পরগণা

১. এই স্থানটির নাম বদাওনী লিখিয়াছেন সাবণ।

২. বদাওনী বলেন যে ইহা আঃ হিঃ ৮৮০ সনে সংঘটিত হয়, কিন্তু তাবাকাত এবং ফিরিশতায় দেওয়া বৎসরই সঠিক।

৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে কুনুজা। বদাওনী লিখিয়াছেন কিচাহ, তবে অপর একটা পাণ্ডুলিপিতে আছে গনজিনাহ, ফিরিশতা লিখিয়াছেন কছা।

৪. বদাওনীর মতে তাহার নাম ছিল কাযী সামাউদ্দীন।

৫. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন অউন্ত, উধু, এবং উথু, এবং উচচু। বদাওনী এই নামটি উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন মালিক বুধু।

দখল করিয়া লইলেন যেমন কসবা-ই-কমবাল[১] এবং পাতিয়ালী, এবং শামসাবাদ এবং সক্কেত এবং কোল এবং মারহরাহ, এবং জালালী এবং প্রত্যেকটির দায়িত্বে একজন অফিসার নিযুক্ত করিলেন। পশ্চাদ্ধাবন যখন সীমা ছাড়াইয়া গেল তখন সুলতান হুসেন রাপ্রীর অধীনস্থ আরাম মহজুর[২] নামীয় গ্রামে পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং যুদ্ধ করিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক আপোষ মীমাংসা সম্মত হয় এই শর্তে যে উভয় সুলতান স্ব-স্ব এলাকা নিয়া এবং তাহাদের প্রাচীন সীমানা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন। শান্তি স্থাপনের পর সুলতান হুসেন রাপ্রী গমন করিলেন এবং সুলতান বহলোল ধোবামৌ[৩] আগমন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পর সুলতান হুসেন পুনরায় এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিলেন এবং সুলতান বহলোলকে আক্রমণ করিতে আগমন করিলেন এবং সোনহারের[৪] সন্নিকটে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সুলতান হুসেন পুনরায় পরাজিত হন।

কবিতা

ভাগ্য যদি মন্দ হয় তবে প্রবল শক্তিসম্পন্ন ধনুকও কোন কাজে আসে না
ভাগ্য প্রসন্ন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর ঠিক স্থানে আঘাত হানে।
ভাগ্য যখন অপ্রসন্ন হয় তখন বহু বীরহৃদয় যোদ্ধা
যুদ্ধে সামান্য শত্রুর নিকটও পরাজিত হয়।

অপরিমিত সম্পদ লোদীগণের হস্তগত হয় এবং ইহার ফলে সুলতান বহলোলের ক্ষমতা এবং মর্যাদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সুলতান হুসেন পুনরায় রাপ্রী গমন

---

১. বদাওনী বলেন যে তিনি স্বয়ং দোয়াবের শামসাবাদ পর্যন্ত তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। শামসাবাদ সুলতান হুসেনের দখলে ছিল, এবং তাহা অধিকার করেন এবং তথায় নিজস্ব অফিসার নিযুক্ত করেন। তিনি যেসব পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন ফিরিশতা সেইগুলির নাম দিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি এবং ষষ্ঠে যে তিনিও লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোল বাদ দিয়াছেন এবং জালালীর স্থলে জালেসর লিখিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে জালালী আছে।

২. এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন আরাম ; আরাম মহজুর ; আরাম লহজু ; আরাম বধু বা আরাম নজু। বদাওনী কোন নাম উল্লেখ করেন নাই ; তিনি বলেন যে যুদ্ধটি রাপ্রীর সন্নিকটে সংঘটিত হয়। ফিরিশতা বলেন, রাম পুরুরাহ। কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন রামপিনজিম।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ধোবামৌ, আর অন্যান্যগুলিতে আছে ধোমা এবং দু'মোনা ; একটিতে আছে হরপামৌ। বদাওনীতে আছে ধোপামৌ। ফিরিশতা বলেন যে এই সিদ্ধান্ত হয় যে মৌযা ধোপামৌ সীমানা হইবে, আর সুলতান হুসেন রাপ্রী গমন করিলেন এবং সুলতান বহলোল দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৪. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এবং বদাওনীতে আছে সোনহার। ফিরিশতায় আছে সহারন ; আর কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন সিরসর।

করিলেন ; আর সুলতান বহলোল ধোবামৌ এর নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময়ে খান-ই-জাহানের, যিনি দিল্লীতে ছিলেন, ইন্তেকালের সংবাদ সুলতান বহলোলের নিকট পেঁৗছিল। সুলতান তাহার পুত্রকে খান-ই-জাহান উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং তাহার পিতার জায়গীরে তাহাকে অনুমোদন দান করিলেন। ঐ স্থান হইতে তিনি রাপ্রী গমন করিলেন এবং সুলতান হুসেনকে আক্রমণ করিলেন ; আর যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের পর তিনি বিজয়ের জন্য খ্যাতিলাভ করিলেন। যুদ্ধের সময় এবং যমুনা নদী অতিক্রম করিবার সময় সুলতান হুসেনের কতিপয় পুত্র এবং তাহার পরিবারের অন্য কয়েকজন ধ্বংসের সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

অতঃপর সুলতান হুসেন গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করেন। হটকাণ্ডের[১] সন্নিকটে, একদল ভাদোরিয়া তাহার শিবির আক্রমণ করে এবং তাহা লুণ্ঠন করে। কিন্তু তিনি যখন গোয়ালিয়র পেঁৗছেন তখন গোয়ালিয়রের রাজা রায় কিরাত সিংহ[২] তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং তাহার প্রতি তাহার একজন ভৃত্যের নাম ব্যবহার প্রদর্শন করিলেন। তিনি কররূপে নগদ কয়েক লক্ষ তংকা এবং কতিপয় তাঁবু এবং মঞ্চ আর কিছু অশ্ব এবং হস্তী এবং উট প্রদান করিলেন ; আর নিজেকে তাহার শুভাকাঙ্ক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং তাহার সঙ্গে গমনের জন্য এক বাহিনী সৈন্য দিয়া এবং তাহার একজন অধীনস্থ লোকের ন্যায় কাল্পী পর্যন্ত আগমন করিলেন। এই সব ব্যাপার যখন ঘটিতেছিল তখন সুলতান বহলোল ইতাওয়া গমন করিয়া তাহা আক্রমণ করিলেন।[৩] সুলতান হুসেনের ভ্রাতা ইব্রাহীম খান এবং হায়বাত খান ওরফে মালিক করকর নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ করিলেন এবং তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং ইতাওয়া সমর্পণ করিয়া দিলেন। সুলতান বহলোল ইহা মুবারক খান লোহানীর[৪]

১. আবুল ফযলের মতে হটকান্ত ছিল ভাদোয়ারের প্রধান শহর। ভাদোয়ার ছিল আগ্রার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি জেলায়। ইহার অধিবাসীগণকে বলা হইত ভাদোরিয়া, ইহারা দুঃসাহসী ডাকাত বলিয়া খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। আর যদিও রাজধানীর নিকটে ছিল তবু তাহারা আকবর শাহের আমল পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। সম্রাট আকবর তাহাদের নেতাকে হস্তী-পদতলে পিষ্ট করিয়া বধ করেন।

২. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন রায় গিরাত সিংহ। ফিরিশতা তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। শুধু গোয়ালিয়রের রাজা বলিয়াছেন। গিরাত সিংহ সম্ভবতঃ ভুল।

৩. বদাওনী এই ইতাওয়া আক্রমণের কোন উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং নাম ইব্রাহীম খান ও হায়বাত খান উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তির ওরফে নামটি তিনি লিখিয়াছেন করকর, মালিক যোগ করেন নাই।

৪. কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে আছে নুহানী।

পুত্র ইব্রাহীম খানের কর্তৃত্বে স্থাপন করিলেন। তিনি ইতাওয়ার অন্তর্গত কতিপয় পরগণা রায় দাউদকে[১] তাহার পারিশ্রমিকরূপে প্রদান করিলেন এবং এক বিরাট বাহিনীসহ সুলতান হুসেনকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। তিনি যখন কাম্পীর অধীনস্থ স্থান রাকানৌ গ্রামে পৌঁছিলেন তখন সুলতান হুসেন কাম্পী হইতে তাহার সঙ্গে মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলেন এবং তাহারা বেশ কয়েকমাস খণ্ড-যুদ্ধে অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে বকসর[২] অঞ্চলের শাসনকর্তা রায় তিলোক চান্দ সুলতান বহলোলের নিকট আগমন করিলেন এবং তাহাকে এমন এক স্থানে নিয়া গেলেন যেখানে নদীর একটি চড়া ছিল এবং যে স্থান দিয়া তিনি নদী অতিক্রম করিলেন। সুলতান হুসেন তাহার মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া বিহতাহ[৩] অঞ্চলে গমন করিলেন।

কবিতা

যে ব্যাঘ্র সিংহের আঘাত অনুভব করিয়াছে
সে আর তাহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার আসিবে না।
যে বৃহৎ বাজ পাখী ক্ষুদ্র বাজের থাবা হইতে শিকার কাড়িয়া নিয়াছে
ইহার পর সে শিকার ক্ষেত্রে ইহাকে মনে করে অসহায় কবুতর।

বিহতার রাজা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন এবং মানবতার বোধে তাহার সহিত ব্যবহার করিলেন আর তাহাকে কয়েক লক্ষ তংকা এবং কতিপয় অশ্ব ও হস্তী কররূপে প্রদান করিলেন এবং তাহার সঙ্গে কতিপয় সেনা দিয়া তাহাকে জৌনপুর পৌঁছাইয়া দিলেন।

ইহার পর পুনরায় সুলতান বহলোল দৃঢ় সংকল্পের পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি যখন ইহার নিকটস্থ হইলেন, তখন সুলতান হুসেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং বাহরাইচের পথে কান্যকুব্জে গমন

১. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন দান্দ, দান্দো, এবং দান্দোয়া। ফিরিশতা লিখিয়াছেন দান্দোয়া।
২. বকসর, উনাস শহরের ৩৮ মাইল দক্ষিণ পূর্বে, গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ফিরিশতা বকসরের স্থলে কাটেহার বা রোহিলখণ্ড লিখিয়াছেন।
৩. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে আছে বিহতা। বদাওনী লিখিয়াছেন ভাটা, তবে ইহা বিহতাও হইতে পারে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন থাথা, আর কর্ণেল রেভিং ইহা সঠিক বলিয়া অনুমান করেন। তবে বিহতা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। কানপুরের নিকটে বিথুর নামে এক স্থান আছে, সম্ভবতঃ এই স্থানই হইবে।

করিলেন। সুলতান বহলোলও কান্যকুব্জ অভিমুখে গমন করিলেন; আর তাহারা রাহাবের তীরে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে সুলতান হুসেনের পক্ষে যাহা ইতিমধ্যে স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি সেই পরাজয় বরণ করিলেন আর তাহার রাজত্বের প্রতীক এবং সাম্রাজ্যের আনুসঙ্গিক উপকরণসমূহ লোদীগণের হস্তগত হইল। তাহার সম্মানীয়া স্ত্রী বিবি খুনযাকেও[১], যিনি ছিলেন খিযির খানের পৌত্র[২] সুলতান আলাউদ্দীনের কন্যা, কারারুদ্ধ করা হইল। সুলতান বহলোল তাহাকে মহা সম্মান এবং মর্যাদাসহকারে রক্ষা করিলেন; আর ইহার কিছুকাল পর তিনি যখন পুনরায় জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিতে গমন করেন, তখন বিবি খুনযা কতিপয় কৌশল প্রয়োগ করিয়া তাহার মুক্তি লাভ করিলেন এবং তাহার স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময়ে সুলতান বহলোল জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং তাহা মুবারক খান লোহানীকে প্রদান করিলেন; আর অন্যান্য কতিপয় আমীরকে যেমন কুতব খান লোদী এবং খান-ই-জাহান এবং তাহাদের ন্যায় অন্যান্যগণকে মঝৌলী[৩] শহরে রাখিয়া বদাওন অভিমুখে গমন করিলেন। সুলতান হুসেন ইহাই উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া এক শক্তিশালী বাহিনীসহ জৌনপুর আগমন করিলেন; আর সুলতান বহলোলের আমীরগণ জৌনপুর ত্যাগ করিয়া মঝৌলীতে কুতব খানের নিকট গমন করেন, কিন্তু ঐ স্থানেও তাহারা থামিলেন না এবং তাহারা আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়া সুলতান হুসেনের নিকট গমন করেন এবং তাহার প্রতি শুভানুধ্যায়ীর ন্যায় কথা বলেন এবং সাহায্য আসিয়া পেঁৗছা পর্যন্ত তাহার সহিত শালীনতা ও বিনয়ের সহিত ব্যবহার করেন। সুলতান বহলোল, কুতব খান লোদীর সঙ্গে তিনি যে সৈন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহার অপদস্থ হওয়া সম্বন্ধে অবহিত হইলেন এবং তাহার পুত্র বারবক শাহকে তাহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন আর তিনি নিজেও তাহার পিছন পিছন জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন। সুলতান হুসেন তাহাকে প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া বিহার গমন করিলেন।

---

১. কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে তাহার নাম দেওয়া আছে খুনযা, আর কয়েকটিতে আছে খুতবা। বদাওনীও খুনযা লিখিয়াছেন। ফিরিশতাও লিখিয়াছেন খুনজহ্। সম্ভবতঃ তিনিই মালকা-ই-জাহান নামে পরিচিত ছিলেন।

২. প্রকৃতপক্ষে সুলতান আলাউদ্দীন ছিলেন খিযির খানের প্রপৌত্র। তিনি ছিলেন মুহম্মদ শাহের পুত্র আর তিনি ছিলেন মুবারক শাহের (বা ফরিদ খানের) পুত্র, আর তিনি ছিলেন খিযির খানের পুত্র।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মহজৌলী আর একটিতে আছে মঝৌলী, আর একস্থানে আছে মহযোলী; আর একটিতে আছে মঝৌলী, আর একটিতে আছে মহনুতি। বদাওনীতে আছে মহজৌলী। ফিরিশতায় আছে মহজৌলী। গোরখপুর জেলায় গণ্ডক নদীর তীরে মঝৌলী নামে এক গ্রাম আছে।

সুলতান বহলোল যখন হলদি শহরে পৌঁছিলেন, তখন তিনি কুতব খান লোদীর মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি শোক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন এবং তৎপর জৌনপুর গমন করিলেন। তথায় তিনি বারবক শাহকে শর্কী রাজ্যের সিংহাসনে বসাইলেন এবং তথায় তাহাকে রাখিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি কাল্পী গমন করিলেন এবং ঐ দেশটা শাহযাদা খাজা বায়েযিদের পুত্র আযম হুমায়ুনকে[১] প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি চান্দোয়ারের পথে ধোলপুর গমন করিলেন। ধোলপুরের রায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিলেন এবং কর রূপে কয়েক মণ স্বর্ণ প্রদান করিলেন এবং তাহার একজন শুভাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হইলেন। সুলতান বহলোল যখন পরগণা বারীর[২] সন্নিকটে গমন করিলেন, তখন ঐ স্থানের শাসনকর্তা ইকবাল খান খেদমত করিলেন এবং তাহার কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত হইলেন। তিনিও কর রূপে কয়েক মণ স্বর্ণ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে বারি দেওয়া হইল। ঐ স্থান হইতে সুলতান বহলোল রণথম্ভোরের অধীনস্থ স্থান অলহানপুর[৩] অঞ্চল তিনি লুট করিলেন এবং ইহার ফলের উদ্যানসমূহ এবং শস্যক্ষেত বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপর দিল্লী আগমন করিলেন।

আর তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তিনি হিসার ফিরোযা গমন করিলেন এবং কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিলেন এবং তৎপর পুনরায় দিল্লী আগমন করিলেন। ইহার কিছুকাল পর তিনি গোয়ালিয়র অভিমুখে গমন করিলেন। গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা রাজা খান তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং তাহাকে কর রূপে আশি লক্ষ তংকা প্রদান করিলেন। তিনি রাজা মানকে ঐ স্থানে বহাল রাখিলেন। ঐ স্থান হইতে সুলতান ইতাওয়া গমন করিলেন আর ঐ অঞ্চলটি রায় দান্দোর পুত্র সকত সিংহের[৪] নিকট হইতে দখল করিয়া লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং সকেত পরগণার অধীনস্থ মৌযা তিলাওয়ানীর[৫] নিকটে

১. বদাওনী আযম হুমায়ুনকে, 'বায়েযিদ নামে তাহার অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভুল। তাবাকাত-ই-আকবরী এবং ফিরিশতা উভয়ে সুলতান বহলোলের সহিত তাহার সঠিক সম্পর্ক দিয়াছেন।

২. ফিরিশতা বারী বা তাহার শাসনকর্তা ইকবাল খানের কোন উল্লেখ করেন নাই, আর বদাওনী শুধু বলিয়াছেন যে সুলতান বহলোল ইহা অতিক্রম করেন।

৩. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে অলহানপুর, অপর একটিতে আছে আশনানপুর, অপর একটিতে আছে অলনপুর; কিন্তু ফিরিশতা লিখিয়াছেন ইলাহীপুর।

৪. বদাওনী ইহার উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন সকেত সিংহ। কিন্তু তাবাকাতের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে সকত সিংহ।

৫. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে তিলাওয়ালী, একটিতে আছে বিলাওয়ালী, আর একটিতে আছে বলাওয়া। বদাওনী স্থানটির নাম উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন ভাদোয়ালী। কর্ণেল রেক্তিং

আঃ হিজরা ৮৯৪ সনে (১৪৮৮খ্রীঃ) তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি আটত্রিশ বৎসর আট মাস এবং আট দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কবিতা

আফ্রাসিয়াব বা যালের পুত্র[১] যেই হোক না কেন
ভাগ্যের হস্তে তাহাকে সাজা পাইতেই হইবে ;
পেয়ালার নিয়ামক পেয়ালায় যাহা পরিমাপ করিয়াছেন
তাহার সাথে এক বিন্দু যোগ করা মানুষের সাধ্যাতীত।
ইনি রাজা-ই-হোন বা ঘাস[২] বিক্রেতাই হোন
ফেরেশতা তাহার কানে মৃত্যুর বাণী বহন করিবেই।

আর তাহারা তাহার ইন্তেকালের তারিখটাই স্মরণে রাখিবার জন্য নিম্ন কবিতাটি লিখিয়াছেন।

কবিতা

আট শত চোরানব্বই সনে এই পৃথিবী ত্যাগ করেন
সুলতান বহলোল যিনি বহু দেশ আর পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন
তাহার তরবারি দ্বারা তিনি পৃথিবী জয় করেন, কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতাকে
তরবারি আর সুতীক্ষ্ণ ছোরা দ্বারা ফিরান যায় না।

সুলতান সিকান্দর, পিতা সুলতান বহলোল লোদী

সুলতান বহলোল যখন তাহার প্রাণ আত্মার রক্ষাকারীর নিকট সমর্পণ করিলেন তখন শাহযাদা নিযাম খান[৩] ছিলেন দিল্লীতে। দ্রুতগতিতে বাতাসকেও হার

ফিরিশতার একটি পাণ্ডুলিপি হইতে লিখিয়াছেন ভদাউনী। তিনি এক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সকেত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ইতাহ জেলায় অবস্থিত আর হান্টারের মতে এই স্থানেই বহলোল লোদী ইন্তেকাল করেন। আবুল ফযল বলেন যে তিনি সকথ শহরের সন্নিকটে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তিনি ভাদাওয়ালী আগ্রা সুবার সাহার সরকারে অবস্থিত বলিয়াছেন আর সকত কণৌজ সরকারে অবস্থিত বলিয়াছেন।

১. বদাওনীতেও এই কবিতাগুলি দেওয়া আছে। যালের পুত্র রুস্তম। রুস্তম খ্যাতনামা পারসিক মহাবীর।

২. প্রকৃত শব্দটি হইল খসকরোনা, অর্থাৎ খস বিক্রেতা। খস এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস।

৩. সুলতান সিকান্দর বা নিযাম শাহের সিংহাসনারোহণের সময় যথেষ্ট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হইয়াছিল কারণ তাহার মাতা ছিলেন একজন স্বর্ণকারের কন্যা, কিন্তু খান খানান ফরমুলি দৃঢ়তার সহিত তাহাকে সমর্থন করেন।

মানাইয়া তিনি সুলতান বহলোলের শবাধার লইয়া জালালী শহরে গমন করিলেন এবং শেষোক্ত জনের শব দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া আব সিয়ার (অর্থাৎ কাল নদী বা কালী নদী) তীরের এক সুউচ্চ স্থানে, জালালী শহরের নিকটস্থ এই স্থানকে বলা হইত সুলতান ফিরোযের প্রাসাদ, আঃ হিজরা ৮৯৪ সনের ১৪৮৮ খ্রীঃ) ১৭ই শাবান, খান-ই-জাহান খান-ই-খানাম ফরমুলি এবং তাহার পিতার আমীরগণের সম্মতিক্রমে নিজেকে সার্বভৌমত্বের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং সুলতান সিকান্দর উপাধি গ্রহণ করিলেন।

কবিতা

চন্দ্র যখন আকাশের নীল পর্দায় নিজেকে ঢাকিয়া রাখে
দিগন্তের উপরের সূর্য তাহার মুখ তুলিয়া ধরে।
যুই ঝরিয়া যায় কিন্তু ডালিম ফুল ফুটিয়া উঠে;
উদ্যানে প্রতিটি আপনার সময় মত প্রস্ফুটিত হয়।

ঐ সময়ে সুলতান বহলোলের ছয়[1] পুত্র ছিল; ইব্রাহীম খান এবং জালাল খান এবং ইসমাইল খান, এবং হুসেন খান এবং মাহমুদ খান এবং শেখ আযম হুমায়ুন; আর তাহার তেপ্পান্ন জন[2] উল্লেখযোগ্য আমীর ছিল; খান জাহান লোদীর পুত্র খান-ই জাহান মুবারক খান, লোহানীর পুত্র আহমদ খান লোদী, মাহমুদ খান লোদী, তাতার খান লোদীর পুত্র ইসা খান, খান-ই খানান শেখযাদা মুহম্মদ ফরমুলি, খান-ই খানান লোহানী, আযম হুমায়ুন শরওয়ানী, বিহারের নায়েব মুবারক খান লোহানীর পুত্র দরিয়া খান, আলম খান লোদী, কাল্পীর নায়েব মাহমুদ খান লোদীর পুত্র জালাল খান, শের খান লোদী, মুবারক খান লোদী মুসা ঘাইল, মুবারক খান লোদীর পুত্র আহমদ খান, খান-ই খানান ফরমুলির পুত্র ইমাদ, উমর খান শরওয়ানী, আলম খান লোদীর পুত্র ভিখন খান—ইতাওয়ার গভর্ণর, ইব্রাহীম খান শরওয়ানী, মুহম্মদ শাহ লোদী, বাবর খান শরওয়ানী, সারণের নায়েব হাসান ফরমুলি, খান-ই-খানান ফরমুলির দ্বিতীয় পুত্র সুলেমান ফরমুলি, মুবারক খান লোদীর পুত্র সইদ খান লোদী, ইসমাইল খান লোহানী, তাতার খান ফরমুলি, উসমান খান ফরমুলি, ইমাদ ফরমুলির পুত্র শেখযাদা মুহম্মদ, শেখ জামাল উসমান, শেখ আহমদ ফরমুলি, আদম লোদী, আদম লোদীর ভ্রাতা হুসেন খান, কবির খান লোদী, নাসির খান লোহানী, ঘাযী

১. অর্থাৎ নিজাম শাহকে বাদ দিয়া। পূর্ববর্তী এক সময়ে সুলতান বহলোলের নয় পুত্র ছিল।
২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। লোহানী অনেক সময় লোহানী বা নুহানী লিখিত আছে।

খান লোদী, জাথরার[১] গভর্ণর তাতার খান, হিজাব খান মৌলানা জুমন কমবু, হিজাব খাস মজদুদ্দীন, হিজাবু খাস শেখ ওমর, হিজাব খাস শেখ ইব্রাহীম, হিজাব খাস মকবিল, তাহির কাবুলীর পুত্র হিজাব খাস কাযী আবদুল ওয়াহিদ, খাওয়ান খানের পুত্র হিজাব খাস[২] ভুরাহ[৩], খাজা নসরুল্লাহ্, মুবারক খান, বারি শহরের গভর্ণর ইকবাল খান, দিল্লীর গভর্ণর এবং কাওয়ামের পুত্র, খাজা আসঘর, মুবারক খান লোহানীর ভ্রাতা শের খান, ইমাদুল-মুলক কমবু, দরিয়া খান লোহানীর উপাধি, ছিল মীর আদল বা প্রধান বিচারক।

কিছুকাল পর সুলতান সিকান্দর পরগণা রাপ্রী অভিমুখে গমন করিলেন; সুলতানের ভ্রাতা আলম খান[৪] কয়েকদিন রাপ্রী এবং চান্দোয়ারের দুর্গে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পলায়ন করিলেন এবং পাতিয়ালিতে তাতার খান লোদীর পুত্র ইসা খানের[৫] নিকট গমন করিলেন। রাপ্রী অঞ্চলটি খান খানান লোহানীকে দেওয়া হইল।[*] সুলতান ইতাওয়া গমন করিলেন এবং তথায় সাত মাস কাল অতিবাহিত করিলেন; তিনি আলম খানের জন্য গমন করিলেন এবং তাহাকে নিজের পক্ষে আনয়ন করিলেন এবং তাহাকে আযম হুমায়ুনের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দিলেন এবং তাহাকে ইতাওয়া অঞ্চলটি প্রদান করিলেন। শান্তি স্থাপনের[৬] জন্য তিনি ইসমাইল খান লোহানীকে জৌনপুরের বাদশাহ বারবক শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন আর নিজে পাতিয়ালির গভর্ণর ইসা খানকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন।

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানটির নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন জথবা, জহত্রা, ঝবাহ এবং ঝাতওয়া। ফিরিশতা লিখিয়াছেন তিজ্রাবা।
২. ফিরিশতা নয় ব্যক্তিকে হাজিব খাস আখ্যা দিয়াছেন। কর্ণেল ব্রিগস তাহাদিগকে শয়ন কক্ষের পার্শ্ব চররূপে আখ্যা দিয়াছেন।
৩. ফিরিশতা লিখিয়াছেন ভুরাহ খান; কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন মিয়া ভুরি।
৪. ফিরিশতা বলেন যে মৃত্যুর পূর্বে সুলতান বহলোল নিম্নরূপে তাহার সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া যান; তিনি শাহযাদা বারবক শাহকে দেন জৌনপুর; শাহযাদা আলম খানকে দেন কারা এবং মানিকপুর। তাহার ভাগীনেয় শেখ মুহম্মদ ফরমুলিকে দেন বাহরাইচ, ইনি কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা বায়েযিদের পুত্র আযম হুমায়ুনকে দেন লক্ষ্ণৌ ও কাল্পী, খাজা বায়েযিদ ইহার পূর্বেই তাহার একজন খিদমতগারের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন; তাহার আত্মীয় এবং একজন অতি বিশ্বাসী আমীর খান জাহানীকে দেন বদাওন আর শাহযাদা নিযাম খানকে দেন দিল্লী এবং দোয়াবের বিস্তৃত অঞ্চল। আর তাহাকে তিনি তাহার উত্তরাধিকারী করেন এবং ইনি পরে সুলতান সিকান্দর লোদী নাম গ্রহণ করেন।
৫. ঈসা খান ছিলেন সুলতান সিকান্দরের চাচাতো ভাই এবং তাহার সিংহাসনারোহণে দৃঢ়তার সহিত বাধা দিয়াছিলেন।
৬. সুলতান কি ধরনের শান্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

শেষোক্ত জন কিছু যুদ্ধের পর আহত হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিনীতভাবে আসিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি তাহার ক্ষতের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রায় গনেশ[১] বারবক শাহের পক্ষে ছিলেন, তিনি আসিয়া সুলতানের সহিত যোগদান করিলেন। পাতিয়ালি জেলাটি তাহাকে বরাদ্দ করা হইল। অতঃপর সুলতান বারবক শাহকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। শেষোক্ত জন জৌনপুর হইতে কান্যকুব্জে গমন করিলেন এবং উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং কিছুকাল যুদ্ধের পর মুবারক খানকে[২] বন্দী করা হইল এবং বারবক শাহ পরাজিত হইয়া বদাওন গমন করিলেন। সুলতান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহাকে অবরোধ করিলেন। অতঃপর বারবক শাহ অতি বিনয়ের সহিত তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। সুলতান তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন এবং তাহার হৃদয়কে উৎফুল্ল করিলেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া জৌনপুর গমন করিলেন আর পূর্বের ন্যায় তাহাকে শর্কী সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্তু ঐ রাজ্যের পরগণাগুলি তাহার নিজের আমীরগণের মধ্যে বিলি করিলেন এবং সর্বত্র তাহার নিজস্ব অফিসার নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার চাকুরীতে নিজের বিশ্বস্ত লোকদের নিযুক্ত করিলেন।[৩]

ঐ স্থান হইতে তিনি কোটলা এবং কাম্পী গমন করিলেন এবং শাহযাদা খাজা বায়েযিদের পুত্র আযম হুমায়ুনের নিকট হইতে কাম্পী ছিনাইয়া নিয়া তাহা মুহম্মদ খান লোদীকে প্রদান করিলেন। ঐ স্থান হইতে তিনি জথরা[৪] গমন করিলেন। জথরার গভর্ণর তাতার খান আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার দায়িত্বসমূহ পালন করিলেন এবং ঐ স্থানের শাসনে তাহাকে অনুমোদন দেওয়া হইল। অতঃপর তিনি গোয়ালিয়র দুর্গের অভিমুখে গমন করিলেন; এবং খাজা মুহম্মদ ফরমুলিকে একটি বিশেষ সম্মানীয় অঙ্গাবরণসহ ঐ স্থানের রাজা মানের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জন বিনীত ব্যবহার করিয়া সুলতানের খেদমতের জন্য তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রেরণ করিলেন

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই নামটি আছে রায় কানেস। বদাওনীর দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে রায় কিস্তন এবং রায় কনেস, আর একটিতে আছে রায় গণেশ। ফিরিশতা লিখিয়াছেন রায় কিলন।

২. বদাওনী বলেন যে মুবারক খান লোহানী ছিলেন বারবক শাহের সেনাবাহিনীর সঙ্গে এবং তাহাকে বন্দী করা হয়। দেখা যায় যে কালা পাহাড় নামে পরিচিত মুহম্মদ খান ফরমুলিকেও এই যুদ্ধে বন্দী করা হয়।

৩. এই অংশটির অর্থ খুব সুস্পষ্ট নয়। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাঠের সামান্য গরমিল আছে। বদাওনী এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি তথায় এক দল সৈন্য রাখিয়া আসেন, অফিসার নহে। কর্ণেল রেঙ্কিং-এর মতে এইসব অফিসারগণকে বারবক শাহকে আয়ত্বে রাখিবার জন্য তথায় রাখিয়া আসা হয়।

৪. ফিরিশতা লিখিয়াছেন জহতরা।

এবং তাহাকে নির্দেশ দিলেন বিয়ানা পর্যন্ত সুলতানের সঙ্গে গমন করিবার জন্য। সুলতান আহমদ জিলওয়ানীর পুত্র, বিয়ানার গভর্ণর সুলতান শর্ক[১] অগ্রবর্তী হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। সুলতান তাহাকে বিয়ানা প্রত্যর্পণের নির্দেশে দিলেন যাহাতে ইহার পরিবর্তে তাহাতে জালেসর এবং চান্দোয়ার, এবং মারহরাক এবং সকেত প্রদান করা যায়। সুলতান শর্ক তাহার সঙ্গে উমর খান শরওয়ানীকে[২] বিয়ানা নিয়া গেলেন, যাহাতে তিনি তাহার নিকট দুর্গের চাবি সমর্পণ করিতে পারেন। তিনি যখন বিয়ানা আগমন করিলেন, তখন কিন্তু তিনি তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন, এবং দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। সুলতান সিকান্দর আগ্রা আগমন করিলেন। সুলতান শর্কের অনুচর হায়বত খান জিলওয়ানী নিজেকে আগ্রা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সুলতান আগ্রা অবরোধ অব্যাহত রাখিবার জন্য কতিপয় আমীরকে তথায় রাখিয়া গেলেন এবং স্বয়ং পুনরায় বিয়ানা গমন করিলেন এবং তাহা অবরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। সুলতান শর্ক যখন চরম দুরবস্থায় পতিত হইলেন, তখন তিনি বিনীতভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আর আঃ হিজরা ৮৯৭ সনে (১৪৯১ খ্রীঃ) বিয়ানা অধিকৃত হইল; আর এই অঞ্চলটি খান-ই খানান ফরমুলিকে বরাদ্দ করা হইল। সুলতান শর্ককে ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং তিনি গোয়ালিয়র গমন করিলেন। সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তথায় চব্বিশ দিন অবস্থান করিলেন।

এই সময় সংবাদ আসে যে জৌনপুর অঞ্চলের জমিদারগণ এবং বাচগোতিগণ[৩] এবং অন্যান্য লোকজনে মিলিয়া সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষ পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে এবং মুবারক খানের[৪] ভ্রাতা শের খান তাহাদের হস্তে শহীদ হইয়াছেন; আর মুবারক খান নিজেও যখন তিনি জোসি প্রাকের[৫]

১. নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ, আছে যেমন শবক, আশরফ। বদাওনী লিখিয়াছেন সুলতান আশরফ, ফিরিশতা লিখিয়াছেন সুলতান শবফ।

২. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে সরওয়ানী; কিন্তু উপজাতিটির নাম অনুযায়ী ইহা শরওয়ানী লেখা হইয়াছে।

৩. এক রাজপুত উপজাতি; কথিত আছে ইহারা মইনপুরী চৌহানদের বংশধর, এবং তাহাদের অশান্ত প্রকৃতির জন্য কুখ্যাত; তাহারা আদিতে মুসলমান ছিল। তারিখ-ই দাউদী হইতে জানা যায় যে তাহারা জুগা নামক একজন হিন্দু কর্তৃক পরিচালিত হইত।

৪. কারার গভর্ণর মুবারক খান লোহানী।

৫. প্রাক. সম্ভবতঃ প্রয়াগের অপভ্রংশ; প্রয়াগ এলাহাবাদের প্রাচীন নাম। ইহা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এলাহাবাদে বর্তমানে ঝোসি নামে পরিচিত একটি স্থান আছে, সম্ভবতঃ ইহাই এই গ্রন্থের জোসি।

ফেরী অতিক্রম করিতেছিলেন, এই স্থানটি ছিল বর্তমানে যেথায় ইলাহাবাদ[১] শহরটি অবস্থিত তথায়, এবং ইহা ছিল হযরত খলিফা-ই ইলাহী (সম্রাট আকবর) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শহর, তাহাকে নৌকার মাঝিগণ বন্দী করে।[২] পাটনার রাজা রায় ভিদ[৩] এই সংবাদ পাইয়া মুবারক খানকে তাহার গ্রেপ্তারকারীগণের হাত হইতে নিয়া কারাগারে আটক করিয়া রাখেন। বারবক শাহ এই লোকগুলির ক্ষমতার কথা অবগত হইয়া জৌনপুর হইতে দরিয়াবাদে কালা পাহাড় নামে পরিচিত মুহম্মদ ফরমুলির নিকট আগমন করিলেন।

আঃ হিজরা ৮৯৭ সনে (১৪৯১ খ্রীঃ) পুনরায় ঐ দিকে গমন করিলেন এবং গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া তিনি দলমৌ[৪] আগমন করিলেন। বারবক শাহ তাহার সকল আমীরসহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন এবং তাহাদের অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করা হইল। রায় ভিদ সুলতানের আগমনের জাঁকজমক এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে এত অবাক হইলেন যে তিনি মুবারক খান লোহানীকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জন তথা হইতে কহতর[৫] গমন করিলেন। তথায় বহু সংখ্যক জমিদার আগমন করিলেন এবং বাধা দান করিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন এবং বহু সংখ্যক তরবারির খাপ্ত হইল আর বাকী সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য সুলতানের সৈন্যদের হস্তগত হইল। অতঃপর সুলতান জৌনপুর গমন করিলেন এবং পুনরায় বারবক শাহকে তথায় রাখিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি অযোধ্যার নিকটবর্তী অঞ্চলে ইতস্ততঃ ভ্রমণে এবং শিকারে এক মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। তিনি যখন কহতর-এ পৌঁছিলেন তখন তাহার নিকট সংবাদ আনয়ন করা হইল যে জমিদারগণের দৌরাত্মের ফলে বারবক শাহ জৌনপুরে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না। সুলতান নির্দেশ দিলেন যে মুহম্মদ ফরমুলি এবং আযম হুমায়ুন এবং খান খানান লোহানী অযোধ্যা হইয়া জৌনপুর গমন করিবেন আর মুবারক খান গমন করিবেন আগ্রার পথে এবং বারবক শাহকে বন্দী করিয়া সুলতানের নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহারা এই নির্দেশ অনুযায়ী জৌনপুর গমন করিলেন

১. কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ইহা 'ইলহায়াস' লিখা আছে।
২. তারিখ-ই-দাউদীর মতে মুবারক খানকে বন্দী করেন মুল্লা খান। এই মুল্লা সম্ভবতঃ সুলতান হুসেন শর্কীর কোন আমীর হইবেন।
৩. পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন: রাজা ভিত, রায় ভিনদ, রাজা বহত, রায় নিন্দ; রায় সিন্দ, রায় মনদ।
৪. দলমৌ কান্নার বিপরীত দিকে গঙ্গার অপর তীরে অবস্থিত।
৫. অর্থাৎ বর্তমানে রোহিলখণ্ড নামে পরিচিত অঞ্চল।

এবং বারবক শাহ গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। বারবক শাহকে যখন সুলতানের সম্মুখে হাজির করা হইল তখন তিনি তাহাকে হায়বত খান এবং উমর খান শরওয়ানীর কর্তৃত্বে ন্যস্ত করিলেন। অতঃপর সুলতান জৌনপুরের উপকণ্ঠ হইতে চুনার[১] অভিমুখে গমন করিলেন। সুলতান হুসেন শর্কীর কতিপয় আমীর তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারা যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহারা পরাজিত হইলেন এবং নিজেদের দুর্গাভ্যন্তরে আটক করিয়া রাখিলেন। দুর্গটি যেহেতু শক্তিশালী ছিল, সুলতান তাহা অবরোধ করিলেন না। কিন্তু পাটনা অধীনস্থ কন্তাত[২] নামক স্থানের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ স্থানের রাজা, রাজা ভিদ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিলেন এবং বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সুলতান তাহাকে কন্তাতের শাসনে অনুমোদন দান করিলেন এবং আরিল অভিমুখে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে রায় ভিদ সন্দিহান হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সাজ-সরঞ্জাম এবং রাজত্বের প্রতীকসমূহ ফেলিয়া পাটনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সুলতান তাহার সমস্ত সম্পদ এবং সাজ-সরঞ্জাম তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সুলতান যখন আরিল[৩] পৌঁছিলেন; তিনি লুণ্ঠনের জন্য তাহার হস্ত প্রসারিত করিলেন এবং ফলের উদ্যান, বাগান ও গৃহাদি ধ্বংস করিয়া দিলেন; এবং কাররার পথে দলমৌ গমন করিলেন; আর মুবারক খান লোহানীর ভ্রাতা শের খানের নিকাহ স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া শামসাবাদে আগমন করিলেন এবং তথায় ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়া সম্বল গমন করিলেন; এবং পুনরায় সম্বল হইতে শামসাবাদ অভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি মদমৌনাকল[৪] শহরের অধিবাসীগণকে লুট এবং হত্যা করিলেন; কারণ এই স্থানটি ছিল দুর্দান্ত এবং উশৃঙ্খল লোকদের আবাসস্থল এবং আশ্রয়স্থল। শেষোক্তগণ উযিরাবাদ পলায়ন করিলেন। উযিরাবাদের লোকদেরও হত্যা করা হয় এবং বন্দী করা হয়; এবং তৎপর সুলতান শামসাবাদ আগমন করেন এবং বর্ষাকাল তথায় অতিবাহিত করেন।

---

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন জুনাবা, জুনার, বা চুনার। বদাওনীতে আছে জুনহাব এবং জুনার। ফিরিশতাতে আছে জুনার।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে একটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন কনতাত, কসতাত এবং কিলু, কনতানাত। বদাওনী এই স্থানটির উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন কতনবা। এলাহাবাদ সরকারে, গঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

৩. এই নামটি পাণ্ডুলিপিতে আরিল এবং আরিয়াল দুই প্রকারই দেওয়া আছে। বদাওনী আরিল এবং এবং আরকল দুইই দিয়াছেন। ফিরিশতা লিখিয়াছেন আরিল। আবুল ফযল লিখিয়াছেন আরাইল।

৪. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন মদমৌনাকাল, মদৌনাকাল ইত্যাদি। বদাওনী স্থানটির উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন দিউতারি।

আঃ হিজরা ৯০০ সনে (১৪৯৪ খ্রীঃ) সুলতান রাজা ভিদকে[১] শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে পাটনা অভিমুখে গমন করেন; আর পথিমধ্যে বিদ্রোহীগণের গ্রামসমূহকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং অধিবাসীগণকে হত্যা করা হয় অথবা বন্দী করা হয়। তিনি যখন খারন ঘাটি[২] পৌঁছেন তখন পাটনার রাজার পুত্র নরসিংহের[৩] সহিত তাহার এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নরসিংহ পরাজিত হন এবং ঘাটি ত্যাগ করিয়া পাটনা অভিমুখে পলায়ন করেন। সুলতান যখন পাটনা আগমন করিলেন রাজা সরকনজা[৪] অভিমুখে পলায়ন করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুলতান সরকনজা হইতে পাটনা অধীনস্থ সউন্দ[৫] নামক স্থানের অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন আগমন করিলেন তখন আফিং এবং কোকনার[৬] এবং লবণ এবং তৈল অত্যধিক দুর্মূল্য হইয়া উঠে। তথা হইতে সুলতান জৌনপুর গমন করিলেন। পাটনা গমনের পথে অশ্বগুলি অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াছিল, অধিক সংখ্যায় মরিতে লাগিল। এত অধিক সংখ্যায় মরিল যে সেনাবাহিনীতে যাহার একশতটি অশ্ব ছিল তাহার নব্বইটিই মরিয়া গেল।

রায় ভিদের পুত্র রায় লক্ষী চাঁদ এবং জমিদারগণের সকলে সুলতান হুসেনের নিকট লিখিলেন যে সুলতান সিকান্দরের বাহিনীতে কোন অশ্ব অবশিষ্ট নাই আর রসদও ফুরাইয়া আসিয়াছে; এই এক মহা সুযোগ। সুলতান হুসেন তাহার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং বিহার হইতে একশত হস্তীসহ সুলতান সিকান্দরকে আক্রমণ করিতে আগমন করিলেন। শেষোক্ত জন কনতাতের চড়া দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিলেন এবং চুনায় আগমন করিলেন এবং তথা হইতে বানারস আসিলেন; এবং রায় ভিদের

১. বদাওনী বলেন যে 'তিনি পাটনা অঞ্চলের বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দানের জন্য গমন করেন', কিন্তু কোন রাজার উল্লেখ করেন নাই; ফিরিশতা বলেন রাজা রায় বলভদ্র।

২. পাণ্ডুলিপিতে খারন ঘাটি বা ঘাটি এবং খারুন লা-ইলালি দেওয়া আছে। বদাওনী এই স্থানটির নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি শুধু বলেন সুলতান পাটনা জেলাসমূহে অবস্থান করিয়া এবং বহু লোককে বন্দী করিয়া জৌনপুরে গমন করিলেন। ফিরিশতা যে স্থানে নরসিংহ পরাজিত হইয়াছিলেন তাহার নাম লিখিয়াছেন ছন্দিয়া ঘাট। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে খান ঘাটি।

৩. পাণ্ডুলিপিতে নামটি নরসিংহ এবং বরসিংহ উভয় প্রকারই দেওয়া আছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন নরসিংহ। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে ইহার নাম লিখা হইয়াছে বীরসিংহ দেও।

৪. ফিরিশতা এই স্থানটির নাম লিখিয়াছেন 'সরকছ'। কর্ণেল লিখিয়াছেন সুর গুজা।

৫. পাণ্ডুলিপিগুলিতে সৌন্দ এবং সহদোয়ার দুই প্রকারই আছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন সহদেও। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে ফাফুন্দ।

৬. আফিং হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার অত্যধিক মাদকতা শক্তি আছে।

পুত্র শালবাহনকে[১] অনুগ্রহের আশ্বাস দিয়া সুলতানের নিকট আনয়নের জন্য খান-ই খানানকে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে সুলতান হুসেনের সৈন্যবাহিনী বানারস হইতে আঠারো কারোহ দূরে অবস্থিত ছিল। সুলতান সিকান্দর অতি দ্রুতগতিতে সুলতান হুসেনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে শালবাহন আনুগত্য প্রকাশ করিতে আগমন করিলেন। খণ্ডযুদ্ধের পর একটি নিয়মিত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সুলতান হুসেন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পাটনা অঞ্চলে গমন করিলেন। সুলতান তাহার শিবির পেছনে ফেলিয়া এক লক্ষ (হাম্বা) অশ্বারোহী সৈন্যসহ সুলতান হুসেনের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং পথিমধ্যে তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় যে সুলতান হুসেন বিহার গমন করিয়াছেন। নয়দিন পর সুলতান প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার শিবিরে যোগ দিলেন এবং বিহার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সুলতান হুসেন বিহার দুর্গে মালিক কন্দু[২]কে রাখিয়া লক্ষ্ণাবতীর অধীনস্থ খুল-গানোন গমন করেন। সুলতান সিকান্দর দেওবারে[৩] অবস্থিত তাহার শিবির হইতে মালিক কন্দুকে আক্রমণের জন্য এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিলেন আর বিহার সিকান্দরের অফিসারগণের হস্তগত হইল।

সুলতান অন্যান্য কতিপয় আমীরসহ মহাবত খানকে বিহারে রাখিয়া যান এবং দরবেশপুর গমন করেন এবং খান-ই খানান এবং খান-ই জাহানকে শিবির এবং সাজ-সরঞ্জামের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রাখিয়া তিরহুত অভিমুখে গমন করেন। তিরহুতের রায় অগ্রবর্তী হইয়া আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। সুলতান তাহার প্রতি কয়েক লক্ষ তংকা কর ধার্য করিলেন এবং ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য মুবারক খানকে রাখিয়া আসিলেন এবং পুনরায় দরবেশপুরে তাহার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আঃ হিজরা ৯০১ সনের ১৪৯৫ খ্রীঃ) ১৬ই শাওয়াল খান-ই জাহান ইন্তেকাল করিলেন। সুলতান তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমদ খানকে আযম হুমায়ুন উপাধিতে

১. অদ্ভুত ব্যাপার এই যে রাজা ভিদের এক পুত্র সুলতান হুসেনের পক্ষাবলম্বন করেন এবং আর এক পুত্র সুলতান সিকান্দরের পক্ষে থাকেন। বদাওনী শালবাহনকে পাটনার রাজারূপে অভিহিত করেন এবং তিনি একজন অতি বিশ্বাসভাজন এবং সমৃদ্ধশালী জমিদার ছিলেন।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে তাহার নাম মালিক কন্দু দেওয়া আছে। বদাওনী কোন নাম দেন নাই, কিন্তু বলেন যে সুলতান হুসেন বিহারে তাহার নায়েবকে রাখিয়া যান। ফিরিশতা তাহার নাম লিখিয়াছেন মালিক খন্দু। ফিরিশতায় অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মালিক কন্দু।

৩. এই নামটি পাণ্ডুলিপিগুলিতে দেওবার এবং দেওযার এই দুই প্রকারই দেওয়া আছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন দেওবার।

ভূষিত করেন। ইহার পর তিনি বিহারে শেখ শরফ মুনিরীর[১] (আল্লাহ যেন তাহার বিশ্রামস্থানকে পবিত্র করেন) কবর জিয়ারত করিতে গমন করেন; তিনি ঐ স্থানের ফকির এবং দরিদ্রগণকে সুখী করেন; এবং তৎপর দরবেশপুর প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ স্থান হইত তিনি বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন বাদশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি যখন বিহারের অধীনস্থ স্থান তুঘলকপুরে[২] আগমন করিলেন, সুলতান আলা-উদ্দীন তাহার পুত্র দানিয়েলকে তাহার সহিত মোকাবেলা করিতে প্রেরণ করিলেন। সিকান্দর, তাহার বিরুদ্ধে মাহমুদ খান লোদী এবং মুবারক খান লোহানীকে তাহার তরফ হইতে প্রেরণ করিলেন। উভয় বাহিনী বারহ মৌযায় পরস্পরের সম্মুখীন হইল; এবং এক সন্ধির শর্তাবলী প্রস্তাব করা হয় এবং ইহা স্থির হয় যে সুলতান সিকান্দর, সুলতান আলাউদ্দীনের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিবেন না এবং অনুরূপভাবে সুলতান শেষোক্তজনও কোন প্রকারেই সুলতান সিকান্দরের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং তাহার শত্রুদেরও আশ্রয় দান করিবেন না। এই সন্ধির পর মাহমুদ খান এবং মুবারক খান লোহানী প্রত্যাবর্তন করিলেন; এবং মুবারক খান, বিহারের অধীনস্থ পাটনা শহরে ইন্তেকাল করিলেন। সুলতান সিকান্দর তুঘলকপুর হইতে দরবেশপুর গমন করিলেন এবং তথায় কয়েক মাস অবস্থান করিলেন। ঐ অঞ্চলটি আযম হুমায়ুনকে দেওয়া হইল এবং মুবারক খানের পুত্র দরিয়া খান বিহার প্রদেশ লাভ করিলেন।

এই বৎসরে শস্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য (সুলতান) তাহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র শস্যে আদায়ীকৃত যাকাত আদায় রহিত করিয়া দেন এবং যাকাত আদায় নিষিদ্ধ করিয়া ফরমান জারী করা হয় এবং ঐ দিন হইতে শস্য দ্বারা যাকাত আদায় করা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

এই সময়ে সুলতান সারণ শহরে আগমন করেন এবং জমিদারগণের নিকট হইতে শহরের সন্নিকটস্থ কয়েকটি পরগণা নিয়া সেইগুলি জায়গীররূপে তাহার নিজস্ব লোকদের প্রদান করেন। সারণ হইতে মহলিগড়ের[৩] পথে জৌনপুর আগমন করেন এবং তথায় ছয় মাসকাল অবস্থান করিবার পর পাটনা অথবা পান্না[৪] অভিমুখে অগ্রসর

১. তিনি ছিলেন ইয়াহিয়া বিন ইসরাইলের পুত্র। ইয়াহিয়া বিন ইসরাইল ছিলেন চিশতী সম্প্রদায়ের নেতা এবং গঞ্জ-ই-শকবের একজন শিষ্য। বিহারে তাহার কবর অবস্থিত।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে তুঘলকপুর। একটি পাণ্ডুলিপি আর ফিরিশতাতে আছে কুতলঘপুর। বদাওনী স্থানটির নাম উল্লেখ করেন নাই, শুধু বলেন দানিয়েল তাহার মোকাবেলা করিবার জন্য বিহারের সন্নিকটে আগমন করিলেন।

৩. পাণ্ডুলিপিগুলিতে আছে মহলিগড়। বদাওনী লিখিয়াছেন মহলিগড়। ফিরিশতা লিখিয়াছেন মহজিগড়।

৪. পাণ্ডুলিপিগুলি হইতে সঠিক নামটি উদ্ধার করা খুব শক্ত। বদাওনীর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে পান্না কিন্তু অন্যান্যগুলিতে আছে পাটনা। ফিরিশতা লিখিয়াছেন পাথনা। ব্রিগস তাহার অনুবাদে

হন। কথিত আছে যে সুলতান পাটনার রায়, রায় সালিবাহনের নিকট তাহার এক কন্যাকে[১] চাহেন ; আর তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন। সুলতান ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আঃ হিজরা ৯০৪ সনে (১৪৯৮ খ্রীঃ) পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হন ; আর তিনি যখন তথায় আগমন করিলেন, তিনি তাহার লুণ্ঠনের হস্ত প্রসারিত করিলেন এবং কৃষিকার্যের কোন চিহ্ন রাখিলেন না। তিনি অতঃপর বান্ধুগড়[২] দুর্গে আগমন করিলেন। ইহা ছিল ঐ দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ এবং ইহার শাসনকর্তার আবাসস্থল। সুলতান তথায় আগমন করিলে সাহসী যোদ্ধাগণ বীরত্ব-পূর্ণ কার্য সম্পাদন করিলেন কিন্তু দুর্গের সুরক্ষিত অবস্থার জন্য সুলতান তথা হইতে জৌনপুর গমন করিলেন ; আর তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া রাষ্ট্রীয় কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তাহার অনুসন্ধানের সময় মুবারক খান মুজিঘাইল লোদীর[৩], যাহাকে বারবক শাহকে কারারুদ্ধ করিবার সময় জৌনপুরের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল, হিসাবপত্র পরীক্ষা করা হইল ; আর যদিও মুবারক খান নানারূপ কৌশল করিয়া এইগুলি অনুমোদন করাইয়া নিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং বহু খানকে দিয়া তাহার পক্ষে সুপারিশও করাইয়াছিলেন, তবু এইসব কোন কাজে আসিল না এবং নির্দেশ দেওয়া হইল যে সুলতানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েক বৎসরের আদায়ীকৃত রাজস্ব তাহার নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে।

এই সময়ে এক ঘটনা ঘটে যে সুলতান (একদিন) চৌগান[৪] খেলা করিতেছিলেন। এই খেলার মধ্যে দরিয়া খান সরওয়ানীর পুত্র সুলেমানের লাঠি, হায়বত খানের লাঠিতে আঘাত করিবার ফলে সুলেমানের মাথা ফাটিয়া যায় আর ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে এক বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং ইহা অসন্তোষের কারণ হয়। সুলে-মানের ভ্রাতা খিযর, তাহার ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইচ্ছা করিয়া একটি লাঠি

লিখিয়াছেন পান্না আর কর্ণেল রেভিং মনে করেন যে ইহাই সঠিক কারণ মাধোগড় বা বান্ধুগড় নামক স্থানের উল্লেখ হইতে এই স্থানই হইবে মনে হয়। তাহার মতে বান্ধুগড় ছিল বান্ধু প্রদেশের দুইটি প্রধান দুর্গের একটি। এই প্রদেশটির বর্তমান নাম রেওয়া রাজ্য। এই স্থানটি পান্না হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে যে রায় ভিদ এবং তাহার পুত্র সালবাহন ছিলেন পান্নার রাজা।

১. সালহাবাহনের কন্যা দাবী করিবার কথা বদাওনী উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ফিরিশতা উল্লেখ করিয়াছেন।

২. এই স্থানটির নাম বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন, বান্ধুগড়, মাধোগড় এবং মাদোগর।

৩. বদাওনী ইহারও কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ফিরিশতা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তিনি মুবারক খানকে মুবারক খান মুজি ; তিনি আরও বলেন যে ইহার ফলেই আফগান আমীরগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন।

৪. আরবীতে ইহাকে বলা হয় সৌলজান। ইহা পলো খেলার প্রাচ্যের সংস্করণ।

দ্বারা হায়বত খানের মস্তকে আঘাত করেন এবং এক গোলযোগ এব. হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। মাহমুদ খান এবং খান খানান হায়বত খানকে শান্ত করিয়া তাহাকে তাহার গৃহে নিয়া যান; আর সুলতান খেলার মাঠ ত্যাগ করিয়া তাহার প্রাসাদে গমন করেন। চার দিন পর তিনি পুনরায় চৌগান খেলিবার জন্য তাহার অশ্বে আরোহণ করেন। পথিমধ্যে হায়বত খানের আত্মীয় শামস খান নামী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি যখন সুলেমানের ভ্রাতা খিযরকে দেখিলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার চৌগান দ্বারা শেষোক্ত ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিলেন; আর সুলতানের নির্দেশে শামস খান বহু লাথি খান। সুলতান ফিরিয়া যান এবং তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করেন।

ইহার পর তিনি তাহার আমীরগণের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠেন এবং অন্য কতিপয় যাহাদিগকে তিনি তাহার প্রতি বিশ্বস্ত এবং তাহার অনুরক্ত বলিয়া জানিতেন তাহাদিগকে তাহার দেহরক্ষী নিযুক্ত করিলেন, আর এই* আমীরগণ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া প্রত্যেক রাত্রিতে তাহাকে পাহারা দিতেন। এই সময়ে কতিপয় (আমীর প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ করিলেন। বাইশ জন সরদার একত্র ষড়যন্ত্র করিলেন এবং সুলতান বহলোলের পুত্র শাহযাদা ফতেহ খানকে সিংহাসনের জন্য চেষ্টা করিতে প্ররোচিত করিলেন; আর শপথ গ্রহণ ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া এবং বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করে। শাহযাদা ব্যাপারটা শেখ তাহির[১] এবং তাহার নিজের মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়; আর ষড়যন্ত্রকারীদের নাম উল্লেখ করে। শেখ এবং শাহযাদার মাতা তাহাকে পরামর্শ দিলেন এবং এই স্থির হইল যে তিনি সব কিছু সুলতান সিকান্দরের নিকট খুলিয়া বলিবেন এবং এইরূপে তাহার পোশাক হইতে বিদ্রোহের দাগ মুছিয়া ফেলিবেন। তিনি তাহাই করিলেন এবং সুলতান ঐ দলটির রাজদ্রোহীতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া, তাহার মন্ত্রীগণের পরামশ অনুযায়ী, বিদ্রোহ দমনের জন্য তাহাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিলেন।

ইহার পর আঃ হিজরা ৯০৫ সনে (.৪৯৯ খ্রীঃ) সুলতান সম্বল গমন করিলেন এবং তথায় চারি বৎসর কাল অবস্থান করিয়া রাষ্ট্রের কার্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং সুখ এবং আরাম-আয়াশে অতিবাহিত করিলেন। তিনি তাহার বেশীর ভাগ সময় চৌগান খেলায় এবং শিকারে ব্যয় করিলেন।

১. বদাওনী ইহার নাম লিখিয়াছেন শেখ তাহির আর ফিরিশতা লিখিয়াছেন শেখ তাহির কাবুলী, কিন্তু তারিখ-ই-দাউদীতে তাহাকে বলা হইয়াছে শেখ তাহা।

এই সময়ে সুলতান দিল্লীর গভর্ণর আসঘরের দুষ্কর্ম এবং অসদুপায় অবলম্বনের সংবাদ পান এবং তিনি মছিওযারাব[১] গভর্ণর খাওয়াস খানকে নির্দেশ প্রেরণ করেন যেন তিনি আসঘর খানকে বন্দী করিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করেন। খাওয়াস খান এই নির্দেশ অনুযায়ী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু তিনি তথায় পৌঁছিবার পূর্বেই আসঘর আঃ হিঃ ৯০৬ সনের[২] (১৫০০ খ্রীঃ সফর মাসের শনিবার রাত্রিতে (দিল্লীর) দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং সত্বরে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। খাওয়াস খান দিল্লীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাহা শাসন করিতে আরম্ভ করেন।

সংবাদ পাওয়া যায় যে সৌধন[৩] নামে পৈতাধারী (ব্রাহ্মণ) এক লোক আছেন আর তিনি কানের নামক স্থানে বাস করেন। এক দিন কতিপয় মুসলমানদের উপস্থিতিতে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইসলাম সত্য ধর্ম আর তাহার নিজের ধর্মও সত্য। তাহার এই বাক্য প্রচারিত হইলে তাহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের গোচরে আসে। কাযী পিয়ারা[৪] এবং শেখ বদাহ, যাহারা উভয়েই লক্ষৌতিতে ছিলেন এবং উভয়েই পরস্পর বিরোধী ফতুয়া দিলেন। ঐ অঞ্চলের গভর্ণর আযম হুমায়ুন এই ব্রাহ্মণটিকে কাযী পিয়ারা এবং শেখ বদাহসহ সত্বরে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন। যেহেতু সুলতানের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনিবার অত্যধিক আগ্রহ ছিল, চতুর্দিক হইতে খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিদের আনয়ন করা হয়। শেখ খুজুর পুত্র মিয়া কাদন[৫] এবং ইলাহাদাদ তালানবীর পুত্র মিয়া আবদুল্লা; এবং সইদ খানের পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ

---

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে মছিওয়াক, একটিতে আছে মাস্তোয়াবা। অপর একটিতে আছে মাছওয়ারা। বদাওনীতে আছে মাছোয়াবা, আর ফিরিশতাতে আছে মাহিওয়ারা। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে মাচিওয়াবা। মাচিওয়ারা শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। হুমায়ুন যখন তাহার পারস্যে অবস্থানের পর ভারত বিজয়ে আগমন করেন তখন মাচিওয়ারাতে তাহার সেনাপতি বৈরাম খান ও অন্যান্যগণ আফগানদের পরাজিত করে।

২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে এবং ফিরিশতাতে কোন তারিখ দেওয়া নাই। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে ১লা সফর ৯০৬ হিজরা (২৭শে আগষ্ট ১৫০০ খ্রী:)।

৩. এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন লৌদন, বা লোদন এবং লৌধন বা লোধন এবং নৌধন বা নোধন। ফিরিশতা লিখিয়াছেন বুধন। কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন বুধুন। তারিখ-ই-দাউদীতে আছে লৌধন। কানের নামটিও বিভিন্নরূপ আছে যেমন কানেব, কানহের। ফিরিশতা লিখিয়াছেন কৈথান, তারিখ-ই-দাউদীতে আছে কানের।

৪. ফিরিশতা লিখিয়াছেন কাযী পিয়াদা আর কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন পুয়ালা। অপর নামটি ফিরিশতা লিখিয়াছেন বদর বা বুদর, আর তারিখ-ই-দাউদীতে আছে বদর।

৫. প্রথম নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন কাদন এবং কারণ। ফিরিশতাতে আছে কাদর। তারিখ-ই-দাউদীতে আছে কাদন। তাহার পিতার নাম নানারূপ দেওয়া আছে যেমন খুজু, জুজু, যুযু, জুযু।

দিল্লী হইতে আগমন করিলেন এবং মুল্লা কুতবুদ্দীন এবং মুল্লা ইলহাদাদ এবং সালেহ আসিলেন সিরহিন্দ হইতে এবং কান্যকুব্জ হইতে আসিলেন সৈয়দ আসিয়ান এবং মিরান সৈয়দ আখন এবং সুলতানের সঙ্গে সর্বদা যে একদল পণ্ডিত ব্যক্তি থাকিতেন তাহারা যেমন সৈয়দ সদরুদ্দীন কনৌজী এবং মিয়া আবদুর রহমান, সিক্রির অধিবাসী এবং মিয়া আযিযুল্লাহ্ সম্বলী ইত্যাদিও আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের সকলেই এই ব্যাপারে একমত হইলেন যে লোকটিকে বন্দী করা হউক এবং তাহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলা হউক ; যদি তিনি অস্বীকার করেন তবে তাহাকে হত্যা করা হউক। লৌধন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করা হইল। পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সকলকেই পুরস্কৃত করা হইল এবং তাহাদের স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করা হইল।

কিছুদিন পর খাওয়াস খান দিল্লীর কর্তৃত্বে তাহার পুত্র ইসমাইল খানকে রাখিয়া সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী সম্বলে গমন করিলেন এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ ও অন্যান্য অনুগ্রহ লাভ করিলেন। এই সময়ে সইদ খান শরওয়ানী লাহোর হইতে আগমন করিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন। যেহেতু তিনি রাজদ্রোহীতার ষড়যন্ত্রকারী দলভুক্ত ছিলেন, সুলতান তাহাকে এবং তাতার খান এবং মুহম্মদ শাহ এবং সকল বিশ্বাসঘাতককে তাহার রাজ্য হইতে বহিষ্কার করেন। তাহারা গোয়ালিয়রের পথে গুজরাট গমন করিলেন। এই সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা, রাজা মান নেহাল নামীয় তাহার একজন খোজাকে অতি চমৎকার এবং মুল্যবান উপহার ও ভেটসহ সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। সুলতান যখন তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি অসৌজন্যমূলক জবাব প্রদান করিলেন। প্রতিবাদ স্বরূপ সুলতান লোকটিকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং শাসাইলেন যে তিনি স্বয়ং দুর্গ অধিকার করিতে আগমন করিবেন।

এই সময় বিয়ানার গভর্ণর খান-খানান ফরমুলির ইন্তেকালের সংবাদ আসে। কিছুকাল ধরিয়া বিয়ানা খান ই- খানানের পুত্র[১] ইমাদ এবং সুলেমানের অধীনে রাখা হয় কিন্তু বিয়ানা দুর্গটি শক্তিশালী হইবার ফলে আর ইহা সীমান্তে অবস্থিত হইবার ফলে বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের স্থানে পরিণত হয়, আর ইমাদ এবং সুলেমান তাহাদের অধীনস্থ লোকজনসহ বিয়ানা হইতে সম্বল চলিয়া আসেন। সুলতান বিয়ানা নিয়া যান এবং তাহা খাওয়াস খানকে প্রদান করেন ; এবং কিছুকাল পরে সফদর খানকে

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে, বদাওনী এবং তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে যে খান-ই-খানানের পুত্র ইমাদ ও সুলেমান তাহার উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু ফিরিশতা বলেন যে খান-খানানের পৌত্র আহমদ এবং সুলেমান তাহার উত্তরাধিকারী হন।

আগ্রার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় ; আগ্রা ছিল বিয়ানার অধীনস্থ স্থান। ইমাদ এবং সুলেমানকে জায়গীররূপে শামসাবাদ এবং জালেসর এবং মংগ্রোর এবং শাহাবাদ এবং অন্যান্য কতিপয় পরগণা দেওয়া হয়।

মেওয়াটের গভর্ণর আলম খান এবং রাপ্রীর গভর্ণর খান-ই-খানান লোহানীকে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা খাওয়াস খানের সহিত একযোগে রায় বিনায়ক দেও[১] এর নিকট হইতে ধোলপুর দুর্গ অধিকার করিয়া নেন। রায় তাহাদিকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং যে সব বীরগণ শত্রু সেনা সন্নিবেশ ভঙ্গ করেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম খাজা বাইন[২] শহীদ হন ; এবং প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক নিহত হইতে থাকে। যখন এই সংবাদ সুলতান সিকান্দরের নিকট পোঁছে তখন তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পূর্বোক্ত বৎসরের রমযান মাসের ৬ তারিখ শুক্র বার ধোলপুরের উদ্দেশ্যে সম্বল ত্যাগ করেন। তিনি যখন ধোলপুরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন তখন রায় বিনায়ক দেও গোয়ালিয়র চলিয়া যান, আর তাহার অধীনস্থগণকে দুর্গে রাখিয়া যান। শেষোক্তগণ সুলতানের বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া মধ্যরাত্রিতে দুর্গ ত্যাগ করে এবং পলায়ন করে। খুব ভোরে সুলতান দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং এক সংক্ষিপ্ত শুকরিয়া আদায় করিয়া বিজয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করেন আর সৈন্যগণ তাহাদের লুণ্ঠনের এবং ধ্বংসের হস্ত প্রসারিত করে, এবং ধোলপুরের চতুর্দিকের সাত কারোহ পর্যন্ত স্থানের গৃহাদি ধ্বংস করে এবং ফলের বাগানসমূহ উৎপাটিত করে।

সুলতান তথায় একমাস কাল অবস্থান করেন এবং তৎপর গোয়ালিয়রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং আদম লোদী এবং অন্যান্য বহু আমীরকে ঐ স্থানে[৩] রাখিয়া সম্বল অতিক্রম করেন এবং আমীর খাজা মেহকী নামে পরিচিত তীরে শিবির স্থাপন করেন এবং তথায় দুই মাস কাল অবস্থান করেন। ঐ স্থানের খারাপ পানির জন্য লোকজনের মধ্যে পীড়া দেখা দেয় এবং ইহা হইতে এক মহামারীর উৎপত্তি হয়।

---

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে নামটি সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে রায় বিনায়ক দেও, অন্যান্যগুলিতে বিভিন্নরূপ আছে যেমন, বিলকদী বা সলকদী বা সমকদী। ফিরিশতা লিখিয়াছেন রায় বিনায়ক দেও। বদাওনী ইহাকে বাদ দিয়াছেন আর তারিখ-ই-দাউদী শুধু ঐ স্থানের রায়, এইরূপ বলিয়াছেন। বদাওনী অপর এক স্থানে ইহার নাম মানিক দেও লিখিয়াছেন। তারিখ-ই-খান জাহান লোদী লিখিয়াছেন রায় মানিক দেও। ধোলপুর একটি রাজপুত রাজ্য। ধোলপুর শহর আগ্রা হইতে ৩৪ মাইল দক্ষিণে আর গোয়ালিয়র হইতে ৩৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

২. নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন বাইন, হনন, ববন এবং মইন ; ফিরিশতা লিখিয়াছেন মইন, কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন বাবুন। তারিখ খান জাহান লোদী লিখিয়াছেন .বন।

৩. ধোলপুর।

গোয়ালিয়রের রাজা তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং শান্তি স্থাপনের প্রার্থনা করিলেন। তিনি সুলতানের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া যে সইদ খান এবং বাবু খান[১] এবং রায় গনেশ তাহার নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহাদের দুর্গ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রমজিতকে সুলতানের খেদমতের জন্য প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত জন তাহাকে একটি অশ্ব এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ উপহার দিলেন এবং তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান করিলেন এবং স্বয়ং আগ্রা অভিমুখে ফিরিলেন। তিনি যখন ধোলপুর পেঁৗছিলেন তখন তিনি ঐ অঞ্চলটি বিনায়ক দেওকে প্রদান করিলেন এবং আগ্রায় আগমন করিয়া বর্ষাকাল তথায় অতিবাহিত করিলেন।

অগস্ত্য তারকা উদয়ের পর[২], আঃ হিজরা ৯১০ সনের (১৫০৪ খ্রীঃ) রমযান মাসে তিনি মুন্দ্রায়েল[৩] দুর্গ অধিকারের জন্য তাহার বিজয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। তিনি ধোলপুরের সন্নিকটে এক মাসকাল অবস্থান করিলেন এবং গোয়ালিয়র ও মুন্দ্রায়েলের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ লুটতরাজ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহার সৈন্যদের প্রেরণ করিলেন। ইহার পর তিনি স্বয়ং গমন করিলেন এবং মুন্দ্রায়েল দুর্গ অবরোধ করিলেন; দুর্গ রক্ষী সৈন্যগণ আশ্রয় প্রার্থনা করিল এবং দুর্গটি সমর্পণ করিল। সুলতান মূর্তি-মন্দির ও অগ্নি মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত করিলেন এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি মুজাহিদ খানের নায়েব মিয়া মকনকে[৪] দুর্গের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং দেশটি লুটতরাজ করিতে এবং বিধ্বস্ত করিতে গমন করিলেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন এবং ফলের বাগান এবং ইমারতসমূহ মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তিনি যখন ধোলপুর পেঁৗছিলেন তখন তিনি তথাকার দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করিলেন; এবং ইহা রায় বিনায়ক দেও-এর নিকট হইতে নিয়া তাহার মালিক কামরুদ্দীন[৫] অধীনে ন্যস্ত করিলেন এবং স্বয়ং আগ্রাতে রহিলেন আর আমীরগণকে তাহাদের জায়গীরে প্রেরণ করিলেন।

---

১. কর্ণেল ব্রিগসের মতে সইদ খান এবং বাচু খান উভয়েই ছিলেন শরওয়ানী।

২. ইহা দ্বারা বর্ষাকাল শেষ হওয়া বুঝায়।

৩. টুকেনথালের ইহার নাম লিখিয়াছেন মন্দাসয়ের বা মন্দ্রায়েল এবং বলেন ইহা চম্বল নদীর পশ্চিম তীরের দুই মাইল দূরে এবং কেরৌলির ১২ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি গোল পাহাড়ের পার্শ্বে অবস্থিত। আইন-ই-আকবরীতে ইহাকে মন্দলায়ের লিখা হইয়াছে।

৪ বদাওনী বা ফিরিশতা কেহই এই নামটি উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা বলেন যে তিনি ইহা একজন বিশ্বস্ত লোকের অধীনে ন্যস্ত করেন।

৫. কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মালিক কমরুদ্দীন, আর কয়েকটিতে আছে মালিক কখরুদ্দীন এবং মালিক ইযযুদ্দীন। ফিরিশতা লিখিয়াছেন শেখ কমরুদ্দীন। বদাওনী নামটি উল্লেখ করেন নাই।

এই সময়ে আঃ হিজরা ৯১১ সনের ৩রা সফর (৬ই জুলাই ১৫০৫ খ্রীঃ) আগ্রাতে এক প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যাহার ফলে পাহাড় কাঁপিয়া উঠে এবং সুউচ্চ এবং সুদৃঢ় ইমারতসমূহ ভূপতিত হয়। জীবিতগণ ইহাকে মনে করিল কেয়ামতের দিন আর মৃতগণ মনে করিল পুনরুত্থানের দিন।

নয় শত এগার সনে এক ভূমিকম্প হয়[১]
আগ্রা তখন মৃত্যুর দেশে পরিণত হয়।
ভিত্তিমূল যেহেতু সুদৃঢ় ছিল
ভূমিকম্পের ফলে সুউচ্চ স্থান নীচু স্থানে পরিণত হয়।

আদমের সময় হইতে এই সময় পর্যন্ত হিন্দুস্তানের কোন অংশে এরূপ কোন ভূমিকম্প আর কখনও সংঘটিত হয় নাই; আর কেহই এরূপ কোন ভূমিকম্পের কথা মনে করিতে পারে না। তাহারা বলে যে ঐ একই দিনে হিন্দুস্তানের বহু শহরে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। আঃ হিজরা ৯১১ সনে (১৫০৫ খ্রীঃ) অগস্ত্য তারকা উদয়ের পর সুলতান গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন; এবং ধোলপুরে দেড় মাস অপেক্ষা করিবার পর চম্বল নদীর তীরে কুসলা[২] চরার নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন এবং তথায় কয়েক মাস অবস্থান করিলেন। অতঃপর শাহযাদা ইব্রাহীম এবং জালাল খান এবং অন্যান্য খানদের তথায় রাখিয়া তিনি একটি ধর্মযুদ্ধ করিবার জন্য এবং লুটতরাজ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়েন।[৩] তিনি লুটতরাজ করিলেন এবং লোক বন্দী করিলেন এবং যে সব লোক বনে জঙ্গলে এবং পাহাড়-পর্বতে পলায়ন করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশকে হত্যা করিলেন। যেহেতু সেনাবাহিনীতে বনজারানগণের[৪] আগমন না করিবার ফলে অতি অল্প পরিমাণ শস্য আমদানী হয়। সুলতান তাহাদিগকে আনয়নের জন্য আযম হুমায়ুন[৫] এবং আহমদ খান এবং মুজাহিদ খানকে প্রেরণ করিলেন এবং যদিও

১. বদাওনীও এই কবিতা লিখিয়াছেন।
২. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন কুসলা, কুবকুহনাহ, কুববাহ, কুহনাহ। ফিরিশতা লিখিয়াছেন কুন্না। তারিখ-ই খান জাহান লোদীতে আছে গৌরবের কেল্লা।
৩. তাবাকাত-ই-আকবরীর সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে শাহযাদা খান। বদাওনী এই সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন শাহযাদা ইব্রাহীম। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে শাহযাদা জালাল খান।
৪. কর্ণেল ব্রিগস বলেন যে এই প্রয়োজনীয় শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে মুসলিম ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে ইহারা অতি প্রাচীন এক হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যাহারা তাঁবুতে বাস করে, তাহাদের নিজস্ব আইন কানুন মানিয়া চলে এবং শহরের লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। লোকগুলি তাহাদের সাহস, সততা ও উদ্যমশীলতার জন্য আর মহিলাগণ সতীত্বের জন্য বিখ্যাত।
৫. ফিরিশতাও হুবহু অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু কর্ণেল ব্রিগস বলেন যে, আযম হুমায়ুন এবং অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এই কাজ সম্পাদন করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কারণ গোয়ালিয়রের সন্নিকটের অধিবাসীগণ প্রবল বাধা দান করে।

গোয়ালিয়রের রায় পথিমধ্যে তাহাদের বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না।

কবিতা

যে পোকা নিজেকে প্রদীপে নিক্ষেপ করে
ঈর্ষা কাতর হইয়া নিজের হৃদয়েই দাগ ফেলে।

সুলতান যখন তাহার গন্তব্য পথের মধ্যে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত হাশাওয়ার[১] নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছেন তখন প্রতিদিন এক অগ্রবর্তী রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনী হইতে শত্রুর দিকে দশ কারোহ অধিক অগ্রসর হয় এবং পাহারা দিতে থাকে এবং শেষোক্তদের গতিবিধির সংবাদ রাখে।

কবিতা

যদি ঐ সাহসী ও যোদ্ধাদলের প্রতি[২]
তুমি একটি সুতীক্ষ্ণ তীর দ্রুতগতিতে নিক্ষেপ কর
ধনুক হইতে তাহা অধিক দূর গমনের পূর্বেই
সুলতান তাহার গগনচুম্বী সিংহাসন হইতে সেই সংবাদ অবগত হন

প্রত্যাবর্তনের সময় গোয়ালিয়রের রায়ের সেনাবাহিনী লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হইল। আউধ খান[৩] এবং খান-ই জাহানের পুত্র আহমদ খান এই দলে ছিলেন; আর ইহাদের প্রচেষ্টা এবং বীরত্বের ফলেই এবং সুলতানের সেনাবাহিনীয় সাহায্যে রাজপুতগণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের এক বিরাট অংশ নিহত হয় এবং বন্দী করা হয়। সুলতান আউধ খানকে মালিক আউধ উপাধি দান করেন এবং তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; আর বর্ষাকাল আসিয়া পড়িবার ফলে আগ্রা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি যখন ধোলপুরে পৌঁছিলেন, তিনি ঐ স্থানে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা আমীরকে রাখিয়া আসেন এবং স্বয়ং আগ্রা গমন করেন এবং বর্ষাকাল তিনি তথায় অবস্থান করেন।

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে হাশাওয়ার, কিন্তু একটিতে আছে চিতাওয়ার। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে চিতাওয়াব। ফিরিশতাতে আছে জনুব আর কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন চিনুর।

২. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতাটি দেওয়া নাই, অন্যান্যগুলিতে বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে।

৩. কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতেই আছে আউধ খান, কিন্তু একটি বা দুইটি পাণ্ডুলিপি, ফিরিশতা এবং তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে দাউদ খান। শেষোক্তটিতে দুই জনকেই খান-ই-জাহানের পুত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলিতে এবং ফিরিশতাতে শুধু আহমদ খানকেই খান-ই-জাহানের পুত্র বলা হইয়াছে।

আঃ হিজরা ৯১২ সনে (১৫০৬ খ্রীঃ) অগস্ত্য তারকা উদয়ের পর তিনি উদিত নগর[১] দুর্গের অভিমুখে গমন করেন। তিনি যখন ধোলপুরে পৌঁছেন তখন তিনি ইমাদ খান ফরমুলি এবং মুজাহিদ খানকে কয়েক সহস্র[২] অশ্বারোহী এবং একশত হস্তীসহ দুর্গটির অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং যে স্থানে ছিলেন তথায়ই অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি থানেশ্বর শহরের অধিবাসী এবং তাহির বেগ কাবুলীর পুত্র কাযী আবদুল ওয়াহিদ এবং শেখ ওমর এবং শেখ ইব্রাহীমকে গৃহাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেন। মাহমুদ খান লোদীর ইন্তেকালের পর তাহার পুত্র জালাল খানকে কাল্পীর গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হয়। জালাল খানের ভ্রাতাদ্বয় ভিখন খান এবং হাজী খান পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া সুলতানের নিকট তাহাদের ব্যাপারে আবেদন পেশ করেন। সুলতান তাহাদের নিকট ফিরোয আখওয়ানকে প্রেরণ করেন। আখওয়ান-গণ আফঘানদের ন্যায় এক উপজাতি, অতঃপর সুলতান মুজাহিদ খানকে ধোলপুরে রাখিয়া গেলেন এবং চম্বলের তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। ভিখন খান এবং হাজী খান আসিলেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

উপরোক্ত মাসের ২' তারিখে সুলতান উদিতনগরে আগমন করিলেন এবং দুর্গটি অবরোধ করিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে সমস্ত বাহিনী বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করি-বার জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং দুর্গটি বিজয়ের চেষ্টায় যুদ্ধের এবং ধ্বংসের সমস্ত প্রকার অস্ত্রাদি যত নিজেদের নিয়োজিত রাখিবে। জ্যোতিষিগণের নির্ধারিত সময়ে সুলতান স্বয়ং যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং যুদ্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সৈন্যগণ নিজেদের পিপি-লিকা এবং পঙ্গপালের ন্যায় ঝুলাইয়া রাখিল এব তাহাদের বীরত্ব ও পৌরুষ প্রদর্শন করিল আর বিজয়ের হাওয়া সুলতানের পতাকার উপরে প্রবাহিত হইল এবং মালিক আলাউদ্দীন যে দিকে আক্রমণ পরিচালনা করিতেছিলেন সেই দিকে দুর্গে একটি ফাটল করা হইল, এবং সাহসী যোদ্ধাগণ ইহা দ্বারা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং জেহাদে লিপ্ত হইল আর দুর্গ রক্ষী সৈন্যগণ আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেও তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। অন্যান্য দিকেও ফাটল করা হইল এবং দুর্গটি দখল করা হইল।

১. কয়েকটি পাণ্ডুলিপির পাঠ সুস্পষ্ট বুঝা যায় না এবং আর কয়েকটিতে আছে উদিতনগর। বদাওনী লিখিয়াছেন অউন্তগর। কর্ণেল রেঙ্কিং লিখিয়াছেন অন্তগড়। ফিরিশতা লিখিয়াছেন উৎন্তগড় আর কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন হনওয়ান্তগড়। কর্ণেল রেঙ্কিং বলেন যে এই দুর্গটি গোয়ালিয়রের দুর্গের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত এবং মানচিত্রে দেওগড়রূপে দেখান আছে।

২. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীসহ।

কবিতা

আকাশের দুর্গ যদি উন্নতও হয়
যোদ্ধা তাহার সূর্যের ন্যায় ফাঁস নিক্ষেপ করিবে।

আর রাজপুতগণ তাহাদের গৃহে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করিল এবং তৎপর তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করিল এবং আগুনে পোড়াইয়া দিল। এই সময়ে একটি তীর আসিয়া মালিক আলাউদ্দীনের চক্ষুতে আঘাত করিল এবং তাহার পৃথিবী দৃশ্যমান চক্ষুগুলিকে আলোহীন করিয়া দিল। বিজয় লাভের পর সুলতান শোকরিয়া আদায় অনুষ্ঠান পালন করিলেন এবং দুর্গটি মকন[১] এবং মুজাহিদ খানের আয়ত্বে প্রদান করিলেন। তিনি মূর্তি পূজার মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিলেন এবং মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। যেহেতু সুলতানের কানে সংবাদ পৌঁছিল যে মুজাহিদ খান উদিতনগরের রাজার নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ করিয়াছে এবং অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তিনি সুলতানকে এই দুর্গ হইতে ফিরাইয়া নিবেন। তাই, তিনি আঃ হিজরী ৯১১ সনের মহরম মাসের ১৬ তারিখে তাহার গৃহাধ্যক্ষ মুল্লা জুমন[২]কে বন্দী করিলেন, কারণ তিনি মুজাহিদ খানের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাহাকে মালিক তাজুদ্দীন কম্বুর নিকট সমর্পণ করিলেন এবং ধোলপুরে যে সব খানগণ ছিলেন তাহাদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করা হইল যেন তাহারা মুজাহিদ খানকে বন্দী করেন।

আঃ হিজরা ৯১৩ সনের (১৫০৭ খ্রীঃ) মহরম মাসে সেনাবাহিনী আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইল।[৩] পথিমধ্যে একদিন পথটির সংকীর্ণতা ও বন্ধুরতার ফলে লোকদের কখনও উপরে উঠিতে এবং কখনও নীচে নামিতে হইতেছিল, তাই সেনাবাহিনীর অতিক্রমের জন্য থামিবার নির্দেশ দেওয়া হয়, আর ইহার ফলে পানির অভাবে এবং অসংখ্য প্রাণীর জন্য বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ দিনে এক মগ পানির মূল্য পনর তংগা পর্যন্ত উঠে আর যাহারা পানি সংগ্রহ করিতে পারিল তাহারা অতিরিক্ত তৃষ্ণার ফলে এত বেশী পানি পান করিল যে ইহার ফলে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নির্দেশ অনুযায়ী যখন মৃতদেহগুলি গণনা করা হইল তখন দেখা গেল যে ইহাদের সংখ্যা আটশত।

১. কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে আছে মকন এবং মুজাহিদ খান। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতেও এইরূপ আছে। ফিরিশতাতে আছে মুজাহিদ খানের পুত্র ভিখন খান।
২. তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে মৌলানা জুমন। ফিরিশতা তাহার নাম লিখিয়াছেন মালিক চমন। তারিখ-ই-খান জাহান লোদী বলেন যে দুর্গটি মালিক তাজুদ্দীন কম্বুর অধীনে দেওয়া হয়।
৩. এই ঘটনাবলী তারিখ-ই-খান জাহান লোদী এবং ফিরিশতা এবং তারিখ-ই-দাউদীতে দেওয়া আছে।

কবিতা

কাহারও জীবনের দিন যখন ফুরাইয়া যায়
তাহার মুখে পানিও বিষের কাজ করে।

পূর্বোক্ত মাসের ২৮ তারিখে[১] সুলতান ধোলপুরে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিবার পর তিনি আগ্রা আগমন করেন এবং বর্ষাকাল তথায় অতিবাহিত করেন।

আঃ হিজরা ৯১৩ সনে (১৫০৭ খ্রীঃ) অগস্ত্য তারকা উদয়ের পর সুলতান মালবের অন্তর্গত নারওয়ার[২] দুর্গ অধিকার করিতে সংকল্প করেন এবং কাল্পীর গভর্ণর জালাল খানকে[৩] এক নির্দেশ প্রেরণ করেন যে তিনি যেন তথায় গমন করিয়া ইহা অবরোধ করেন আর দুর্গ রক্ষী সৈন্যগণ যদি শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করে তবে যেন তিনি তাহাদের আবেদন বাতিল না করেন। জালাল খান লোদী তথায় গমন করিলেন এবং দুর্গটি অবরোধ করিলেন। কয়েক দিন পর সুলতানও তথায় আগমন করিলেন। পরদিন যখন সুলতান দুর্গটি পর্যবেক্ষণের জন্য গমন করিতে অশ্বারোহণ করিলেন জালাল খান তাহার সৈন্য সন্নিবেশ করিযা পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; যেন তাহার অসংখ্য সৈন্য সুলতানের নজরে পড়ে এবং তাহার প্রচেষ্টার উপযুক্ত স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি তাহার সৈন্যদলকে তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত করেনঃ একটি পদাতিক বাহিনী; দ্বিতীয়টি অশ্বারোহী বাহিনী আর তৃতীয়টি হস্তী বাহিনী। সুলতান তাহার বিপুল সৈন্যসংখ্যা দর্শন করিলেন এবং ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাকে ধ্বংস করিবেন এবং তাহার ক্ষমতা বিনষ্ট করিবেন। সুলতান এক বৎসর কাল দুর্গটি অবরোধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যেহেতু দুর্গটি খুব শক্তিশালী ছিল এবং ইহার দৈর্ঘ ছিল আট কারোহ, সৈন্যগণ প্রতিদিন ইহা আক্রমণ করিতে গমন করিত আর নিহত হইত। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর সুলতান নির্দেশ দিলেন যে সৈন্যগণকে দুর্গটিকে ধ্বংস করিবার জন্য পাকানো চামড়ার ফিতা, বড় ছুরি, বেলচা ও কোদাল এবং যুদ্ধের কুঠার প্রস্তুত করিয়া রাখিবে এবং তৎপর দুর্গ আক্রমণ করিবে। সৈন্যগণ এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিল

১. তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে ২৭ তারিখে। ফিরিশতা মাসটি উল্লেখ করিয়াছেন, তারিখ উল্লেখ করেন নাই।

২. কর্ণেল রেঙ্কিং বদাওনীর অনুবাদের এক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে নারওয়ার গোয়ালিয়র ও ধার-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আইন-ই-আকবরীর মতে ইহা কালী সিন্ধু নদীর ডান তীরে এবং গোয়ালিয়র শহরের ৪৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

৩. ইনি মাহমুদ খান লোদীর পুত্র এবং তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি কাল্পীর গভর্ণর নিযুক্ত হন।

এবং সব দিক হইতে দুর্গটি আক্রমণ করিল এবং অসম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিল। সুলতান একটি গৃহের ছাদে উঠিয়া যুদ্ধ পরিদর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে এক স্থানে দুর্গে ফাটল করা হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে ফাটলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহার বহু সংখ্যক লোক নিহত হইয়াছে। ঐদিন দুর্গটি অধিকার করা সম্ভব হয় নাই, ফলে তিনি তাহার সৈন্য ফিরাইয়া আনিলেন। এই সময়েও সুলতান জালাল খানকে বন্দী করিবার এবং ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাহার উৎকৃষ্ট লোকদের তাহার নিজের পথে আনয়ন করিলেন এবং তাহার সৈন্যদের বিশৃঙ্খল করিয়া দিলেন। ইহার পর দুইটি ফরমান জারি করা হইল: একটিতে জালাল খানকে বন্দী করিবার জন্য ইব্রাহীম খান লোহানী এবং সুলেমান ফরমুলি এবং মালিক আলাউদ্দীন জালওয়ানীকে নির্দেশ দেওয়া হইল; আর অপরটি প্রেরণ করা হইল উযির মালিক ভূয়া এবং যকুর পুত্র সইদ খান এবং মালিক আদমকে। আর উপরোল্লিখিত খানগণ জালাল খান এবং শের খানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন এবং তাহাদিগকে উদিতনগর দুর্গে নিয়া গেলেন আর তথায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এই ঘটনাবলীর পর নারওয়ার দুর্গের রক্ষীবাহিনী, পানি এবং শস্যের অভাবে শোচনীয় দূরবস্থায় পতিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তাহাদের জিনিসপত্র এবং আসবাবপত্রসহ বাহির হইয় যায়। সুলতান মন্দিরসমূহ ধ্বংস করেন এবং মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন; আর পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এব ছাত্রগণের জন্য বৃত্তি ও ভাতা বরাদ্দ করেন এব তাহাদিগকে তথায় বসতি করান এবং দুর্গের পাদদেশে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে মালবের শাসনকর্তা সুলতান নাসিরুদ্দীনের পুত্র, শাহাবুদ্দীন তাহার পিতার সহিত বিরক্ত হইয়া সুলতানের দরবারে আগমন করিতেছেন। তিনি যখন মালবের অধীনস্থ সুই[১] নামক স্থানের নিকটবর্তী হন, তখন সুলতান তাহার নিকট একটি অশ্ব এবং একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ প্রেরণ করেন আর এই সংবাদ পাঠান যে মালবের অধীনস্থ চন্দেরী যদি তিনি সমর্পণ করেন তবে তাহাকে এরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে যাহাতে সুলতান নাসিরুদ্দীনের তাহার উপর আর কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। ঘটনাক্রমে কতিপয় এমন ব্যাপার ঘটে যাহার ফলে শাহাযাদা শাহাবুদ্দীনের মালব ত্যাগ করা বন্ধ হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে ঐ রাজ্যের বিবরণে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন, সিরি, সিপ্রি, তিসরী; ফিরিশতা লিখিয়াছেন সিরি। বদাওনী শাহাবুদ্দীনের আদৌ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি বলেন যে সুলতান নাসিরুদ্দীনের পৌত্র মুহাম্মদ খান, সুলতান সিকান্দরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তবে তাহা আঃ হিঃ ৯১৫ সনে (১৫০৯ খ্রীঃ)।

আঃ হিজরা ৯১৪ সনের (১৫০৮ খ্রীঃ) শাবান মাসের ২৬ তারিখে সুলতান সিকান্দর নারওয়ার দুর্গ হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং ঐ বৎসরেরই যি-কোয়াজা মাসে সিপ্রা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় তাহার মনে হয় যে যেহেতু নারওয়ার দুর্গটি এত শক্তিশালী যে যদি ইহা কোন শত্রুর হস্তগত হয় তবে ইহা তাহার নিকট হইতে পুনরায় দখল করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই কারণে তিনি ইহার চতুর্দিকে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন যাহাতে কোন শত্রু আর ইহা দখল করিতে সক্ষম না হয়। এই দুশ্চিন্তা হইতে তাহার মনকে মুক্ত করিয়া তিনি লহায়ের[১] শহরে আগমন করেন এবং তথায় এক মাসকাল অবস্থান করেন। এই সময়ে কুতব খান লোদীর স্ত্রী নয়ামত খাতুন[২] শাহাযাদা জালাল খানের সহিত আগমন করেন এবং সুলতানের বাহিনীতে যোগদান করেন। সুলতান তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এব' তাহাদের প্রীতি কামনা করেন এবং ইহার কয়েক দিন পর সরকার কাল্পী শাহযাদা জালাল খাঁনকে জায়গীররূপে প্রদান করা হয়। তিনি তাহাকে ১২০টি অশ্ব এবং ১৫টি হস্তী, একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ প্রদান করেন এবং তাহাকে খাতুনের সঙ্গে কাল্পী অভিমুখে প্রেরণ করেন।

শ্লোক

মহানুভব হও কারণ মহানুভবতা
স্বাধীন লোককেও তোমার অনুগত ভৃত্যে পরিণত করে।

আঃ হিঃ ৯১৫ সনের (১৫০৯ খ্রীঃ) ১০ই মহরম রাজকীয় পতাকাসমূহ লহায়ের হইতে রওয়ানা হয় এবং ইহারা যখন হটকান্তের নিকটে উপস্থিত হয় তখন তিনি ঐ স্থানের জেলাগুলির বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং ঐ গুলিকে বিদ্রোহী এবং শান্তিভঙ্গকারীদের কবল হইতে মুক্ত করেন; আর বিভিন্ন স্থানে পাহারাদার প্রতিষ্ঠা করিয়া আগ্রা গমন করেন এবং তথায় অবস্থান করেন।

---

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে লহায়েব, আর একটিতে আছে লহাবর, আর একটিতে আছে লভায়েব। ফিরিশতা লিখিয়াছেন বেহার। কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন ইয়েহর। বদাওনী সুলতানের এই স্থানে আগমনের কোন উল্লেখ করেন নাই, তবে তিনি লিখিয়াছেন যে আঃ হিঃ ৯১৫ সনে তিনি লহায়ের হইতে যাত্রা করেন। কর্ণেল রেভি; ইহাকে লহাঙর লিখিয়াছেন এবং এক ব্যাখ্যার বলিয়াছেন যে লহায়র স্থানটি রেনেলের মানচিত্রে গোয়ালিয়রের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দেখান আছে।
২. ফিরিশতা বলেন যে খাতুন ছিলেন শাহযাদার পালক মাতা। কর্ণেল ব্রিগস তাহাকে তাহার দাই অভিহিত করিয়াছেন। তারিখ-ই-দাউদীতে কুতব খান লোদীকে সুলতান বহলোলের চাচাতো ভাই বলা হইয়াছে।

এই সময়ে সংবাদ আসে যে লক্ষৌতির[১] গভর্ণর, মুবারক খান লোদীর পুত্র, আহমদ খান, কাফেরদের সহিত মেলামেশা করিয়া বিকৃতমনা হইয়া উঠিয়াছে এবং ইসলাম ধর্ম হইতে মুখ ফিরাইয়াছে। আহমদ খানের ভ্রাতা মুহম্মদ খানের নিকট এক নির্দেশ প্রেরণ করা হয় যেন তিনি আহমদ খানকে গ্রেপ্তার করিয়া সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন; আর সরকার লক্ষৌতি তাহার ভ্রাতা সৈয়দ খানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

এই একই সময়ে সুলতান নাসিরুদ্দীন মালভীর পৌত্র মুহম্মদ খান তাহার পিতামহ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠেন এব সুলতান সিকান্দরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং সরকার চন্দেরী তাহাকে জায়গীররূপে প্রদান করা হয় এবং শাহযাদা জালাল খানকে এক নির্দেশ প্রেরণ করা হয় যেন তিনি তাহাকে সাহায্য ও সহায়তা করেন যাহাতে মালবের সেনাবাহিনী তাহার কোন ক্ষতিসাধন না করিতে পারে। এই সময়ে সুলতানের ভ্রমণ করিবার এবং শিকার করিবার প্রবল বাসনা জাগে; আর তিনি ধোলপুর অভিমুখে গমন করেন এবং আগ্রা হইতে ধোলপুর পর্যন্ত তিনি প্রত্যেক দিনের পথ অতিক্রম হওয়ার স্থলে অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যেহেতু ভাগ্য তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল, তিনি শিকাররূপে একটি রাজ্য লাভ করেন। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের বিশদ বিবরণ হইল এই যে নাগোরের শাসনকর্তা মুহম্মদ খানের আত্মীয় আলী খান[২] এব আবু বকর, মুহম্মদ খানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রতারণাপূর্বক তাহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করে এবং তাহার রাজ্য দখল কিরতে চায়; আর তিনি এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়া তাহাদের আক্রমণ করেন। তাহারা পলায়ন করেন এবং সুলতানের দরবারে আগমন করেন। মুহম্মদ খান তাহার ভ্রাতাগণ এবং আত্মীয়গণের শত্রুতার সম্বন্ধে অবহিত থাকিবার ফলে এবং তাহারা যে মহা সুলতানের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে, অত্যন্ত দূরদৃষ্টির সহিত কাজ করিলেন এবং আন্তরিক ভাষায় নিবেদন পেশ করিলেন এবং বহু উপহার ও ভেট প্রেরণ করিলেন এবং তাহার রাজ্যে সুলতানের নামে খোৎবা পাঠ করাইলেন এবং মুদ্রা প্রচলন করিলেন আর সুলতান তাহাকে একটি সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং একটি অশ্ব প্রেরণ করিলেন। অতঃপর

---

১. অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে লক্ষৌতি, তবে একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে লক্ষৌ। বদাওনী আদৌ. এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন লক্ষৌতি; কর্ণেল ব্রিগস এবং তারিখ-ই-খান জাহান লোদী লিখিয়াছেন লক্ষৌ. সম্ভবতঃ ইহা লক্ষৌই হইবে, লক্ষৌতি নহে।

২. বদাওনী এই নামগুলির উল্লেখ করেন নাই। ফিরিশতা আবু বকরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীও শুধু আবু বকরের নাম উল্লেখ করিয়াছে।

তিনি ধোলপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহার রাজধানী আগ্রায় বসবাস করিতে লাগিলেন। আর কিছুকালের জন্য ভোগের বিছানা পাতিয়া উদ্যানসমূহে বিচরণ করিয়া ফিরিলেন এবং আনন্দ উৎসবাদিতে আর আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-উপভোগে অতিবাহিত করিলেন। তাহার সময়েই আগ্রা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়।

ইহার বেশ কিছুকাল পর তিনি পুনরায় ধোলপুর অভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে তিনি খান খানান ফরমুলির পুত্র মিয়া সুলেমানকে নির্দেশ দান করেন যে তিনি যেন তাহার সৈন্যবাহিনী এবং সাজ-সরঞ্জামসহ উদিতনগরে সুই সুইর[১] অঞ্চলে গমন করেন এবং হাসান খানকে যাহার পূর্ব নাম ছিল রায় দুস্থার এবং যিনি সদ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি তাহার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে সুলতানের নিকট হইতে তাহার দূরে গমন করা উচিত হইবে না। বাক্যগুলি সুলতানের অসন্তোষভাজনের কারণ হইল এবং তিনি নির্দেশ দান করিলেন যে তাহাকে (অর্থাৎ মিয়া সুলেমানকে) সুলতানের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা উচিত আর তাহার জিনিসপত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের যাহা কিছু তিনি ঐ রাত্রির মধ্যে তাহার সঙ্গে নিয়া যাইতে পারিবেন শুধু সেগুলিই তাহার হইবে, আর যাহা তিনি সঙ্গে নিতে পারিবেন না সেইগুলি লোকদের লুট করিতে দেওয়া হইবে। তাহার ভরণ-পোষণের জন্য ইন্দরী পরগণাটি তাহাকে বরাদ্দ করা হইল আর তিনি তথায় গমন করিলেন এবং বসবাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে চন্দেরীর গভর্ণর বহজাত খান, যাহার পূর্ব পুরুষগণ কয়েক পুরুষ ধরিয়া মালবের বাদশার প্রজা ছিলেন, সুলতান মাহমুদ মালভীর দুর্বলতার জন্য এবং তাহার সরকারের অবনতির ফলে, উপহার প্রেরণ করিয়া সুলতানের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। সুলতান ইমাদুল-মুলক বদাহকে, যাহার নাম ছিল আহমদ[২] চন্দেরী অভিমুখে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি বহজাত খানের সহযোগিতায় চন্দেরী এবং তৎ-পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে সুলতানের নামে খোৎবা পাঠ করাইতে পারেন। ইহার পর সুলতান ধোলপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আগ্রা আগমন করেন এবং বহজাত

১. এই নামটির সঠিক পাঠোদ্ধার করা দুরূহ। পাণ্ডুলিপিগুলিতে বিভিন্নরূপ আছে, যেমন সুরি, সুই সিউর, সুই মিউর, তবনি সুইর। ফিরিশতা আর বদাওনী এই নামটির উল্লেখ করেন নাই। তারিখ-ই-খান জাহান লোদীতে আছে সুইসিপুর। বদাওনীতে নামটি অন্যত্র লিখা আছে, তথায় ইহা সুই সুইর দেওয়া আছে। এই স্থানে ফিরিশতাও নামটি 'শিউপুর' উল্লেখ করিয়াছেন।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটি বিভিন্নরূপ আছে যেমন আহমদ খান, আহমদ, হামিদ। ফিরিশতা লিখিয়াছেন আহমদ।

খানের বশ্যতা স্বীকার করা এবং চন্দেরী অঞ্চলে তাহার নামে খোৎবা পাঠ করিবার সুসংবাদ দিয়া ফরমান জারি করেন এবং নূতন বিজয় লাভ দ্বারা চতুর্দিকে এবং সর্বত্র তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে।[১]

এই সময়ে রাষ্ট্রীয় কারণে সুলতান কতিপয় আমীরের জায়গীর বদল করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন। তিনি সরকার ইতাওয়া, আলম খান লোদীর পুত্র ভিখন খানের নিকট হইতে নিয়া নেন এবং ইহা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খিযির খানকে প্রদান করেন। এইরূপে খাজা মুহম্মদ ইমাদ ফরমুলির জায়গীর হস্তান্তর করিয়া তাহার ভ্রাতা খাজা আহমদকে দেওয়া হয়: আর অন্যান্য আমীরদের জায়গীরও অনুরূপভাবে হস্তান্তর করা হয়। ইহার পর (সুলতান) মুবাক খান লোদীর পুত্র সইদ খান, এবং উসমান ফরমুলির পুত্র শেখ জামাল, এবং রায় জগর সেন কাচওয়াহা এবং খিযর খান এবং চন্দেরীর খাজা আহমদকে প্রেরণ করেন আর তাহারা ঐ অঞ্চলটিকে তাহাদের আয়ত্বে আনয়ন করেন এবং তথায় প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করেন ; আর সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী সুলতান নাসিরুদ্দীন মালভীর পৌত্র শাহযাদা মুহম্মদ খানকে ঐ শহরে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।[২] আর ঐ অঞ্চলের শাসনভার পূর্বের ন্যায় তাহাকে প্রদান করা হয় ; কিন্তু সকল ক্ষমতা তাহাদের হস্তগত হয়। বহজাত খান এই সব দেখিয়া শুনিয়া তথায় অবস্থান করা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না, এবং তিনি সুলতানের নিকট চলিয়া আসিলেন।

এই সময়ে সুলতানের হৃদয় সারণ শহরের গভর্ণর হুসেন খান ফরমুলির প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে ; আর উত্তম নীতিরূপে তিনি হাজী সারঙ্গকে তথায় প্রেরণ করেন এবং হুসেন খানের সেনাবাহিনীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন আর তখন তিনি এই সম্বন্ধে অব্যাহত হইয়া তাহার অল্প কয়েকজন বন্ধুসহ লক্ষ্ণৌতি অঞ্চলে গমন করেন এবং বাঙ্গালার শাসনকর্তা সুলতান আলাউদ্দীনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে আলী খান নাগোরী যাহাকে সুই সুইর সুবায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সুলতান মুহম্মদ মালভীর প্রজা এবং রণথম্ভোরের শাসনকর্তা শাহযাদা দৌলত খানের সহিত একমত হইয়া এবং যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এবং তাহার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানটির পাঠ বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। ফিরিশতা যে পাণ্ডুলিপিগুলি সমর্থন করেন এই স্থানে তাহার পাঠই গ্রহণ করা হইয়াছে।

২. এই স্থানের অর্থ খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে মনে হয় শাহযাদা মুহম্মদ খানকে কোন সাক্ষীগোপালরূপে রাখা হয়। যদিও প্রকৃত ক্ষমতা সুলতানের হাতে চলিয়া আসে। ফিরিশতা ইহা সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন।

দ্বারা তাহাকে সুলতানের (সিকান্দরের) নিকট বশ্যতা স্বীকারে প্ররোচিত করে এবং স্থির করে যে তিনি শেষোক্ত জনের নিকট রণথম্ভোর দুর্গটি সমর্পণ করিয়া দিবেন। আলী খান এই ব্যাপার সম্বন্ধে সুলতানের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন এই সুসংবাদে অত্যন্ত প্রীত হন এবং ঐ দিকে গমনের সংকল্প করেন এবং পর পর পথ চলিয়া বিয়ানার সন্নিকটে উপস্থিত হন। তিনি তথায় ইতঃস্তত ভ্রমণে এবং শিকারে চারি মাসকাল অতিবাহিত করেন; আর পণ্ডিত ব্যক্তি ও শেখগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিশেষ করিয়া তিনি সৈয়দ নমতুল্লাহ এবং শেখ আবদুল্লাহ্ হুসেনীর[১] সাহায্যে তাহার সময় অতিবাহিত করেন; ইহারা প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি এবং কেরামতি প্রদর্শনের জন্য সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

কবিতা

ন্যায়পরায়ণকে অতিক্রম করিয়া যাইও না, কারণ ওজন করিবার সময়
ভারসাম্য অনুযায়ী পাথরকে সোনার বিপরীতে স্থাপন করা হয়।

সংক্ষেপে আলী খান শাহযাদা দৌলত খান আর তাহার মাতাকে যিনি রণথম্ভোর দুর্গে কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নানারূপ অঙ্গীকার দ্বারা এমনভাবে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে শাহযাদা কাল বিলম্ব না করিয়া সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শেষোক্ত জনের নির্দেশক্রমে আমীরগণের সকলেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া যান এবং তাহাকে সর্বপ্রকার সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সুলতানের সম্মুখে আনয়ন করেন। শেষোক্ত জন তাহাকে পিতার ন্যায় মহব্বতে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে একটি বিশেষ সম্মানীয় অঙ্গাবরণ এবং কতিপয় অশ্ব ও হস্তী উপহার প্রদান করিলেন এবং ইতিমধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তাহাকে রণথম্ভোর দুর্গটি তত্ত্বাবধান করিবার কষ্ট স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ আলী খান-ই শঠতাপূর্ণভাবে কাজ করিতেছিলেন এবং শাহযাদা দৌলত খানকে দুর্গটি সমর্পণ না করিবার প্ররোচনা দিলেন এবং তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার সাহস জোগাইলেন। অতঃপর শাহযাদা দুর্গটি হস্তান্তর করা পরিহার করিতে লাগিলেন। সুলতান আলী খানের কপটতা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন এবং সুই সুইর সরকার তাহার নিকট হইতে হস্তান্তর করিয়া তাহার ভ্রাতা আবু

১. দুইটি পাণ্ডুলিপি তাহার নাম দিয়াছে শেখ আবদুল্লাহ হুসেনী, আর অন্যান্যগুলিতে আছে শেখ আবদুল্লাহ আল হুসেনী। বদাওনী লিখিয়াছেন শেখ আবদুল্লাহ হুসেনী। ফিরিশতা লিখিয়াছেন শেখ হুসেনী।

বকরকে দিলেন ; আর তাহার ধৈর্য এবং স্বাভাবিক দয়াশীলতার জন্য আলী খানের প্রতি অধিকতর অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না এবং রণথম্ভোরের শাহযাদার প্রতিও কোনরূপ অসন্তোষ বা ক্রোধ প্রদর্শন করিলেন না।

সুলতান বিয়ানা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে তাহার মন স্থির করিয়া তথা হইতে থনকর[১] উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ; আর ঐ স্থান হইতে তিনি বারি[২] নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ পরগণাটি মুবারক খানের পুত্রগণের নিকট হইতে হস্তান্তর করিয়া শেখযাদা মকনকে দিলেন এবং তৎপর ধোলপুর গমন করিলেন আর তথা হইতে তাহার রাজধানী আগ্রা আগমন করিলেন ; আর তাহার পূর্ব প্রথা অনুযায়ী সর্বত্র ফরমান প্রেরণ করিলেন এবং আমীরগণকে তাহাদের সরকার হইতে তলব করিলেন।

জীবনের যেহেতু কোন বিশ্বাস নাই আর সার্বভৌমত্বের কোন স্থায়িত্ব নাই, তাই এই সময়ে সুলতান অসুস্থ হইয়া পড়িলেন আর যদিও তাহার উচ্চ মনোবলের জন্য তিনি ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব দিলেন না এবং ঐ অবস্থাতেই দেওয়ানে বা দরবার কক্ষে উপবেশন করিতেন এবং অশ্বারোহণে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে রোগ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে এবং এমন অবস্থা হয় যে এক মুঠো খাদ্য বা পানি তাহার গলা দিয়া যাইত না ; আর আত্মার গমনপথ বন্ধ হইয়া যায়।

কবিতা

এই উৎসবের কক্ষে, পেয়ালা বাহকগণ এত নির্দয়,
যে আনন্দের সময়েই তাহারা বিষের পাত্র তুলিয়া ধরে !
হায় আনন্দের জন্য তাহারা মাটির সিকান্দর তৈরী করে
তাহারা সঞ্জরের হৃদয়-রক্তে উত্তেজনার মদিরা পান করে।

আঃ হিঃ ৯২৩ সনের (১৫১৮ খ্রীঃ) যি-কাজা মাসের ৭ তারিখে[৩] রবিবারে তিনি এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে নামটি থনকর এবং থহকব দুই রকমই আছে। বদাওনীও লিখিয়াছেন থনকর ; ফিরিশতা লিখিয়াছেন থানকর। কর্ণেল রেভিং-এর মতে স্থানটির নাম থনকর, ভনকর বা থনফির বা থনগির হইবে। ইহা বিয়ানা অঞ্চলে অবস্থিত একটি দুর্গ।
২. আগ্রা সরকারে একটি ক্ষুদ্র শহর।
৩. কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে এবং বদাওনী লিখিয়াছেন ১৭ তারিখে ; অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে এবং তারিখ-ই-দাউদীতে আছে ৭ তারিখে।

কবিতা

সপ্ত আবহাওয়ার অধিপতি সিকান্দর আর জীবিত নাই,
কেহই বাঁচিয়া থাকে না, যেমন সিকান্দর বাঁচিয়া নাই।

তাহার রাজত্বকাল ছিল ২৮ বৎসর এবং পাঁচ মাস।

যেহেতু কতিপয় ইতিহাসে সুলতান সিকান্দরের প্রশংসা এবং গৌরবে এত কিছু বলা হইয়াছে যে ইহার এক বৃহৎ অংশকে অতিরঞ্জিত এবং অত্যুক্তি বলিয়া সন্দেহ করা হয় এবং যাহা শুধু নিছক সত্য কথা তাহাই এই স্থানে বলা হইয়াছে। তাহারা বলে যে সুলতান সিকান্দর দৈহিক সৌন্দর্য এবং মানসিক উৎকৃষ্টতায় সুশোভিত ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে সব কিছুই ছিল অত্যন্ত স্বল্পমূল্য এবং শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। সুলতান প্রতিদিন জনসমক্ষে উপবেশন করিতেন এবং বিচার প্রার্থী সকলেই সহজে তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিতেন। আর কখনও কখনও সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং ঘুমাইতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি বিবাদমান বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই বৈঠকেই সম্পন্ন করিতেন। তাহার সার্বভৌমত্বের সময়ে ভারতের জমিদারগণের অত্যাচারের হস্ত সংকীর্ণ হইয়া আসে আর তাহাদের সকলেই বাধ্য এবং অনুগত থাকে। শক্তিমান আর দুর্বলকে সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হইত। সর্বক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার করা হইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও ভোগবিলাসের পিছনে ছুটিতেন না এবং আল্লাহর পরম ভক্ত ছিলেন এবং লোকের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। যে দিন তিনি তাহার ভ্রাতা বারবক শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন যুদ্ধ চলিবার সময় একজন দরবেশ আসিয়া হাজির হন এবং সুলতানের হাত ধরিয়া বলেন, "আপনার জয় হইবে।' সুলতান জোর করে তাহার হাত টানিয়া লইলেন। দরবেশ বলিলেন, "আমি আপনাকে শুভ ইঙ্গিত দান করিতেছি আর আপনাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতেছি; তবে কেন আপনি আপনার হাত টানিয়া লইলেন?" প্রত্যুত্তরে সুলতান বলিলেন যে যখনই দুই দল মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় তখন এক পক্ষের বিজয়ের ভবিষ্যৎ বাণী করিতে নাই, কিন্তু এইরূপ বলিতে হয় যে. ইসলামের মঙ্গলের জন্য যাহা ঘটা প্রয়োজন তাহাই ঘটিবে; আর বিজয়ের জন্য লোকের উচিত আল্লাহর নিকট মোনাজাত করা যেন লোকের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই যেন সম্পন্ন হয়। প্রতি বৎসরে দুইবার তিনি তাহার সাম্রাজ্যের ফকিরগণ এবং অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিগণকে নির্দেশ দিতেন[১] যেন তাহারা তাহাদের

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে ভিন্নরূপ পাঠ আছে যেমন, প্রতি বৎসরে দুইবার তিনি ফকির, দীন দরিদ্র এবং যাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতেন তাহাদিগকে তলব করিতেন এবং তাহাদিগকে পোশাক, স্বর্ণ এবং ছয় মাসের জন্য যাহা কিছু তাহাদের প্রয়োজন তাহাই দান করিতেন।

প্রয়োজনীয় জিনিসের একটি বিশদ বিবরণ লিখিয়া আনেন। আর তিনি তাহাদের প্রত্যেককে তাহার অবস্থা অনুযায়ী পরবর্তী ছয় মাসের জন্য অর্থ প্রেরণ করিতেন; আর যে কেহ সামরিক চাকুরীর জন্য আসিতেন, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব পুরুষদের সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন এবং সেই অনুযায়ী তাহাকে নিযুক্ত করিতেন[১] (অর্থাৎ তাহার বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করিতেন), এবং তাহার অশ্ব এবং সাজ-পোশাক পরিদর্শন না করিয়াই তাহাকে জায়গীর বরাদ্দ করিতেন এবং বলিতেন, "তোমার জায়গীর হইতে তোমার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া নাও।"

ইসলামের প্রতি তাহার এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে অনেক সময় তিনি সীমা ছাড়াইয়া যাইতেন। তিনি কাফেরদের সকল পূজার স্থান ভূমিস্যাৎ করিয়া দেন; আর তাহাদের নাম বা অন্য কোনরূপ চিহ্ন রাখেন নাই। মথুরা এবং অন্যান্য যে সব স্থানে হিন্দুদের স্নানের স্থান আছে সে সব স্থানে তিনি সরাই এবং বাজার এবং মসজিদ এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এব হিন্দুদিগের স্নান বন্ধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। যদি কোন হিন্দু মথুরায় তাহার দাঁড়ি অথবা মাথা কামাইতে চাহিত, তবে নাপিত তাহার দাঁড়িতে বা মাথায় হাত রাখিতে অস্বীকার করিত এবং তিনি প্রকাশ্য নির্দেশ জারি করিয়া সর্বপ্রকার পৌত্তলিক আচার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তিনি সালার মাসুদের বল্লমধারীগণের বাৎসরিক শোভা-যাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া দেন।[২] পবিত্র লোকদের দরগাহে মহিলাদের গমনও তিনি নিষিদ্ধ করেন। তাঁহার তরুণ বয়সে অর্থাৎ তিনি যখন শাহযাদা ছিলেন তিনি শুনিতে পান যে থানেশ্বরে একটি জলাশয় আছে যেখানে হিন্দুগণ জমায়েত হয় এবং স্নান করে। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করেন; এই ব্যাপারে মহানবীর প্রবর্তিত আইনের বিধান কি?" তাহারা বলিলেন, "প্রাচীন পৌত্তলিক মন্দিরসমূহ ধ্বংস করা আইনসম্মত নয় এবং প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত প্রথা জলাশয়ে স্নান করা নিষিদ্ধকরণ আপনার পক্ষে উচিত হইবে না।" শাহযাদা তাহার ছোরায় হাত রাখিলেন এবং ঐ পণ্ডিত ব্যক্তিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "তুমি পৌত্তলিকদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছ।" জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলিলেন, "মহানবীর প্রবর্তিত আইনের বিধানে যাহা আছে আমি তাহাই বলিতেছি, আর আমি সত্য কথা বলিতে ভয় পাই না।" ইহাতে শাহযাদা শান্ত হইলেন।

১. একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে, 'তাহাব বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করিতেন।'

২. সালার মাসুদ গাযী ছিলেন ইসলামের একজন সুবিখ্যাত বীর; তিনি পৌত্তলিক হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেন এবং অবশেষে বাহরাইচের নিকটেব যুদ্ধে আঃ হিঃ ৪২৪ সনে নিহত হন। এবং তৎপর সুলতান-উশ-শুহাদা বা শহীদগণের রাজা উপাধি লাভ করেন। তাহার বল্লমধারীদের শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া সুলতান সিকান্দর মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রকার পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা প্রদর্শন করেন।

সংক্ষেপে তিনি তাহার রাজ্যের সর্বত্র প্রত্যেক মসজিদে কোরান পাঠক বা ইমাম এবং ধর্ম প্রচারক এবং ঝাড়ুদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য বৃত্তি ও ভাতা মঞ্জুর করেন। শীতকালে তিনি ফকিরদের জন্য পোশাক ও শাল প্রেরণ করিতেন; আর প্রতি শুক্রবার তিনি শহরের ফকিরদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করিতেন, আর প্রত্যেক দিন পাক না করা খাদ্য এবং পাক করা খাদ্য কতিপয় স্থানে বিতরণ করা হইত। আর তাহার রাজত্বের সর্বত্র প্রতিদিন[১] আর প্রতি শুক্রবারে এবং প্রতি বৎসরে দুইবার বিশেষতঃ ফকিরদের জন্য পুরস্কার বিতরণ করা হইত। সকল পবিত্র দিনে যেমন রমযানে এবং মহরম মাসের প্রথম দশ দিন এবং বিজয়ের ফলে এবং অন্যান্য আনন্দের পর শোকরিয়া আদায় উপলক্ষে তিনি ফকির ও দরবেশগণের হৃদয় উৎফুল্ল করিতেন।

শ্লোক

আপনার যদি মহত্বের গৌরব থাকে
তবে দরিদ্রের হৃদয় আপনার হাতে তুলিয়া নিন।

দেশে শিক্ষার[২] প্রসার লাভ করে এবং আমীর ও সৈন্যদের পুত্রগণও নিজেদের জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভে নিয়োজিত করে। সম্পদশালী ব্যক্তিগণ তাহাদের সম্পদ হইতে ফকির ও দরিদ্র লোকদের মহানবীর আইন অনুযায়ী দান করিতেন।

কথিত আছে যে, যে সময় সুলতান বহলোল ইন্তেকাল করেন এবং তাহারা সুলতান সিকান্দরকে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হন, সেই সময় এক দিন তিনি শেখ সামাউদ্দীনকে[৩] যিনি তদানীন্তন সময়ের একজন পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দিল্লীর বাইরে গমন করেন এবং তাহার জন্য তাহাকে দোয়া করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে আমি আপনার সঙ্গে মিযান সরফ (আরবী ব্যাকরণ) কিতাবটি পাঠ করিতে চাই এবং তাহা আরম্ভ করেন। শিক্ষক যখন ইহাতে "অসাদক আল্লাহ তা'আলা ফি দারইন,' অর্থাৎ মহান আল্লাহ যেন উভয় পৃথিবীতে সৌভাগ্যশালী করেন, পাঠ করেন তখন সুলতান বলিলেন, "ইহা আবার বলুন" এবং তাহাকে তিনবার ইহা

১. এই স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্নরূপ আছে যেমন দৈনিক বা প্রতি শুক্রবার।
২. তারিখ-ই-দাউদীতে আছে যে আবগব মহাভেদক বা ভেষজ শাস্ত্র অনুবাদ করা হয় এবং তাহার নাম দেওয়া হয় তিবিব সিকান্দরী। আরগর সম্ভবতঃ আর্য শব্দের অপভ্রংশ। মহাভেদক সম্ভবতঃ মহাভেদ।
৩. ফিরিশতাতে আছে শেখ বাহাউদ্দীন।

বলাইলেন এবং তৎপর পবিত্র লোকটির হস্ত চুম্বন করিলেন এবং ঐ মোলাকাতটি শুভ-লক্ষণসূচক গণ্য করিয়া যাত্রা করিলেন।

কবিতা

পবিত্র ও জ্ঞানী লোকদের বাণী ভাগ্যের ব্যাখ্যা সূচিত করে
তাহাদের মন আর তাহাদের জিহ্বা কালি আর কলমের ন্যায়
তাহাদের শুভাকাঙ্খায় আছে চিরন্তন শান্তি
আর তাহাদের শত্রুতায় লুক্কায়িত আছে চির বিনাশ।

আমীর এবং বিত্তবান লোকদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র এবং ফকিরদের মধ্যে বৃত্তি ও ভাতা দিতেন তাহারা সুলতানের বিশ্বাসভাজন হইলেন; আর শেষোক্ত জন বলিতেন যে তাহারা সৎ কাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, যাহাতে কখনও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

তিনি তাহার রায়ত এবং সৈন্যগণ সম্বন্ধে এমন পর্যায় পর্যন্ত সংবাদ রাখিতেন যে তাহাদের পারিবারিক বিষয়সমূহের বিশদ বিবরণও তাহার নিকট পৌঁছিত; আর কখনও কখনও লোকেরা একা থাকিলেও তাহারা যাহা কিছু ঘটিত তাহার সংবাদও তিনি লাভ করিতেন; ফলে লোকেরা সন্দেহ করিত যে সুলতানের একটি জিন আছে এবং তিনি তাহার সহিত এত অন্তরঙ্গ যে সে তাহাকে ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে তাহারও সংবাদ দেয়।

তাহারা বলে যে যখনই তিনি কোন স্থানে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন ঐ বাহিনীতে প্রতিদিন দুইটি ফরমান পৌঁছিত, একটি খুব ভোর বেলা, ইহাতে নির্দেশ থাকিত যে দিনের যাত্রা শেষে তাহারা কোন কোন স্থানে অবস্থান করিবে আর অপরটি পৌঁছিত বিকালে, বা দিনের শেষে যাহাতে নানা কার্য সম্পাদনের নির্দেশ থাকিত। কখনও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই; আর পথে সর্বদা ডাক চলাচলের অশ্ব প্রস্তুত থাকিত। যখনই কোন সীমান্তবর্তী জেলার কোন আমীরের নিকট কোন ফরমান প্রেরণ করা হইত, শেষোক্ত জন দুই বা তিন কারোহ অগ্রবর্তী হইয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিতেন, আর যে লোক ফরমান বহন করিয়া নিয়া যাইতেন তাহার জন্য একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইত এবং তিনি তাহার উপরে দাঁড়াইতেন, আর যিনি ফরমান গ্রহণ করিতেন তিনি ইহার নীচে দাঁড়াইতেন; আর ফরমানটি তাহার দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহা মাথায় রাখিতেন। নির্দেশ যদি এইরূপ থাকিত যে ঐ স্থানেই ইহা পাঠ করিতে হইবে, বাহক নির্দেশটি বলিয়া দিতেন এবং ইহা ঐ

স্থানেই পাঠ করা হইত ; আর যদি নির্দেশ এরূপ থাকিত যে ফরমানটি কোন মসজিদে মঞ্চের নিকটে পাঠ করিতে হইবে তবে তাহাই করা হইত। ফরমানটি যদি বিশেষ করিয়া ঐ লোকটির জন্যই হয়, বা তাহার জন্যই বিশেষভাবে লিখিত হয় তবে ইহা গোপনে তাহার নিকট পাঠ করা হয়।

প্রতিদিন পরগণা ও প্রদেশসমূহের জিনিসপত্রের মূল্য এবং ঘটনাসমূহের একটি তালিকাপঞ্জী সুলতানের নিকট পেশ করা হইত। যদি কোথাও এক চুল ব্যতিক্রম দেখা দিত তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা হইত। তিনি সর্বদা কলহ মীমাংসায় এবং মামলার বিচার সম্পাদনে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহে আর প্রজাদের মঙ্গল বিধানে ব্যাপৃত থাকিতেন।

তাহার বুদ্ধিমত্তার তীক্ষ্ণতা এবং তাহার প্রতিভা সম্বন্ধে অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। যাহা কিছু সত্য এবং যাহাতে সর্বাপেক্ষা কম অতিরঞ্জন এবং অত্যুক্তি আছে আমি শুধু সেইগুলিই বিধৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

একদা গোয়ালিয়রের অধিবাসী দুই ভ্রাতা, যাহারা অতি শোচনীয় অবস্থা ও দারিদ্রতায় পতিত হইয়াছিল, এক সেনাবাহিনীতে যোগদান করে আর ঐ বাহিনীকে কোন এক বিশেষ প্রদেশ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করা হয়। সৈন্যগণ যখন লুটতরাজ ও ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল তখন এক টুকরা স্বর্ণ, কতিপয় রঙীন বস্ত্র, এবং দুইটি মূল্যবান চুনি তাহাদের হস্তগত হয়। দুই ভ্রাতার একজন বলিল, "আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, আমরা আর অধিক কষ্ট সহ্য করিব কেন ; চল আমরা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাই।" অপর জন বলিল, "দেখ ভাই, প্রথমবারেই যখন এমন মূল্যবান সম্পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সম্ভবতঃ পরে আমরা ইহার চেয়ে মূল্যবান জিনিস লাভ করিতে পারি।" অপর জন বলিল, "আমি আর কোথাও যাইব না।" অতঃপর তাহারা জিনিসগুলি দুই ভাগ করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অংশও অপর ভ্রাতাকে দিল, যাহাতে সে এইগুলি তাহার স্ত্রীকে দিতে পারে। ঐ লোকটি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং তাহার ভ্রাতার স্ত্রীর নিকট চুনিটি ছাড়া আর সবই প্রদান করিল। দুই বৎসর পর যখন তাহার ভ্রাতা ফিরিয়া আসিল এবং অনুসন্ধান করিল তখন সে চুনিটির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে বলিল, "চুনিটা কি হইল।" তাহার ভ্রাতা জবাব দিল, "আমি তাহা আপনার স্ত্রীকে দিয়াছি।" সে বলিল, "সে বলে যে সে কখনও তাহা পায় নাই।" সে জবাব দিল, 'তিনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, তাহাকে কিছু ভয় দেখানো প্রয়োজন।" লোকটি তাহার স্ত্রীকে শাসাইল। সে বলিল, "আমাকে এই রাত্রির জন্য সময় দাও। আমি কাল সকালে

ইহা বাহির করিব।" খুব ভোরে সে মিয়া ভুদার[১] গৃহে গমন করিল। তিনি ছিলেন সুলতান সিকান্দরের প্রধান আমীরগণের অন্যতম এবং প্রধান বিচারক; এবং তাহার নিকট সকল ঘটনা বিবৃত করিল। মিয়া ভুদা মহিলাটির স্বামীকে তাহার ভ্রাতাসহ হাজির হইতে নির্দেশ দিলেন; আর তাহারা যখন আসিল তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। মহিলাটির স্বামীর ভ্রাতা বলিল, "আমি তাহাকে চুনিটাও দিয়াছি।" মিয়া ভুদা বলিলেন, "তোমার কি কোন সাক্ষী আছে।" সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।" তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "কে সে?" লোকটি জবাব দিল, "দুইজন ব্রাহ্মণ।" মিয়া বলিলেন, "তাহাদের হাজির কর।" লোকটি একটি জুয়ার আড্ডায় গমন করিল এবং দুইজন জুয়াড়ীকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদেরকে কি বিষয়ে এবং কিরূপ সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহা শিখাইয়া পড়াইয়া আনিল। লোক দুইজনকে পরিষ্কার পোশাক পরাইয়া কাচারীতে হাজির করা হইল। তাহারা সাক্ষ্য দান করিবার পর মিয়া ভুদা মহিলাটির স্বামীকে বলিলেন, "যাও তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে যত কঠোরতার প্রয়োজন তাহাই প্রয়োগ করিয়া চুনিটা আদায় কর।" মহিলাটি ঐ স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং সুলতানের দরবার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল এবং বিচার প্রার্থনা করিল। সুলতান তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। মহিলাটি যাহা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ দিল। সুলতান বলিলেন, "তুমি মিয়া ভুদার নিকট যাও নাই কেন?" সে বলিল, "আমি গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার যে রূপ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল তিনি তাহা করেন নাই।" সুলতান নির্দেশ দিলেন এবং সকল পক্ষকে তাহার নিকট হাজির করা হইল। তিনি তাহাদের সকলকেই আলাদা আলাদাভাবে তলব করিলেন। মহিলাটির স্বামী এবং তাহার ভ্রাতাকে কিছু মোম দিলেন এবং হুকুম দিলেন যেন তাহারা ইহা দ্বারা চুনিটির মত আকৃতি প্রস্তুত করে। তাহারা সম্পূর্ণ এক প্রকার দুইটি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিল। অতঃপর তিনি সাক্ষীগণকে আলাদা আলাদাভাবে তলব করিলেন এবং তাহাদিগকে মোম দিলেন। তাহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্নরূপ প্রতিকৃতি তৈরী করিল। প্রত্যেকটি মোমের টুকরা সংরক্ষণ করা হইল। অতঃপর মহিলাটিকে তলব করা হইল এবং সুলতান তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি মোমটি দ্বারা চুনিটির প্রতিকৃতি তৈরী করিতে পারিবে?" মহিলাটি বলিল, "যে জিনিস আমি কখনও দেখি নাই, আমি কি করিয়া তাহার প্রতিকৃতি তৈরী করিব?" যদি তাহাকে পুনঃপুনঃ ইহা করিতে বলা হইল, সে কিছুতেই রাজী হইল না। অতঃপর তিনি মিয়া ভুদাকে সম্বোধন করিলেন এবং তৎপর

১. পাণ্ডুলিপিগুলিতে ইহার নাম বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে। ফিরিশতা লিখিয়াছেন মিয়া ভুরি।

সাক্ষীগণকে বলিলেন, "তোমরা যদি সত্য কথা বল তবে তোমাদের জীবন রক্ষা পাইবে, কিন্তু তোমরা যদি তাহা না কর তবে তোমাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে।" অতঃপর তাহারা সত্য ঘটনা বিবৃত করিল। মহিলাটির স্বামীর ভ্রাতাকেও তলব করা হইল এবং তাহাকেও কঠোর শাস্তির ভয় দেখান হইল। সেও ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দিল। অসহায় মহিলাটিকে এইবার মিথ্যা দোষারোপ হইতে মুক্তি দেওয়া হইল ; আর সুলতানের মহা অন্তর্দৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তা সকলের নিকট প্রকট হইয়া উঠিল।

তিনি মিলসহ সাধারণ পারসিক কবিতা লিখিতেন আর তাহার কবিরূপে ছদ্মনাম ছিল গুলরুখী। শেখ জামাল তাহার একজন সভাসদ ছিলেন এবং তিনি তাহার সহিত বহু আলাপ-আলোচনা করিতেন। তিনি সুলতানের স্মৃতিতে নিম্নরূপ দ্বিপদী কবিতাগুলি রচনা করেন।

কবিতা

আপনার গলিপথের ধূলায় আমার পোশাক প্রস্তুত হইয়াছে,
আর তাহাও আমার চোখের অশ্রুতে ভিজিয়া গিয়াছে !
তাহার শরাঘাতে আমার ডানা সম্পূর্ণ ছুলিয়া গিয়াছে
ধনুক ভ্রূসম্পন্ন তাহার নিকট আমি এখন উড়িয়া যাইব।

তাহারা বলে যে একদা সুলতান নামাজ পড়িবার পর তাহার তসবিহ জপিতে-ছিলেন। তাহার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুলতান তাহার প্রতি এমন এক ইঙ্গিত করিলেন যাহার অর্থ, তলব কর ; তত্ত্বাবধায়ক ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না ; এবং বাহির হইয়া গিয়া মিয়া ভুদাকে বলিলেন, "সুলতান তাহার তসবিহ জপ করিতেছেন এবং আমাকে তলব করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমি সাহস করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই যে কাহাকে তলব করিব আর এখন আমার ফিরিয়া যাইবার মুখ নাই। আমি এখন ফিরিয়া গিয়া সুলতানের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না. আর আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না, কাহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব।" মিয়া ভুদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সুলতান তখন কোন দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাহার দৃষ্টি কিসের উপর নিবদ্ধ ছিল ?" তিনি বলিলেন, "সদ্য নির্মিত ইমারতটির দরজার দিকে ছিল।" মিয়া ভুদা বলিলেন, "ওস্তাগার ও জুতার মিস্ত্রিকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে নিয়া যান।" প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ওস্তাগার ও জুতার মিস্ত্রিকে সঙ্গে নিলেন। সুলতান ইহাতে অবাক হইলেন যে কি করিয়া তিনি তাহার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে পারিলেন ; তিনি জানিতে চাহিলেন, "আপনি কি করিয়া বুঝিলেন যে আমি এই লোকগুলিকে

চাহিতেছি?" প্রধান তত্ত্বাবধায়ক জবাব দিলেন "মিয়া ভুদা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন।" মিয়া ভুদার বুদ্ধিমত্তার প্রতি সুলতানের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

কথিত আছে যে একদা সুলতান সিকান্দর তাহার প্রধান বিচারপতি এবং উযির মিয়া ভুদাকে বলিলেন "আমার রাজ্যে প্রায়ই আমার অফিসারগণের মধ্যে বহু দুর্নীতি সংঘটিত হয় আর ইহা আমার প্রজাদের সর্বনাশের কারণ হয়। আমার মহান মন প্রায়ই এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ইহার যদি কোন প্রতিকার আপনার মনে জাগে তবে অত্যন্ত উপকার হয়।" মিয়া ভুদাও তাহার নিকট নিবেদন করিলেন, "দুর্নীতি দূর করা খুবই সহজ, আর ইহা এইরূপে করা যায় যে সুলতান যদি শিকলের এক প্রান্ত ধরিয়া রাখেন আর অপর প্রান্ত আপনার দাসের নিকট দেন, তবে কখনও কোন দুর্নীতি দেখা দিবে না। আর প্রকৃতপক্ষে যখনই কাহাকেও কোন কাজ করিতে দেওয়া হয় তবে তাহাকে অবশ্যই নির্লোভী হইতে হইবে অন্যথায় দুর্নীতি দূর করা যাইবে না।"

সুলতান ইব্রাহীম, পিতা সুলতান সিকান্দর, পিতা সুলতান বহলোল লোদী

সুলতান সিকান্দর যখন আল্লাহ্ তা'আলার করুণার সহিত একত্রিত হইলেন, তখন সুলতানের সুউচ্চ, শক্তিসম্পন্ন এবং মর্যাদা সম্পন্ন পদে রাষ্ট্রের আমীর ও উচ্চ পদস্থ অফিসারগণের সম্মতিক্রমে তাহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র[1] সুলতান ইব্রাহীমকে প্রতিষ্ঠিত

[1] সম্ভবতঃ সুলতান ইব্রাহীম সুলতান সিকান্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। বয়সের দিক দিয়া সুলতান সিকান্দরের পুত্রগণের পর্যায় এইরূপ ছিল, আযম হুমায়ুন, জালাল, ইব্রাহীম, ইসমাইল এবং হুসেন। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানার মতে তাহার নির্বাচনের কারণ এইরূপ। সুলতান সিকান্দরের এক স্ত্রীর গর্ভের দুই সন্তান রাখিয়া যান। তাহারা হইলেন ইব্রাহীম এবং জালাল। প্রথমোক্ত যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তিনি তাহার দৈহিক সৌন্দর্য এবং চমৎকার স্বভাবের জন্য খ্যাতি লাভ করেন এবং আমীরগণ তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প করেন এবং আঃ হিঃ ৯২৩ সনের (নভেম্বর ১৫১৭ খ্রীঃ) ৭ই যিল হিজ্জা তারিখে তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু যেহেতু সুলতান সিকান্দর ৭ই যিল কাদা তারিখে ইন্তেকাল করেন দেখা গিয়াছে, যে তাহার সিংহাসনারোহণের এই তারিখটি সম্ভবতঃ ভুল। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানার অনুবাদক বলেন যে তারিখ-ই-খান জাহান লোদী অনুযায়ী সুলতান ইব্রাহীম ৮ই যিল কাদা তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন আর এই তারিখটিই সঠিক। সম্ভবতঃ সুলতান সিকান্দরের অন্যান্য পুত্রগণের মাতাগণ অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন এবং ফলে ইব্রাহীম ও জালাল তাহার উত্তরাধিকারী হন। সুলতান ইব্রাহীম দিল্লীতে আর জালাল কিছুকালের জন্য জৌনপুরে। তারিখ-ই-দাউদী সুলতান সিকান্দরের পুত্রগণের একটা ভিন্নরূপ তালিকা দিয়াছেন। ইহার মতে তাহাদের সংখ্যা ছয়জন এবং বয়োঃক্রম অনুযায়ী তাহাদের তালিকা নিম্নরূপ: ইব্রাহীম খান, জালাল খান ইসমাইল খান, হুসেন খান, মাহমুদ খান এবং আযম হুমায়ুন।

করা হয়। তিনি তাহার বুদ্ধিমত্তার সৌন্দর্য ও প্রখরতা এবং তাহার সাহস এবং প্রশংসনীয় নৈতিক গুণাবলীর জন্য সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু সৈন্যগণ বিশেষ করিয়া যোদ্ধা ও কর্মী লোকেরা তাহাদের বিষয়সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আর তাহাদের চাকুরী ও নির্দেশনার সুনাম ও গৌরবের জন্য আর তাহাদের লোকজন ও সাজ-সরঞ্জামের বিরাটত্বের জন্য সর্বদা তাহাদের সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে যে রাজ্যের শাসন পরিচালনা এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসন হইতে নির্দেশ দানে ক্ষমতা অত্যধিক হইবে না বা তাহারা সম্পূর্ণ প্রাধান্য থাকিবে না। আর এই কারণে তাহারা স্থির করেন যে সুলতান ইব্রাহীম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবেন আর তাহার শাসন জৌনপুর রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে ; আর শাহযাদা জালাল খান জৌনপুরের সলতানাতের মসনদে আরোহণ করিবেন, এব ঐ অঞ্চলের দেশসমূহ শাসন করিবেন।[১] কিন্তু তাহারা জানিতেন না যে সার্বভৌমত্ব ভাগ করা যায় না আর এক খাপে দুইটি তরবারি রাখা যায় না।

শ্লোক

এক দেহে দুই প্রাণ কখনও থাকিতে পারে না
আর এক রাজ্যে দুই রাজা শাসন করিতে পারে না।

১. এই গ্রন্থে জৌনপুরে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের যে কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা তেমন কোন জোরালো কারণ মনে হয় না। সম্ভবতঃ লেখক স্বয়ং ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, আর তাহারই ফলে তিনি এরূপ এক ঘোর প্যাচওয়ালা পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বদাওনী ইহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। তারিখ-ই-সালাতিন-ইআফঘানাতে আছে : রাষ্ট্রের আমীর ও অন্যান্য পারিষদ ব্যক্তিগণ অতঃপর ইব্রাহীমের এক মাতার গর্ভজাত ভ্রাতাকে সুলতান জালালুদ্দীন উপাধি দান করিলেন এবং তাহাকে বহু অফিসার ও এক বিশাল বাহিনীসহ জৌনপুর রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু তাহাদের এইরূপ কার্যের জন্য কোনরূপ যুক্তি দেন নাই। একমাত্র ফিরিশতাতেই ইহার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় ; তাহার মতে ইব্রাহীম তাহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেন যে অফিসারগণের মধ্যে তাহার নিজের গোত্রের এবং অন্যান্যদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ থাকিবে না এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে রাজাদের কোন আত্মীয় স্বজন বা স্বগোত্রীয় থাকা উচিত নয়, সকলকেই এক পর্যায়ভুক্ত প্রজারূপে গণ্য করিতে হইবে আর সকলেই এক পর্যায়ের রাষ্ট্রের কর্মচারী হইবে। আর যে সব আফঘান আত্মীয় ইতিপূর্বে সম্রাটের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহাদিগকে তখন সম্মুখে হাত জুড়িয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। ইহার ফলে ক্ষমতাশালী লোদী ও অন্যান্য আমীরগণ তাহার প্রতি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন এবং তাহারা একত্র ষড়যন্ত্র করেন এবং ইব্রাহীমের অধীনে দিল্লী এবং কতিপয় অধীনস্থ প্রদেশ রাখিয়া তাহারা জালাল খানকে জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সংক্ষেপে শাহযাদা জালাল খান আমীরগণ এবং জৌনপুরের পরগণাসমূহের জায়গীরদারগণসহ জৌনপুর অভিমুখে গমন করিলেন এবং ঐ রাজ্যের সিংহাসনে সুদৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আযম হুমায়ুন সরওয়ানীকে তাহার প্রতিনিধি এবং উযির (ভকিল ওয়া পেশওয়া) নিযুক্ত করেন। এই সময়ে রাপ্রী হইতে খান জাহান লোদী সুলতান ইব্রাহীমের দরবারে আগমন করেন এবং উযির এবং ভকিলগণকে তিরস্কার এবং উপহাস করিয়া বলেন যে সার্বভৌমত্ব এবং শাসনকার্যকে দুই ভাগ করিয়া তাহার চরম ভুল এহং মারাত্মক সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন ; আর ইহা গ্রহণ করা বিজ্ঞ জনের কাজ নয়। অবশেষে রাষ্ট্রের অফিসারগণ ইহার সংশোধন করা সুবিবেচনার কাজ বলিয়া গণ্য করেন ; আর যেহেতু তখন পর্যন্ত শাহযাদা জালাল খান ক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব লাভ করেন নাই, তাহাকে দিল্লীতে তলব করা স্থির করেন। তাহারা তাহাকে তলব করিবার জন্য হায়বত খান গুর্গ আন্দাজকে প্রেরণ করেন ; আর মর্যাদাপূর্ণ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ ভাষার পোশাকে এক ফরমান প্রেরণ করিয়া বলা হয় যে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে এবং তিনি যেন সামান্য সংখ্যক রক্ষী-সহ দ্রুত আগমন করেন। হায়বত খান যখন শাহযাদার দরবারে আগমন করেন, যদিও তিনি নানারূপ ছল-চাতুরী এবং তোষামোদ ব্যবহারের চেষ্টা করেন এবং প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন, শাহযাদার তাহাদের প্রতারণার সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে অসম্মত হন ; আর মোলায়েম জবাব দিয়া তিনি কৌশল করিয়া এড়াইয়া যান। হায়বত খান এই সব ব্যাখ্যা করিয়া সুলতানের নিকট নিবেদন প্রেরণ করেন। সুলতান তখন শেখ সইদ ফরমুলির পুত্র শেখযাদা মুহম্মদ এবং মালিক আলাউদ্দীন জিলওয়ানীর পুত্র মালিক ইসমাইল এবং কাযী মজদুদ্দীন হেজাবকে (গৃহাধ্যক্ষ) প্রেরণ করিলেন। তাহাদের খোশামোদেও কোন কাজ হইল না এবং শাহযাদা প্রত্যাবর্তন করিলেন না। ইহার পর ঐ সময়ের পণ্ডিত ব্যক্তি ও দার্শনিকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ সব অঞ্চলের আমীর এবং শাসন-কর্তাগণের নিকট ফরমান প্রেরণ করা হয় ; আর ইহাদের প্রত্যেকের নিকট তাহার পদমর্যাদা এবং অবস্থা এবং বংশগৌরব অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র যুক্তি, এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের আশ্বাস এবং ইঙ্গিত ও প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই ফরমানগুলির উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ যে তাহারা যেন শাহযাদা জালাল খানের প্রতি কোনরূপও আনুগত্য প্রকাশ বা মেলামেশা হইতে বিরত থাকেন, আর তাহার দরবারে গমন না করেন এবং তাহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ না করেন। যে সব আমীরের ঐ সব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক সৈন্য আছে এবং ত্রিশ হইতে চল্লিশ সহস্র অনুচর আছে যেমন বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা

দরিয়া খান লোহানী, যাযীপুরের শাসনকর্তা নাসির খান এবং অযোধ্যা এবং লক্ষৌর[১] শাসনকর্তা শেখযাদা মুহম্মদ ফরমুলি এবং অন্যান্যগণের নিকট একজন বিশ্বস্ত বিশেষ প্রতিনিধিকে বিশেষ সম্মানীয় পোশাক, একটি অশ্ব এবং অন্যান্য উপহার[২] সহ প্রেরণ করা হয়। এই সব ফরমান যখন তাহাদের নিকট পৌঁছে তখন তাহাদের সকলেই শাহযাদার প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করেন এবং তাহার প্রতি বৈরী হইয়া যান।

এই সময়ে[৩] সুলতান চমৎকার মণিমুক্তাখচিত ও সুশোভিত একটি সিংহাসন দেওয়ানখানায় স্থাপন করেন। আর আঃ হিজরা ৯২৩ সনের যিল হিজ্জা মাসের ১৫ তারিখ শুক্রবার দিন (.৫১৭ খ্রীঃ) তিনি ইহাতে আরোহণ করেন এবং এক মহা দরবার সম্পন্ন করেন। তিনি প্রাসাদের ভৃত্যগণ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণ এবং সকল সামরিক অফিসারগণকে সম্মানীয় পোশাক, তরবারি ও ছোরার জন্য বেল্ট, এবং অশ্ব ও হস্তী এবং উচ্চ পদ এবং মর্যাদা এবং প্রত্যেকের পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী জায়গীর দান করেন।

কবিতা

তোমার যদি ক্ষমতা, মহত্ব আর মর্যাদা থাকে
অনুগ্রহ আর মর্যাদা দিয়া তোমার বন্ধুদের হৃদয় জয় কর।
ইহার দ্বারাই কাউস তাহার শত্রুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন
তিনি একজন রুস্তম হইলেও তোমার আদেশ পালন করিবেন।
তোমার সৈন্যদের প্রচুর অনুগ্রহ দ্বারা যুদ্ধে শক্তিশালী কর
কারণ মানবহন্তার কাছে সিংহও পরাজয় বরণ করে।

আর তিনি তাহাদের কানে আনুগত্যের কানবালা পরাইলেন[৪] এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন দ্বারা নূতন করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। তিনি ক্ষমতাবান এবং সাধারণ লোক সকলকেই তাহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন।

১. দুইটি পাণ্ডুলিপিতে আছে লক্ষৌতি, আর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে লক্ষৌ। এই স্থানে লক্ষৌই হইবে। ফিরিশতা লক্ষৌ লিখিয়াছেন।
২. সম্মানীয় পোশাক এবং অশ্বের সঙ্গে বেল্টসহ ছোরাও উপহারগুলির মধ্যে ছিল।
৩. তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফখানার মতে ঠিক এই তারিখেই শাহযাদা জালাল খান অনুরূপ এক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।
৪. ক্রীতদাসগণের কান ফুটা করিয়া তাহাতে যে আংটা পরান হয়, এই স্থানে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

তিনি ফকির, এবং দীন-দরিদ্রের প্রতি মহানুভবতার দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং তাহাদের ভাতা বৃদ্ধি এবং দান ও দক্ষিণা বৃদ্ধি করিলেন এবং যাহারা লোকচক্ষুর আড়ালে আছেন তাহাদের নিকট দান ও উপহার প্রেরণ করিলেন এবং আল্লাহর প্রতি তাহাদের বিশ্বাস দৃঢ় করিলেন। তিনি মহৎ কাজ ও সার্বভৌমত্বকে নব গৌরবে মণ্ডিত করিলেন; আর রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী শক্তিশালী ও অধিকতর সুদৃঢ় হইল।

শাহযাদা জালাল খান যখন সুলতানের এই সব কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিলেন[১] এবং ঐ সব জেলার আমীরগণের শত্রুতা লক্ষ্য করিলেন, তখন তিনি জৌনপুর ত্যাগ করিলেন এবং কাল্পী আগমন করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, সুলতান ইব্রাহীমের সহিত আলাপ-আলোচনা করা বা তাহাকে পরিহার করিয়া চলা আর সম্ভবপর নয় এবং তখন প্রকাশ্যে শত্রুতা প্রদর্শন আরম্ভ করিলেন আর তাহার সহিত যাহারা যোগ দিয়াছিলেন তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া জৌনপুর রাজ্যের সব আশা ত্যাগ করিলেন এবং কাল্পীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ নামে খোৎবা পাঠ করাইলেন এবং সিক্কাতে (মুদ্রা) নিজ নাম মুদ্রিত করিলেন এবং সুলতান জালালুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার অনুচর এবং সৈন্যদের প্রতি নজর দেওয়ার কাজে, এবং তাহার সাজ-সরঞ্জাম, কামানের কারখানার দেখাশুনার কাজে আর চতুর্দিকস্থ পরগণাসমূহের রাজা ও জমিদারগণকে সন্তুষ্ট করিবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন এবং অধিকতর শক্তিশালী এবং অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাবান হইয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনি আযম হুমায়ুন সরওয়ানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই সময় এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন; এবং নিম্নরূপ সংবাদসহ তাহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন, "আপনি আমার নিকট পিতা বা চাচার ন্যায়; আর আপনি জানেন যে, আমি কোন অন্যায় করি নাই, এবং সুলতান ইব্রাহীমের দিক হইতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে। যে স্বল্প পরিমাণ ভূখণ্ড এবং সম্পদ তিনি উত্তরাধিকাররূপে আমাকে বরাদ্দ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার প্রতিও তিনি তাহার চক্ষু বন্ধ করিয়াছেন; আর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন এবং ভালবাসার আকর্ষণ ভঙ্গ করিয়াছেন; আপনার পক্ষে ইহাই সঙ্গত হইবে যে আপনি ন্যায়ের পথ ত্যাগ করিবেন না এবং নির্যাতিত পক্ষকে সাহায্য করিবেন।" প্রকৃতপক্ষে আযম হুমায়ুনের সুলতান ইব্রাহীমের প্রতি বৈরী ভাব ছিল আর সুলতান জালালুদ্দীনের দারিদ্রতা, ভাগ্যের পরিহাস এবং বিনীত ভাব তাহাকে প্রভাবান্বিত করিল,

১. বদাওনী বলেন যে, "পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের আমীরগণের নিকট ফরমান জারি করিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাহারা যেন জালাল খানকে বন্দী করিয়া তাহাকে দরবারে আনয়ন করেন, আর তিনি জৌনপুর হইতে কাল্পী আগমন করিয়া......সুলতান জালালুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন।

আর তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে শাহযাদাকে (অর্থাৎ সুলতান জালালুদ্দীন) বাধা দিবার ও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তাহার নাই, ফলে তিনি কালিঞ্জর দুর্গের অবরোধ উত্তোলন করিলেন এবং দ্রুত সুলতান জালালুদ্দীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে গমন করিলেন। সুদৃঢ় সন্ধি ও অঙ্গীকার করিবার পর তাহারা স্থির করিলেন যে তাহারা প্রথমে জৌনপুর অঞ্চল এব তৎসন্নিহিত জেলাসমূহ অধিকার করিবেন এবং তৎপর অন্য বিষয় চিন্তা করিবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা অবিরাম পথ চলিয়া অযোধ্যার শাসনকর্তা এবং মুবারক খান লোদীর পুত্র সইদ খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাহাদের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন এব সুলতান ইব্রাহীমের নিকট প্রকৃত অবস্থার বিবরণ নিবেদন প্রেরণ করিলেন।

সুলতান ইব্রাহীম স্থির করিলেন যে তিনি এই বিদ্রোহ দমনের জন্য একদল বাছাই করা সৈন্যসহ অগ্রসর হইবেন। এই সময়ে তাহার শুভাকাঙ্খীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নির্দেশ দিলেন যে তাহার কতিপয় ভ্রাতা[১] যাহাদের কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল যেমন শাহযাদা ইসমাইল খান এবং হুসেন খান এবং মাহমুদ খান এবং শাহযাদা শেখ দৌলত খানকে হানসী দুর্গে নিয়া যাওয়া হইবে এবং তথায় কঠোর পাহারায় রাখা হইবে; আর ইহাদের প্রত্যেকের পরিচর্যার জন্য দুইজন বিশ্বাসভাজন ভৃত্য নিযুক্ত করা হইল আর তাহাদের আহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হইল। আঃ হিঃ ৯২০ সনের যি হিজ্জা মাসের ২৪ তারিখে সুলতানের পতাকা পূর্বাভিমুখে ফিরিল এবং অনবরত পথ চলিয়া সেনাবাহিনী ভোনগাঁও পৌঁছিল। ঐ স্থান হইতে ইহা কাণ্যকুব্জ অভিমুখে গমন করিল। পথিমধ্যে সংবাদ আসিল যে আযম হুমায়ুন তাহার সুবিজ্ঞ পুত্র ফতেহ খানসহ শাহযাদা জালাল খানের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন এবং সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য আগমন করিতেছেন। এই সুসংবাদ সুলতানের হৃদয়ে প্রভূত শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করিল। আযম হুমায়ুন যখন নিকটে আসিলেন সুলতান

১. কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ভ্রাতাগণ ও আত্মীয়গণ। বদাওনী শুধু ইসমাইল খান ও হুসেন খানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তৎপব অন্যান্যদের যোগ করিয়াছেন। ফিরিশতা বলেন যে ইসমাইল খান, হুসেন খান এবং মাহমুদ খানকে দৌলত খানের নিকট সমর্পণ করা হয়। কর্ণেল ব্রিগস বলেন যে ইব্রাহীম তাহার অন্যান্য ভ্রাতাগণকে হানসী দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। সম্ভবতঃ ফিরিশতাই ঠিক লিখিয়াছেন, তাহা হইলে এই অংশের অনুবাদ এইরূপ দাঁড়াইবে, "তিনি শাহযাদা শেখ দৌলত খানকে নির্দেশ দান করিলেন যেন তিনি তাহার (সুলতানের) ভ্রাতাগণের কয়েকজনকে, যাহাদের কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, যেমন শাহযাদা ইসমাইল খান ইত্যাদিকে হানসী দুর্গে নিয়া যান এবং তথায় কড়া পাহারায় রাখেন।"

ইব্রাহীম তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহার অধিকাংশ আমীরগণকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে রাজকীয় অনুগ্রহ দ্বারা উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই সময়ে খ্যাতনামা মাওয়াস[১] কোল পরগণার অন্তর্গত জারতোলির জমিদার মানচান্দ[২] সিকান্দর সুরের পুত্র উমরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহাকে শহীদে পরিণত করিয়াছিল (অর্থাৎ নিহত করিয়াছিল); আর সম্বলের গভর্ণর মালিক কাসিম ঐ বিদ্রোহীকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন এবং নিহত করেন এবং এইরূপে এই অভাবিত বিশৃঙ্খলা দমন করেন এবং কান্যকুব্জে আগমন করেন। তথায় সুলতান শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় তাহার খেদমত করিতে নিজেকে সমর্পণ করেন। জৌনপুরের অধিকাংশ আমীর ও জায়গীরদার যেমন সইদ খান এবং অন্যান্যগণ সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আগমন করেন এবং তাহার শুভাকাঙ্খীদের দলের অন্তর্ভুক্ত হন। এই সময়ে (সুলতান) আযম হুমায়ুন সরওয়ানী এবং আযম হুমায়ুন লোদী[৩] এবং নাসির খান লোহানী এবং অন্যান্যদের এক বিশাল বাহিনী এবং পর্বত প্রমাণ হস্তীসহ শাহযাদা জালাল খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন এই সময়ে কাল্পীতে ছিলেন। উপরোক্ত আমীরগণ ঐ স্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি নয়ামত খাতুন এবং কুতব খান লোদীর অনুচরগণ এবং ইমাদুল মুলক এবং মালিক বদরুদ্দীন এবং তাহার পরিবারের লোকদের একদল সৈন্যসহ কাল্পী দুর্গে রাখিয়া যান এবং স্বয়ং তিনি ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী এবং কতিপয় হস্তীসহ আগ্রা অভিমুখে গমন করেন। সুলতান ইব্রাহীমের বাহিনী কাল্পী অবরোধ করে এবং কামান ও বন্দুকের যুদ্ধে কয়েক দিন অতিবাহিত হয়। অবশেষে দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ সুলতানের বাহিনীকে বাধা দিবার পক্ষে নিজেদের অতি দুর্বল গণ্য করে এবং শেষোক্ত জন দুর্গ অধিকার করে। শহরটি লুট করা হয় এবং বহু দ্রব্যসম্ভার সৈন্যদের হস্তগত হয়।

সুলতান অতিদ্রুত আগ্রা রক্ষা করিবার জন্য মালিক আদমের[৪] সঙ্গে এক সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। শাহযাদা জালাল খান আগ্রার উপকণ্ঠে পৌঁছিলেন এবং কাল্পীর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আগ্রা লুণ্ঠন করিতে মনস্থ করেন। এই সময়ে মালিক আদম আগ্রা আসিয়া উপস্থিত হন এবং মধুর বাক্য দ্বারা জালাল খানের

১. মাওয়াস দোয়াবের একটি জেলা।

২. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি বিভিন্নরূপ দেওয়া আছে যেমন খান, খানচান্দ, মানচান্দ এবং মাজ চান্দ। ফিরিশতা লিখিয়াছেন জয়চান্দ।

৩. ফিরিশতা তাহার নাম লিখিয়াছেন আযম খান লোদী।

৪. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এবং ফিরিশতায় ইহাকে মালিক আদম বলা হইয়াছে। কিন্তু বদাওনী তাহার নাম লিখিয়াছেন মালিক আদম কাকব। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানাতেও তাহাকে মালিক আদম কাকর বলা হইয়াছে।

মধুর স্বভাবকে নরম করিয়া তাহাকে আগ্রা লুণ্ঠন স্থগিত রাখিতে সম্মত করান, আর ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দীন জিলওয়ানীর পুত্র মালিক ইসমাইল, এবং কবির খান লোদী এবং বাহার খান লোহানী এবং অন্যান্য কতিপয় আমীর এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ আগমন করেন এবং মালিক আদম প্রভৃত ক্ষমতা সঞ্চয় করেন। ইহার পর তিনি জালাল খানের নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিয়া জানান[১] যে তিনি যেন রাজকীয় ছত্র, আফতাবগীর সূর্য-ছত্র) নৌবত (বৃহৎ নাকাড়া) এবং নাকাড়া এবং অন্যান্য রাজকীয় আনুসঙ্গিক প্রতীকসমূহ ত্যাগ করেন এবং নিজেকে আমীরদের ন্যায় পরিচালিত করেন যাহাতে তিনি (মালিক আদম সুলতানের নিকট তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন ; আর পূর্বের ন্যায় সরকার কাল্পী তাহার জায়গীর থাকিতে পারেন। জালাল খান এইসব শর্তে সম্মত হইয়া রাজকীয় প্রতীক-সমূহ ত্যাগ করেন।

শ্লোক

দম্ভ করিয়া কেহ কখনই মহান লোকদের মধ্যে
নিজের আসন করিয়া লইতে পারে না।
যতক্ষণ না সে মহান হইবার আনুসঙ্গিক সবকিছু
প্রস্তুত করিয়া নিতে পারে।

মালিক আদম রাজকীয় ছত্র এবং সূর্য-ছত্র এবং নাকাড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং এইগুলি সুলতানের নিকট প্রেরণ করিলেন, সুলতান ইতিমধ্যে কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং ইতাওয়া আগমন করিয়াছেন। মালিক আদমের নিবেদন-সহ জিনিসগুলি তাহার সম্মুখে হাজির করা হইল কিন্তু তিনি জালাল খানের সহিত প্রস্তাবিত সন্ধিতে সম্মত হইলেন না এবং জালাল খানের ধ্বংসের জন্য তাহার মনো-যোগ নির্দেশ করিলেন। শেষোক্ত জন এই সংবাদ শুনিয়া গোয়ালিয়রের রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সুলতান আগ্রায় অবস্থান করিলেন এবং সুলতান সিকান্দরের ইন্তেকালের পর রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে যে শৈথিল্য আসিয়াছিল তাহা সুশৃঙ্খল এবং সুদৃঢ় হয়। যে সব আমীরগণ বৈরী ছিলেন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বিশ্বস্ততার সহিত তাহা-দের আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর হায়বাত খান গুর্গ আন্দাজ এবং

১. তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানা বলে যে জালাল খান ভীরুর ন্যায় এই সব শর্ত মানিয়া লন, যদিও তাহার প্রধানগণ তাহাকে ইহাতে সম্মত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার এই কার্যের কুফল কি হইবে তাহা বুঝাইয়াছিলেন। বদাওনী এবং ফিরিশতাও তাহার এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

করিম দাদ তোগ এবং দৌলত খান ইন্দরকে দিল্লীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় :[১] আর শেখযাদা মনঝুকে[২] চন্দেরী দুর্গের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য আর সুলতান নাসিরুদ্দীন মালভীর পৌত্র শাহযাদা মুহম্মদ খানের পেশোয়ার (প্রতিনিধি) কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

কালক্রমে সুলতানের হৃদয় মিয়া ভুদার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে,[৩] তিনি সুলতান সিকান্দরের একজন অন্যতম প্রধান আমীর এবং উযির ছিলেন কিন্তু তিনি তাহার ভূতপূর্ব খেদমতের ফলে সুলতানের ইচ্ছা অনুসরণ করিতে গাফিলতি প্রদর্শন করেন এবং অবস্থা এইরূপ পর্যায়ে পৌঁছে যে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় আর তাহাকে মালিক আদমের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। সুলতান কিন্তু তাহার পুত্রকে ক্ষমা করেন এবং তাহাকে সম্মানে ভূষিত করিয়া তাহাকে তাহার পিতার পদে নিয়োগ করেন। কারারুদ্ধ অবস্থায়ই মিয়া ভুদা ইন্তেকাল করেন[৪]।

এই সময়ে সুলতানের মনে হয় যে যেহেতু সুলতান সিকান্দর সর্বদাই গোয়ালিয়র এবং ঐ সব জেলার বাকী দুর্গ ও শহরগুলি বিজয়ের বাসনা পোষণ করিতেন এবং

১. বদাওনীতে এই নামগুলি দেওয়া নাই; তিনি দিল্লী ও চন্দেরী রক্ষার জন্য কাহাকেও প্রেরণের কোন উল্লেখ করেন নাই। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানা বলে, করিমদাদ খান তারকে অন্যান্য আমীরগণসহ দিল্লীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ফিরিশতা এই গ্রন্থের ন্যায় একই নাম দিয়াছেন, তবে তিনি দৌলত খান ইন্দরকে দৌলত খান ইন্দরায় লিখিয়াছেন। এই শেষ নামটি সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপিতে পার্থক্য দেখা যায়; একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে ইন্দর। আর একটিতে আছে আইদর আর অন্যান্যগুলিতে দৌলত খানের নামই বাদ পড়িয়াছে এবং দাগ এর সহিত দার যোগ করিয়াছে। কর্ণেল ব্রিগস লিখিয়াছেন যে দুইজন আমীর করিমদাদ খান তারক এবং দৌলত খানকে দিল্লীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

২. বদাওনী বা তারিখ-ই সালাতিন-ই-আফঘানাতে এই নামের কোন উল্লেখ নাই। ফিরিশতা লিখিয়াছেন শেখ মচ্ছু; কিন্তু তাবাকাতের সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই আছে শেখযাদা মনঝু। কর্ণেল ব্রিগস ইহার নাম লিখিয়াছেন শেখযাদা মুহম্মদ ফরমুলি।

৩. বদাওনী মিয়া ভুদার প্রতি সুলতানের বিরাগের কোন কারণ দেন নাই। ফিরিশতা এই গ্রন্থের ন্যায় এই কারণ দিয়াছেন। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানাতে অন্যরূপ কারণ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে গোয়ালিয়র বিজয়ের পর সুলতান অত্যন্ত অহংকারী হইয়া উঠেন এবং তাহার পিতার আমীরগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং যে মিয়া ভুদা আটাশ বৎসর ধরিয়া তাহার পিতার মন্ত্রী ছিলেন, তাহাকে তিনি কারারুদ্ধ করেন।

৪. তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানাতে মিয়া ভুদা, ইসলাম খান এবং অন্যান্য কতিপয় আমীর সম্বন্ধে এক বিবরণ দিয়াছেন। তাহাদিগকে সুলতান একটি কক্ষে গমন করিয়া তথায় সলা-পরামর্শ করিবার নির্দেশ দেন। তাহারা কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া তাহাই করে কিন্তু কক্ষটির নীচে আর একটি গুপ্তকক্ষ বারুদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছিল; আর তাহাদের সকলেই বারুদে উড়িয়া যায় এবং ঝড়ের মুখে গাছের পাতার ন্যায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বারুদ দ্বারা তাহাদিগকে হত্যার বিবরণ কিন্তু আর কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না।

পুনঃ পুনঃ তাহার বাহিনী পরিচালনা করিয়াও কখনও তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন নাই। যদি সৌভাগ্য তাহাকে পরিচালনা করে এবং বিজয় তাহাকে পথ প্রদর্শন করে তবে তিনি সম্ভবতঃ রাজোচিত দৃঢ়তার সহিত গোয়ালিয়র এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চলটি দখল করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাররা জেলাসমূহের গভর্ণর আযম হুমায়ুন সরওয়ানীকে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী এবং তিনশত হস্তীসহ গোয়ালিয়র বিজয়ে প্রেরণ করেন। আযম হুমায়ুন যখন গোয়ালিয়রেব সন্নিকটে উপস্থিত হন তখন শাহযাদা জালাল খান ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া মালবের সুলতান মাহমুদের[১] নিকট গমন করেন। প্রায় এই সময়েই আলম খান লোদীর পুত্র ভিখন খান এবং জালাল খান লোদী এবং সুলেমান ফরমুলি এবং বাহাদুব খান লোহানী এবং বাহাদুর খান সরওয়ানী এবং মালিক ফিরোয আখওয়ানের পুত্র ইসমাইল এবং খিযর খান লোহানী এবং ভিখন খান লোদীর ভ্রাতা খিযর খান এবং খান-ই-জাহানকে এক বিশাল বাহিনী এবং কতিপয় হস্তীসহ আযম হুমায়ুনকে সাহায্য করিতে এবং গোয়ালিয়র অবরোধ করিতে আর ঐ দেশটি জয় করিতে প্রেরণ করা হয়। ঘটনাক্রমে এই সময়ে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা রাজা মান যিনি সাহসিকতা এবং দয়াশীলতার জন্য তাহার সমকক্ষ ও প্রতিবেশীগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু বৎসর ধরিয়া দিল্লীর সুলতানগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন, মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার পুত্র রায় বিক্রমজিৎ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া দুর্গটিকে শক্তিশালী করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সুলতান ইব্রাহীমের আমীরগণ তাহার নির্দেশ অনুযায়ী একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এব প্রতিদিন তথায় সমবেত হইয়া সর্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করিতেন এবং অবরোধ পরিচালনার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে থাকেন। কিন্তু ব্যাপার এইরূপ ছিল যে রাজা মান দুর্গের নীচে ইহাকে বেষ্টন করিয়া একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন[২] এবং ইহা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল আর ইহাকে বলা হইত বাদলগড়। বেশ কিছুকাল পর সুলতানের সৈন্যগণ মাইন খনন করিয়া তাহাতে বারুদপূর্ণ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল এবং দুর্গের দেওয়াল উড়িয়া গেলে ইহাতে প্রবেশ করিল এবং ঐ স্থানটি দখল করা হয়। ঐ স্থানে তাহারা একটি পিতলের ষাঁড়[৩] দেখিতে পান, হিন্দুগণ বহু বৎসর ধরিয়া ইহার

১. সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে এবং তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানাতে এবং ফিরিশতাতেও এইরূপই আছে। কিন্তু ফিরিশতা মালবের রাজার নাম লিখিয়াছেন সুলতান মাহমুদ খিলজি।

২. অর্থ সুস্পষ্ট নয়। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাঠের সামান্য তারতম্য দেখা যায়।

৩. তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানীতে আছে যে ষাঁড়টি তাম্র নির্মিত ছিল আর ইহার মুখ হইতে এক প্রকার শব্দ নির্গত হইত। আর ইহা আগ্রার দুর্গে নিয়া যাওয়া হয় এবং তাহা সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত তথায় বর্তমান ছিল, আর সম্রাট আকবর ইহা কামান তৈরীর জন্য গলাইয়া

পূজা করিয়া আসিতেছিল। সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ পিতলের ষাঁড়টি দিল্লীতে নিয়া যাওয়া হয় এবং তাহা বোগদাদ দরওয়াজায় স্থাপন করা হয়। হযরত খলিফা ইলাহীর (সম্রাট আকবর) রাজত্বকাল পর্যন্ত ঐ ষাঁড়টি দিল্লীর প্রবেশদ্বারে অবস্থিত ছিল। এই ইতিহাসের লেখক স্বয়ং ইহা দেখিয়াছেন।

সংক্ষেপে ঐ সময়ে সুলতান ইব্রাহীম তাহার পিতার আমলের বৃদ্ধ আমীরগণের প্রতি আস্থা হারান আর তিনি মহা-খানদের অধিকাংশকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়েই শাহাযাদা জালাল খান, যিনি গোয়ালিয়র হইতে সুলতান মাহমুদ মালভীর নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত সমাদর লাভ না করিবার ফলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করেন; এবং কারা কতিঙ্ক[১] দেশে গমন করেন আর তথায় একদল গোণ্ড কর্তৃক তিনি কারারুদ্ধ হন। তাহারা তাহাকে পাহারারত অবস্থায় সুলতান ইব্রাহীমের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত জন তাহাকে হান্‌সী দুর্গে প্রেরণ করেন আর পথিমধ্যে তিনি শহীদ হন।

কবিতা

ক্ষমতা ও দম্ভের শরবত এত সুমিষ্ট
যে রাজাগণ তাহার তৃষ্ণায় তাহাদের ভ্রাতার রক্তপাত ঘটায়;
ক্ষমতার জন্য ভগ্নহৃদয়ের রক্তপাত করিও না
তোমার জন্যে তাহারা ইহার বিন্দুই পেয়ালায় ঢালিবে।

ইহার কিছুকাল পর আযম হুমায়ুন সরওয়ানী এবং তাহার পুত্র ফতেহ খান, যাহারা গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করিতেছিলেন, আর তাহা প্রায় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সুলতানের নির্দেশক্রমে আগ্রা আগমন করিলেন আর শেষোক্ত জন তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন। এই কারণে আযম হুমায়ুনের পুত্র ইসলাম খান, যিনি কারাতে ছিলেন, বিদ্রোহ করিলেন এবং তাহার পিতার সম্পত্তি ও সাজ-সরঞ্জাম দখল করিলেন এবং যে আহমদ খানকে ঐ স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহার নিকট দখল দিতে অস্বীকার করিয়া সৈন্য ভর্তি করিতে এবং

ফেলেন। বদাওনীর গ্রন্থে আছে একটি পিতলের মূর্তি, কিন্তু অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে আছে পিতলের জন্তু। বদাওনী ও ফিরিশতা একটি অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করেন যে আমীরগণ ষাঁড়টি সুলতানের নিকট আগ্রায় প্রেরণ করেন এবং সুলতান তথা হইতে ইহা দিল্লী প্রেরণ করেন।

১. কতিপয় পাণ্ডুলিপিতেই নামটি এইরূপ দেওয়া আছে। অন্যান্যগুলিতে নামটি স্পষ্টভাবে লিখা নাই। বদাওনী লিখিয়াছেন কারা কংক। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘানাতে আছে গড় কনটক। ফিরিশতাতে আছে রাজা গড়।

সেনাবাহিনী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। আহমদ খান তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হন। সুলতান ইব্রাহীম এই সংবাদ শুনিয়া ইহার প্রতিকারের ইচ্ছা করেন এবং এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন; আর এই সময়েই সহসা আযম হুমায়ুন এবং সইদ খান লোদী, যাহারা ছিলেন প্রখ্যাত আমীরগণের মধ্যে অন্যতম, তাহার সেনাবাহিনী (সুলতানের বাহিনী) হইতে পলায়ন করেন এবং লক্ষ্ণৌ গমন করেন। এই স্থানটি ছিল তাহাদের জায়গীর এবং তাহারা তথায় বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে আরম্ভ করেন। সুলতান ইব্রাহীম তাহাদের আক্রমণ করিতে আযম হুমায়ুন লোদীর ভ্রাতা আহমদ খান[১] এবং হুসেন ফরমুলির পুত্রগণ এবং মজলিস আলী শেখযাদা মুহম্মদ ফরমুলি, আলী খান খান-ই-খানান ফরমুলি এবং মজলিস আলী ভিখারী ফরমুলি এবং আহমদ খানের পুত্র দিলাওয়ার খান এবং সারঙ্গ খান এবং ঘাযী খান জালওয়ানীর পুত্র কুতব খান, এবং ভিখন খান লোহানী এবং আদম কাকরের পুত্র সিকান্দর এবং তাহাদের স্বীয় অন্যান্যদের, তাহাদের সঙ্গে এক বিরাট বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। তাহারা যখন কান্যকুব্জের নিকটস্থ বাঙ্গরমৌ শহরের উপকণ্ঠে পেঁৗছেন, তখন আযম হুমায়ুন লোদীর স্বগোত্রীয়[২] ইকবাল খান ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং কতিপয় হস্তীসহ সহসা লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং তাহাদের উপর নিপতিত হন আর বহু সংখ্যক লোককে আহত ও নিহত করিয়া এবং সৈন্য-বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়া চলিয়া যান।

এই সংবাদ যখন সুলতানের নিকট পেঁৗছে তখন তিনি আমীরগণকে বহু তিরস্কার করিয়া পত্র প্রেরণ করেন এবং তাহাদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বিদ্রোহীদের নিকট হইতে ঐ ভূখণ্ড অধিকার করিতে সক্ষম না হইবে ততক্ষণ তাহারাও অভিযুক্ত ও পরিত্যাজ্যদের দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন; আর সাবধানতারূপে অপর একদল আমীরও খানকে বিশাল এক সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীগণের দিকেও ৪০,০০০ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০০ হস্তী সংগৃহীত হয়। উভয় পক্ষ যখন পরস্পরের সম্মুখে অগ্রসর

১. বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নামগুলি সম্বন্ধে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কয়েকটি নাম অন্য কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না যেমন মজলিস আলী ভিখারী এবং ভিখন খান লোহানী। বদাওনী বলেন যে সুলতান ইব্রাহীম আযম হুমায়ুন লোদীর ভ্রাতা আহমদ খানের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফঘান বলেন যে সুলতান অপর এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন। ফিরিশতা লিখিয়াছেন যে তাহাদের সাহায্যের জন্য অপর এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করেন।

২. ফিরিশতা ইহাকে আযম হুমায়ুন লোদীর ক্রীতদাস আখ্যা দিয়াছেন। কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে আছে শুধু হুমায়ুন লোদী, 'আযম' শব্দটি নাই।

হয় আর যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয় তখন ঐ যুগের প্রধান বা নেতা শেখ রাজু বুখারী[১] উভয়ের মধ্যে আগমন করেন এবং উভয় পক্ষকে বিরত করিয়া বিদ্রোহীগণকে উন্নত নীতিকথা এবং মহান উপদেশ দ্বারা পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা বহু যুক্তি প্রদর্শন করিবার পর নিবেদন করেন যে সুলতান যদি আযম হুমায়ুন সরওয়ানীকে মুক্ত করিয়া দেয় তবে তাহারা তাহার রাজ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকিবে এবং তাহার প্রতি কোনরূপ শত্রুতা প্রদর্শন করিবে না এবং অন্য কোন রাজ্যে চলিয়া যাইবে। এই প্রস্তাব যখন সুলতানের নিকট পেঁৗছিল, ইহা তাহার অনুমোদন লাভ করিল না এবং তিনি বিহারের গভর্ণর দরিয়া খান লোহানী এবং নাসির খান লোহানী এবং শেখযাদ মুহম্মদ ফরমুলিকে নির্দেশ দান করেন তাহারা যেন ঐ দিক হইতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং বিদ্রোহ দমন করেন।

ঐ সেনাদলগুলি যখন ঐ দিক হইতে আগমন করে, বিদ্রোহীগণ তাহাদের অহমিকার ফলে সুলতানের নিয়তির মহত্ব আর তাহার সেনাবাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ অনুভব করে না এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে; আর উভয় পক্ষে সু-সন্নিবেশিত সৈন্যগণ প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এমন রক্তের স্রোত বহাইয়া দেয় যে তাহা দেখিয়া এই যুগের চক্ষু অন্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত যেহেতু বিদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতার ফল মন্দ হয় এবং ইহা কখনও সৌভাগ্য সূচিত করে না, বিদ্রোহী ইসলাম খান নিহত হয়, আর দরিয়া খান লোহানীর সৈন্যগণ কর্তৃক সইদ খান বন্দী হন। বিদ্রোহ ধ্বংস করা হয় এবং বিদ্রোহীদের সম্পদ এবং ভূভাগ সুলতান ইব্রাহীমের অধিকারে আসে।

কবিতা

তোমার উপকারীর প্রতি মেঘমালার ন্যায় ব্যবহার করিও না।
তাহারা সমুদ্র হইতে তাহাদের সম্পদ আহরণ করে
অথচ তাহারই বক্ষে তীর নিক্ষেপ করে।
নদীর ন্যায় হইলেও কৃতজ্ঞতাকে তোমার অভ্যাসে পরিণত কর
ইহা এক বিন্দু বারি লাভ না করিয়াই মেঘকে একটি সমুদ্র দান করে।

সুলতান এই সংবাদ লাভ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হন।[২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেহেতু আমীরগণের প্রতি সুলতানের ঘৃণা তাহার হৃদয় হইতে চলিয়া যায় নাই এবং

১. তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানাতে তাহার নাম লিখা আছে শেখ রাজু। বদাওনী তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

২ তাবাকাত এবং বদাওনী এবং ফিরিশতার বিবরণে মিল আছে কিন্তু তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানাতে এক বিবরণ দেওয়া আছে যে রাজা সাংকের অধীনে রাজপুতগণ এবং মিয়া মাখনের, যাহাকে

আমীরদের সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক মতদ্বৈধতা আর তাহার প্রতি তাহাদের প্রকাশ্য এবং গোপন শত্রুতা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায় আর আমীর ও মালিকদের অনেকেই, যেমন মিয়া ভুদা এবং আযম হুমায়ুন সরওয়ানী যিনি ছিলেন আমীর-উল উমরা, সুলতানের নির্দেশে কারারুদ্ধ হইয়া ঐ অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। বিহারের গভর্ণর দরিয়া খান লোহানী এবং খান জাহান লোদী এবং মিয়া হাসান ফরমুলি এবং তাহাদের ন্যায় অন্যান্যগণ যে ভয় ও আশঙ্কা তাহাদিগকে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সুলতানের আনুগত্য হইতে তাহাদের মাথা ফিরাইয়া দেয় এবং শত্রুতার পতাকা উত্তোলন করে। ঘটনাক্রমে এই সময় চন্দেরীর কতিপয় নীচ জাতীয় শেখযাদা কর্তৃক তথায় মিয়া হুসেন ফরমুলি সুলতানের প্ররোচনায় নিহত হন; আর ইহা সুলতানের প্রতি আমীরগণের ঘৃণার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইয়া উঠে।

ইহার কিছুকাল পর দরিয়া খান লোহানী ইন্তেকাল করেন এবং তাহার পুত্র বাহাদুর খান সুলতানের নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া, এবং এক বিশেষ পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার পিতার স্থানে বসিয়া পড়ে; আর যে সব আমীর সুলতানের প্রতি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাহারা তাহার সহিত যোগদান করেন আর তাহারা বিহার অঞ্চলে এক লক্ষ অশ্বারোহী সংগ্রহ করে এবং সম্বল পর্যন্ত ঐ দেশটি দখল করিয়া নেয় এবং সুলতান মুহম্মদ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার নিজ নামে খোৎবা পাঠ করান আর মুদ্রা প্রচলন করেন। এই সময়ে ঘাযীপুরের গভর্ণর নাসির খান লোহানী সুলতানের বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহার নিকট গমন করেন; আর কয়েক মাস কাল[১] বিহার ও তাহার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে তাহার নামে খোৎবা পাঠ হয়; আর এই সময়ের মধ্যে তিনি সুলতানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নিজেকে তাহার সমকক্ষ সপ্রমাণ করেন।

ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে দৌলত খান লোদীর পুত্র[২] লাহোর হইতে সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আগমন করেন। কিন্তু তিনি শেষোক্ত জন সম্বন্ধে সন্দিহান

তিনি অন্যান্য অধিক বয়স্ক এবং অধিকতর সেনাপতিগণের বাদ দিয়া তাহাকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নেতৃত্বে সুলতানের সেনাবাহিনীর মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে আযম হুমায়ুনের হত্যারও একটি পারিপার্শ্বিক ঘটনার বিবরণ দান করেন। ইহাতে আরও আছে যে মিয়া হুসেন ফরমুলি বা হুসেন খানের ঘাতকগণ ইনামরূপে ৭০০ স্বর্ণমুদ্রা ও দশটি গ্রাম লাভ করে। তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগান দরিয়া খান লোহানীর পুত্রকে শাহবাজ খান নাম দিয়াছেন।

১. ওয়াকিয়াত-ই-মুশতাকী বলে যে তাহার নামে দুই বৎসর কয়েক মাস সময় খোৎবা পাঠ করা হয়।

২. তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানী বলে যে তিনি ছিলেন দৌলত খানের কনিষ্ঠ পুত্র আর তাহার নাম ছিল দিলাওয়ার খান। ইহা আরও বলে যে দৌলত খান তাহাকে কাবুলে বাবরের নিকট প্রেরণ

হইয়া উঠেন এবং পলায়ন করিয়া তাহার পিতার নিকট গমন করেন। যেহেতু দৌলত খান সুলতানের কোপ এবং ভয়ানক শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়ার কোন পথ দেখিতে পাইলেন না, তিনি কাবুলে গমন করিলেন এবং হযরত ফির্দৌস মকানী (স্বর্গবাসী সম্রাট) বাবর বাদশাহের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং শেষোক্ত জনকে ভারত আক্রমণের জন্য আনয়ন করেন। পথিমধ্যে দৌলত খান ইন্তেকাল করেন আর বিহারের সুলতান মুহম্মদও ইন্তেকাল করেন। যদিও হিন্দুস্তান বিজয়ের সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পূর্ণ করা হইয়াছিল, তবু মহান বাদশাহ প্রধানতঃ আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়াই পানিপথের সন্নিকটে সুলতান ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং শেষোক্ত জন পরাজিত হন; এবং তিনি আর বহু সংখ্যক আমীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্ব লোদী আফগানদের বংশ হইতে এই সৌভাগ্যশালী বংশে চলিয়া যায়। সুলতান ইব্রাহীমের রাজত্বকাল ৭ বৎসর কয়েক মাসকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

করেন আর বাবর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন যে যদি বিজয় লাভ করাই তাহার নিয়তি হয় তবে আল্লাহ তাহার নিকট পান ও আম ইঙ্গিতস্বরূপ প্রেরণ করিবেন, কারণ তাহার নিকট এই দুইটি জিনিসই ছিল ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু। ব্যাপার এইরূপ ঘটে যে দৌলত খান, মধুর পাত্রে ভরিয়া কতিপয় অর্ধ পক্ক আম এবং পান আহমদ খানের হস্তে প্রেরণ করেন আর দিলাওয়ার খান এইসব বাবরকে উপহার দেন। বাবর তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করেন এবং আক্রমণের দৃঢ় সংকল্প করেন। এই বিবরণে আমীরগণ কর্তৃক আলম খান লোদীর হস্তে প্রেরিত দরখাস্তের কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু ইহা তবাকাতের গ্রন্থকার, বদাওনী এবং তারিখ-ই-খান জাহান লোদী লিখিয়াছেন। ফিরিশতা আলম খান লোদীর উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন দৌলত খান কাবুলে বাবরের নিকট একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করেন।